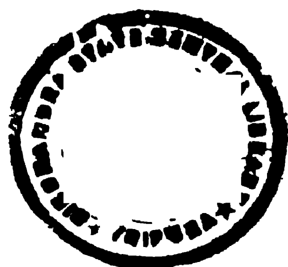
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়





মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

সম্পাদনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন— অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রণ— সানলিথোগ্রাফী

ASUTOSH MUKHOPADHYAYA RACHANAVALI VOL. V
An Anthology of Complete Works of Asutosh Mukherjee
Vol V. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10. Shyama Charan Dey Street. Calcutta-700 073.

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও লেজার ইম্প্রেশানস্‌, অরিজিৎ কুমার কর্তৃক ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা-৪ হইতে কম্পোজ করিয়া অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

ভূমিকা

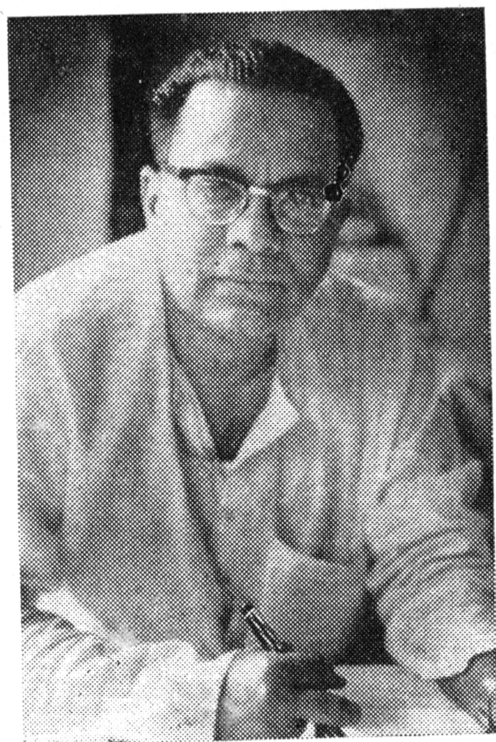
আলোচ্য খণ্ডে যথাক্রমে 'সেই অজানার খোঁজে' (প্রথম ভাগ), 'রাগশর' এবং 'মানুষের দরবারে'—এই তিনখানি উপন্যাস সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই নির্বাচন রচনার কালানুক্রমিকতার আদর্শে স্থিরীকৃত হয়নি, হয়েছে বিষয়গত বিভিন্নতার দিকে লক্ষ রেখে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন, তাঁর সৃষ্টির সবিশেষ আকর্ষণ বিষয়-পরিবেশ-চরিত্রায়নের বৈচিত্র্যমুখী রূপায়ণ। সেদিক থেকে খণ্ডটি অবশ্যই পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করবে। 'সেই অজানার খোঁজে' ঈশ্বরপ্রীতির অন্তর্লগ্ন তাৎপর্য অনুসন্ধানে কেন্দ্রীভূত। তন্ত্রসাধনার রহস্যময় পরিমণ্ডলে উপন্যাসখানির চালচিত্র বিকশিত হয়েছে। কালীকিঙ্কর অবধূত, দিব্যাঙ্গনা মাতাজী, মহাশ্মশানের সাধক-ভৈরব কংকালমালী—উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি আমাদের এক সম্পূর্ণ ভিন্নতর অভিজ্ঞতার জগতে পৌঁছে দেয়। 'রাগশর' লেখকের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির অন্যতম। বিষয় পাপবদ্ধ আবেগতাড়িত জীবন থেকে বৃহত্তর সাধনার জগতে মুক্তিলাভের চেষ্টা। উপন্যাসের প্রধান তিন চরিত্র অঙ্কু-অনুশ্রী-বিভূতি আমাদের পরিচিত জগতের মানুষ। এদের ত্রিকোণ প্রেমের টানাপোড়েন আমাদের কাছে অভিনব কিছু বলে মনে না হলেও মুখ্য চরিত্র অঙ্কুকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গীতসাধনার বিচিত্র প্রয়াস এবং তজ্জনিত ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতার দিগন্তকে উন্মোচিত করে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিচিত্র রাগরাগিণীর পরিচয়ে উপন্যাসখানি সমৃদ্ধ। সেইসঙ্গে সঙ্গীতসাধনার পূর্ণতার অন্বেষায় অঙ্কুর কাশী-লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি দূর দূরান্তে পর্যটন—নুরনওয়াজ খাঁ জামাল খাঁ, কিশোর মহারাজ, পণ্ডিত ভাসের একমাত্র কন্যা কুন্তীবাঈ, তারাবাঈ প্রভৃতির সান্নিধ্যে আসা এবং একাধারে হৃদয়াবেগ ও সাধনার বিপরীত আবর্তে পড়ে উপন্যাসের পরতে পরতে অঙ্কু যে বিপুল সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে জড়িয়ে পড়েছে সেসব অভিজ্ঞতা লেখকের অসামান্য লেখনীগুণে পাঠককেও সম্মোহিত করে। বলতে বাধা নেই, এজাতীয় অভিভূতি বাংলা উপন্যাসে সহজলভ্য নয়। 'মানুষের দরবারে' উপন্যাসের পটভূমি বিহারের দেহাত অঞ্চল। শহর পাটনা থেকে দূরবর্তী না হলেও যেসব অঞ্চলের জীবনধারা বিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও মধ্যযুগীয় বর্বর অনুশাসন-অপশাসনে জর্জরিত। ভূস্বামী-জোতদারের অকরুণ অত্যাচার, বিকৃত লালসা আর হৃদয়হীন উৎপীড়নে যেখানে এখনো নিম্নবর্গের মানুষ বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু থেকে বঞ্চিত। সে এক এমন অবিশ্বাস্য অঞ্চল যেখানে কোন আইন নেই নীতিনিয়ম নেই, আছে বলবান ভূস্বামীর ভূমিসেনার দল। যাদের কাজ দলিত অসহায় মানুষের রক্তে হোলীখেলা। যেখানে জাতপাত আর ছুঁৎমার্গের আবিলতায় মানুষে মানুষে বিস্তর ফারাক। গ্রাম-ভারতবর্ষ বিশেষ করে বিহারের গ্রামীণ জীবনের সাম্প্রতিককালের এক বিশ্বস্ত দর্পণ হিসেবে 'মানুষের

দরবারে' উপন্যাসখানির মূল্য অপরিসীম। পরিবেশ রচনাতেও লেখকের দক্ষতা স্মরণযোগ্য। ছুপা গ্রাম এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিচিত্র বর্ণ এবং বর্গের মানুষের যেসব চিত্র-চরিত্র লেখক এঁকেছেন তা ভূস্বামী ব্রীজমোহন এবং তার সাগরেদ ভাইপো বাবুয়া, মহাবীর প্রসাদ, জগদেও মিশির, পূজারী জনার্দন ঠাকুর কিংবা পার্শ্ববর্তী লোহার গ্রামের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কুন্দন সিং থেকে অচ্ছুত মেয়ে তিতলি, তার উদাসীন মদ্যপ কবিস্বভাবের বাপ বলদেও মল্লার, লোভী ফুফু হীরামল্লা, বৈরী ব্রীজমোহন এবং কুন্দন সিং'এর ডবল এজেন্ট তোতারাম এবং তার প্রেমিকা দুলারী পর্যন্ত সবই আমাদের আকর্ষণ করে।

বাংলাসাহিত্যে চল্লিশের দশকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটলেও পঞ্চাশের দশক থেকেই তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শুরু। বলতে গেলে আমৃত্যু অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকে তিরোধান পর্যন্ত তিনি ছিলেন এক অবিসংবাদিত জনপ্রিয় লেখক। বলতে বাধা নেই, তিনি তাঁর সমকালীন এবং সমানবয়সী লেখকদের থেকে একটু ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। অর্থাৎ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিষয়-বিন্যাস-প্রকরণে এমন কি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, কিছুটা নিঃসঙ্গ, ভিন্ন পথাশ্রয়ী। কিন্তু জনচিত্তজয়ে তাঁর সিদ্ধি সমকালীন কোন লেখকের চেয়ে কম ছিল না। তিনি কোন বড় মঞ্চ পাননি, বড় প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য লাভ করেননি, কোন নামীদামী শিরোপাও পাননি, কিন্তু যা তিনি পেয়েছিলেন, যা যে কোন লেখকেরই চূড়ান্ত অন্বিষ্ট, বৃহৎ ব্যাপক পাঠক সমাজের অভিনন্দন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সফলতার রহস্যটা তাহলে কী? প্রথমত, বিষয়বৈচিত্র্য। তাঁর উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি সবসময় নতুন নতুন বিষয়, অভিনব পরিবেশ-সৃজন করে গেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কাহিনীবয়নের কৌশলটিও জনচিত্তজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁর কাহিনীর মধ্যে গতিবেগ, স্বভাবতই স্তরে স্তরে তরঙ্গভঙ্গ, মৃদু নাটকীয়তা (যে নাটকীয়তা পাঠকের কৌতূহলকে আদ্যন্ত টানটান রাখে) এবং পরিসমাপ্তিতে বিপরীত আবর্তের চমক—যা সূক্ষ্মভাবে পাঠককে অভিভূত করে—এসবই ছিল তাঁর কাহিনীরচনার প্রধান কৌশল। আলোচ্য খণ্ডের উপন্যাস তিনখানি পাঠে পাঠক এই সত্য উপলব্ধি করবেন। তৃতীয়ত, চরিত্রায়ণও তাঁর সিদ্ধির অন্যতম প্রধান দাবিদার। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একাধিকবার একথা তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলি যতক্ষণ না তাঁর কাছে সজীব বলে উপলব্ধ হয় অর্থাৎ চরিত্রগুলি যতক্ষণ না তাঁর চিন্তার জগতে সচল হয়ে ঘুরে বেড়ায় ততক্ষণ তিনি লেখনী ধারণ করেন না। আরো একটা কথা। সজীব বলেই তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি কখনো একপেশে বা একরঙা হয় না। বিমিশ্র ক্রিয়ায় তাঁর চরিত্রগুলি সজীব হয়ে ওঠে এবং পরিণতি পায়। চতুর্থত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষাব্যবহারেও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যখন তাঁর রচনা বিবৃতিধর্মী তখন তাঁর সজাগ পরিমিতিবোধ কাহিনীতে কোন শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয় না। সংলাপ রচনায় তাঁর দক্ষতা বিস্ময়কর। তা যথাযথ, বাহুল্যবর্জিত, প্রয়োজনে তীর্যক আবার প্রয়োজনে আবেগমথিত। তাঁর ভাষাব্যবহারে যে সরসতা লক্ষ করা যায় তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে (wit) কখনো কখনো হীরকদ্যুতি লাভ করে। পঞ্চমত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রচনার আর একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি নিছক সুনিপুণ

কাহিনীকার ছিলেন না, তাঁর রচনা শুধুমাত্র কোনো মনোজ্ঞ আখ্যান নয়—তাঁর প্রতিটি উপন্যাস শেষ পর্যন্ত কোন না কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্যে তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। এবং সেই বক্তব্য তাঁর সাহিত্যসাধনা বা জীবনাদর্শের অঙ্গীভূত ছিল। এই কারণে তাঁর উপন্যাস জগৎ ও জীবন সম্পর্কে হাজার ক্ষয়ক্ষতি স্খলন পরাজয়ের শেষেও এক আশার বাণী বহন করে আনে। যে বাণী একাধারে ষোল আনা মানবিক আবার মুক্তিপথের দিশারীও বটে। 'সেই অজানার খোঁজে' উপন্যাসে লেখকের ঈশ্বরদর্শন হয়নি বটে, কাঙ্ক্ষিতও ছিল না, কিন্তু যে বিশ্বাস মানুষকে যাবতীয় বিমূঢ়তার পরেও বেঁচে থাকতে, জীবনকে ভালবাসতে শেখায় সেই বিশ্বাস বা প্রত্যয়ই উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। 'রাগশর' উপন্যাসেরও বিস্তৃত প্রেক্ষাপট অঙ্কুর এক ব্যাপক অনুসন্ধান এবং উত্তরণের ক্ষেত্র বলা যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনের আবেগাতিশয্য এবং চ্যুতি তার মুক্তির পথে বার বার বাধা হয়ে দাঁড়ালেও শেষমেশ সেইসব বিরুদ্ধতাকে জয় করে এক মহৎ উপলব্ধির জগতে পৌঁছে তার সাধনা সার্থকতা পেয়েছে। আর 'মানুষের দরবারে' উপন্যাসে লেখক তাঁর বক্তব্য তথা লক্ষ বিষয়ে রীতিমত সোচ্চার। উচ্চবর্ণের তরুণ জিওলজিস্ট শাওন ভার্মার সঙ্গে অচ্ছুতকন্যা তিতলির বিবাহ তো জাতপাত আর ছুঁৎমার্গের আবিলতায় দীর্ণ সাম্প্রতিক ভারতবর্ষীয় গ্রামীণ সমাজে এক প্রবল বিপ্লবাত্মক মানবিক আদর্শের মহতী প্রতিষ্ঠা। এইভাবে প্রতিটি উপন্যাসে মানুষকে কোন না কোন দিক থেকে বদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে প্রসারিত, মুক্ত এবং প্রত্যয়বান করে তোলার চেষ্টা করেছেন লেখক। আর এইখানেই তাঁর জিৎ ; তাঁর সৃষ্টিসম্ভার কালোত্তীর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

প্রলয় সেন



সেই অজানার খোঁজে

প্রথম খণ্ড

শ্রীসরোজকুমার কুশারী
প্রীতিভাজনেষু

দু'রাতের জার্নিতে পথে এ-রকম একজন সহযাত্রী জুটে যাবে, স্ত্রী মেয়ে বা আমি কেউ আশা করিনি। আমার আর মেয়ের ভিতরটা একটু বিরূপ হয়ে উঠেছিল। স্ত্রীর মুখ দেখে মন বোঝা শক্ত। উনি সব পরিবেশেই ঠাণ্ডা, চুপচাপ।

ময়দানে মস্ত একটা রাজনৈতিক সমাবেশ ছিল সেদিন। বিকেলে মিটিং, দুপুর থেকে মিছিলে মিছিলে বহু রাস্তার সমস্ত যান-বাহন বিকল। কম করে তিন সাড়ে-তিন ঘণ্টার জ্যাম। সে-সময়ে কলকাতার এটা নৈমিত্তিক চিত্র। অফিস থেকে দু'ভাই পর পর আমাকে ফোনে বলে দিয়েছিল অনেক আগেই হাওড়া স্টেশনে রওনা হতে হবে। ওই মিটিং ভাঙলে কলকাতার কত রাস্তা কত ঘণ্টার জন্য আটকে যাবে ঠিক নেই। এ-রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রওনা হয়ে রাত সাড়ে সাতটার ট্রেন ফেল করেছি। যাক, এবারে আমরা যাব হরিদ্বার। গত দেড় মাস ধরে আমাদের মন এত বিষণ্ণ যে কলকাতার বাড়ি-ঘর হাওয়া -বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎই এই যাত্রা স্থির। রেল দপ্তরের এক চেনা-জানা অফিসারের কল্যাণে রিজারভেশনও পেয়ে গেলাম। হরিদ্বারে গিয়ে কোথায় থাকব তা-ও ঠিক করার ফুরসৎ মেলেনি। সেখানে গেলে সাধারণত কংখলের রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় পেয়ে থাকি। সেখানকার বড় মহারাজ স্নেহ করেন। প্রত্যেক বার সুব্যবস্থাই হয়। কিন্তু তার জন্য অনেক আগে থাকতে চিঠি লিখে জানিয়ে রাখতে হয়। নইলে ভালো ঘর ছেড়ে ঠাঁই মেলাই শক্ত। বিশেষ করে যাত্রীর মৌসুমে। এটা মৌসুম ঠিক নয়। কিন্তু মৌসুমের কাছাকাছি সময়। আর সপ্তাহ তিনেক বাদে পুজোর ভ্রমণ বিলাসীদের হাওয়া বদলানোর হিড়িক পড়ে যাবে। মনে মনে ঠিক করেছি কংখলের আশ্রমে জায়গা পাই তো ভালো, না পেলেও খুব দুর্ভাবনার কিছু নেই। হরিদ্বারে হোটেল আর ধরমশালার ছড়াছড়ি। কোথাও জায়গা পেয়েই যাব।

ডুন এক্সপ্রেস সাড়ে ন'টা নাগাদ ছাড়ে। হয়তো বা আরো মিনিট দশ-পনেরো আগে। হালের টাইম-টেবল প্রায়ই একটু আধটু বদলাচ্ছে। যা-ই হোক মিটিং ভাঙার জ্যামের ভয়ে আমরা বিকেল সাড়ে ছ'টার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। তখন আমাদের মনের অবস্থা শুধু আমরাই জানি। মোটরে ওঠার আগে বাড়ির সকলের চোখেই জল। স্ত্রী আর মেয়ের চোখেও।...দু'বছর আগে পর্যন্ত ছুটি-ছাটার সঙ্গে কিছু বাড়তি ছুটি যোগ করে ফি বছরেই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়েছি। বেরুতাম একজনকে উপলক্ষ করে, তাকে আনন্দে রাখার জন্য। তখন সংখ্যায় আমরা চারজন। এবারে সেই একজন কম।

পথে ভিড় যেটুকু পেয়েছি, সেটা এমন কিছু নয়। সোয়া সাতটার মধ্যে আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেছি. ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে আমার কোনদিনই ভালো লাগে না। আমাদের তিন জনের সঙ্গে তিনটে সুটকেস, এবং বড় টিফিন ক্যারিয়ার আর একটা কুজোর সাইজের জলের জাগ। আমরা প্লাটফর্মে সুটকেসের ওপর বসে অপেক্ষা করছি..ট্রেনের আনাগোনা, লোকজনের ছোটা-ছুটি দেখতে দেখতে সময় বেশ কেটে যায়। ট্রেন ঠিক কটায়

ছাড়বে খোঁজ নিয়েছি। ন'টা পঁয়ত্রিশে। দু'ঘণ্টা দশ-বারো মিনিট বাকি।

মিনিট পঁচিশ বাদে হন্ত-দন্ত হয়ে দুটি ছেলে এদিকে এলো। আমার চোখে ছেলে, দু'জনেরই বয়েস আটাশ-তিরিশের মধ্যে। দু'জনেরই পরনে চোঙা না হোক পা-চাপা প্যান্ট, একজনের গায়ে টেরিকটের চকচকে বুশ-শার্ট, অন্য জনের এমনি শার্ট, টেরিকটের। পায়ে ছুঁচলো চকচকে শু। মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো ঘাড়ে-নামা চুলের মতোই চকচকে। কিন্তু তার দু'হাত আর শ্যামবর্ণ মুখের দিকে তাকালে চোখে ধাক্কা লাগে। বাঁ-হাতের দুটো আঙুল আধখানা করে নেই, দু'হাতেই অনেকটা জায়গা জুড়ে পোড়া দাগ। বাঁ-চোখের পাশ ঘেঁষেও গালে-মুখে-কপালে ওই রকম পুরনো পোড়া দাগ। চোখটা বরাত জোরে বেঁচে গেছে। কালোর ওপর তার মুখখানা মিষ্টি, কিন্তু ওই অঘটনের পাকা দাগে সেটুকু চোখে পড়ার নয়। প্ল্যাটফর্মে ভিড় দেখেই তার মেজাজ অপ্রসন্ন। কোমরে হাত দিয়ে চারদিকে একবার দেখে নিয়ে সঙ্গীকে বিরক্তির সুরে বলে উঠল, এ শালার ভিড়ের মধ্যে কোথায় এনে বসাব! খুব কষ্ট হবে যে...।

মিটিং-এর দরুন হয়তো অনেক যাত্রীই আমার মতো আগে এসে বসে আছে। অন্য ট্রেনের যাত্রীর ভিড়ও থাকা সম্ভব। কিছু জিগ্যেস করার ব্যাপারে ছেলেটার আমাকেই পছন্দ হলো।— আচ্ছা দাদা, ডুন এক্সপ্রেস ঠিক ক'টায় ছাড়বে বলতে পারেন?

যে-ভগ্নিপতির দল কারো খুব কষ্ট হবার মতো প্ল্যাটফর্মের ভিড় বাড়িয়েছে আমিও তাদের একজন। তার ওপর বাপ ছেড়ে জ্যাঠার বয়সীকে দাদা সম্বোধন। অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, ন'টা পঁয়ত্রিশ।

নিজের হাতঘড়ি দেখল। এখনো পৌনে দু'ঘণ্টার কাছাকাছি দেরি। আবার প্রশ্ন, ট্রেনটা কখন ইন্ করবে জানেন দাদা?

ঘুরে তাকালাম তার দিকে।

সেটা এক ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ঠিক-ঠিক জানে না—তার সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি ভাইটি।

—লে হালুয়া— আপনার অমন ত্যারছা করে জবাব দেবার কি হল মশায়—জানেন না বললেই হত! সঙ্গীর দিকে ফিরল, তুই ছুটে চলে যা, ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করাই ভালো, এখানে ভিড়ের গরমে বেজায় কষ্ট হবে— আমি দেখি দুই একটা ডাব-টাব পাই কিনা।

দু'জনে ব্যস্ত পায়ে চলল। সঙ্গীটি সত্যিই ছুটল।

মেয়ে আমার ওপরে ঝাঁঝিয়ে উঠল, এ-সব লোকের সঙ্গে তুমি ও-ভাবে কথা বলো কেন বাবা —যা বলে গেল শুনতে খুব ভালো লাগল?

মেয়ের মা-ও এক-নজর আমার দিকে তাকিয়ে নীরবে তাকেই সমর্থন করল।

আমি বললাম, বেচারার মেজাজ অমন খারাপ কেন বুঝলি না, সদ্য বিয়ে করা বউ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে বউয়ের কত কষ্ট হবে ভেবেই মেজাজের ঠিক নেই— এখন ডাব না পেলে এই মেজাজ আরো তিরিক্ষি হবে।

মেয়ে হেসে ফেলল। স্ত্রী অন্য দিকে মুখ ঘোরালেন।

বরাত একটু ভালোই। প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এলো এক ঘণ্টা দশ মিনিট আগে। তা সত্ত্বেও

লোকের ছোটাছুটি। কুলি কোচ নম্বর জেনে নিয়ে তার হিসেব মতো জায়গায় আমাদের বসিয়েছিল। ঠিক সামনেই সেই কোচ। চারটে করে বার্থের কুপেতে আমরা তিন বার্থ রিজারভ্ করেছি। একটা নিচের আর ওপরের দুটো বার্থ পেয়েছি। দ্বিতীয় নিচের বার্থের প্যাসেঞ্জারকে ওপরে পাঠানোর চেষ্টা সম্ভব কিনা আঁচ করার জন্য গাড়ির গায়ে আটকানো চার্টে তার নামটা পড়ে নিলাম। আর তার পরেই সম্ভাবনাটা বাতিল করলাম।

নিচের বার্থের প্যাসেঞ্জারের নাম কালীকিঙ্কর অবধূত।

...এত বয়েস পর্যন্ত অবধূত নামে একজনকেই চিনতাম, জানতাম। তিনি তন্ত্র সাধক কত বড় ধারণা নেই, কিন্তু নামী লেখক যে তাতে সন্দেহ নেই। সহযাত্রীর নামখানা গাল-ভরা, ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী এই অবধূত কোন্ পর্যায়ের তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। কেবল এটুকু ধরে নিলাম মেয়ের জন্য নিচের বার্থ পাওয়ার কোনো আশা নেই, কারণ কোনো অবধূতকে আমি অনুরোধই করতে পারব না। তাছাড়া কুপের একমাত্র বাইরের সহযাত্রী হিসেবে অবধূত-টবধূত প্রত্যাশিত তো নয়ই—বাঞ্ছিতও নয়।

কুলি বিদায় করে মেয়েকে বললাম, নিচের ওই বার্থ যাঁর, তিনি কালীকিঙ্কর অবধূত... তোকে ওপরের বার্থেই উঠতে হবে।

স্ত্রী মন্তব্য করলেন, তাতে কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, সিঁড়ি লাগানো আছে, তুমিও ইচ্ছে করলে নিচের বার্থে থাকতে পারো।

আমি বললাম, তোমার সামনের বার্থ অবধূতের শুনেই ঘাবড়ে গেলে নাকি?

স্ত্রী বিরক্ত। এত বয়সেও মেয়েটার সামনে মুখের লাগাম নেই।

সাতাত্তর সালের সেপ্টেম্বর সেটা। এই মাসেই সাতান্ন ছাড়িয়ে আটান্নয় পা দিয়েছি। স্ত্রীর তিপ্পান্ন। মেয়ের একুশ বাইশ। মায়ের কথা শুনে মেয়ে হাসছে। ওদের দু'জনের মুখেই হাসি দেখলে এই বেরুনো সার্থক।

নিচের একটা বার্থেই আপাততঃ ঠিক-ঠাক করে বসা হল। ওপরের ব্যবস্থা পরেও হতে পারবে। তার পরেই যে-দৃশ্য আর নাটকের মুখোমুখি আমরা, তিনজনেই ভেবাচাকা।

ব্যস্তসমস্তভাবে বার্থে এসে ঢুকল আঙুল-কাটা এক-গাল পোড়া সেই মূর্তি, প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড় দেখে যার মেজাজ বিগড়েছিল। তার বগলে একটা চকচকে ছোট হোল্ড-অল্। সামনের বার্থে আমাদের, বিশেষ করে আমাকে দেখে তার ব্যস্ত মুখে যে ছায়া পড়ল, মনে হল নিঃশব্দে সে নিজেকে আর এক-দফা ভগ্নিপতির সম্মান দিল।

ফার্স্ট ক্লাসের বার্থ একটু বেশি চওড়া। দেখা গেল হোল্ড-অলের পুরু তোষক ঠিক সেই মাপের তৈরি। অনুমান ওই বার্থের যাত্রী কালীকিঙ্কর অবধূত সর্বদাই ফার্স্টক্লাসে যাতায়াত করে অভ্যস্ত। তোষক-চাদর-গায়ের চাদর ইত্যাদি দেখে আরো অনুমান ভদ্রলোক শৌখিন মানুষ।...সদ্য বিয়ে করা বউয়ের জন্য নয়, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে কষ্ট পাবেন বলেই এই ছেলের উতলা বিরক্ত মুখে দেখেছিলাম। এই মূর্তি অবধূতজীর চেলা চেলা হবে। তাই যদি হয় তো যেমন চেলা তেমনি গুরু হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু এরপর অপ্রত্যাশিত কিছু দেখারই ভাগ্য আমাদের। করিডোরের জানলা বরাবর

এক-দঙ্গল মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে। সেদিকে ফিরে চেলাটি হাঁক দিল, সব রেডি, বাবাকে নিয়ে আসুন। চেলা যে তাতে আর সন্দেহ থাকল না।

করিডোরের জানলা দিয়ে বাবার দর্শন পেলাম না। আধ মিনিটের মধ্যে কুপের দরজার সামনে তাঁর আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তিনজোড়া চোখে লালের ধাক্কা। বাবার পরনে টকটকে লাল চেলির থান। কপালে লাল সিঁদুর টানা, গায়ে তেমনি লাল কনুই-হাতা ফতুয়া, গলায় বড়সড় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, পায়ে চপ্পল, দুটো আঙটি পরা দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। হাসি-হাসি মুখ। চওড়া বুকের ছাতি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরিষ্কার শেভ-করা মুখখানা কমনীয় বলা যেতে পারে। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে।

লাল বসন থেকে লালের জেল্লা ঠিকরোচ্ছে। আমাদের তিনজনকে দেখে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে আর দু'পাশে গিজগিজ করছে লোক। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটার চারভাগের তিনভাগ জ্বলতে বাকি। ঘুরে ওটা একজনের হাতে দিয়ে বললেন, ফেলে দাও।

এটুকু যে কুপের দুটি মহিলার সম্মানে কারোরই বুঝতে বাকি থাকল না। এ-দিকের চেলাটির আর এক-দফা বিরক্তির কারণ হলাম আমরা। সে বলে উঠল, বাবার ওটার ফেলার কি দরকার ছিল, দু'দিনে তো একশ'বার সিগারেট খেতে হবে, তখন উঠে উঠে বাইরে গিয়ে খাবেন নাকি! ভিতরে এসে বসুন! আমার মুখের ওপর তার আড়চোখের একটা ঝাপটা এসে লাগল। ভাবখানা, বাবার মুখের সিগারেট ফেলে দিতে হয় এমন মেয়েছেলে নিয়ে ট্রেনে ওঠা কেন। বাবা ভিতরে এলেন। চেলার কথায় কান দিলেন বলে মনে হল না। নিজের বার্থের শয্যা-রচনা দেখলেন। আমাদের বার্থ আর ওপরের খালি বার্থ দুটো দেখলেন। নিচের যে বার্থে আমরা বসা তাতে দু'ভাঁজ করে একটা সুজনি আর একটা ছোট্ট বালিশ পাতা। আমার স্ত্রী বাতাসে ফোলানো বালিশে শুতে পারেন না। আমাদের ওপরের দুই বার্থের সুজনি আর রবারের বালিশ এখনও পর্যন্ত যার-যার সুটকেসে।

অবধূতের পিছনের ভক্ত সংখ্যা ঠাওর করা গেল না। তাঁর পিছনে দু'জন মাত্র ঢুকতে পেরেছে। তিনি আসন নিলে ভেতরে বড়জোর আর চার পাঁচজনের জায়গা হতে পারে। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে থাকার দরুন পিছনের কেউ এগোতে পারছে না। ভিতরের চেলা তাড়া দিল, কি হল বাবা, বসুন!

কিন্তু বাবার দু'চোখ স্ত্রী আর মেয়েকে ছেড়ে এবারে আমার মুখের ওপর।—ওপরের ওই দুটো বার্থ আপনাদের?

জবাবে মাথা নাড়লাম। আমাদেরই।

হরিদ্বারে যাচ্ছেন?

বলতে যাচ্ছিলাম, সেই রকমই ইচ্ছে। না বলে আবারও মাথাই নাড়লাম। হরিদ্বারই যাচ্ছি। বাবার সঠিক অনুমানের ফলে চেলা আর পিছনের ভদ্রলোক দু'জনের হাসি-হাসি মুখ। অর্থাৎ তাদের বাবাটি সর্বজ্ঞ, অনুমানের কোনো ব্যাপার নেই। আমার বিবেচনায় কেরামতিও কিছুই নেই। বেনারস বা লক্ষ্ণৌ যাবার পক্ষে ডুন এক্সপ্রেস আদৌ ভালো গাড়ি নয়। আর হাওড়া থেকে সোজা হরিদ্বার বা দেরাদুন এই একটা গাড়িই যায়। তাছাড়া দেরাদুন অর্থাৎ এই শীতের

জায়গায় যেতে হলে সঙ্গে কিছু বাড়তি সরঞ্জাম থাকার কথা। অতএব হরিদ্বার।

কিন্তু চেলার প্রতি বাবার পরের নির্দেশ শুনে আমি তো বটেই, স্ত্রী আর মেয়েও সচকিত একটু। তিনি বললেন, আমার বিছানা ওপরে পেতে দে, মায়েদের পক্ষে ওপরে উঠতে-নামতে অসুবিধে হবে।

গাড়িব চার্টে সহযাত্রীর নাম অবধূত দেখেই এই সুবিধেটুকুর আশা মন থেকে ছেঁটে দিয়েছিলাম। দেখছি মেঘ না চাইতে জল। তবু বলতে যাচ্ছিলাম, দরকার নেই, অসুবিধে হবে না। কিন্তু বলার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই ওই চেলাটির মুখে প্রতিবাদের ঝাপটা।—আপনার কি-যে কখন মাথায় ঢোকে বুঝি না বাবা, ওই বাচ্চা মেয়ের অসুবিধে হবে আর আপনার খুব সুবিধে হবে—এই সরু সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে গিয়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙুন আর কি—এখন বসে পড়ুন তো!

বাবার মুখে রাগ-বিরাগের অভিব্যক্তি নেই।—বক-বক না করে যা বললাম চট-পট করে ফ্যাল না—নইলে তো পরে আমাকেই বিছানা টানাটানি করতে হবে।

চেলা থমকালো। রুষ্ট চাউনি আমার মুখের ওপর। নির্বাক রোষের সাদা তাৎপর্য, ভ্যালা লোক জুটেছেন মশাই আপনি একখানা! কিন্তু সকলকেই একটু সচকিত করে মেয়ে বলে উঠল, আমার কোনো অসুবিধে হবে না, সরানোর দরকার নেই!

মেয়ের বলার ধরনটা আদৌ মোলায়েম নয়। একুশ বাইশ বছরের মেয়েকে বাচ্চা মেয়ে বলার দরুন হতে পারে, অথবা ইদানীং এই গোছের গড-ম্যানদের প্রতি তার বিশ্বাস বা ভক্তি-শ্রদ্ধা একেবারে শূন্য বলেও হতে পারে। চেলাটির অপ্রসন্ন চাউনি এবার মেয়ের দিকে—বাবার মুখের ওপর এমন ঝাপটা মারা কথা বরদাস্ত করার ইচ্ছে নেই, আবার মেয়েছেলেকে বলেই বা কি।

কিন্তু এর পরেও অবধূতটির বেশ প্রসন্ন সপ্রতিভ মুখ। বললেন, অসুবিধে না হলেও সামনের এই বার্থে তোমার বদলে একটা রক্তাম্বর-পরা লোককে দেখতে তোমার মায়েরই কি ভালো লাগবে মা? তা ছাড়া ট্রেনে উঠে যদি দেখতে তোমার মা আর তুমি এই দুটো পাশাপাশি বার্থ পেয়েছ—তাহলে তোমারও ভালো লাগত না? চেলার দিকে তাকালেন, কিরে, কথা শুনবি না দাঁড়িয়ে থাকবি?

সঙ্গে সঙ্গে করিডোর থেকে একজন ভক্তর অসহিষ্ণু গলা।—এই পেটো কার্তিক, বাবা যা বলছেন চটপট করে দে না—অবাধ্য হওয়াটা তোর রোগে দাঁড়িয়েছে—না?

অবধূত মানুষটির বিবেচনা-বোধ প্রখর বলতে হবে। আর কথা বলার ধরনও সরস। ও-দিকে পেটো কার্তিক অভিহিত চেলাটি এক হ্যাঁচকা টানে বালিশসুদ্ধু পাতা বিছানা ওপরের বার্থে ফেলার মধ্যেই তার মেজাজ বুঝিয়ে দিল। শিকল ধবে ঝুলে নিজেও উঠে গেল। হাতের ঝাপটায় চাদর টান করে তার ওপর বালিশ পেতে ঝাঁঝালো গলায় জিগ্যেস করল, জিনিস-পত্রগুলোও কি ওপরে আসবেন না তাঁরা নিচেই থাকবেন?

বাবার মুখে বাৎসল্যের হাসি —রাতে যা লাগবে ওপরে তোল, আর সব নিচের বার্থের তলায় থাক—আপনাদের অসুবিধে হবে না তো?

শেষেরটুকু আমার উদ্দেশে। বললাম, অসুবিধে হবে কেন...আপনি মিছিমিছি নিজের অসুবিধে করলেন।

—ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে, আমি তাহলে নিচেই বসি খানিক? ভদ্রলোক অমায়িকও বটে।

—হ্যাঁ, বসুন।

বসলেন। সেই ফাঁকে তাঁর আরো কিছু ভক্ত ভিতরে ঢুকে পড়েছে। নিজের দু'পাশে আরো জনা চারেককে বসালেন তিনি। জনা-কতক দাঁড়িয়ে রইলো। দরজার বাইরেও অনেকে, ভিতর খালি হলে তাদের ঢুকতে পাওয়ার আশা। সৌজন্যের খাতিরে আমি একটু সরে বসে একজনের বসার জায়গা করে দিলাম। অবধূত ডাইনে বাঁয়ের দু'জন ভদ্রলোক আর মহিলার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। অসুখ আর ওষুধের প্রসঙ্গ কানে এলো।—আমি ফিরে আসা পর্যন্ত ওই ওষুধই চলুক, মায়ের ইচ্ছে হলে ফিরে এসে দেখব ওতেই বউমা ভালো হয়ে গেছেন—আর তুই পানজর্দা খাওয়া একটু কমা তো, অত খেলে ভালো লোকেরই অম্বল হবে—

আমাদের সামনে এক সারি লোক দাঁড়িয়ে। তাই কার প্রতি কি নির্দেশ ঠিক ঠাওর করা যাচ্ছে না। ও-দিকে পেটো কার্তিক নেমে এসে একে ঠেলে ওকে ধাক্কা দিয়ে তার কাজ সারতে লাগল। তার সেই বন্ধ মাথার ওপর দিয়ে আর কাউকে বা ঠেলে সরিয়ে ফলের ডালা, ডাব, সুটকেস, একটা বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি পাঠাতে লাগল। সেগুলো পায়ের ফাঁক দিয়ে বার্থের নিচে ঠেলে কার্তিক খিটখিটে গলায় বলে উঠল, আগে হাতপাখাটা দে—ভক্তির ঠেলায় যে বাবার দম বন্ধ হয়ে গেল—আপনারা একসঙ্গে এত লোক ঢুকে পড়লেন কেন—যাঁদের দর্শন হয়েছে বাইরে যান তো!

আধ ডজন মাথার ওপর দিয়ে পাখা এলো। পাশের মহিলার হাতে ওটা দিয়ে পেটো কার্তিক হুকুম করল, বাতাস করুন।

মাথার ওপর পাখা চললেও সত্যি গরম হচ্ছিল। ঠেলে-ঠুলে একটু জায়গা করে বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তিন-চারজন বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কার্তিকের হুমকি, দাঁড়ান কেউ ঢুকবেন না, ভিতরের লোক বেরিয়ে গেলে একে একে আসুন আর বেরিয়ে যান—এই নীলু, বাবার রবারের চপ্পল দে—এখন পর্যন্ত জুতো জোড়া পর্যন্ত বদলানো গেল না।

পেটো কার্তিকের দাপটে সত্যিই কেউ আর হুড়োহুড়ি করে ঢুকতে চেষ্টা করছে না। সে এরই মধ্যে জায়গা করে নিয়ে মেঝেতে বাবার পায়ের কাছে বসে গেছে। বাবা নিচু গলায় তাঁর ওপাশের বসা লোকটাকে কিছু বলছেন বা নির্দেশ দিচ্ছেন। হাতে হাতে জুতোর বাক্স এলো একটা। নিজের হাতে পেটো কার্তিক বাবার পায়ের শৌখিন স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে নিজের পকেটের রুমাল বার করে তাঁর পায়ের তলা পর্যন্ত মুছে দিল। আমি বড় চোখ করে দেখলাম এরই মধ্যে বাবার পায়ের কাছে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট, একটা কুড়ি টাকার নোট, আর দুটো দশ টাকার নোট পড়েছে। পেটো কার্তিক রুমালটা কপালে ঠেকিয়ে নিজের কোলের ওপর

রাখল। জুতোর বাক্স থেকে রবারের চপ্পল বার করে বাবার পায়ে পরিয়ে দিয়ে স্যাণ্ডেল জোড়া সেই জুতোর বাক্সয় রেখে বার্থের নিচে ঠেলে দিল। অবধূতের সেদিকে চোখ নেই, সামনের দাঁড়ানো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার সঙ্গে হেসে কথা বলছেন—আমার কি ক্ষমতা, ও-বেটি আঙুল না নাড়লে কিছু করার সাধ্য আছে—তাঁর করুণা হয়েছে তাই তোমাদের মেয়ের মাথার ব্যামো সেরেছে।

নোট ক'টা এখন পেটো কার্তিকের এক হাতের দু' আঙুলের ফাঁকে ভাঁজ করা। বাসের কণ্ডাক্টাররা নোট ভাঁজ করে যে-ভাবে আঙুলের ফাঁকে রাখে। গম্ভীর মুখে ফতোয়া দিল, যার করুণাই হোক, বাবার দেওয়া মাদুলি-ধোয়া জল রোজ মেয়েকে খাওয়াবেন।

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, খাওয়াচ্ছি বাবা, রোজ খাওয়াচ্ছি।

তাঁরাও একে একে বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সারলেন। এবারে তাঁর পায়ে দু'খানা পঞ্চাশ টাকার নোট পড়ল। উঠে দাঁড়ানোর ফাঁকে নোট দুটো ভাঁজ হয়ে পেটো কার্তিকের আঙুলের ফাঁকে।

এর পরের শৌখিন বাবুটি কাছে এসে হাত জোড় করে জিগ্যেস করল, আপনি দেরাদুন থেকে কবে ফিরছেন বাবা?

—আমি জানি না, মা জানে। কেন, মামলার তারিখ কবে?

—বারো দিন পরে বাবা।

—না, তার মধ্যে ফেরার আশা কম—আর ফিরলেই বা কি, তোরা শালারা ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা করে মরবি, আর আমি সে-জন্য মায়ের কাছে একজনের জন্য কাঁদতে যাব? বলেছি না, ভাইকে ধরে নিয়ে আয় একদিন আমার কাছে, দেখি মিটমাট হয় কিনা—

—সে এলো না বাবা...

—তার বড় দোষ, সে তোকে বিশ্বাস করবে কেন?

—আপনি একটু দয়া রাখবেন বাবা। বলেই হাঁটু গেড়ে বসে বাবার পায়ে আর রবারের চপ্পলে কপাল ঘষল। উঠে দাঁড়াতে দেখলাম বাবার পায়ে এবারে একখানা একশ টাকার নোট। সেটাও পেটো কার্তিকের আঙুলের ভাঁজে আশ্রয় নিল।

এবারে যে লোকটির পালা তার পরনের জামা-কাপড় আধময়লা। রোগা শুকনো মুখ। সামনে এসে দাঁড়াতেই বাবার নির্দেশ, দেখি জামাটা তোল তো—

লোকটি তক্ষুণি জামা তুলল। আমরা পিছনে তাই বাবার দ্রষ্টব্য কি বুঝতে পারছি না। প্রসন্ন গলা শুনলাম, বাঃ, দুটোই তো বেশ সাফ হয়ে গেছে দেখছি, পুরো অজ্ঞান করে অপারেশন করা হল?

—না, ওই জায়গায় ইঞ্জেকশন দিয়ে।... সবই আপনার অসীম করুণা বাবা...

—না-ও ঠেলা, আমি আবার কি করলাম, ডাক্তার বায়পসি করে বলল, ক্যানসার গ্রোথ্ নয়, সীস্ট-অপারেশন করে দিল, ফুরিয়ে গেল—তুই তো ভয়ে হেদিয়ে গেছলি।

গম্ভীর মুখে পেটো কার্তিকের মন্তব্য, বাবার কাছে এসে পড়েছে যখন, ক্যানসার হলেই বা ভয়ের কি ছিল।

কিন্তু লোকটার বোধহয় বদ্ধ ধারণা, বাবার কৃপাতেই ক্যানসার সীস্ট হয়ে গেছে। পায়ে

কপাল ঠেকিয়ে আর ওঠেই না। উঠতে দেখা গেল বাবার পায়ে একটা দশ টাকার নোট।

এই প্রথমবার পায়ের দিকে চেয়ে নোট দেখলেন অবধূত। তারপর চেলাকে বললেন, ফলের ডালাটা বার কর তো—

চেলা হাত বাড়িয়ে ডালা টেনে আনল। বড় ডালা ফলে বোঝাই। অবধূত নিজের হাতে মস্ত এক থোকা আঙুর তুললেন।—ধর...

—এত কেন বাবা...।

—ধর না। আঙুর নিতে বড় বড় দুটো আপেল তুলে তার হাতে দিলেন।

—এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ভালো করে একটু খাওয়া দাওয়া কর তো। আর রাত করিস না, বাড়ি যা।

চলে গেল। আমার মনে হল অসময়ের ওই আঙুর আর বড় দুটো আপেলের দাম তিরিশ টাকার কম হবে না। কিন্তু পেটো কার্তিকের মুখখানা প্যাঁচার মতো। অমন আঙুরের থোকাটা দিয়ে দেওয়া বরদাস্ত হওয়া কঠিন যেন। মেয়ের দিকে চোখ পড়তে ভ্রূকুটি করতে হল। সে পেটো কার্তিকের মুখ দেখে নিজের মুখ রুমাল চাপা দিয়ে হাসছে। চোখে পড়লে ওই পেটো কার্তিক এটা বরদাস্ত করবে না।

বয়স্ক আর বয়স্কাদের সঙ্গে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরাও দর্শন প্রণাম সেরে যাচ্ছে। প্রণামী পড়ছে। কিন্তু ফলের ঝুড়িও খালি হয়ে যাচ্ছে। অবধূত উদার হাতে যাকে যা ইচ্ছে দিয়ে দিচ্ছেন। অতবড় ফলের ডালা একেবারে খালি হয়ে গেল। তখনো তিন চার জনের দর্শন প্রণাম বা আবেদন জানানো বাকি। পেটো কার্তিক থমথমে মুখে খালি ডালাটা জোরে ধাক্কা মেরে বার্থের নিচে পাঠিয়ে দিল। আমি প্রমাদ গুনছি। হাসি চাপার চেষ্টায় মেয়ের মুখ লাল।... দেড় মাস বাদে ওর মুখে আগের স্বাভাবিক হাসি দেখছি, তাই ভালো লাগছে। কিন্তু পেটো কার্তিকের চোখে পড়লে বিপদ। মেয়ের হাসি দেখে তার মায়ের ঠোঁটের ফাঁকেও হাসির আভাস। একটি মেয়ের দর্শন প্রণাম শেষ হতে অবধূত জিগ্যেস করলেন, ফল সব ফুরিয়ে গেল বুঝি...?

গনগনে মুখে চেলাটি বলে উঠল, আমার কেনা ডাব দুটো আছে—বার করব?

—তোর যেমন কথা, হাওড়া স্টেশন থেকে বালীগঞ্জ পর্যন্ত ডাব বয়ে নিয়ে যাবে! থলেতে খেজুরের প্যাকেট আছে দেখ, বার করে দে—

চেলার মুখ দেখে আমারই হাসি পাচ্ছে, মেয়ের দোষ দেব কি। এবারে বার্থের নিচে থেকে থলে টেনে বার করে একটা প্যাকেট বাবার হাতে দিল।

এর পরেই বাকি যারা ছিল ব্যস্ত। কারণ গাড়ি ছাড়ার সময় হল। প্রণাম করে প্রণামী রেখে তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগল। হাতপাখা রেখে শেষের মহিলাও ব্যস্ত মুখে প্রণাম সারলেন। অবধূত চেলাকে বললেন, তুইও নেমে যা, তোর বার্থও দেখে রাখিস নি তো?

—হুঁঃ, ছাড়ুক গাড়ি, আপনাকে না খাইয়ে আমি গেলাম আর কি—কোচ নম্বর জানা আছে, নীলুর কণ্ডাক্টর গার্ডকে বলেও যাবার কথা।

—নেমেই যা না, এর পর তো দেড় দু'ঘণ্টার আগে ট্রেন থামবে না—রাত হয়ে গেলে এদের অসুবিধে হবে না!

চেলার তেমনি ঝাঁঝালো উত্তর, দেরি হয়ে গেলে আমি ওই করিডোরে বসে থাকব— আপনাকে না খাইয়ে আমি নড়ব কি করে— আপনার খাওয়া না হলে আমার খাওয়া আসবে কোত্থেকে?... আপনি নিচে থাকলে নিজের ইচ্ছে মতো খেতে-শুতে পারতেন, এখন তো আপনাকে এঁদের ঘড়ি ধরে খেতে শুতে হবে।

— তুই থাম্ তো, উঠে বোস।

উঠে গুরুর পাশে বসল। ভাঁজ-করা নোটগুলো এখনো আঙুলের ফাঁকে গোঁজা। পোড়া দাগের মুখ একটু শ্রান্তই লাগছে।

গাড়ি নড়ল। প্ল্যাটফর্মের মানুষদের মুখগুলো একটু একটু করে সরতে লাগল। মিনিট দুই লাগল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যেতে। এতক্ষণের হট্টগোলের শেষ।

গুরু সম্পর্কে কৌতূহল নেই। শিষ্যর চরিত্রখানা সেই থেকে বেশ লাগছে। আধুনিক চেলা গুরুকেও মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলে দেখছি। পেটো কার্তিক উঠে দাঁড়ালো। নোটের গোছা নিজের প্যান্টের পকেটে গুঁজল। ওপরের বার্থ থেকে বড়সড় ভি. আই. পি. অ্যাটাচি কেসটা নামিয়ে নিচের বার্থে রাখল। সেটা খুলতে প্রথমেই যে জিনিসটার দিকে চোখ গেল সেটা একটা চ্যাপটা স্কচ্ হুইস্কির বোতল। মুখ খোলা হয়নি। তার পাশে আট দশ প্যাকেট কিং সাইজের সিগারেট।

একটা প্যাকেট, লাইটার আর অ্যাশ-ট্রে বার করে গুরুর সামনে রেখে অ্যাটাচি কেস আবার ওপরের বার্থে তুলে দিল। সিগারেটের প্যাকেটের ওপর নাম দেখলাম রথ্ম্যান। সিগারেটের নেশা না থাকলেও খুব দামী ফরেন জিনিস ওটা, জানি। তন্ত্র-সাধক অবধূতটি বিলাসী এবং সুরসিক বলতে হবে। সফরে বেরুলে সঙ্গে স্কচ-হুইস্কি মজুত থাকে। বোতলটা যে আমরাও দেখলাম সে-জন্য তাঁর মুখে সংকোচের লেশমাত্র নেই। সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। মুখে সামান্য দ্বিধার হাসি, বললেন, এই এক বদ নেশা আমার, মায়েদের কি খুব অসুবিধে হবে?

পেটো কার্তিক আবার বসে পকেট থেকে নোটের গোছা বার করে গোনা শুরু করেছিল— তার এক-এক আঙুলের ফাঁকে এক-এক অঙ্কের নোট— একশ পঞ্চাশ কুড়ি দশ পাঁচ। পাঁচের নিচে নেই। জবাবটা মায়েদের দিক থেকেই আশা করে সে মা-মেয়ের দিকে তাকালো। মেয়ে একটা বাংলা বার্ষিক সংকলন বার করে বসেছে। আমি জবাব দিচ্ছি না দেখে স্ত্রী বিব্রত মুখে আমার দিকে তাকালেন। পেটো কার্তিকের ভুরুর মাঝে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। বললাম, এ-টুকুতে অসুবিধে হলে আমাকে তো গোটা কুপ রিজার্ভ করে যাতায়াত করতে হয়, অসুবিধে হবে না, আপনি খান।

প্যাকেট খুলে অবধূত আগে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন— চলে তো।

কখনো-সখনো শখ করে চলে, এত দামী সিগারেট নষ্ট না করাই ভালো।

মিটি মিটি হাসি। হাসলে সপ্রতিভ আর ফর্সা মুখখানা বেশ সুন্দরই দেখায়।— এ-সব দামী জিনিস সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমার কোনো কেরামতি নেই মশাই, জুটে যায়— না জুটলে সিগারেট ছেড়ে বিড়িতেও অসুবিধে হয় না। ধরুন—

একটা তুলে নিতে দেখলাম সিগারেট খাওয়ার ধাক্কায় ভদ্রলোকের আঙুল দুটো হলদে হয়ে গেছে। আমার সিগারেট নেওয়াটা মেয়ের পছন্দ হল না বুঝলাম। কারণও আছে। কিন্তু নিজে সেধে নিচের বার্থ ছেড়ে দিলেন, ভদ্রলোককে সদাশয় বলতেই হবে। শখে এক-আধটা চলে বলার পর একটা না নেওয়া অভব্যতা।...এরপর গাড়িতে হুইস্কির বোতল খোলা হতে দেখলে অবশ্য বরদাস্ত করা শক্ত হবে। কিন্তু সিগারেট ধরাবার ব্যাপারেই যা বিনয় দেখলাম, মনে হয় না ও-রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে।

নিজে লাইটার জ্বেলে আমার সিগারেটের মুখে ধরালেন। তারপর পিছনে ঠেস দিয় দু'পা বার্থে তুলে টান করে দিলেন। চেলা আধ-হাতটাক সরে বসল। টাকা গোনা থামিয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে। মনে হল তার বিবেচনায় গুরু যা করলেন সেটা আমারই করা উচিত ছিল। অর্থাৎ তাঁর সিগারেট আমারই ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। চোখোচোখি হতেই গম্ভীর মুখে জানান দিল, অল্ ওভার দি ওয়ারলড্ বাবার বাঙালী ভক্ত আছে— বাবার ভালো জিনিসের কখনো অভাব হয় না। তারা বাবার জন্য এনে ধন্য হয়, সেবা করতে পেরে ধন্য হয়।

আমি আল্‌তো করে বলে বসলাম, বাবাও ধন্য হন না?

এমন দুঃসাহসের কথা পেটো বোধহয় আরশোনেনি। পোড়া দাগের মুখে রক্তকণার ছোটাছুটি শুরু হল। কিন্তু যাঁকে নিয়ে কথা তিনি জোরেই হেসে উঠলেন। চেলার দিকে চেয়ে বললেন, কেমন জব্দ, আর হড়বড় করবি? আমার দিকে তাকালেন, ঠিকই বলেছেন আপনি, শুধু ধন্য কেন, এত ঋণের বোঝা কাঁধে চাপছে শেষে নরকেও ঠাঁই হলে হয়।

এই বিনয় অবশ্য কানে একটু নতুন ঠেকল। ক্রুদ্ধ চেলাটি নোটের গোছা আবার নিজের প্যান্টের পকেটে চালান করল। টাকার জিম্মাদার সে-ই বোঝা গেল। অবধূত পিছনে ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট টানছেন, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। এক-আধবার স্ত্রী আর মেয়ের দিকেও। প্রণামী কত জুটেছে সে-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন বটে।

মুখুজ্জে মশাইয়ের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো...আমি ওপরে উঠে যাব?

মুখুজ্জে মশাই শুনে আমি থমকে তাকালাম। আমার স্ত্রী আর মেয়েও।

তিনি বললেন, ওঠার আগে গাড়ির গায়ের চার্টে আমার নামের ওপর এ মুখার্জী অ্যাণ্ড্ ফ্যামিলি দেখেছিলাম...ভুল করলাম না তো?

স্বস্তি। বললাম, ভুল করেননি। আমরা দশটা সাড়ে দশটার আগে খাই না, শুতে শুতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা।

তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আর একটু আরাম করে ঠেস দিলেন। ওই সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরালেন। আগের টুকরোটা হাত থেকে নিয়ে চেলা জানলা দিয়ে ফেলে দিল। এটুকু হাত পিছনে নিয়ে গুরু নিজেই করতে পারতেন। আরো দৃষ্টিকটু লাগল সিগারেট ফেলে চেলাটি রক্ত-বর্ণ চেলির ওপর দিয়েই গুরুর পা-টিপতে লেগে গেল।

গুরু নির্লিপ্ত। সেবায় এমনি অভ্যস্ত যে খেয়াল করছেন কিনা সন্দেহ। সিগারেট টানার ফাঁকে মাঝে-মাঝে স্থির চোখে আমাকে দেখছেন। দুই একবার স্ত্রীকে আর মেয়েকেও। এই সিগারেটটা শেষ হতে সোজা হয়ে বসলেন। নিজেই সিগারেটের শেষটুকু জানলা দিয়ে ফেলে

পা টেনে নিয়ে সোজা আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সামনে একটু ঝুঁকে মুখের কিছু যেন একটু ভালো করে দেখে নেওয়ার দরকার হল। আবার সোজা হলেন। দু'চোখ অপলক, একটু বেশি মাত্রায় তীক্ষ্ণ। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই ভদ্রলোকের একটা বৈশিষ্ট্য আমার নজরে এসেছিল। না-ফর্সা না-কালো কমনীয় মুখের ওই দুটো চোখ। চাউনি স্বচ্ছ আবার গভীরও। কিন্তু ওই চোখ দেখে মনে হল, এক্সরে আই কি একেই বলে? সত্যিই আমার ভেতর দেখতে পাচ্ছেন?

স্ত্রী আর মেয়েও নিঃশব্দে তাঁকেই লক্ষ্য করছিল। শুধু আমি কেন, এ-রকম-গড়ম্যান ওরাও কম দেখেনি। আমি নিস্পৃহ মুখে জিগ্যেস করলাম, কি দেখছেন?

চাউনি আবার সহজ। মুখেও সুন্দর হাসি।— মুখুজ্জে মশাই গায়ক লেখক না আর্টিস্ট?

আবার থমকাতে হল একটু। গড়ম্যানদের দাপটের অস্তিত্ব অতি দুঃখের ভিতর দিয়েই আমাদের মন থেকে মুছে গেছে। এ-রকম হুট্-হাট্ কথা বা অবাক হবার মতো কিছু ক্রিয়া-কলাপ স্বচক্ষে দেখা আছে। নির্লিপ্ত জবাব দিলাম, জার্নালিস্ট...।

কোন্ কাগজের?

বললাম।

কি-রকম জার্নালিস্ট?

সানডে ম্যাগাজিন এডিটর।

তার মানে সাহিত্য বিভাগের। আবার সামনে ঝুঁকলেন একটু। কপাল নিরীক্ষণ করছেন মনে হল। মাথা নাড়লেন।— নাঃ, মিলছে না, আরো একটু বেশি কিছু হবার কথা।

মেয়ে বার্ষিক সংখ্যা খুলে কোনো লেখার চার লাইনও পড়েছে কিনা সন্দেহ। এবার পেটো কার্তিককেই একটু জব্দ করার সুযোগ পেল। তাকে একবার দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে জবাব দিল, আমার বাবার অল্ ওভার দি ওয়ারলড্ বাঙালী আর হিন্দুস্থানী ভক্ত পাঠক আছে, বাবার উপন্যাস পড়ে তারা ধন্য হয়, চিঠি লিখেও ধন্য হয়।

দু'চোখ পেটো কার্তিকের মুখের ওপর তুলে বক্তব্য শেষ করল। ছেলেটাকে এই প্রথম হকচকিয়ে যেতে দেখলাম। একবার আমার দিকে আর একবার মেয়ের দিকে তাকাতে লাগল। আমি মেয়েকে ছোট করে ধমক লাগাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অবধূতের উচ্ছ্বাসে ফুরসৎ পেলাম না।— তাই বলো, তাই বলো! ভাবছিলাম কপালে স্পষ্ট দেখছি উনি আর্টের কোনো লাইনে বড় কিছু, তবু এমন ভুল হল কি করে!...বইয়ের কি নাম বলো তো মা?

আমি বললাম, ছেড়ে দিন না, বাপকে মেয়েরা সব-সময়েই বড় দেখে।

হাতের ঢাউস সংকলনের এক জায়গা খুলে মেয়ে সেটা অবধূতের দিকে এগিয়ে দিল। ওই স্পেশ্যাল নাম্বারে আমার লেখা থাকবে সেটা অবশ্য কাকতালীয় কিছু নয়। তাঁর নাম পড়া হতেই চেলাটি ম্যাগাজিনটা হাত থেকে টেনে নিল। তার পরেই তার চোখ মুখ উদ্ভাসিত।— কি আশ্চর্য! এনার অনেক গল্পের সিনেমা তো আমি তিন চারবার করে দেখেছি— অ্যাঁ? এক লাফে আমার কাছে এগিয়ে এলো।— পায়ের ধুলো দিন সার, না জেনে খুব অপরাধ করেছি। পা গুটিয়ে নিয়ে বললাম, জায়গায় গিয়ে বোসো, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব মিথ্যে নয়, আমি লোকটা তেমন সাদাসিধে নই।

অবধূত চোখ বড় বড় করে ফেললেন, কি ব্যাপার রে— কিছু গোল বাঁধিয়ে বসে আছিস বুঝি? তোকে নিয়ে আর আমি বেরুবো না। আমার দিকে ফিরলেন, কি করেছে?

হেসে জবাব দিলাম, কিছু না, প্ল্যাটফর্মে আমার কথা-বার্তা ওর একটু ত্যারছা মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনার প্রতি ওর ভক্তিতে একটুও খাদ নেই।

উনি চেলাকে বললেন, বসে নিজের নাক-কান মল এখন, তোর স্বভাব আর বদলাবে না। পরে আমাকে আবার একটু ভালো করে দেখে নিলেন।— তা আমার মুশকিল কি জানেন, সাহিত্য জগৎ ছেড়ে আমি কোনো জগতেরই কিছু খবর রাখি না, রোজ খবরের কাগজে চোখ বোলানোরও ফুরসত মেলে না। যাক, একজন গুণী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হল এটুকুই আনন্দ।

ভদ্রলোকের কথা-বার্তার ধরন বেশ। ভক্তদের সঙ্গে যখন কথা কইছিলেন তখনো খুব একটা সব-জান্তা ভাব দেখিনি। অলৌকিক জ্ঞান বুদ্ধির জলুস দেখাতে না এলে আমার বিরক্তির কারণ নেই। নিজে থেকে নিচের বার্থ ছেড়ে দিলেন সে-জন্যও আমার মনে মনে একটু কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আবার একটা সিগারেট ধরালেন। আমাকেই দেখছেন।— মুখুজ্জে মশাইয়ের জন্ম বোধহয় সেপ্টেম্বরে...মানে ভাদ্র মাসে?

অনুমান সত্যি। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার উৎসাহ বা কৌতূহল নেই। ফিরে জিগ্যেস করলাম, কি করে বুঝলেন?

— ভাদ্র মাসের জাতকের লক্ষণ দেখেছি...আমারও ভাদ্রয় জন্ম।

— তাহলে আমার সঙ্গে আপনার কিছু মিল আছে বলছেন?

— না, চেহারার মিলের কথা বলছি না...লক্ষণের মিলটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। বোঝার আগ্রহও নেই। তবু একটু খুশি করার জন্য বললাম, ভাদ্র মাসেই জন্ম, সেভেনথ্ সেপ্টেম্বর নাইনটিন টোয়েন্টি।

হাসতে লাগলেন।— আমার থেকে তাহলে তিন বছর চারদিন পিছিয়ে আছেন...আমার ফোর্থ সেপ্টেম্বর নাইনটিন সেভেনটিন।

এবারে আমি অবাক একটু। চেহারা-পত্রে পঞ্চাশের নিচেই মনে হয়। অবিশ্বাসের সুরে বললাম, আপনার বয়েস ষাট বলতে চান?

খুশির হাসিতে মুখখানা ভরাট। জবাব দিলেন, বয়েস ভাঁড়াতে হলে মাত্র ষাট বলব কেন, উত্তর কাশীতে এক যোগীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার বয়েস খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ— তার ভক্তরা আমাকে বলল, বাবার বয়েস নব্বুই। শুনে আমি পালিয়ে বাঁচি।

শুনতে মন্দ লাগল না। লক্ষ্য করছি আমিও। ভদ্রলোক সরস বচন-পটু বটেই। কিন্তু ভক্তরা আরো বেশি অভিভূত হয় বোধহয় তাঁর চোখের আকর্ষণে। চেয়ে থাকেন যখন, মনে হয় চোখও কথা বলে। এত স্বচ্ছ অথচ গভীর চাউনি আমি কমই দেখেছি।

সিগারেট ফেলে ঘড়ি দেখলেন।— দশটা পঁচিশ— খাওয়ার পাট সেরে ফেলা যাক, কি বলেন?

— হ্যাঁ...।

মেয়ের বোধহয় খিদে পেয়েছে। বলার আগেই উঠে খবরের কাগজ পেতে টিফিন ক্যারিয়ার রাখল। স্ত্রী তার সুটকেস খুলে প্লাস্টিকের বড় ডিশ আর গেলাস বার করে একটু ধুয়ে নিলেন। তিনি জানালার ধারে, তাই ওঠার দরকার হল না।

ও-দিকে অবধূতের সঙ্গে দেখলাম পরিপাটি-ব্যবস্থা। পেটো কার্তিক একটা বড়-সড় প্লাস্টিকের সেট পাতল। বেশ বড় দুটো ডিনার ডিশ আর কাচের গেলাস সাজালো। বড় একটা চামচ বার করল। ডিশের কোণে একটু নুন আর দুটো কাঁচা লঙ্কা রাখল। তারপর পেট-মোটা বেঁটে একটা টিফিন ক্যারিয়ার প্লাস্টিকের শিটের ওপর রাখল।

অবধূত করিডোরের জানালায় গিয়ে মুখে-হাতে জল দিয়ে এসে বসলেন। পেটো কার্তিক প্রায় বড় ডিশ জোড়া দুটো মোটা মোটা পরোটা তার ডিশে রেখে পরের বাটি খুলল। আর তার পরেই আমি আর মেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। মস্ত বাটিটা ভরতি পেল্লায় সাইজের পাকা পোনার খণ্ড। এক এক খণ্ডের ওজন দেড়শ গ্রামের কাছাকাছি হতে পারে। চামচে করে তার দু'খানা দ্বিতীয় ডিশে রাখা হল।

এ-দিকে আমাদের প্লাস্টিকের ডিশে লুচি আর আলুর দম। স্ত্রীর ডিশে পটলের তরকারি। আর আলুর দম ছাড়া বাটিতে মেয়ের জন্য একটা ডিমের কারি।

আধখানা লুচি আর আলুর দম মুখে তুলে দেখি অবধূত হাত গুটিয়ে চুপচাপ স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছেন। গভীর চাউনিও একটু যেন বিষণ্ণ মনে হল। স্ত্রী-ও হয়তো খেয়াল না করেই তাকালেন তাঁর দিকে।

দু'-হাত জোড় করে অবধূত বললেন, মা-গো ছেলের একটা অনুরোধ রাখবেন?

আমার স্ত্রী হকচকিয়ে গিয়ে চেয়ে রইলেন।

— আপনার খুব হাই ডায়বেটিস দেখতে পাচ্ছি, তাই আলুর দমের বদলে পটলের তরকারি...এক টুকরো মাছ এখান থেকে দিতে অনুমতি পেলে আপনার এই ছেলে খুব তৃপ্তি করে খেতে পারবে।

যে-ভাবে মা-গো দিয়ে শুরু করলেন আর যে-ভাবে নিজে তৃপ্তি করে খেতে পারবেন বলে শেষ করলেন— আপত্তির কথা মুখে আনাও মুশকিল। স্ত্রী অসহায় চোখে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু অনুমতি যেন পেয়েই গেছেন। অবধূত নিজে উঠে চামচসুদ্ধ মোটা বাটিটা হাতে নিয়ে নেমে এলেন। চামচে করে একটা মাছ তুলে ডিশে রাখতেই স্ত্রী আঁতকে উঠলেন, এত বড় মাছ খাব কি করে...

— ছেলের মুখ চেয়ে ঠিক খেতে পারবেন, আপনার হাই প্রোটিন ঠিক মতো পড়ছে না। দ্বিতীয় বারে একটু গ্রেভি তুলে দিলেন। তারপর তেমনি বড় আর একখণ্ড মাছ মেয়ের ডিশে দিয়ে বললেন, মাছ খাও, ডিম সরিয়ে রাখো, তোমার লিভারের গণ্ডগোল আছে, জিভের এক-পাশ কালচে দেখলাম— ডিম খাওয়া উচিত নয়— ওটা শেষ হলে আর একটা দেব।

মেয়ে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো একটু, তারপর হেসে ফেলে বলল, একখানা পরোটা দেবেন না? ...চমৎকার গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছি—

আনন্দে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠলেন।— এই তো চাই— কার্তিক, শীগগির পরোটা দে।

বাটি নিয়ে এবার আমার দিকে তাকাতেই তাড়াতাড়ি দু'হাতে নিজের ডিশ ঢাকলাম।— আর না, আর না, এবারে আপনি খান।

— দেখুন মশাই, মায়েদের নিয়ে আমার ভাবনা ছিল, না সরালে হাতের ওপরেই বাটি উপুড় করে দেব— খাওয়ার থেকে খাইয়ে কি কম আনন্দ নাকি! হাত সরান বলছি—

আমার ডিশেও তেমনি পরিপুষ্ট একটা খণ্ড পড়ল। বললাম, আপনাদের আর কি থাকল, ওই দেখুন কার্তিকের মুখ শুকিয়ে গেছে।

কার্তিক তক্ষুণি জোরালো প্রতিবাদ করল, কক্ষণো না! লোক পেলে বাবা ওই-রকম মিলে মিশে খান বলে সব সময় বেশি যোগাড় থাকে— ওই শেষের বাটিতে আরো তিন চার পিস মাছ আছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, তাছাড়া আপনাদের আলুর দমের ভাগ একটু পাব না— খাসা চেহারা দেখছি।

আমার স্ত্রী তখনো খাওয়া শুরু করেননি। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। অবধূত এক হাতে নিজের পরোটার ডিশটা তুলে সামনে ধরলেন, এতেই দিন—

চারটে আলুর দম দিতেই তিনি ডিশ সরালেন।— লাগলে আর থাকলে পরে চেয়ে নেব। ডিশ জায়গায় রেখে মাছের বাটি নিয়ে আবার মেয়ের দিকে এগোতে সে বলল, আমি আর না, এই একটা মাছ খেলেই পেট প্রায় ভরে যাবে—

প্রায় ভরলে তো চলবে না, ডিম তুমি খাবে না বললাম না— ওটা কার্তিকের জন্য সরিয়ে রাখো, মাঝে-সাজে এক আধটা পোচ খেতে পারো— হাত সরাও, আমার খিদে পেয়ে গেছে।

মেয়ে হাসি মুখে আরো এক টুকরো মাছ নিল।

— ভেরি গুড। এবারে নিজের জায়গায় আয়েস করে বসলেন।— কার্তিক, আর দেরি করিস না, তুইও খেয়ে নে।

কার্তিক অম্লানবদনে আর একটা ডিশ বার করে বসে গেল।

খাওয়া চলল। ভিতরে ভিতরে এবার আমার একটু অবাক হবার পালা।

...আমি ভুক্তভোগী বলেই এ-সব লোকের ক্ষমতা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। স্ত্রী বা মেয়েরও নেই। এই ভদ্রলোককে ভালো লেগেছে কারণ, তান্ত্রিক অবধূত হলেও তাঁর মন জয় করার রীতি আলাদা। তাতে ভড়ং-চড়ং কম। কপাল দেখে বা লক্ষণ দেখে ভাদ্র মাসে জন্ম বলে দিলেন তাও আমার কাছে কোনো শক্তির নজির নয়।...কিন্তু স্ত্রীর ডিশে পটলের তরকারি দেখেই খুব হাই ডায়েবেটিস আঁচ করে ফেললেন। তাও না হয় হল, মেয়ের লিভার খারাপ কিনা জানি না, শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে ইদানীং তাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে— সেই ডাক্তারও ওকে পারলে ডিম না খেতেই বলেছে, আর খেলে পোচ ছাড়া অন্য কিছু খেতে বারণ করেছে। অবধূত খাইয়ে আনন্দ পান সে-তো দেখলামই। নিজেও বেশ ভোজনরসিক। আরো একটু আলুর দম চেয়ে নিয়ে ওই-রকম চার পিস মাছ আর তিনখানা ঢাউস পরোটা

পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠলেন। পেটো কার্তিকও খুব পিছনে থাকল না। সে খেল চারখানা পরোটা, আমার স্ত্রীর দেওয়া আলুর দম ডিমের কারি, আর দু'পিস ওই দেড়শ গ্রাম-ওয়ালা মাছ। ততক্ষণে সে আরো অন্তরঙ্গ অমায়িক হয়ে উঠেছে। আমাদের খাওয়া হতে প্রায় হুকুমের সুরেই বলল, ডিশ-টিশ টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি যেমন আছে থাক, খাওয়া হলে আমিই ধুয়ে নিয়ে আসছি— হরিদ্বার পর্যন্ত আপনাদের আর কুটোটি নাড়তে দিচ্ছি না— সার আমাকে যতো বাজে লোক ভেবেছেন, অতটা নই— বাবা সাক্ষি।

খাওয়ার পর অবধূত আবার সিগারেট ধরিয়েছেন। পলকা গম্ভীর মুখে সায় দিলেন, তা বটে। খুব ঠাণ্ডা ছেলে, অন্যের মাথা উড়িয়ে দেবার জন্য বোমা বানাতে গিয়ে হাত-মুখের ওই দশা— আজকালকার ছেলেরা বোমাকে পেটো বলে, তাই ওর নাম পেটো কার্তিক।

স্ত্রী আর মেয়েরও পেটো কার্তিকের মুখ নতুন করে নিরীক্ষণ করার পালা। সে হতাশ গলায় বলে উঠল, যা-ও একটু মন পাওয়ার চেষ্টায় ছিলাম, বাবা দিলেন পাংচারড করে।... আচ্ছা মা, হাত আর মুখের যে দশাই হোক, ওই করতে গিয়েই বাবার আশ্রয় তো পেয়ে গেলাম, আমার বরাত খারাপ কে বলবে— বাবা আমাকে নিজের কাছে রেখে শুধু প্রাণে বাঁচালেন না— পুলিসের হাত থেকেও বাঁচালেন।

যুক্তির কথাই। পেটো কার্তিককে সত্যিই এখন খারাপ লাগছে না।

খাওয়া হতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার ডিশগুলো আর সাবান নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। কারণ গাড়ির গতি একটু শিথিল হয়েছে। ওর নামার স্টেশন আসছে।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো। ট্রেন তখন সবে থেমেছে। অবধূত তাকে সাবধান করলেন, রাতে আর খবরদার নাব্বি না বলে দিলাম, সকালের আগে আমার খবর নেবার দরকার নেই। তোর কোচ নম্বর কত?

জবাব দিয়ে পেটো কার্তিক আমাকে বলল, বাবাকে একটু দেখবেন সার তাহলে—

— তোমার বাবা সকলকে দেখেন আর আমি তাঁকে দেখব?

অবধূত তাড়া দিলেন, সর্দারি না করে তুই নাম এখন!

চলে গেল। অতি আপনার জনকে একলা রেখে যাওয়ার দুশ্চিন্তা মুখে।

আমার মনে পড়ল, হাওড়া স্টেশনের প্রণামীর টাকা সব ওর পকেটে। মনে হয়, অবধূতের ট্রেজারারও পেটো কার্তিকই হবে। তাই হয়তো এ নিয়ে কেউ কিছু উল্লেখ করল না।

ট্রেন ছাড়লে শোয়ার তোড়জোড় হবে। অবধূত নতুন সিগারেট ধরিয়েছেন। খাওয়ার পরে আমাকেও সিগারেট সেধেছিলেন। নিইনি। তোয়ালে আর সাবানের কেস নিয়ে স্ত্রী উঠলেন। শোবার আগে তাঁর বেশ করে হাত-মুখ না ধুলে চলে না। মেয়েও তাঁর পিছনে গেল।

অবধূত জিগ্যেস করলেন, আপনার স্ত্রীর ব্লাড-সুগার কতো?

— তিনশ'র ওপরে। খাবার আগে দুবেলা ইনসুলিন নিতে হয়।

— নিজে নেন?

— হ্যাঁ।

— আজ আমাদের জন্যেই বাদ পড়ল...

— কোথাও বেরুলে এ-রকম বাদ পড়ে।

— ওঁর ব্লাড-সুগার কি হিরিডিটরি?

— না।

— মেয়ের তো বিয়ে হয়নি...আপনাদের কাছেই থাকে, না হস্টেল-টস্টেলে থেকে পড়ে?

— আমাদের কাছেই থাকে।...কেন?

— আপনার স্ত্রীকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল, তাই। সিগারেট মুখে তুলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

ওরা বাথরুম থেকে ফিরে আসতে আমি গেলাম। ততক্ষণে গাড়ি আবার নড়েছে। মনে হল, ডায়বেটিসের চিকিৎসা ভালো জানা আছে কিনা জিগ্যেস করলে ভদ্রলোক খুশি হতেন। কিন্তু আমি আর ও-দিক মাড়াতে রাজি নই। আমার স্ত্রীকেও রাজি করানো যেত না।

আমি ফিরে আসার পর অবধূত উঠলেন। বেরুলেন।

মেয়ে মন্তব্য করল, ভদ্রলোক সিগারেট খান বটে— থামা নেই, দরজা বন্ধ করার পরেও খাবেন না তো?

— কি করে বলব...কেমন দেখলি অবধূতকে?

সাফ জবাব, অবধূতগিরির বুজরুকি বাদ দিলে বেশ ভালো।

স্ত্রী বিরক্ত।— তোর ও-ভাবে বলার দরকার কি?

মেয়ে বলল, তবে তোমার ভাদ্রয় জন্ম, শিল্প বা সাহিত্য করো, মায়ের ডায়বেটিস, আমার ডিম খাওয়া বারণ— বেশ জল ভাতের মতো বলে গেলেন— এ-সব কি ওঁদের অকাল্ট সায়েন্সের মধ্যে পড়ে?

স্ত্রী বাধা দিলেন, থাম না, এসে যাবেন...।

— এলেই বা, মাছ খাইয়ে মাথা কিনে ফেলেছেন নাকি যে ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারব না! হেসে ফেলল, যা-ই বলো, খাসা মাছ কিন্তু, আর পরোটাও খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের বাবা— একটাই তল করতে পারছিলাম না।

এবারে স্ত্রীর ধমক।— তুই থামবি?

ফুঁ দিয়ে আমার আর মেয়ের রবারের বালিশ ফোলানোর মধ্যে অবধূত এসে গেলেন। নিচের বার্থেও সুজনি পাতা হয়ে গেছে। আমার ওপরের বার্থ বাকি। সেটা নিজেই পাতলাম।

মা-কে একটু জব্দ করার জন্যেই হয়তো মেয়ে খুব নিরীহ মুখে অবধূতকে বলল, আপনি কি রাতেও সিগারেট খাবেন নাকি?

ওর মা কেন,আমিও একটু বিব্রত বোধ করলাম। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন, না মা না, রাতে আর না— ইস্, তোমার অসুবিধে হচ্ছিল আমাকে বললে না কেন!

মেয়ে হাসি মুখেই মাথা নাড়ল।— জানলা দরজা সব খোলা ছিল, আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না— আপনাকে জিগ্যেস করলাম বলে মায়ের মুখ দেখুন— তোমাকে

বললাম না, মানুষ হিসেবে উনি দারুণ ভালো?

প্রসন্ন মুখে হাসছেন ভদ্রলোক। মেয়ের দিকেই চেয়ে আছেন। বললেন, আর অবধূত হিসেবে দারুণ ভাঁওতাবাজ, এই তো?

মেয়ে এবারে নিজের কলে নিজে পড়ল। মুখ লাল করে আত্মরক্ষার চেষ্টা।

— তা কেন...

তেমনি হাসছেন।— আমি যেমনই হই, মেয়ে তুমি কত ভালো এ কিন্তু নিজেও জানো না। আচ্ছা গুড্ নাইট।

উনি ওঁর জায়গায় উঠে গেলেন। আমি প্রথমে দরজা, পরে মেয়ের দিকের জানলাও বন্ধ করলাম। স্ত্রী মাথার জানলা খোলা থাকলো, ওটা বন্ধ করতে গেলে বাধা দেবেন জানা কথাই।

...এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। ওপরের সামনের বার্থে অবধূত নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। মেরুদণ্ড সোজা। দুচোখ বোজা।

ঘড়ি দেখলাম। রাত সাড়ে তিনটে।

এরপর আবার ঘুম ভাঙলো সকাল সাড়ে পাঁচটায়। অবধূত তেমনি বসে আছেন। তবে এখন চোখ বোজা নয়। চোখোচোখি হতে হেসে একটু মাথা নাড়লেন। নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম, স্ত্রী-ও বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। মেয়ে ও-পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। আমার কেমন মনে হল সেই রাত থেকে সিগারেট খেতে না পেয়ে ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে। নিচে নেমে এলাম। ফিসফিস গলায় স্ত্রীকে বলতে তিনিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে অবধূতকে বললাম, আপনি নেমে এসে বসুন, এতক্ষণ সিগারেট খেতে না পেয়ে আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি।

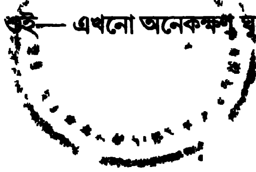
তিনি হাসলেন, হাতের কাছে থাকলে খেয়ে যাই— আবার না খেলেও কষ্ট-টষ্ট খুব কিছু হয় না...ব্যস্ত হবেন না, ওঁরা উঠুন—

স্ত্রী উঠে বসেই আছেন, উনিই নিচে নেমে বসতে বললেন আপনাকে।

খুশি মুখে নেমে এলেন। কাঁধে তোয়ালে, এক-হাতে সোপ কেস্, টুথ-ব্রাশে পেস্ট লাগানো, অন্য হাতে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার। আমাকে বললেন, দরজাটা খুলুন, এ-পাট সেরে আসি।

আধ-ঘণ্টা বাদে ফিরলেন।...আমি রাত সাড়ে তিনটে থেকে ওঁকে বসা দেখেছি, তারও কত আগে থেকে বসেছিলেন জানি না। কিন্তু তরতাজা মুখ। হাতের তোয়ালে হুকে ঝুলিয়ে টুথ-ব্রাশ আর সাবান ওপরের বার্থের ভি. আই. পি. ব্যাগে রাখতে রাখতে বললেন, পর পর তিনটে সিগারেট খেয়ে এলাম, মা-মণির ঘুম ভাঙার আগে আর খাচ্ছি না।

আর ঠিক তক্ষুণি মা-মণি আড়মোড়া ভেঙে এ-দিক ফিরল। একবার চোখও তাকিয়েছে। আবার বুজতে গিয়েও বুজল না। সামনের লোকের বসনের লালের ধাক্কায় ঘুম একটু চটে গেল বোধহয়। উঠে বসল। মেঝের স্যাণ্ডেলে পা গলাতে গলাতে বলল, আপনারা গল্প করুন, আমি বাবার জায়গায় গিয়ে শুই— এখনো অনেকক্ষণ ঘুমোবো।



সামনের সিঁড়ি দিয়ে প্রায় চোখ বুজেই ওপরের বার্থে উঠে গেল। ওর রাজসিক ঘুম। ইচ্ছে করলে বেলা ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ঘুমোতে পারে। তবে গত দেড় মাস ধরে ঘুমনো থেকে ছটফটই করত। আশা করছি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ওঁর অন্তত উপকার হবে।

অবধূত আমাদের মুখোমুখি বসলেন। বললেন, গাড়ি ঘণ্টাখানেকের মতো লেট যাচ্ছে, ছ'টা ক'মিনিটে গয়া পৌঁছনোর কথা, সাতটা বেজে যাবে— গয়ার আগে ব্রেকফাস্টের আশা নেই। ভদ্রলোক ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা নিজের ঘাড়ে তুলে নেবেন মনে হতে বললাম, ব্রেকফাস্ট অন্ মি, আগে থাকতেই বলে রাখছি।

হাসছেন মিটিমিটি। —কেন, মাছের জবাবে আলুরদম তো হয়ে গেছে।

—দুধের বদলে ঘোল।

—ঘোল কি দুধের থেকে খারাপ জিনিস নাকি মশাই! অবস্থা বিশেষে দুধ বিষ, ঘোল অমৃত।...তা আমার আপত্তি করার কোনো কারণ নেই, এই জীবনটা পরের ওপর দিয়েই দিব্বি চালিয়ে যাচ্ছি। হাসতে গিয়ে আমার স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তে একটু থমকালেন। উনি আমার দিকে পিঠ রেখে জানলা দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে আছেন। অপলক চোখে খানিক তাঁকে দেখার কারণ কি ঘটল বুঝলাম না। সকালের তাজা হাসি মুখখানা একটু যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কালও একবার এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। উঠলেন। নিজের ওপরের বার্থ থেকে ভি. আই. পি. ব্যাগটা নামিয়ে আবার বসলেন। পাশে লাইটার আছে, সিগারেট নেই। অর্থাৎ ফুরিয়েছে। ওটা খুলে আর একটা ডবল প্যাকেট বার করলেন। কিন্তু সেই ফাঁকে এমন কিছু চোখে পড়ল যে ভিতরে ভিতরে বেশ অবাক আমি। কাল রাতে বিলিতি হুইস্কির বোতলটা পুরো ভরতি দেখেছিলাম। আজ এই সকালে দেখছি বোতলের জিনিস অনেকটা নেমে এসেছে। বোতলটা শোয়ানো অবশ্য, কিন্তু তবু বেশ বোঝা যায়। যেটুকু কম সেটুকুর সদ্‌গতি রাতের মধ্যেই হয়েছে সন্দেহ নেই।

ব্যাগ বন্ধ করলেন। ওটা পাশেই পড়ে থাকল। প্যাকেট খোলার ফাঁকে স্ত্রীকেই লক্ষ্য করছেন। একটা সিগারেট বার করলেন। বারকয়েক সেটা প্যাকেটে ঠুকে স্ত্রীকেই জিগ্যেস করলেন, মায়ের কি রাতে প্রায় ঘুম হয় না নাকি?

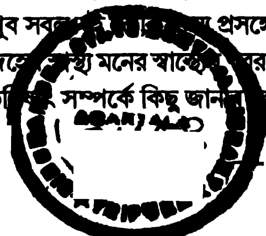
স্ত্রী জানলার দিক থেকে মুখ ফেরালেন। অস্ফুট জবাব দিলেন, হয়...।
আমি জানি হয় না। একদিন দু'দিন নয়, প্রায় চৌদ্দ বছর যাবতই হয় না।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ অবাঞ্ছিত আমার কাছে।

সিগারেটটা হাতে করেই কিছুটা সরে গিয়ে স্ত্রীর মুখোমুখি বসলেন তিনি। বেশ গম্ভীর।—মা, ছেলেকে যে হাতখানা একটু দেখাতে হবে।

বিব্রত মুখে স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন।

আমি ঘর-পোড়া গোরু। এ-সবে কোনদিনই বিশ্বাস ছিল না— এখন তো বিরক্তিকর। কিন্তু তাহলেও ভিতরে মানুষটা আমি খুব সব[illegible] প্রসঙ্গে উতলা হবার মতোই কিছু বলে বসার সম্ভাবনা। কারণ তাঁর দে[illegible]স্থ্য মনের স্বাস্থ্যে[illegible]র আমি জানি। আপত্তির সুরেই বললাম, থাক না—আমাদের ভ[illegible] সম্পর্কে কিছু জান[illegible]কৌতূহল নেই।



দু'চোখ আমার মুখের ওপর ফেরালেন। এ সেই চোখ। স্বচ্ছ অথচ গভীর ব্যঞ্জনাময়। এই দৃষ্টির প্রভাব তুচ্ছ করার মতো নয়। বললেন, আপনার মনের ভাব বুঝতে পারছি। আমি গায়ে পড়ে কারো ভবিষ্যৎ বলতে যাই না। নিজের শিক্ষার জন্যেই একবারটি মায়ের হাতখানা দেখতে চাইছি...একবারটি দেখান মা।

অগত্যা স্ত্রী আস্তে আস্তে বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিলেন। ঝুঁকে বেশ নিবিষ্ট চোখে দেখলেন খানিক।— ডান হাতও একটু দেখি...

দেখলেন। তারপর সরে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন। গম্ভীর ঠিক নয়, আরো বিষণ্ণ মনে হল।— আপনাকেও একটু বিরক্ত করব, ডান হাতটা একটু দেখান।

বিরক্ত নয়, আমার রেগে যাওয়ারই কথা। কিন্তু এই মুখের দিকে চেয়ে হাত কেন যেন আপনিই উঠে এলো। কম করে মিনিটখানেক দেখলেন উনি। তারপর পিছনে গা ছেড়ে দিয়ে বড় নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। হাতের সিগারেটটা ধরালেন। স্ত্রী এখন উতলা মুখে তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। সিগারেটে পর পর দু'তিনটে টান দিয়ে বিষণ্ণ গম্ভীর চোখে অবধূত আমার দিকে তাকালেন। ভারী গলায় বললেন, আপনাদের একমাত্র ছেলেটি বুঝি অনেককাল ভুগে কিছুদিন আগে চলে গেল...?

গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। স্ত্রীও স্তব্ধ। অবধূত এই দুঃখের অতীত দেখার জন্য হাত দেখতে চেয়েছেন এ কে ভাবতে পারে। আমি বিস্মিত বিমূঢ় চোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছি।...হ্যাঁ, হাত দেখার আগেও এঁকে বিষণ্ণ মুখে চেয়ে থাকতে দেখেছি।

— আপনি হাত দেখে এটা বুঝে ফেললেন?

— হাত আমি খুব কমই দেখি।... দরকার হয় না। কাল রাতেও মায়ের ভিতরে আমি শোকের ছায়া দেখেছিলাম। আজও দেখলাম। শিওর হবার জন্য আজ হাত দেখতে চাইলাম।... কত বছর বয়েস হয়েছিল?

— আঠারো।

— অনেক দিনের পুরনো অসুখ?

— হ্যাঁ, মাসকুলার ডিসট্রফি...চৌদ্দ বছর ভুগে দেড় মাস আগে চলে গেল।

এবারে শান্ত মুখেই স্ত্রী জিগ্যেস করলেন, আপনার হাতে এলে আপনি কিছু করতে পারতেন?

— কিছু পারতাম না মা, কেউ পারত না।

নিজের অগোচরে একটু রুক্ষ স্বরে বলে উঠলাম, না পারলেও আপনারা পারার আশ্বাস দেন কেন? অভয় দ্যান কেন? সতেরো রকমের ক্রিয়াকলাপ করান কেন?

যে-ভাবে চেয়ে রইলেন, আমি নিজেই অপ্রস্তুত একটু। চাউনির মতো গলার স্বরও ঠাণ্ডা।—আপনি অনেকের কাছেই গেছলেন?

— আমার কোনদিনই এ-সবে খুব বিশ্বাস ছিল না...এ রোগের চিকিৎসা নেই শোনার পর স্ত্রীর ইচ্ছেয় যেতে হয়েছে। চুপচাপ বসে তো আর দেখতে পারি না।...প্রচার আছে, ভারতবর্ষের

এ-রকম প্রায় সব গড়্‌ম্যানের কাছে ছেলে নিয়ে আমরা গেছি।

সিগারেট এরপর হাতেই পুড়তে থাকল। বিমনা মুখে ভদ্রলোক বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। সিগারেটের আগুন আঙুল ছুঁই-ছুঁই হতে ওটা ফেলে দিলেন। নিজের মনেই বার দুই বললেন, গড়্-ম্যান...গড়্-ম্যান। আমার দিকে তাকালেন।— গডের হদিস কেউ কখনো পেয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু এ-টুকু মনে হয়, পেলে তার আর গড়্-ম্যান হবার সাধ থাকে না।... আপনার বিচারে ভুল খুব নেই, তবু একটু আছে। মানুষ দুঃখ কষ্ট ভয় কারো না কারো কাছে জমা দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়। কিছু কাজ পেলে আমাদের গড়্-ম্যান তারাই বানায়। তাদের বিশ্বাসের পুঁজি বাড়তে থাকে।

— যেটুকু কাজ পায় তা হয়তো আপনাদের কাছে না এলেও পেতে পারত।

— নিশ্চয়ই পেতে পারত, কিন্তু সব-সময় নয়। আমাকেই ধরুন। আমি ওষুধে বিশ্বাস করি, কিছু ওষুধ নিজেও জানি।... আপনাদের মেডিক্যাল সায়েন্সের ওষুধের কথা বলছি না, ও-ছাড়াও পৃথিবীতে কত রকমের ওষুধ আছে তা কে বলতে পারে? সে-রকম ওষুধ জানা থাকলে লোকের কাজ হয়।

— কিন্তু তার জন্যে কারো অবধূত কারো মহারাজ হয়ে বসার দরকার কি? ওষুধ দিলেই তো হয়? হাসলাম।

— আপনার খুব রাগ আমাদের ওপর। ...কিন্তু আমাদের কাছে লোক এলে তবে তো ওষুধ! আসবে কেন? আসে ভয়ে, ভয় জমা দিতে। কিছু পেয়ে হোক বা অপরকে দেখে হোক, তার ভিতরে বিশ্বাসের প্রবণতা আসে।... এই বিশ্বাস কি জিনিস আপনি জানেন? আপদে-বিপদে এর মতো ক্যাটালিটিক এজেন্ট খুব কম আছে। সব ছেড়ে শুধু এই বিশ্বাসের জোরেই কত লোককে কত রকমের বিপদ কাটিয়ে উঠতে দেখেছি শুনলে আপনি অবাক হবেন। মাঝখান থেকে নাম হয়ে যায় আমাদের। আর পতনও হয় শুধু আমাদেরই। কারণ সেই অহঙ্কারে আমরাও ওদের দেওয়া গড়্-ম্যানের নামাবলীটা আঁকড়ে থাকি।

অবধূত সিগারেট ধরালেন।

আমি চেয়ে আছি। এমন সহজ যুক্তির কথা কম শুনেছি বটে। এই গোছের লোকের সঙ্গে এমন সদয় অথচ অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগও কম পেয়েছি। লোকটি যে দস্তুরমতো শিক্ষিত তাতেও ভুল নেই। নইলে ক্যাটালিটিক এজেন্টের উপমা দিতেন না। কিন্তু আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি ছেলের প্রসঙ্গের পর থেকে।

— কি দেখছেন?

বললাম, আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।

এবারে চোখে কৌতুকের আভাস।— কি রকম?

— কাল আমার কপাল দেখে জন্ম মাস আর পেশা বলে দিলেন, স্ত্রীর হাই ডায়বেটিস বললেন আর তাঁর ভিতরে শোকের ছায়া দেখলেন, মেয়ের জিভ দেখে লিভারের কথা বললেন, আর আজ আমাদের এত বড় শোকের ব্যাপারটাও আপনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

হেসে উঠলেন।— একটু-আধটু আছে অস্বীকার করছি না— কিন্তু জেনে রাখুন, এই ক্ষমতার একটুও ঐশ্বরিক নয়— এ-ও একটা সায়েন্স— এই সায়েন্স ফলো করলে আপনিও এই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন— লোকের কাছে আমরা অবশ্য এটাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলেই ক্যাশ করে থাকি।

বড় ভালো লাগল। হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে বসে ভক্ত সমাবেশে দেখে এই মানুষ যে এমন নিরহঙ্কার একবারও ভাবতে পেরেছি।

স্টেশন প্রায় এসেই গেছে খেয়াল করিনি। গাড়ির গতি খুব শ্লথ। অবধূত বললেন, এবারে গলা ভেজানোর তোড়জোড় করা যাক— আপনি ব্যস্ত হবেন না, ট্রেন থামলেই কার্তিকের শ্রীমুখ দেখা যাবে।

— বাবা, আমারও চা নিও। ওপরের বার্থ থেকে মেয়ের গলা। গলার স্বর থমথমে। চেয়ে দেখি সে শেকলের কাছে কাত হয়ে অবধূতকেই দেখছে।

চোখ লাল-লাল।

অবধূত বললেন, যাক, ঠিক সময়ে তোমার ঘুম ভেঙেছে। চট-পট নেমে মুখ-হাত ধুয়ে এসো। আমার মনে হল মেয়ে জেগেই ছিল। চুপ-চাপ নেমে এলো। তারপর অবধূতকে অপ্রস্তুত করে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

— এ কি গো মা! সকালে উঠেই প্রণাম কেন?

ভার-ভার গলায় মেয়ে জবাব দিল, আপনার কার্তিকের থেকেও আমি বেশি অপরাধ করেছিলাম— তাই।

তোয়ালে সোপ-কেস আব পেস্ট লাগানো টুথ-ব্রাশ হাতে করে বেরিয়ে গেল।

অবধূতের বিড়ম্বিত মুখ আরো কমনীয় দেখালো।— কি কাণ্ড, মেয়ে তো ওপরে শুয়ে আমাদের কথা সব শুনেছে!

বললাম, শোনার মতো কথা, শুনে ভালোই করেছে।

ট্রেন থামার এক মিনিটের মধ্যে পেটো কার্তিক হাজির। মেঝেতে সোজা শুয়ে পড়ে বাবার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম সারল। তারপর উঠে আমার দিকে ফিরে বলল, আজ আর বঞ্চিত করবেন না সার, পায়ের ধুলো নিতে দিন। তারপর হাত ঠেলে সরিয়ে আমার স্ত্রীকেও একটা প্রণাম ঠুকে উঠল।

ব্রেক-ফাস্টের মেনু ব্রেড-বাটার, ডবল ডিমের পোচ, দু'পট চা আর কলা পেলে কলা। আর ছোট এক পট চা চিনি ছাড়া।

স্ত্রী মেয়ের দিকে চেয়ে এক আঙুল দেখিয়ে ইশারা করতে ও বলল, মা সিঙ্গল পোচ খাবে বলছে, আমার কিন্তু ডবলই চাই।

পেটো কার্তিক গজ-গজ করে উঠল, এখন কলার খোঁজ—ডালা ভরতি ফল কাল সব দাতব্য করে বসলেন!

আমরা হাসছি। অবধূত বললেন, তুই কিছুই সরিয়ে রাখিসনি বলতে চাস?

—বাদাম আখরোট কিসমিস আছে, বিস্কুট আছে, মেওয়ার সন্দেশ আছে, চানাচুর আছে।

অবধূত টিপ্পনীর সুরে বললেন, ডিম টোস্ট কলা আর ওইসব দিয়েই কষ্ট করে ব্রেক-ফাস্টটা সেরে ফ্যাল—কি আর করবি?

এই ছেলেটাকেও আজ আমার ভালো লাগছে। বোমা-বাজ ছেলেটাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ভদ্রলোক ভালো ছাড়া মন্দ কি করেছেন।

চা-পর্ব শেষ হবার বেশ আগে ট্রেন ছাড়ল। পেটো কার্তিক জোর করেই দিদিকে কলা মিষ্টি খাওয়ালো, একটা মাত্র মিষ্টি খেলে মায়ের ক্ষতি হবে কিনা জিগ্যেস করল—হবে শুনে তাঁর ডিশে অনেকটা চানাচুর ঢেলে দিল।—চায়ের সঙ্গে খান, বেশ ভালো চানাচুর।

এই অন্তরঙ্গ খুশির হাওয়া আমরা ভুলতে বসেছিলাম।

খাওয়া শেষে ট্রে-তে জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে একদিকে সরিয়ে রেখে পেটো কার্তিক বলল, দিদি, আপনার কালকের সেই বইখানা দেবেন, সারের গল্পটা পড়ে ফেলি—

বলার ধরনটা আমাকে একটু অনুগ্রহ করার মতো। দিদি বই বার করে দিল।

অবধূতকে জিগ্যেস করলাম, আপনি আপাততঃ তাহলে দেরাদুনেই থাকছেন কিছুদিন?

—দিন পনেরোর বেশি নয়, তার মধ্যে দিন দুই মুসৌরিতেও কাটানোর ইচ্ছে আছে।

—চেঞ্জে?

—আমার আবার চেঞ্জ, যাচ্ছি এক ভক্তর টানা-হেঁচড়ায়।

বইয়ের দিকে চোখ, পেটো কার্তিকের গম্ভীর মন্তব্য।—ভক্ত টাকার আণ্ডিল, কিন্তু হাড় কেপ্পন, আমার সেকেণ্ড ক্লাসে যাবার ভাড়া পাঠিয়েছে...ফাঁক পেলে আমি ঠিক শুনিয়ে দেব।

অবধূত হাসি চেপে ধমকে উঠলেন, যেটুকু জোটে তাতেই খুশি থাকতে পারিস না কেন? তেমনি গম্ভীর উত্তর।—পারলে আর চেলাগিরি করব কেন, বাবাই হয়ে বসতাম।

মেয়ে তো বটেই আমার স্ত্রী-সুদ্ধু হেসে ফেললেন। গুরু-শিষ্যের এমন সদালাপও কম শোনা যায়।

অবধূত জিগ্যেস করলেন, আপনি হরিদ্বারে কতদিন থাকবেন?

—ভালো লাগলে ওই-রকমই—দিন পনেরো।

—দু'চার দিনের জন্য দেরাদুনে চলে আসুন না—ভালোই লাগবে।

—আগে গেছি। ওখানে যাবার মতো গরম জামা-কাপড় সঙ্গে আনিনি, আমার আবার অল্পেতে ঠাণ্ডা লাগার ধাত...হরিদ্বারেই নিরিবিলিতে দিন কতক কাটিয়ে আসব, তাছাড়া এখন বেড়ানোর মন খুব নেই।

—হরিদ্বারে থাকছেন কোথায়, কংখল রামকৃষ্ণ মিশনে?

—সে রকমই ইচ্ছে।

—ইচ্ছে মানে... লিখে জায়গা বুক করেননি?

—এবারে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম, সেটা করা হয়নি।

—তাহলে তো মুশকিল, জায়গা পাবেন মনে হয় না। হাতের সিগারেট জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে হেসে বললেন, না মশাই, আমি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করছি না—এই সময় থেকেই সেখানে যাত্রীর ভিড় হতে থাকে—মহারাজদের সঙ্গে জানাশোনা আছে?

—তা আছে, কিন্তু ঘর খালি না থাকলে আর জায়গা দেবেন কোথা থেকে...তখন ভালো কোনো ধরমশালায় ওঠার চেষ্টা করব।

—কেন, মনের এই অবস্থা নিয়ে আপনি একজন গুণী মানুষ যাচ্ছেন—তাঁদের নিজেদের কারো ঘর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

হেসে জবাব দিলাম, সেই উচিত কাজটি তাঁরা করতে যাচ্ছেন বুঝলে আমি আগেই পালাব।

অবধূত বললেন, দেখুন পান কিনা, না পেলেও কিছু অসুবিধে হবে না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বই থেকে মুখ না তুলে পেটো কার্তিক মন্তব্য করল, মুখ দিয়ে যখন একবার বেরিয়েছে কংখলে ঘর পাবেন না—পাবেন না।

এবারে সত্যিই ধমকের সুরে অবধূত বললেন, তোর চোখ কোন্ দিকে আর কান কোন্ দিকে। নিরুত্তর। নির্লিপ্ত।

ট্রেন মোগলসরাই পৌঁছতেও প্রায় ঘণ্টাখানেক লেট। গাড়ি থামতেই দু'রকমের ব্যাজ আর তকমা-পরা লোকের তৎপর আনাগোনা শুরু হয়েগেল। বেনারসে লাঞ্চ। অর্ডার নেবে। ট্রেন এক ঘণ্টার ওপর লেট হয়ে এক-দিক থেকে ভালোই হল। ঠিক সময়ে অর্থাৎ সাড়ে বারোটা নাগাদ লাঞ্চ পাব। একটা লোক আমাদের কেবিনে মুখ বাড়াতে তাকে ডাকলাম। সকলের লাঞ্চও 'অন্ মি'ই করতে চাই। এবং সেটা খুশি মনেই।

কিন্তু আমাকে অবাক করে অবধূত তাকে বলে দিলেন, দরকার নেই, যাও।

চলে গেল। আমি বললাম, সে কি, বেনারসে লাঞ্চ হবে না?

—হবে আশা কবা যায়... সেখানে গিয়ে দেখা যাক না কি জোটে।

—কিন্তু বেনারসে আধ ঘণ্টা স্টপ, তখন অর্ডার দিয়ে কিছু পাওয়া যাবে?

মুচকি হাসলেন। মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার বাবাব বোধহয় বেজায় খিদে পেয়ে গেছে, বেনারসে কিছু না জুটলে বিপদেই পড়ে যাব দেখছি...।

বইয়ের দিকে চোখ, পেটো কার্তিকের ঠোঁটেও হাসি ঝুলছে।

অবধূত তেমনি হেসেই আবার বললেন, সকালের ব্রেকফাস্ট তো আপনার ওপর দিয়ে হয়ে গেছে, এরপর কাল হরিদ্ব... পর্যন্ত যা কিছু সব আমাদের অদৃষ্টের ওপর দিয়েই হয়ে যাবে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বুঝলাম বেনারসে কারো কাছ থেকে খ বার আসবে। তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। প্রথমতঃ এতে ঠিক অভ্যস্ত নই। দ্বিতীয়ত, কলকাতা বা হাওড়া থেকে না-হয় নিজে টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই করে খাবার এনেছিলেন। কিন্তু এখানে আবার তিনজন বাড়তি লোকের খাবার কে যোগাবে?

ট্রেন ছাড়লে মোগলসরাই থেকে বেনারস সামান্যই পথ। ..মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। তার আগেই পেটো কার্তিকের আমার গল্প পড়া শে' ময়েকে বই ফেরত দিতে দিতে বলেছে, ফার্স্ট ক্লাস—আর একবার সারের পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

আর অবধূত হেসে মন্তব্য করেছেন, কার্তিককে কিন্তু হেলা-ফেলা করবেন না—দস্তুর

মতো বি. এ. ফেল। তাঁর এই কথার মধ্যেই বেনারস এসে গেল। পেটো কার্তিকও চটপট উঠে পড়ল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিনজন বয়স্কা মহিলা আর তিনজন বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে ফিরল। দেখলেই মনে হয় সকলেই অবস্থাপন্ন এঁরা। মহিলাদের বেশ-বাসের আড়ম্বর তেমন নেই, হাতে এক গাদা করে চুড়ি-বালা -আঙটি, গলায় মোটা হার, কানে হীরের দুল, দু'জনের নাকে হীরের ঝকঝকে নাক- ফুল। ভদ্রলোকদের পরনে পাট-ভাঙা ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি, ঝকঝকে সোনার বোতাম, কব্জিতে সোনার ব্যাণ্ডের ঘড়ি। আর প্রত্যেকের আঙুলে একটা করে হীরের আঙটি। মহিলাদের তিনজনেরই হাতে একটা করে প্যাকেট।

তাঁদের দেখে অবধূত হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকদের একজন জিগ্যেস করলেন, বাবার ট্রেনে কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না?

—কিচ্ছু না। তোমাদের মতো আপনার জনেরা থাকতে অসুবিধা করে কার সাধ্য—তা ভালো আছ তো সব? মায়েরা ভালো? ছেলে-মেয়েদের আনোনি বুঝি?
সামনে মহিলারা। একজন বললেন, ওদের সকলেরই স্কুল কলেজ... আপনার ফেরার সময় দর্শন করবে।

হাতের প্যাকেট পায়ের কাছে রেখে তিনিই প্রথম মাথা রেখে প্রণাম করলেন। উঠতে দেখা গেল, পায়ের কাছে দু'ভাঁজ করে একশ টাকার নোট—একাধিক তো বটেই।

একে একে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মহিলাও প্যাকেট পায়ের কাছে রেখে ওই ভাবে প্রণাম করলেন। তাঁরাও ভাঁজ করা নোট রেখেছেন।

প্রণাম শেষ হতে অবধূত হাত দেখিয়ে তাঁর দিকের বার্থে বসতে বললেন। তাঁরা বসতে ভদ্রলোক তিনজন একে একে পায়ে কপাল ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠলেন। সামনের জন পিছনের জনকে বললেন, বাবার খাবার নিয়ে ওরা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আনতে বলো—

তিনি ও-দিক ফিরতে আমরা সরে গিয়ে বাকি দু'জনের বসার জায়গা করে দিলাম। অবধূত হাসি মুখে মহিলাদের মাঝখানে বসে তাঁদের বললেন, বোসো—এবারে আমি মস্ত এক গুণীজনের সঙ্গে সফর করছি—ইনি সাহিত্যিক ওমুক...এঁরা তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে। মহিলাদের জিগ্যেস করলেন, এঁর লেখা তোমরা পড়েছ?

বয়েস যার একটু কম তিনি হেসে জানান দিলেন, আমি অনেক বই পড়েছি, অনেক গল্পের সিনেমাও দেখেছি—

বড় নিঃশ্বাস ফেলে অবধূত বললেন, আমিই হতভাগা দেখছি—

যিনি বেরিয়ে গেছলেন তিনি একটা টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে ফিরলেন, তার পিছনে দু'জন লোকের হাতে বড়সড় দুটো করে ঝক-ঝকে কাঁসার পরাতের মতো, তার ওপর এনামেলের থালার ঢাকনা। জায়গা করার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পেটো কার্তিক প্যাকেটগুলো আর তিন গোছা নোট তুলে নিল। লোক দুটো কাঁসার দু'জোরা ঢাক্না পরাত মেঝেতে রাখল, ওগুলোর পাশে ভদ্রলোকের হাতের টিফিন-ক্যারিয়ার।

অবধূত বললেন, এত কি এনেছ—অ্যাঁ?

সামনের ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন, মাছ আর গরম ভাত— আর কিছু না। একটু মাংস আনার ইচ্ছে ছিল, তা কার্তিকবাবু চিঠিতে জানালেন মাংস আনার দরকার নেই, আর কলকাতায় পাকা পোনাই খেতে হয়— বাবার জন্য অন্য মাছের ব্যবস্থা করাই ভালো।

অবধূত হাঁ করে কার্তিকের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। আমার দিকে চেয়ে বললেন, ওর কর্তামো দেখুন।

হাত জোড় করে ভদ্রলোক হাসি মুখে কার্তিকের সহায় হলেন, এটা কার্তিকবাবুর সঙ্গে আমাদের ব্যাপার, উনি কেবল আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

—বেশ করেছে। নে এ-সব কোথায় রাখবি এখন দ্যাখ্, বাসনগুলো চটপট খালি করে দে— একজন মহিলা বাধা দিলেন, ট্রেনে আবার বাসন খালি করবে কি করে, সব নষ্ট হয়ে যাবে— সঙ্গেই যাক, আপনার ফেরার সময় আমরা নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব।

এরপর খানিক ঘরোয়া প্রসঙ্গ আর ব্যবসার প্রসঙ্গে কথা হতে হতে গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেল। আর একবার পায়ের ধুলো নিয়ে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা নেমে গেলেন। ট্রেন ছাড়ল।

এবারের ব্যাপারটা কিন্তু হাওড়া স্টেশনের মতো খারাপ লাগল না। এই মানুষটিকে নিয়ে আমার আগ্রহ বাড়ছে। অনেক লোক যাঁর কাছে আসে তাঁর ওপর ঈশ্বরের বিশেষ দান কিছু থাকেই— শ্রীরামকৃষ্ণ এই গোছের কি-যেন বলেছিলেন। এই মুহূর্তে কথাটা মনে পড়ল কেন জানি না। পেটো কার্তিক গম্ভীরমুখে বসে পকেট থেকে তিন থাক নোট বার করে গুনছে। অবধূত তার দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসছেন আর সিগারেট টানছেন। এক-এক থাকে পাঁচখানা করে একশ টাকার নোট আর একটা এক টাকার। সব মিলিয়ে পনেরশ' তিন টাকা। পেটো কার্তিক সবগুলো একসঙ্গে ভাঁজ করে এবারে নিজের প্যান্টের বাঁদিকের পকেটে গুঁজল। তারপর প্যাকেটগুলো খুলল। প্রত্যেক প্যাকেটে চকচকে টকটকে লাল সিল্কের চেলি আর কোয়ারটার হাত সিল্কের ফতুয়া। সেগুলো আবার প্যাকেটে রেখে পেটো কার্তিক বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল, আমি যে একটা লোক বাবার সঙ্গে থাকি এ কারোর চোখেই পড়ে না।

আমরা হেসে উঠলাম। আলতো করে বাবা বললেন, টাকা-কড়ি তো সব আগে-ভাগে তুই-ই হাতিয়ে নিস—

—হুঁ, আমি চিনির বলদ।

অবধূত ছদ্ম কোপে চোখ রাঙালেন, এই হারামজাদা, ওই টাকা থেকে তুই বিড়ি, সিগারেট, চপ, কাটলেট খাস না?

লজ্জা পেয়ে পেটো কার্তিক চার আঙুল জিভ কাটলো। তারপর টিফিন-ক্যারিয়ারের গায়ে হাত রেখে বলল, ভাত গরম আছে, আর দেরি করে কি হবে?

এক-একটা পরাতের ঢাকনা খুলতে আমাদের চক্ষু স্থির। প্রথমটাতে একগাদা বড় বড় মাছের ফ্রাই। তার নিচেরটাতে চিতল মাছের পেটির কালিয়া। ছ'পিস আছে, এক-এক পিসের ওজন আড়াইশ'র কম হবে না। তার পরের পরাতে আধ-হাতেরও বড় এক-একটা পাবদা মাছ— সর্ষের ঝাল। সে-ও আট ন' পিস হবে। ওটার নিচের পরাতে তোপসে মাছের পাতলা

ঝোল—এও দেখার মতো সাইজ, গোটা বারো চোদ্দ হবে।

দেখেই আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। ওই সাইজের দুটো ফ্রাই আর একখণ্ড করে চেতল মাছের পেটি খেলে পেট টাঁই হবার কথা।

অবধূত হাসছেন, এ-সব মাছ আনার জন্য তুই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলি? হৃষ্টবদন পেটো কার্তিক জবাব দিল, তা কেন, আপনি যাচ্ছেন জেনে ওঁরাই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, বেনারস স্টেশনে আপনার দুপুরের খাবার নিয়ে আসবেন—বাবা কি-কি আনলে পছন্দ করবেন। আমি শুধু লিখে দিয়েছিলাম, পাকা পোনা আর মাংস বাদে অন্য সব মাছই বাবা ভালো খাবেন—মাংস আর পোলাউ তো লক্ষ্ণৌয়ের পার্টি নিয়ে আসবেন।

আমার মেয়ে হঠাৎ খিল-খিল করে হেসে উঠল। হাসি থামতেই চায় না। তারপর অবধূতের দিকে চেয়ে বলল, এরপর আপনার কবে কোথায় যাবার প্রোগ্রাম হয় আমাদের আগে থাকতে জানাবেন তো!

অবধূত হেসে সায় দিলেন, জানাবেন।

আমি বললাম, তা তো হল, দু'জনের জন্য ওঁরা এই খাবার এনেছেন?

পেটো কার্তিক জবাব দিল, তা না, পথে কারো না কারো সঙ্গে বাবার আলাপ হয়ে যায়ই, আর বাবা না দিয়ে থুয়ে খান না, এ সব ভক্তরাই জানেন।

সকলে গলা পর্যন্ত খেয়েও সবই বেশি হল। আমার পরের কথায় আর কেউ না হোক স্ত্রী অসন্তুষ্ট হলেন। বলেছিলাম, যা রইলো তার কিছু রাতে কাজে লাগতে পারে—আমার স্ত্রী মাংস খান না।

অবধূত ব্যস্ত হয়ে পরিষ্কার মতো টিফিন-ক্যারিয়ারে সরিয়ে রাখতে বললেন। আমার দিকে চেয়ে স্ত্রী রাগ করেই জিগ্যেস করলেন, এরপর রাতে আর দরকার হবে?

মেয়ে জানান দিল, আমার অন্তত দরকার হবে না।

অবধূত বললেন, রাতের কথা রাতে— তোমার মা এক-এক পিসের বেশি কিছুই খাননি, তোপসে মাছ পাতেই নেননি।

মেয়ে ছেলেমানুষের মতো জিগ্যেস করে বসল, আচ্ছা আপনি কি রোজই এ-রকম খান?

জবাব দিল পেটো কার্তিক।—সপ্তাহের মধ্যে অনেক রাত বাবার খাওয়াই হয় না। শনি মঙ্গলবার তো কোনো না কোনো শ্মশানে কাটান, অন্যবারেও এক-একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকেন, তখন মা-ও ডেকে বিরক্ত করেন না—তাছাড়া ঘরে বাবা শাক-ভাত ডাল-ভাত সমান আনন্দ করে খান—তখন আমার আবার বেজায় কষ্ট।

মুখের সিগারেট নামিয়ে অবধূত বললেন, এই, তোকে কি আমার পাব্লিসিটি অফিসার রেখেছি?

...এরপর ভক্ত আর ভক্তি দেখলাম লক্ষ্ণৌ স্টেশনে, আর দেখলাম পরদিন সকালে হরিদ্বারে পৌঁছেও। হরিদ্বারের ভক্তদের মধ্যে যে প্রৌঢ়টি বিশিষ্ট, তাঁর নাম পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী। ইউ. পি-রই মানুষ। অনেক ফলমূল আর মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। আর এসে পর্যন্ত দু'হাত জোড় করেই ছিলেন। অবধূত তাঁকে ডেকে বন্ধু বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন। তাঁকে জিগ্যেস করলেন, তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে তো?

—জি মহারাজ।

—স্ত্রী আর মেয়ে নিয়ে ইনি দিন পনেরো হরিদ্বারে থাকবেন। কংখলে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ওঠার কথা, তুমি এদের সঙ্গে করে কংখলে যাও—সেখানে ঘর না পেলে তোমার বাড়িতে নিয়ে তুলবে—আমার ঘর দুটো ছেড়ে দেবে—পারি তো আমিও একবার দেরাদুন থেকে নেমে এসে দেখে যাব'খন।

তাঁর ঘর ছেড়ে দেওয়া আর নিজে এসে দেখে যাওয়ার কথা শুনেই হয়তো আমাকে মস্ত কেউ ধরে নিলেন। হাত জোড় করে মিনতির সুরে বললেন, উনি কংখল যাবেন কেন— আমার গরীবখানায় নিয়ে তোলার অনুমতি দিন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আগে কংখলেই যাই, ঘর না পেলে কোনো ধরমশালা বা হোটেলে উঠব।

অবধূত বললেন, এঁরই দু'দুটো হোটেল আছে এখানে—কিন্তু মা ডায়বেটিক রোগী, হোটেলে অসুবিধে হবে—আপনার অসুবিধে বুঝতে পারছি, আপনি না-হয় খাওয়া দাওয়ার বাবদ কিছু মূল্য ধরে দেবেন—

কাতর মুখে পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী বললেন, মহারাজ, কৃপা করে এ-রকম বলবেন না, আপনার দৌলতে আমার ভাগ্য—এই মহান মেহ্মানকে একটু সেবা করার আদেশ করুন।

মুচকি হেসে অবধূত জবাব দিলেন, তোমার এই ভাগ্যটা আমার হাতে নেই— দেখো কি হয়। আর দেরি কোবো না, এঁরা খুব ক্লান্ত।

ঝকঝকে অ্যামবাসাডারেব দরজা খুলে হাত জোড় করে পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী জিগ্যেস করলেন, কংখলেই যেতে হবে?

আমিও হাত জোড় করে জবাব দিলাম, আপনার এত ব্যস্ত হবার মতো আমি কেউ নই... এখানে এলে বরাবর কংখলেই উঠি...জায়গা পেলে সেখানেই থাকব।

—জায়গা পেলে কেন, ঘর বুক করা নেই?

—তা নেই, হঠাৎ চলে এসেছি।

শুনেই দুহাত কপালে ঠেকালো।—জয় মহারাজ! চলুন তাহলে—

মহারাজেরই জয় বটে। কংখলের আশ্রমে অতিথি উপচে পড়ছে। সব ঘর ভরতি। তিন চারটে ফ্যামিলি ওয়েটিং লিস্ট-এ থেকে একদিন দু'দিনের জন্যে হোটেলে আছে। আগে জানিয়ে আসিনি বলে এখানকার বড় মহারাজ দুঃখ করলেন। আর কোথায় উঠব তা-ও তাঁকে জানাতে বললেন।

আবার পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর গাড়িতে। ভদ্রলোক বেজায় উৎফুল্ল। তিনি সামনে, ড্রাইভারের পাশে। পিছনে আমরা। ঘুরে আমাদের দিক চেয়ে বললেন, আমি একটু নির্বোধ আছি।

—কেন?

মহারাজ যখন বললেন, কংখলে জায়গা না পেলে আমার বাড়িতে তাঁর ঘর দুটো ছেড়ে

দিতে তখনই বোঝা উচিত ছিল, কংখলে আপনি জায়গা পাবেন না।

আড়চোখে মেয়ে আর স্ত্রীর দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বিশ্বাসের রূপ দেখছে তারাও...। এমন বিশ্বাস মানুষের কি করে হয়? কি পেলে হয়? এই ভারতের তো আমি অনেকটাই দেখেছি। মানুষ দেখেছি। হিংসা-বিদ্বেষ-আক্রোশ দেখেছি। ত্যাগ-উদারতা-উদাসীনতাও কম দেখিনি। এর মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, এক-একজনের এমন কিছু সম্পদ আছে যা আমার নেই। সেটা অর্থ বা প্রতিপত্তি নয়। যা নেই তা এই আপোস-শূন্য বিশ্বাস। যে বিশ্বাসকে অনেক সময় আমার অন্ধ আর অহেতুক মনে হয়। কিন্তু সার ফলটুকু কি? ওরা ঠকছে না আমি ঠকছি?

হঠাৎ একটু যাচাই করার লোভ মাথায় চাপল। বললাম, আমার স্ত্রী ডায়বেটিক পেশেন্ট, তাঁর খাওয়া দাওয়ার একটু আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে—আপনি হোটেলে যেমন চার্জ করেন তেমনি চার্জ করতে হবে... নইলে আপনার ওখানে থাকা আমার পক্ষে সুবিধে হবে না—অবধূতজীও আপনাকে মূল্য নিতে বলেছেন।

অম্লান বদনে জবাব দিলেন, নেব, মহারাজের আদেশ অমান্য করব না—কিন্তু কত মূল্য তিনি বলেননি, আপনি এক টাকা দেবেন।

একে আর কিভাবে যাচাই করব আমি? তবু বললাম, আপনি একটা বড় ভুল করছেন, অবধূতজীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার পরে—তার আগে কেউ কাউকে চোখেও দেখিনি।

সাদা-সাপটা জবাব, আপনাকে দেখার জন্য মহারাজ দেরাদুন থেকে নেমে আসতে পারেন বলেছেন...আপনাকে নিজের ঘর ছেড়ে দিতে বলেছেন—আপনি কি লোক বা কতদিনের আলাপ আমার আর জানার দরকার নেই—আপনার সঙ্গে তাঁর কত জন্ম-জন্মান্তরের আলাপ আপনি জানছেন কি করে?

...ঈশ্বর, তুমি কি কোথাও আছ? যদি থাকো তো বলব, তুমি আমার অনেক নিয়েছ, কিন্তু দিয়েছও অনেক। শুধু এই বিশ্বাসটুকু দিলে না কেন? বিশ্বাসের এমন সহজ জোর থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে কেন?

হর্-কি-পিয়ারীর কাছাকাছি সুন্দর বাড়ি পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর। ঝকঝকে তকতকে বাড়ি। শ্বেতপাথরের মেঝে। অবধূত বছরে দু'বছরে একবার হরিদ্বারে আসেন। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এই দুটো বিশাল ঘর শুধু তখনই ব্যবহার করা হয়। এই প্রথম ব্যতিক্রম। ঘর দুটো আমি দখল করেছি। অ্যাটাচড্ বাথ। আরামের সমস্ত উপকরণ মজুত।

চারদিক দেখে নিয়ে স্ত্রী একটা খাটে বসলেন। বললেন, আমার বড় অদ্ভুত লাগছে।

জিগ্যেস করলাম, কেন?

জবাব দিলেন, কি জানি।... কেবল মনে হচ্ছে, দুদিন যাঁকে ট্রেনে দেখলাম, তাঁর কিছুই জানা হল না।

মেয়ে সায় দিল।—সত্যি মা, কত তো দেখলাম, কিন্তু এ-রকম মানুষ তো কোথাও দেখিনি।...বাবা, তুমি এঁকে নিয়ে কিছু লিখবে?

হেসে বললাম, কি জানি যে লিখব? কেবল তাঁর কল্যাণে তোফা খেলাম-দেলাম আরামে এলাম—আর এখনও তাঁর জন্যেই রাজসিক অভ্যর্থনা।

কিন্তু জানি, এ-টুকুই আমার মনের কথা নয়।

পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর আদরে যত্নে আমরা ব্যতিব্যস্ত। দশ পা রাস্তায় হাঁটার উপায় নেই। তাঁর গাড়ি সর্বদাই আমাদের জন্য মজুত। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি শুধু বুঝে নিয়েছেন, রান্নায় আলু আর মিষ্টি চলবে না। হরিদ্বারে কোথাও আমিষ চলে না। নিরামিষ আহারের এত আয়োজন যে, খেয়ে উঠতে পারি না, ফেলতেও পারি না।

পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী নিজেই নিজের গল্প করেছেন। নিজের গল্পের মধ্যে অবধূতজীর মাহাত্ম্যের কথাই সব। তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন হর-কি-পিয়ারীর ঘাটে, ব্রহ্মকুণ্ডুর পাশে। ত্রিপাঠীর তখন ভিকিরি দশা। বছর একুশ-বাইশ বয়েস। ধরমশালায় কোনোদিন খাওয়া জোটে কোনোদিন জোটে না। নিজের বাপ-মা নেই। দিল্লীতে কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, হাইস্কুল পাশ করার পরে কাজ জোটাতে পারেননি বলে আর আশ্রয়ও মেলেনি। ঘুরতে ঘুরতে ভবঘুরের মতো চলে এসেছিলেন হরিদ্বারে। হরির দরজায় এসে যদি কিছু হয়।

...হবার মতো আশার ছিটে-ফোঁটাও দেখেন না। ভিক্ষে করতে পারেন না। আত্মহত্যা করে যন্ত্রণা শেষ করার মতো মনের জোরও পান না। এই সংকল্প নিয়ে মনসা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন একদিন। মনে হল কে যেন তাঁকে ঠেলে নামিয়ে দিল।

...নেমে আসতে হর-কি-পিয়ারীর ঘাটে মহারাজের সঙ্গে দেখা। তিনি নয়, মহারাজই তাঁকে কখন দেখেছেন কতক্ষণ দেখেছেন জানেন না। কাছে ডাকলেন। তারপর এমন চেয়ে রইলেন মনে হল ভিতরসুদ্ধু ফালা-ফালা করে দেখছেন। চাপা ধমকের সুরে বলেছেন, হরির দরজায় এসে মাথায় বদ মতলব নিয়ে ঘুরছ কেন— পবিত্র স্থানকে কলংকিত করার জন্য এখানে এসেছ?

...মহারাজের সঙ্গে তখন দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি একা। পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী তিনি দিন তাঁর সঙ্গে তাঁর কাছেই কাটালেন। তারপর মহারাজ যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁকে বললেন, তুমি এখানে ছোট করে একটা হোটেল খোলো, লোক ঠকিও না।

ত্রিপাঠী বিমূঢ়। এক পয়সার সম্বল নেই, তিনি হোটেল খুলবেন কি!

মহারাজ নগদ পাঁচশ টাকা তাঁর হাতে দিলেন। বললেন, এই দিয়ে শুরু করো, আমি আবার এসে দেখব তুমি কতটা কি করলে।

...পঁয়ত্রিশ বছর আগে হরিদ্বারের এই চেহারা ছিল না। ছোট বড় ধরমশালা ছিল বটে, কিন্তু হোটেল নামমাত্র। যাত্রীর মৌসুমে লোকের থাকার জায়গা খাওয়ার জায়গা মেলে না। একটি মাত্র রান্নার লোক আর একটা চাকর রেখে ছাপরা ঘরে হোটেল শুরু করেছিলেন। শুধু খাওয়ার ব্যবস্থা। নিজেই হাট-বাজার করতেন। লোকের খাওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করতেন। মহারাজের কৃপায় সেই থেকে আজ এই অবস্থা—দুটো বড় হোটেলের মালিক তিনি, এই বাড়ি, গাড়ি।

এ যাত্রায় কালীকিংকর অবধূতের সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবিনি। ত্রিপাঠীর কাছ থেকে

আমি তাঁর ঠিকানা চেয়েছিলাম। শুনলাম তিনি কলকাতায় থাকেন না। কোন্নগরে থাকেন। স্টেশন থেকে এক মাইলের কিছু বেশি হবে পথ। শ্মশানের কাছাকাছি। স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশঅলাকে অবধূতজীর বাড়ি বললেই সে নিয়ে যাবে।

...কিন্তু শুরু থেকে আমাদের এবারের সম্পূর্ণ যাত্রাটাই যেন আর কারো নিয়ন্ত্রণের ছকে বাঁধা ছিল। তেরো দিনের মাথায় অবধূত সত্যিই পেটো কার্তিককে নিয়ে হরিদ্বারে হাজির। আসছেন সে খবর অবশ্য আগের দিনই পেয়ে গেছলাম। সকলে মিলে তাঁকে স্টেশনে আনতেও গেছলাম। ত্রিপাঠীর মুখ দেখে মনে হয়েছিল এমন আনন্দের দিন তাঁর জীবনে বেশি আসেনি। আমার প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞ। কারণ কোন্নগর থেকে তিনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, এ যাত্রায় তাঁর হরিদ্বারে থাকা হবে না। ত্রিপাঠীর বদ্ধ ধারণা, আমার জন্যই তাঁর এমন সৌভাগ্য।

অবধূতকে বলেছিলাম, আপনি সত্যি আসবেন ভাবিনি।

তিনি হেসে জবাব দিয়েছেন, স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা নড়ে! দেরাদুনে তিনটি বাঙালী পরিবার আমার ভক্ত। সেখানকার গিন্নিরা আর ছেলে-মেয়েরাও দেখলাম আপনার লেখার ভক্ত—তা আমি ভাবলাম আপনাদের মতো গুণীজনদের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে দেখলে আমার প্রেস্টিজ বাড়বে, খাতির-কদরও বাড়বে—সেই লোভেই চলে এলাম।

হেসে বলেছি, সাহিত্যিক না হলেও আপনি বাক্-পটু আমার থেকে ঢের বেশি।

...এই মানুষের প্রতি আমি ট্রেনেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেই আকর্ষণ হরিদ্বারের দু'দিন আর ফিরতি ট্রেনে একসঙ্গে আসার দু'দিনে কত যে বেড়েছে আমিই জানি। ত্রিপাঠীর এখানে যা প্রভাব, অবধূত মুখের কথা আসাতে তিনি একই কুপেতে ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের টিকিট করাই ছিল, কেবল অবধূতের বার্থ অদল-বদল করে নেওয়া।

হরিদ্বারে বা ট্রেনে আমাদের কোনোরকম আধ্যাত্মিক বা তন্ত্রমন্ত্রের আলোচনা হয়নি। তারথেকে রসের কথা ঢের বেশি হয়েছে। রাতের নিরিবিলিতে দু'জনে ত্রিপাঠীর ওখানে বোতল নিয়েও বসেছিলাম। আমারও একটু আধটু চলে দেখে উনি মহা খুশি। তখনই কথায় কথায় বলেছিলেন, এর মতো জিনিস আছে মশাই! বছর চারেক আগে বিহারের কাকুরঘাটি মহাশ্মশানে আমি টানা প্রায় তিন বছর কাটিয়েছি—সেখানে বেশিরভাগ দিন আমার রাতের খাওয়া ছিল মুড়ি তেলেভাজা আর ওখানকার শস্তা দিশী মদ—আহা কি দিনই গেছে।

আমি থমকেছি।—শ্মশানে টানা তিন বছর কাটিয়েছেন...তা-ও বিহারের শ্মশানে—কেন, কোনো তন্ত্র-সাধনার ব্যাপারে?

হাসতে লাগলেন।—স্রেফ পালিয়েছিলাম মশাই, বন্ধন কাটানোর ঝোঁকে—এ আবার আমার অনেক কালের ঝোঁক, কেউ বেঁধে ফেলছে মনে হলেই পালানোর তাগিদ, কিন্তু হেরে গেছি।

—কিসের বন্ধন? কোথা থেকে কোথায় পালানোর তাগিদ?

হাসছিলেন আর গ্লাসে চুমুক দেবার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে দেখছিলেন। ধীরে সুস্থে জবাব দিলেন, রমণীর বাহুবন্ধন থেকে। আমার অদৃষ্টে এই শেকল যে কি শেকল তা যদি জানতেন। সেটা ছেঁড়ার তাগিদে মাঝে মাঝে আমার মাথায় ভূত চাপত—পালাতাম। সেই প্রথম আমার

ভিতরের লেখক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কৌতূহল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অ-প্রসঙ্গ আর বিস্তারের দিকে গড়ায়নি। প্রস্তুতি হিসেবে বলেছিলাম, ফিরে গিয়ে ফাঁক পেলে আমি কিন্তু আপনার কোন্নগরের ডেরায় গিয়ে হাজির হব।

—নিশ্চয়ই আসবেন। আমিও যাব। আমরা মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন সোসাইটি গড়ে তুলব, আপনার কি হবে জানি না, আমার পশার বাড়বে। পরের কথায় গলায় একটু রহস্যের ছোঁয়া পেলাম। বললেন, আসবেন...আপনার ভালোই লাগবে হয়তো...অনেকের লাগে।

হরিদ্বারে আর ফেরার সময় ট্রেনেও অবধূতের কিছু কথা আমার মনে দাগ কেটেছে।—আমার চোখে এই জগতের সব-কিছুই বড় আশ্চর্য লাগে। জন্ম-মৃত্যু-সৃষ্টি-ধ্বংস সবই যেন কেউ সাজিয়ে সাজিয়ে যাচ্ছে। মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীর এমন বায়োলজিকাল পারফেকশন কি করে হয়— কে করে? একটা ফুলের বাইরে এক-রকম রঙ, ভিতরে এক রকম, পাপড়ির গোড়ায় এক রঙ, মাথার দিকে অন্য রকম—এমন নিখুঁত বর্ণ বিন্যাস কি করে হয়—কে করে? আপনারা লেখেন, ঘটনা কতটা দেখেন আপনারাই জানেন। আমি শুধু ঘটনা দেখে বেড়াই, যা দেখি তা কোনো বইয়ে পাই না, কোনো চিন্তায় আসে না। যেখানে যাই, দেখি কিছু না কিছু ঘটনার আসর সাজানো— পরে মনে হয়েছে আমি নিজের ইচ্ছেয় আসিনি, কিছু ঘটবে বলেই আমার টান পড়েছে—আমার কিছু ভূমিকা আছে বলেই আমাকে সেখানে গিয়ে হাজির হতে হয়েছে—এমন কেন হয়, কি করে হয় বলতে পারেন? এই দেখুন না, ক'দিন আগেও আপনি আমাকে চিনতেন না, আমিও আপনার অস্তিত্ব জানতাম না, আমার এই বেশভূষা আর হাওড়া স্টেশনে ভক্তদের সঙ্গে আমাকে দেখে আপনারা বিরূপই হয়েছিলেন, পরেও আপনার আলাপের কোনো আগ্রহ ছিল না. উল্টে বিরক্ত হচ্ছিলেন—অথচ এই ক'টা দিনের মধ্যে দেখুন পরস্পরকে আমরা আত্মীয় ভাবছি—এ-ই বা কি করে হয়, কেন হয়?

আমি জবাব দিয়েছি, এর সবটই আপনার গুণে হয়েছে।

—তা নয়, আপনাকে দেখেই যদি আমার ভালো না লাগত এমন হত না, আপনার স্ত্রীর দিকে চেয়ে যদি শোকের ছায়া চোখে না পড়ত, তাহলেও এমন হত না— সব-কিছুর পিছনে অবধারিত কিছু কার্য-কারণ-সম্পর্ক থাকে—মানুষ দেখে দেখে আমার এটুকুই অভিজ্ঞতা।

২

কলকাতায় এসে আমাদের তিন জনেরই মন অনেকটা সুস্থ। বিদায় নেবার আগে অবধূত আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, মা, আপনার প্রাণের জিনিসই তো জমা দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন—এবার দুঃখটুকুও জমা দিতে চেষ্টা করুন, তাতে আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তিনি বন্ধন-মুক্ত হবেন। দিন পনেরো বাদে স্ত্রীকে বললাম, একবার কোন্নগর থেকে ঘুরে আসি, মনটা বড় টানছে।

স্ত্রী তক্ষুণি সায় দিলেন।

দিনটা রবিবার। ড্রাইভারের ছুটি। নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ছুটির দিনে রাস্তা

অনেকটাই ফাঁকা থাকবে আশা করা যায়। স্নান সেরে সকাল ন'টায় বেরিয়েছি। অবধূত বলে দিয়েছিলেন, যে-দিন আসবেন সকালেই চলে আসবেন— খেয়ে আসার অজুহাত শুনব না। না খেয়েই বেরিয়েছি। তাঁর কাছে অন্তত এ ব্যাপারে আর কোনো সংকোচ নেই। কোন্নগর স্টেশনের পথ থেকে তাঁর ডিরেকশন ধরে মিনিট পাঁচ-ছয় ড্রাইভ করতে একজন বাড়ি দেখিয়ে দিল।

বেশ পুরনো ছাতলা-পড়া একতলা বাড়ি। এক-নজর তাকালেই বোঝা যায় অনেক দিন সংস্কার হয়নি। ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় যাঁর সঙ্গে পরিচয়, যাঁর অমন পয়সাঅলা সব শিষ্য— এক দেড় দিনে দু'আড়াই হাজার টাকা প্রণামী পড়তে দেখেছি— শিষ্যের ডাকে যিনি দেরাদুন-মুসৌরি যাতায়াত করেন— হরিদ্বারে ত্রিপাঠীর বিলাসবহুল ঘরে যাঁর সঙ্গে থেকে এসেছি— তাঁর নিজের এমন বাড়ি ভাবতে পারিনি।

ছোট্ট আঙিনার মধ্যে বাড়িটা। সামনে কোমর-উঁচু বাঁশের গেট তারের খাঁজে আটকানো। গেটের দু'পাশে দুটো শ্বেত করবী আর লাল করবীর গাছ। এক দিকে ফুলবাগান, তাতে কিছু বুনো ফুল ফুটে আছে। অন্য দিকে দুটো জবা গাছ, ছোট বড় কয়েকটা কলা গাছ, মাঝারি সাইজের দুটো নারকেল গাছ আর একটা আম গাছ।

গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে হর্ন দিলাম। দরজা খুলে যিনি সোজা গাড়ির দিকে তাকালেন, এমন এক সুদর্শনার অবস্থান এখানে আশা করিনি। কেউ আমাকে ভুল বাড়ি দেখিয়ে দিল কিনা এমন সন্দেহও হল। আমাকে দ্বিধান্বিত দেখে মহিলা দরজা ছেড়ে সামনের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন।

অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে বাঁশের গেট সরিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। চোখে ধাঁধাই লাগছে।

—এটা কালীকিংকর অবধূতের বাড়ি?

—হ্যাঁ আসুন...তিনি একটু বেরিয়েছেন, আপনি আজ আসতে পারেন বলে গেছেন— এখুনি ফিরবেন মনে হয়।

আবার একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমি আজ আসতে পারি অবধূত সেটা অনুমান করতেও পারেন...কিন্তু আমিই যে সেই লোক তা এই মহিলার আঁচ করা সম্ভব কি করে! তাছাড়া আমার আসা একেবারে হঠাৎ। সকালে চা খেতে খেতে ঠিক করেছি।

দাওয়ায় দরজার দু'দিকে দু'জোড়া বেতের চেয়ার পাতা। একদিকের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন। একটু ব্যস্ত পায়েই ভিতরে চলে গেলেন।

আমি বিমূঢ়ের মতো বসে। খুব সাদাসিধে বেশবাসে এ আমি কোন্ দিব্যাঙ্গনাকে দেখলাম! মহিলা বলছি, মুখের অচপল গম্ভীর অভিব্যক্তি দেখে, নইলে বয়েস বড় জোর বছর ত্রিশেক হতে পারে, পরনে চওড়া লালপেড়ে চকচকে কোরা শাড়ি— মুখের রঙ গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। গায়ে শেমিজ, টিকালো নাক, আয়ত-গভীর কালো চোখ, কপালে সিকি সাইজের টকটকে লাল সিঁদুর টিপ, সিঁথিতে মোটা করে টানা সিঁদুর, হাতে গলায় বা কানে গহনা নেই, বাঁ হাতে লোহা-বাঁধানো গোছের কিছু। দীর্ঘাঙ্গী, নিটোল স্বাস্থ্য, সুডোল বাহু— সব থেকে

বাহারের বোধহয় চুল, পিঠে ছড়ানো চুল কোমর ছাড়িয়ে হাঁটুর কাছাকাছি। চলে যাবার সময় পায়ের দিকে চোখ গেছে, আলতা-পরা এমন দু'খানি পা-ও যে রমণীর এক বিশেষ রূপ— কলকাতায় থেকে তা ভুলেই গেছি।

...অবধূতের ঘরে এমন দিব্যাঙ্গনাটি কে? দিব্যাঙ্গনা ছাড়া অন্য শব্দ আমার মনে আসছে না। অবধূতের বয়েস যদি ষাট হয়, তাঁর মেয়ে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অবধূতের গায়ের রং বড় জোর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যেতে পারে। এ যদি মেয়ে হয় তো মা-টি অত রূপসীই হবেন সন্দেহ নেই। আবার সচকিত আমি। মেয়েটির হাতে (মেয়েটিই বলি) পাথরেব ডিসের ওপর বসানো বড় একটা পাথরের গেলাস। সামনে ধরতে মনে হল, গেলাসে গুড়ের সরবত। ব্যস্ত হয়ে বললাম, এক্ষুণি এর কি দরকার ছিল...অবধূতজী আসুন—

— রোদের মধ্যে ড্রাইভ করে এসেছেন, ভালো লাগবে।

গেলাসটা তুলে নিলাম। আঁখি গুড়ের সরবতই বটে, কিন্তু তাতে সুগন্ধ লেবু আর কিছু মশলার গুঁড়ো মেশানো। ভারী সুস্বাদু লাগল।

—-যাঃ। গলা দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এলো।

ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস।

বললাম, অবধূতমশাই হয়তো আমি আসব ভাবেন নি... আর কারো কথা বলে গিয়ে থাকবেন— চাউনিটা স্পষ্ট, সোজা।— আপনার কথাই বলেছেন...কলকাতা থেকে আসছেন তো?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

— দেরাদুন যাবার সময় আপনার সঙ্গেই তো ট্রেনে পরিচয়?

আর কোনো সন্দেহ থাকল না যে অবধূত আমিই আসতে পারি আশা করেছেন। জিগ্যেস কবতে ইচ্ছে করল, উনি আশা করলেও তুমি জানলে কি করে যে আমিই সেই লোক। কিন্তু জিগ্যেস করা গেল না, বয়েস যা-ই হোক, রূপেব সঙ্গে এমন এক শান্ত ব্যক্তিত্ব মিশে আছে যে চট করে তুমি বলতেও বাধে। দু'চুমুকে সরবত খেয়ে জিগ্যেস করলাম, উনি কে হন?

ঠোঁটের হাসি আবার একটু স্পষ্ট।— আপনাদের অবধূত?

পাল্টা প্রশ্নটা কি-রকম যেন লাগল। মাথা নাড়লাম।

— হন্ কেউ একজন...

বলতে বলতে বাঁশের গেটের দিকে চোখ। আমিও দেখলাম। পেটো কার্তিক। হাতে বাজারের থলে। আমাকে দেখে ছোটখাটো একটু হাঁ করে ফেলল। তারপরেই উল্লাসে ছুটে এলো।— আপনি এসে গেছেন সার।

দাওয়ায় উঠেই ডান হাতের ব্যাগ বাঁ-হাতে নিয়ে ঝুঁকে একটা প্রণাম ঠুকে ফেলল।— বাবা তো ঠিকই বলেছেন মাতাজী উনি আজ আসতে পারেন, আমিই বরং ভাবছিলাম মাংস আনব কি আনব না— ভাগ্যিস এনেছি।

পেটো কার্তিকের মুখে মাতাজী শুনে আমি বিমূঢ় হঠাৎ। স্থান-কাল ভুলে রমণীর দিকে তাকালাম। থলেটা কার্তিকের হাত থেকে নিয়ে উনি বলছেন (মাতাজী শোনার পর উনি ছাড়া

আর কি বলব!), যা তো বাবা, বোসেদের ছেলের অসুখ, ওঁকে সেখানে ডেকে নিয়ে গেছে—কোথাও গিয়ে বসলে তো আর ওঠার নাম নেই—একটা খবর দে।

পেটো কার্তিক তক্ষুণি ছুট লাগালো।

পাথরের গেলাস মাটিতে নামিয়ে রাখতে যেতে মহিলা নিঃসংকোচে হাত বাড়ালেন। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে গেলাস এগিয়ে দিলাম।

—এবারে একটু চা করে আনি?

ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলাম, উনি আসুন—

চলে গেলেন। আমার মনে হল চোখের গভীরে একটু কৌতুকের আভাস দেখলাম।... আমার মুখের অবস্থা দেখেই কি?

...হরিদ্বারে রাতে ত্রিপাঠীর বাড়িতে বোতল-গেলাস নিয়ে বসে উনি যে কথাগুলো বলেছিলেন মনে পড়ল।...বলেছিলেন, কেউ বেঁধে ফেলছে মনে হলেই তাঁর পালানোর ঝোঁক—বন্ধন কাটানোর তাগিদ। আমি জিগ্যেস করেছিলাম, কিসের বন্ধন থেকে?... গেলাসে চুমুক দিয়ে মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, রমণীর বাহুবন্ধন থেকে।...আর বলেছিলেন, তাঁর অদৃষ্টে এই শেকল যে কি শেকল তা যদি জানতেন— সেটা ছেঁড়ার তাগিদে মাঝে মাঝে আমার মাথায় ভূত চাপত— পালাতাম।

...এখন বুঝতে পারছি কি অমোঘ শেকলের কথা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু আমার ভেতরটা একটু বিরূপ হয়ে উঠল। হতে পারে অবধূতের প্রতি এই মহিলার আকৃষ্ট হবার মতো মতিভ্রমই হয়েছিল, এ-লাইনের লোকদের বশ করার ক্ষমতা তো কিছু আছেই— তাই মহিলার চোখে বয়েসের তফাৎটা বড় বাধা না-ও হতে পারে। কিন্তু মেয়ের বয়সী একজনের বাহুবন্ধনে শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়ে অবধূত পাষণ্ডের মতোই কাজ করেছেন।

পেটো কার্তিকের সঙ্গে অবধূত মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরলেন। একমুখ হাসি।—একলা যে, মা এলেন না?

হেসে জবাব দিলাম, সবে তো শুরু।

—ড্রাইভার দেখছি না, নিজে ড্রাইভ করে নাকি?

—ড্রাইভারের রোববারে ছুটি থাকে।

হাসছেন।—সকাল থেকেই কি-রকম মনে হচ্ছিল আপনি আসতে পারেন। হাঁক দিলেন, কই গো!

—বসুন, ব্যস্ত হবেন না, ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আসার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার সরবত খাইয়েছেন।

পেটো কার্তিক ভিতরে চলে গেছে। বেতের চেয়ারটা মুখোমুখি টেনে নিয়ে বসলেন। এক চোখ টিপে জিগ্যেস করলেন, সরবত বেশি মিষ্টি লাগল না ওঁকে?

হাঁকের জবাবে মহিলা এসে উপস্থিত। অবধূতের রসালো প্রশ্ন কানে গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু লাজ-লজ্জার অভিব্যক্তি চোখে পড়ল না। অবধূতই আরো সরস হয়ে উঠলেন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, এসো, লেখককে জিগ্যেস করছিলাম, সরবত বেশি মিষ্টি লাগল, না সরবতদাত্রীকে?

-বুড়ীকে নিয়ে এই এক ঢঙের কথা আর কতবার কত জনকে বলবে? আমার দিকে ফিরলেন, এবারে চা দিই?

—তা তো দেবেই। অবধূতের কড়া মেজাজের গলা।—আমার চির-যৌবনা স্ত্রীকে তুমি বুড়ী বলো কোন্ সাহসে? উনি আমারও পঞ্চাশের নিচে বয়েস ভেবেছিলেন সে ভিন্ন কথা— তা বলে তোমার বেলায়ও ভুল হবে নাকি? আচ্ছা আপনি তো মশাই একজন নামী লেখক... বেশ করে ওঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে বলুন তো, খুব বেশি হলে ওঁর বয়েস কত হতে পারে—আমি যে লোকের কাছে পঞ্চম পক্ষের স্ত্রী বলে পরিচয় দিই—সেটা খুব বেশি বলি কিনা দেখুন না, লজ্জা কি, পাসপোর্ট তো পেয়ে গেছেন।

প্রথম দর্শনে কোনো রূপসী মহিলাকে সোজাসুজি দেখতে যাওয়ার নানা বিড়ম্বনা। অনুমতি পেয়ে হাসি মুখে একটু ভালো করেই দেখলাম। ফলে মনে হল তিরিশের কিছু বেশিই হবে। অবধূতের কথায় আরো একটু গার্ড নিয়ে বললাম, মহিলারা এই প্রসঙ্গ সব থেকে অপছন্দ করেন শুনেছি—

তবু ধরুন ওকে নিয়ে যদি আপনার লিখতে হয়, কত লিখবেন?

—বছর পঁয়ত্রিশ।

অবধূত হা-হা করে হেসে উঠলেন, আমার কথা শুনেই বাড়িয়ে বললেন তো? তেত্রিশ...

ছদ্ম কোপে মহিলা বললেন, এরপর তোমার কাছে কেউ এলে আমি আর বাইরে আসব না। আমার দিকে ফিরলেন, শুনুন, আরো একত্রিশ বছর আগে আমার কুড়ি আর ওঁর উনত্রিশ বছর বয়সে আমাদের বিয়ে হয়েছে—তাহলে বুঝুন আমার বয়স কত—সকলের কাছে আমাকে ডেকে এনে এই ব্যাপার করা চাই!

অবধূত বলে উঠলেন, বুঝুন ঠেলা, বিশ্বাস করবেন কিনা আপনিই বলুন।

আমি বিমূঢ় একেবারে। একত্রিশ বছর আগে কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে মানে এঁর বয়েস এখন একান্ন। বয়েস বেঁধে রাখারও কোনো জাদু আছে নাকি! হতভম্বের মতো খানিক চেয়ে থেকে মহিলাকে বললাম, আপনার কথা সত্যি হলে অবধূত মশাইয়ের কোনো দোষ নেই—এই দেশের সব মেয়েদেব ডেকে ডেকে এনে আপনাকে দেখানো উচিত।

অবধূত গম্ভীর মন্তব্য করলেন, ডাকতে হয় না, আপনিই আসে—তবে মেয়েরা নয়, বেশিরভাগই ছেলে। হরিদ্বারে আপনি আমার বাড়ি আসবেন বলতে আপনাকে এই জন্যেই বলেছিলাম, এলে ভালো লাগবে—অনেকের লাগে।

হালছাড়া রাগে মহিলা বলে উঠলেন, আচ্ছা, যারা এখানে আসে সকলে আমাকে মাতাজী বলে ডাকে—এ-ভাবে বলতে তোমার মুখে আটকায় না?

—মাতাজী বলে তাতে কি হলো, মাতাজীকে ভালো লাগতে পারে না? আচ্ছা মশাই আপনিই বলুন, একে দেখে আপনারও যে ভালো লেগেছে এ-তো চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারছি—ভালো লাগাটা কি দোষের—এরপর আমার এখানে আসতে আপনার কি আরো ভালো লাগবে না?

আমার হাঁসফাঁস মুখ দেখে ভদ্রমহিলা দ্রুত চলে গেলেন। অবধূত হাসছেন।

আমি বললাম, কংগ্র্যাচুলেশনস—থাউজেণ্ড কংগ্র্যাচুলেশনস।... আপনি এই শিকল ছিঁড়ে পালাতে চেষ্টা করেছেন?

—অনেকবার। শেষের বারে বিহারে টানা তিন বছর।

—উনি জানতেনও না আপনি কোথায় আছেন?

—নাঃ।

—আপনি যত বড় অবধূতই হোন, আপনাকে নরাধম বলতে ইচ্ছে করছে। তিন বছর ধরে আপনি ওঁকে যন্ত্রণার মধ্যে রেখেছেন!

নিঃশব্দ হাসিতে মুখখানা ভরাট শুধু নয়, সুন্দরও হয়ে উঠল। বললেন, আপনি তাহলে ওকে খুব বুঝেছেন।...আরে মশাই, যন্ত্রণার মধ্যে আছে জানলে তো আমার পালানো সার্থক ভাবতাম। যন্ত্রণা দূরে থাক, একটু তাপ-উত্তাপও যদি দেখতাম! যেখানে যত দূরেই যাই, শেকলটা যে আমার গলায় পরানোই আছে সেটা উনি খুব ভালো করেই জানতেন।

সেবারে ছাড়া পেয়েছি বিকেল চারটের পরে। সঙ্গে ড্রাইভার থাকলে রাতের আগে ছাড়া পেতাম না।

সেই থেকে আমার কোন্নগরে যাতায়াত শুরু। পনেরো দিন বা তিন সপ্তাহে একবার করে যাই-ই। অবধূত নিজেই বলেছিলেন উনি ঘটনা দেখেন। আমি চরিত্র দেখে বেড়াই। সদ্য বর্তমানে এই একটি চরিত্র নিয়ে আমার আগ্রহের সীমা-পরিসীমা নেই। একটি নয়, আগ্রহ তাঁর স্ত্রীকে নিয়েও। দু'জনেরই বিশেষ একটা অতীত আছে যার আভাস এখনো আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। হবে, আশা রাখি।... কোন্নগরের এই বাড়িতে লোকের আনাগোনা লেগেই আছে। যে রবিবারে আমি প্রথম গেছলাম, বিকেল চারটের মধ্যে কম করে পনেরো-ষোলজন লোককে অবধূত ফিরিয়ে দিয়ে হতাশ করেছিলেন। সেটা আমার খাতিরে। পেটো কার্তিক আমাকে টিপ দিয়ে রেখেছিল। এর পরে এলে বুধবারে আসবেন, ওই একদিন বাবা অনেকটা ফাঁকা থাকেন, লোকের চিঠিপত্রের জবাব দেন, বা ওষুধ-টষুধ তৈরি করেন।

লক্ষ্য করেছি অবধূতের কাছে বেশির ভাগ লোক কিছু না কিছু সংকট ত্রাণের আশা নিয়ে আসে। অবশ্য সংকটের রকম-ফের আছে। এদের ভিতর দিয়ে অবধূতকে বোঝার জন্য বুধবার ছেড়ে এক-একদিন অন্য বারেও এসে হাজির হয়েছি। সত্যিকারের সংকটে পড়েই অনেকে আসে বটে। কিন্তু ব্যতিক্রমের মধ্যেও অন্য যে আসে তার সংকট তার কাছে অন্তত বিষম। একবার এক মহিলাকে দেখলাম, অবধূতের সামনে বসে খুব কান্নাকাটি করছেন। ব্যাপার সাংঘাতিক বইকি। তাঁর বড় আদরের বেড়ালটি হারিয়ে গেছে। তাকে ফিরে না পেলে তিনি প্রাণে বাঁচবেন না।

অবধূত গম্ভীর। চেষ্টা করে বিষণ্ণও। —আপনার ছেলেপুলে নেই তো?

—না বাবা, ওই পুষিই আমার সব।

—খুব দুঃখের কথা।... কিন্তু আপনাকে তাহলে কিছু ক্রিয়া করতে হবে।

মহিলা আশায় উন্মুখ।—আমি সব করব, কি করতে হবে বলুন বাবা?

—খুব গরিব দুঃখী একটা বা দুটো বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আপনার চেনাজানার মধ্যে আছে?

ভাবলেন একটু।—আছে বাবা, আমাদের যে ঘর ঝাড়-মোছ্ করে ঠিকে ঝি-টা, তার বাচ্চা দু'টো ছেলে মেয়ে আছে—স্বামীটা অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বউটা কাজে বেরিয়েছে—দু'বেলা খাওয়া জোটে না।

—তাহলে ওই দুটো বাচ্চাকে আপনাকে পুষির মতো—না, পুষির থেকেও বেশি ভালোবাসতে হবে—আপনার ভালবাসা যত খাঁটি হবে—পুষির ফিরে আসার চান্স ততো বেশি।

—কিন্তু বাবা পুষি গেল কোথায়? সে বেঁচে আছে তো, না কেউ মেরে-টেরে ফেলল?

—বেঁচে না থাকলে আপনার কাছে আর ফিরছে কি করে? যান, যা বললাম, মনে-প্রাণে তাই করুন। পুষি ফিরে এলে আমাকে একটা খবর দেবেন।

পায়ের কাছে দশটা টাকা রেখে প্রণাম করে চোখ মুছতে মুছতে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

আমি হেসে বলেছি, বেশ, পুষি যদি আজ-কালের মধ্যেই ফিরে আসে?

অম্লানবদনে জবাব দিলেন, ওই জন্যেই ফিরে এলে খবর দিতে বললাম। ফিরে এলে উনি জানবেন, আমার অব্যর্থ ক্রিয়ার ফল, তখন ওই মানুষের বাচ্চা দুটোকে আরো বেশি ভালবাসতে বলতে হবে—নইলে পুষি আবার একদিন বরাবরকার মতো হারিয়ে যাবে।

কথা শেষ হতে না হতে একটি বছর তেইশ-চব্বিশের ছেলে আর বছর উনিশের মেয়ে এসে উপস্থিত। দেখে আমার মনে হলো এই প্রথম আসছে। লাল চেলি দেখে চিনল, ভক্তিভরে প্রণাম করল।

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখে অবধূত জিগ্যেস করলেন, দু'জনেরই গার্জেনের আপত্তি?

ওরা হকচকিয়ে গেল একটু। ছেলেটি বলল, আজ্ঞে...?

—বলছি, তোমাদের বিয়ের ইচ্ছেয় দু'জনেরই গার্জেনের আপত্তি হয়েছে বা হবে?

দু'জনেই বিস্মিত এবং মুগ্ধ। ইতস্তত করে ছেলেটি একবার আমার দিকে তাকালো। অবধূত বললেন, উনিও একজন যোগীপুরুষ, ওইভাবে থাকেন—বেশি সময় দিতে পারব না, চটপট বলো—

ছেলেটি বলল, আজ্ঞে আপনি ঠিকই বলেছেন—দু'জনেরই বাবা-মায়ের আপত্তি। বিশেষ করে আমার বাবার..

—আপত্তি কেন? জাতে-বর্ণে তো মিল আছে দেখছি?

তারা আরো মুগ্ধ।

—তোমার বাবা কি করেন?

—উকিল।

—তুমি এক ছেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনটি বোন আছে। আমার ছোট।

—তুমি চাকরি-বাকরি করো?

—বাবার সঙ্গে প্র্যাকটিস শুরু করেছি।

—তোমার বাবার কি ইচ্ছে, তোমার বিয়েতে অনেক টাকা পেয়ে তোমার পরের বোনের

বিয়ের টাকা কিছুটা যোগাড় করে রাখবেন?

মেয়ে উন্মুখ। ছেলেটি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ছে।—আপনি ঠিকই বলেছেন...এখন একটা উপায় করে দিন।

—উপায় তোমাদের হাতে। তোমাদের মতি স্থির থাকলে তবেই তোমাদের বাবা-মায়েদের মতি ফেরা সম্ভব। দু'তিনটে বছর এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কাটাতে হবে তোমাদের। ...তোমরা এখানে এসেছ কাউকে না জানিয়ে, কোনো আত্মীয় বা তোমার বাবার কোনো বন্ধুর মারফৎ তোমার বাবাকে একবার আমার কাছে পাঠাতে চেষ্টা করো— তোমরা আমার খবর পেলে কি করে?

ছেলেটি জানালো, এক মামা আমাকে খুব ভালবাসেন— তিনি বলেছেন আপনি কিছু করে বাবার মত ফেরাতে পারেন।

— তোমরা আমার কাছে এসেছ মামা জানেন?

—না...তিনি কারোর কাছে আপনার ক্ষমতার কথা শুনে আমাকে বলেছিলেন।

— তোমরা এখানে এসেছ তাঁকেও বলবেনা। গিয়ে তাঁকেই একবার আমার কাছে আসার জন্য ধরে পড়ো— সেটা পারলে তোমার বাবাকে এখানে আনাবার ব্যবস্থা আমি করতে পারব। ইতস্তুতঃ করে ছেলেটি বলল, আপনি যদি কিছু ক্রিয়া করেন...

— সেটি করতে হলে তোমার বাবাকে দরকার— ক্রিয়াটা তাঁর ওপর দিয়ে হবে। আর আবারও বলছি, সব নির্ভর করছে তোমাদের মতির ওপর— আপনি কি বলেন?

আচমকা শেষের প্রশ্ন আমাকে। কোনোরকমে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।—এ ছাড়া আর কি করার আছে...।

ওরাও একটা দশ টাকার নোট রেখে প্রণাম করে চলে গেল। ছেলেটি তার নাম ঠিকানা আর মামার নাম রেখে গেছে। তার আশা, মামাকে পাঠাতে পারবে।

অবধূত হেসে বললেন, কত রকমের কেস আমার জোটে দেখছেন?...তবে এই ছেলের বাবাকে একবার নাগালের মধ্যে পেলে এ কেস জলভাত— এই বিয়ে দিয়ে সে তার নিজের ফাঁড়া কাটিয়ে বাঁচবে। ছেলের মতি ফেরানোর নাম করে মামাকে দিয়ে ওই বাপটিকে একবার এখানে আনাতে হবে। আমার মন বলছে এই বিয়ে হবে, ছেলে-মেয়ে দু'জনেরই কপালের লক্ষণ ভালো।

মাতাজীর নাম কল্যাণী। তাঁর কাছে যারা আসে তাদের মধ্যে নানা বয়সের পুরুষের সংখ্যাই বেশি। মেয়ে ভক্তও অবশ্য কম নয় একেবারে। সকলেরই তিনি মাতাজী। তাদের শ্রদ্ধাভক্তিতে ভেজাল আছে মনে হয় না। কারো ওষুধ-বিষুধের দরকার হলে মাতাজী তাকে অবধূতের কাছে পাঠান। আর কেউ দীক্ষা নিতে চাইলে অবধূত তাকে মাতাজীর কাছে পাঠান। অবধূত নিজে কাউকে দীক্ষা দেন না। কল্যাণী দেবী আমাকে বলেছেন, এই জন্যেই আমার কাছে পুরুষের ভিড় বেশি, কারো মনে ডাক দিলেই সে দীক্ষা নেবার জন্য ব্যস্ত হয়, আর আপনাদের অবধূত তখন তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে খালাস। দায় উদ্ধারের আশায় প্রথমে সকলেই আসে ওঁর কাছে, শেষে বিপাকে পড়ি আমি।

অবধূত হেসে বলেন, বিশ্বাস করবেন না মশাই, আমার আসল শক্তি যে উনি এটা সকলেই টের পেয়ে যায়।

অবধূতও আমার কলকাতার বাড়িতে বার কয়েক এসেছেন। আমি স্ত্রীকে আর মেয়েকে নিয়েও গেছি। অবধূতকে তাদের জানতে বুঝতে বাকি নেই। কল্যাণী দেবীকে দেখে দুজনেই মুগ্ধ। মেয়ে তাঁকে দেখে বলে উঠেছিল, আপনাকে তো আমি অনায়াসে আমার বড় বোন বলে চালিয়ে দিতে পারি।

তাঁর সম্পর্কে আমার মুখে আগেই শুনেছিল। কল্যাণী হেসে বলেছেন, তুমিও আর ওই এক রা তুলো না—আমার ছেলেপুলে থাকলে তোমার থেকে বড় বই ছোট হত না।

—কিন্তু এ বয়সেও আপনি এরকম স্বাস্থ্য আর শ্রী রাখলেন কি করে—আমাকে এটুকুই শিখিয়ে দিন।

তিনি হেসে জিগ্যেস করেছেন, তুমি স্বাস্থ্য চর্চা মনের চর্চা করো?

—না তো।

—তাহলে কি করে হবে?

—আপনি এক্সারসাইজ করেন নাকি?

—করি বইকি...তবে আমার এক্সারসাইজ একটু অন্য রকমের। আচ্ছা এসো মাঝে মাঝে, যতটা পারি শিখিয়ে দেব।

খুশি হবার মতো কথা আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন নাকি। বলেছেন, মুখুজ্জে মশাই এলে (অর্থাৎ আমি এলে) উনি সব থেকে বেশি খুশি হন! কেন জানেন? এখানে স্বার্থ ছাড়া, বিপদ বা দায় উদ্ধারের আশা নিয়ে ছাড়া একজনও আসে না। কোনো স্বার্থ নেই এমন কেবল উনিই আসেন। কত লোকের কাছে ওঁর কথা বলেন উনি।

শুনে মনে মনে হেসেছি। স্বার্থশূন্য আমিও নই। আর আমার স্বার্থটা কি অবধূত তা একটুও আঁচ করতেপারেন না এমন মনে হয় না। তবু তাঁর অন্তরঙ্গতাটুকু অকৃত্রিম।

অন্তরঙ্গতার ফাঁক দিয়েই এই দম্পতীর অতীতের আভাস আমি মোটামুটি পেয়েছি।

৩

কালীকিংকর অবধূতের পৈতৃক নাম প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাকনাম চাঁদু। বাবা কোনো বে-সরকারি কলেজের অধ্যাপক। পাঁচ বছর বয়সে মা মারা যান। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। যিনি এসেছেন তিনি একজন স্কুলের শিক্ষিকা। বিমাতা বলে তিনি নিষ্ঠুর বা নির্দয় ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বাড়ির আচরণ-শাসন-অনুশাসন সব স্কুল মাস্টারের মতো ছিল। সব-কিছু নিক্তির ওজনে বিচার বিবেচনা করতেন। চাঁদুর ভালো লাগত না। মা না থাকার দরুন হোক বা যে কারণে হোক ছেলেবেলা থেকে সে জেদী আর একগুঁয়ে। পড়তে ইচ্ছে না করলে পড়বে না, খেতে ইচ্ছে

না করলে খাবে না। সব থেকে গোল পাকাতো স্কুলে যাওয়া নিয়ে। রোজই বায়না ধরত স্কুল যাবে না।

স্কুল মাস্টার নতুন মা এসব বরদাস্ত করার মানুষ নয়। নিজে চেষ্টা করে না পারলে গায়ে হাত তুলতেন না, খোদ জায়গায় অর্থাৎ বাবার কাছে ধরে নিয়ে যেতেন। বাবার ধৈর্য খুব বেশি নয়। কলেজের চাকরি ছাড়া দু'দুটো টিউশনি করতে হয়, নিজের হাট-বাজার করতে হয়। তখনকার বে-সরকারি কলেজের মাস্টারদের কিই বা মাইনে। বাবা প্রথমে ভালো কথা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেলের মতি ফেরাতে চেষ্টা করতেন। তাতে কাজ হতো না। ফলে অবধারিত মার-ধোর। তাতেও কাজ না হলে আরো মার বা অন্য শাস্তি। নতুন মায়েরও রাগ হতো। বলতেন, এইটুকু ছেলের এমন ঠ্যাটামো আর দেখিনি।

কিন্তু চাঁদু কি করবে, যা ভালো লাগে না তা কিছুতেই ভালো লাগে না। কত বই ইচ্ছে করে ছিঁড়ে ফেলে বাবার কাছে মার খেয়েছে ঠিক নেই। স্কুলের ক'ট ঘণ্টা বন্দী থেকে তার হাঁপ ধরে যায়, মনে হয় এমন দম-বন্ধ করা শিকল আর দুটি নেই। কিছু ওপরের ক্লাসে ওঠার পর স্কুল পালানোর বিদ্যে রপ্ত হলো। কিন্তু সে সময়ে স্কুল পালানো অত সহজ ছিল না। ধরা পড়তে হতো। তাই খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে স্কুলে আসতই না। সমস্ত দিন টো-টো করে বেড়াতে মন্দ লাগত না। মানুষ আর মানুষের মিছিল দেখত। কিন্তু স্কুলে না গেলে কামাইয়ের চিঠি আনতে হয়। এই নিয়েই ধরা পড়ত। বাবার হাতে তখন বেদম মার।

সংসারে আরো তিনটে ভাই বোন এসেছে। তারা কিন্তু অন্যরকম। বাবার থেকে মা'কে বেশি ভয় করে। তারা কথা শোনে, কেউ অবাধ্য নয়। তাদের খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া, স্কুলের সময় স্কুল। তাদের নিয়ে মায়ের খুব গর্ব। তেমনি চিন্তা চাঁদুকে নিয়ে। ওটা অমানুষ হলে সকলে তো তাকেই দুষবে। বলবে, সৎমা নিজের ছেলেকে তো দেখবেই, পরের ছেলে বয়ে গেলে তার কি। তার এই ন্যায্য দুশ্চিন্তার ফলে বাবার ক্রোধ এবং প্রহার। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ার সময়ও চাঁদু বাবার হাতে কম মার খায়নি।

সকলকে অবাক করে সে ম্যাট্রিক আর আই. এ. ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। বাবার খুব আপত্তি সত্ত্বেও সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। কেবল বাবা আর মায়ের কাছে ছাড়া এখন আর সে কারো কাছে চাঁদু নয়। প্রবোধচন্দ্র। মা'টি এখনো তার মতি-গতি ফিরেছে বলে একটুও ভাবেন না। ভাববেন কি করে, যখন যা খুশি তাই তো করে বেড়াচ্ছে। বাপের শাসনের আওতা ডিঙোবার পর কাউকে আর পরোয়াই করে না। যে-দিন ইচ্ছে কলেজে গেল, যে-দিন ইচ্ছে গেল না। রাতে খাবার সময় বাড়ি থাকে না, ভাত ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়। বাপ তিনবার জিগ্যেস করলে একবার জবাব দেয়, দক্ষিণেশ্বরে গেছল, বা ময়দানে বসেছিল। এই কৈফিয়ত কারো কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

...কিশোর বয়স থেকেই তার নিজস্ব জগতের খবর কেউ রাখত না। ওই বয়সের সেই জগৎ অনেকটাই শূন্য। নিজেকে বড় অসহায় মনে হতো। এই পৃথিবীতে নিজেকে বড় একলা মনে হতো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম কল্পনা দিয়ে শূন্য জগৎ কিছুটা ভরে তুলতে চেষ্টা

করত। নানা-রকম উদ্ভট কল্পনাও তার মাথায় আসত। স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই রাতে প্রায়ই ভালো ঘুম হতো না। রাত তার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। এরপর একটা উপায় বার করল। আলো নিভিয়ে চোখ বুজে আর ঘুমোতে চেষ্টা করত না। বিছানায় গা-হাত-পা ছেড়ে চোখ বুজে মনে মনে শিবঠাকুরের কৈলাসে চলে যেত। নন্দী-ভৃঙ্গী দোর আগলে বসে আছে। কল্পনার পাখায় ভর করে তাদের এড়িয়ে কোনো-না-কোনো ভাবে ভিতরে ঢুকতই। ঢুকে কি শিবঠাকুরের খোঁজ করত? মোটেই না। মা গৌরীর খোঁজে এ-দিক সে-দিক ঘুরত। বেশির ভাগ রাতেই হ্রদের ধারেপেত তাকে। চারদিকের ফুলের গন্ধে প্রবোধচন্দ্রের ফুসফুস ভরে উঠত। হ্রদের বুকে পূর্ণিমার চাঁদ খলখল করে হাসছে। দু'জোড়া রাজহাঁস মনের আনন্দে ভেসে চলেছে। হ্রদের কোনো এক ধারে বসে আছে মা গৌরী। প্রবোধচন্দ্রকে দেখে তার হাসি-হাসি মুখ, সদয় চোখ। প্রবোধচন্দ্র সটান গিয়ে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। মা হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ব্যস, চোখ খুলেই দেখে সকাল। ঘুমের এমন মোক্ষম দাওয়াই আর বুঝি হয় না। পাছে নিত্য ব্যবহারে দাওয়াইর ফল কমে যায়, তাই তিন-চারদিন ঘুম না হলে এক রাতে চোখ বুজে সে কৈলাস রওনা হয়। বি. এ. পড়ার সময়ও কৈলাস পাড়ি দিয়েছে।

...বাবা অনেক সময় মন্তব্য করেন, এ-ছেলের কিছু হবে না। বলেন, ওর দুর্ভোগ আছে। আর মুখে না বললেও মা-তো জেনেই বসে আছেন, কিছু হবে না তো বটেই, উল্টে এ-ছেলে নিয়ে তাঁদের দুর্ভোগ আছে।...দুর্ভোগ বলতে টাকা-পয়সার অভাব ছাড়া আর কি। তা এমন তন্ত্র-মন্ত্র বা দ্রব্যগুণ কি নেই নাকি যার জোরে ইচ্ছে করা মাত্র হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা এসে যাবে? কল্পনার জো'র থাকলেই আছে। সেই কল্পনার পাখায় ভর করে কতবার প্রবোধচন্দ্র লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছে। তারপর কি-কি ভাবে অত টাকা খরচ করবে সেই হিসেব মেলাতে গিয়ে হিমসিম।

...বি. এ. পরীক্ষার ফল তেমন ভালো হলো না। মোটামুটি অনার্স পেয়ে পাশ করল। এম. এ-তে ভর্তি হলো। পড়ার খরচ অবশ্য বাবাই চালিয়ে আসছে। কিন্তু আই. এ. পাশ করার পর থেকেই প্রবোধচন্দ্র টিউশনি করা শুরু করেছিল। কেউ জানত না। পরে ভাইয়েরা জেনে বাবা-মাকে বলে দিয়েছে। বাবা খুব কিছু বলেননি। মা রাগ করেছেন।— আমাদের কাছে গোপন কেন, আমরা তোর টিউশনির টাকা কেড়ে নেব?

টিউশনি করে টাকা উপার্জন করার ব্যাপারে খুব যে ঝোঁক ছিল তা নয়। নিজের হাত-খরচের জন্য বাবার কাছে হাত পাততে পারে না। তার থেকেও বড় কারণ, হঠাৎ-হঠাৎ মনে হতো, কিছু টাকা এক সময় তার দরকার হবে। কোন্ সময় দরকার হবে জানে না। কেবল মনে হতো দরকার হবে— কিন্তু হলে তাকে টাকা দেবার মতো মানুষ কে আছে? এই কারণেই টিউশনি। রোজগারের টাকা খরচ প্রায় হতই না। জমত। অথচ জমানোর প্রতিও তার খুব একটা আগ্রহ ছিল না।

জীবনের ধারা বাঁক নিল এই এম. এ. পড়ার সময়। কিছুই ভালো লাগে না। ভিতরটা যেন কোথাও উধাও হবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু কোথায়, তার কোনো হদিস নেই।

বয়েস তখন একুশ। পর পর তিনদিন বাড়ি থেকে নিখোঁজ সে। চতুর্থ দিন বাড়ি ফিরতেই বাবার অগ্নিমূর্তি। চীৎকার করে উঠলেন, ফিরে আসার দরকার কি ছিল? কোথায় ছিলি তিন দিন?

প্রবোধচন্দ্রের জবাব, তারাপীঠে।

বাবা বিমূঢ় প্রথম।— তারাপীঠে। সেখানে তোর কি?

নিরুত্তর।

—বলে যাসনি কেন?

মা ইন্ধন যোগালেন, আমি বিশ্বাস করি না ও তারাপীঠ গেছল— তুমি খোঁজ নাও।

বাবা আমার ক্ষিপ্ত।— এইরকম স্বাধীন ভাবিস তুই নিজেকে, কেমন? তোকে দেখে তোর ছোট ভাই দুটো কি শিখছে? নিজের সর্বনাশ করছিস, সেই সঙ্গে ওদেরও সর্বনাশ করছিস? আমি এই লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম, এমন স্বাধীনতার পাখা আমি বাড়তে দেব না— দেব না!

পরদিন আবার ঘর ছেড়েছে। সকলের অগোচরে। সঙ্গে ছোট্ট সুটকেস। দু'চারটে জামা-কাপড়। নিজের আড়াই বছরের টিউশনির রোজগার শ'পাচেক টাকা। পৈতেয় পাওয়া সোনার বোতাম আর দুটো সোনার আঙটি। হাতের ঘড়ি। এই সম্বল।

প্রথমে পুরী গেছে। জনা দুই সাধকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তাঁরা ত্রাণ আর পরমার্থ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পাঁচ মাস না যেতে প্রবোধচন্দ্র দু'জনার কাছ থেকেই পালিয়েছে। তার কেবল মনে হয়েছে আলোর হদিস নেই, সে কেবল অন্ধকারের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ঘরের বদলে ভবঘুরের নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে। কাশী-হরিদ্বার-ঋষিকেশ-লছমনঝোলা-উত্তরকাশী-কেদারবদ্রী এসব কিছুই বাকি থাকেনি। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছে। হিমালয়ের গুহা-কন্দরে বিচরণ করেছে। হ্যাঁ, কোনো না কোনো যোগীপুরুষের সন্ধান পেয়েছে। কিছুকাল লেগে থাকার পর আবার একই দশা। তখন যেন প্রাণ নিয়ে পালানোর তাড়া।

...কামাক্ষ্যায় এক তান্ত্রিকের আশ্রয়ে এক বছর ছিল। ভেবেছিল আশ্রয় মিলল। কিন্তু শেষে দেখল ভৈরব-গুরুর যোগসাধনা ব্যভিচার-মুক্ত নয়। আবার পথ সম্বল। বিহার আর মধ্য-প্রদেশেরও অনেক জায়গায় ঘুরেছে। ফল শূন্য।

লাভের মধ্যে এই চার বছরে সে রিক্ত, কপর্দকশূন্য। কারো অনুগ্রহ হলে আহার জোটে, না হলে জোটে না। ঘুরে ফিরে আবার সে এই বাংলায় ফিরে এলো। কলকাতায় নয়, এলো রামপুরহাটে। বয়স তখন পঁচিশ। কিন্তু মনের বয়েস যেন একশ পঁচিশ। ইচ্ছে, সেই তারাপীঠেই বামাক্ষেপার পঞ্চমুণ্ডির আসনে মৃত্যু পণ করে বসবে। জীবিত কাউকে পেল না। অমর লোকের ওই সাধক যদি পথের হদিস দেয়। বাড়ি ছেড়ে তিন দিনের জন্য এই তারাপীঠে এসেছিল বলেই বাবা বরাবরকার জন্য তাকে বাইরের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে সেই তারাপীঠই আবার তাকে টানছে। গত চার বছরে কম করে এক কুড়ি যোগীর সংস্রবে এসেছে।

এদের কেউ তান্ত্রিক, কেউ বা ভিন্ন পথের। তন্ত্রের ওপরেই প্রবোধচন্দ্রের বেশি টান কেন নিজেও জানে না। এ সম্পর্কে যেটুকু ধারণা তার সবটাই ভাসা-ভাসা। এই সাধনার লক্ষ্য মোটামুটি জানা আছে। বৈদিক সাধনার তুলনায় তন্ত্রসাধনা অনেক বেশি রহস্যময় বলে মনে হয়। তাছাড়া বৈদিক সাধনার মধ্যে অপ্রকাশ কিছু নেই, গোপন কিছু নেই। তন্ত্রসাধনার সবটুকুই গোপন, গুহ্য। রহস্যময় মনে হওয়ার এও হয়তো একটা কারণ। কিন্তু এই মার্গের খাঁটি সাধক বা সিদ্ধপুরুষ কি নেই কোথাও? যারা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরতে চাইলো, তাদের কাছে ধরা দিতে পারা গেল না কেন? কামাচার-ব্যভিচার কোনো সাধনার অঙ্গ হতে পারে এই চিন্তা কিছুতেই মনে ঠাঁই পায় না। আশার থেকে অনেক বেশি হতাশা নিয়েই তারাপীঠ লক্ষ্য করে রামপুরহাটে এসেছে।

কিন্তু আসলে তার জন্য অন্য কিছু নির্দিষ্ট বলেই রামপুরহাট আসা।

এখানে খবর পেল বছর তিন চার হলো বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানের গায়ে একজন বিরাট তন্ত্রসাধক ডেরা করে আছেন। এর বহু আগে থেকেই বক্রেশ্বরের ওই মহাশ্মশান তাঁর সাধন ক্ষেত্র ছিল নাকি। কিন্তু তখন এক নাগাড়ে তিনি চার ছ'মাসের বেশি থাকতেন না। কোথায় চলে যেতেন কেউ জানে না। অনেকের ধারণা তিনি এখানেই থাকতেন কিন্তু অদৃশ্যভাবে থাকতেন। মোট কথা বছরে চার ছ'মাস করে প্রতি বছরই তাঁকে বক্রেশ্বরে দেখা যেত। কারো সঙ্গেই তিনি বড় একটা বাক্যালাপ করতেন না, কারো দিকে চোখ মেলে তাকাতেনও না বড়। কিন্তু যাকে ডাকতেন বা যার দিকে তাকাতেন, সকলেই বুঝতো সে বাবার কৃপা পেল। এ-রকম কৃপা এই রামপুরহাটেও কেউ কেউ পেয়েছে। যেমন এখানকার এক পুলিশ অফিসারের নাম সকলেই জানে। মোহিনী ভট্চায্। খুব জাঁদরেল লোক ছিলেন এক সময়। কিন্তু তাঁকে কেউ ভালো মানুষ বলে ভাবত না। মদ্যপ অত্যাচারী বলেই জানত। শুধু তিনি কেন, তাঁর ভাই ভাইপোও পুলিশে চাকরি করে। কেউ কম যায় না। এই মোহিনী ভট্চায্কে যম-রোগে ধরেছিল। লিভার ক্যানসার। শিবের অসাধ্য রোগ। শুনে অনেকে খুশি হয়েছিল। হবে না কেন, মিত্রর থেকে তাঁর শত্রুই তো বেশি।

...মোহিনী ভট্চায্ পাগলের মতো হয়ে গেছলেন। সবই কৃতকর্মের অপরাধের ফল ভেবেছেন তিনিও। তারাপীঠ তো রামপুরহাটের গায়েই। স্টেশন থেকে আড়াই তিন মাইল পথ। মোহিনী ভট্চায্ তারা মায়ের সামনের চাতালে এসে হত্যা দিলেন। মায়ের সামনেই এই পাপ-দেহ যাক। তিন দিন বাদে ভোরের দিকে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। কোনো মেয়েছেলের গলা যেন ধমকাচ্ছে তাকে।— এখানে পড়ে থাকলে তো মরবি, বাঁচতে চাস তো বক্কোমুনির থানে কংকালমালীর কাছে যা না। তার ঝাঁটা না খেলে এই রোগ পালায়?

...ঘুম ভাঙার পরেও সেই রমণী-কণ্ঠ যেন কানে লেগে আছে। বক্কোমুনির থান মানে বক্রেশ্বরের মহাশ্মশান। আর সেখানকার ওই ভৈরবের নাম কংকালমালী। কংকাল যার গলার মালা সে কংকালমালী। এককথায় রুদ্র, শিব। কিন্তু সেই ভৈরবের কংকালমালী নাম বটে, তার অঙ্গে কংকালের কোনো চিহ্নও নেই নাকি।

কংকালমালী ভৈরবের নাম মোহিনী ভট্চাযের শোনা ছিল অবশ্য। কৃপা হলে অনেকের

আধি-ব্যাধি সারিয়েছেন এমন খবরও কানে এসেছে। কিন্তু কণামাত্র বিশ্বাস নেই বলেই তাঁর কথা মনে হয়নি। না, ভোর-রাতের এই আদেশ তিনি নিজের অবচেতন মনের ক্রিয়ার ফল ভাবতে পারলেন না। গাড়িতে কত আর পথ বক্রেশ্বর। পুলিশের চাকরি, গাড়ি পেতেও অসুবিধে নেই। ডেরায় ভৈরব কংকালমালী নেই। কেউ বলতে পারল না তিনি কোথায়। অথচ এক ঘণ্টা আগেও অনেকে দেখেছে নাকি। মোহিনী ভট্চায্ তাঁকে মন্দিরে আর উষ্ণ প্রস্রবণগুলির দিকে খোঁজাখুঁজি করলেন। কোথাও তাঁর হদিস পেলেন না।

শ্রান্ত ক্লান্ত মোহিনী ভট্চায্ সন্ধ্যার দিকে একলা পাপহরার প্রবাহ ধরে এগিয়ে চললেন। এই পাপহরার ধারেই শ্মশান। অনেক দূরে একটা নিভু-নিভু চুল্লি লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন তিনি। নিজের ইচ্ছেয় নয়, পা দুটো আপনা থেকে সেই দিকে চলল। জায়গায় জায়গায় শেয়ালের শব নিয়ে কাড়াকাড়ি চোখে পড়ছে। কিন্তু মোহিনী ভট্চাযের তখন আর ভয়-ডর বলে কিছু নেই। চুল্লির অদূরে কে একজন বসে। মাঝে মাঝে জোরে বাতাস দিচ্ছে, বাতাসে চুল্লির আগুন এক-একবার বাড়ছে। সেই আগুনে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। কাছে এগোলেন। আরো ভালো করে তাঁকে দেখলেন। সম্পূর্ণ নগ্ন। মাথার জটাজুট চুল-দাড়ি বুক-পিঠের নিচে নেমে এসেছে। গায়ের রং কালোর দিক ঘেঁষা লালচে মনে হলো।

কেউ বলে না দিলেও ভট্চায্ যেন জানেন ইনিই কংকালমালী ভৈরব। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ বাদে ভৈরব ভাঁটার মতো চোখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একটা আধপোড়া চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করলেন তাঁকে। মোহিনী ভট্চাযের প্রথম অনুভূতি পালানোর। তারপর মনে হলো মৃত্যুর খাঁড়া তো এমনিতেই মাথার ওপর ঝুলছে—পালাতে যাবেন কেন! হাত জোড় করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

ভৈরব হুংকার দিয়ে উঠলেন, শালা, মরনেকা লিয়ে আয়া— নিকালো হিঁয়াসে।

ভট্চায্ হাত জোড় করে দাঁড়িয়েই রইলেন। ক্রুদ্ধ ভৈরব হাতের জ্বলন্ত চেলা কাঠ নিয়েই হন-হন করে একদিকে চললেন।

মোহিনী ভট্চায্ কলের মতোই তাঁকে অনুসরণ করলেন।

অনেকটা পথ পেরিয়ে ভৈরব একটা ভাঙাচোরা চালাঘরের সামনে মাটির দাওয়ায় বসলেন। জোরে হাওয়া দিলে ভেঙে পড়বে এমনি ঘরের দশা। অন্ধকার। চেলা-কাঠের আগুনে যেটুকু দেখা যায়।

চোখের ইশারায় ভট্চায্কে সামনে বসতে বললেন।

ভট্চায্ বসলেন।

ভৈরবের সঙ্গে তিন দিন সেই চালাঘরে কাটিয়েছেন তিনি। না, চালাঘরেও নয়, ওই দাওয়ায়। ভৈরব ঘরের মধ্যে রাত কাটিয়েছেন নয়তো শ্মশানে। গাঁয়ের লোক ভৈরবকে ফলমূল দিয়ে যায়। তিনি পা দিয়ে সেগুলো ওঁর দিকে ঠেলে দেন। এ-ছাড়া এই তিন দিনে আর কোনো আহার ছিল না। তিন দিনের মধ্যে ভৈরবকে তিনি কিছুই মুখে তুলতে দেখেন নি।

...তৃতীয় রাতে ঝোলা থেকে কিছু শেকড়-বাকড় বার করে তাঁর হাতে দিয়েছেন। রোজ

একটু একটু করে জল দিয়ে ছেঁচে তারপর বেটে খেতে বলেছেন। তখনই স্পষ্ট বাংলা কথা শুনেছেন তাঁর মুখে। বলেছেন, শালা তুই অনেক পাপ করেছিস, তারই দুর্ভোগে পড়েছিস— এমনিতে তোর বিশেষ কিছুই হয়নি, এরপর সমঝে না চললে হাড়ে-মাংসে পচন ধরে মরবি। যা ভাগ—

...দিন সাতেকের মধ্যেই সুস্থ সবল মানুষ মোহিনী ভট্চায্! দেহে কোনো ব্যাধির চিহ্নমাত্র নেই। সেই থেকে ভদ্রলোক একেবারে বদলে গেছেন। এখনো কাজে বহাল আছেন এই পর্যন্ত। জপ-তপ সম্বল করে ভারী আনন্দে আছেন। আরো আশ্চর্য, শুধু তিনিই নন, পুলিশের চাকুরে তাঁর ভাই-ভাইপোরা পর্যন্ত একেবারে বদলে গেছে। কংকালমালী ভৈরব তাঁদের কাছে জাগ্রত শিব।

কিন্তু এই শিবের নাগাল পাওয়া ভার। মোহিনী ভট্চাযের সুস্থ হবার খবর শুধু রামপুরহাটে কেন— অনেক জায়গার লোকই জেনেছে। ব্যাধি নিরাময়ের আশায় আগেও লোক যেত তাঁর কাছে। এরপর ছোটাছুটির ধুম পড়ে গেল। কিন্তু কোথায় কংকালমালী ভৈরববাবা? তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। পরের বছরখানের তাঁর আর কোনো পাত্তাই নেই।

তারপর শ্মশানের সেই ডেরায় হঠাৎই আবার তাঁর দেখা মিলল। তখন আবার কাতারে কাতারে মানুষের ভিড়। ব্যাধিগ্রস্তদের আবেদন নিবেদন। মেজাজ হলে ভৈরব ওষুধ দেন। না হলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু তাড়ালেই কি লোক সরে যায়! ফলে ভৈরবই আবার অদৃশ্য হন। এই করেই কয়েকটা বছর চলেছিল। বছরের মধ্যে মাস কয়েক ভৈরব-বাবা বক্কোমুনির এই শ্মশানের ডেরায় থাকেন। বাকি সময় তিনি কোথায় থাকেন কেউ জানে না। এখানে থাকেন যখন, একটি লোক সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই ভৈরবের ওখানেই পড়ে থাকেন। তিনি রামপুরহাটের মোহিনী ভট্চায্।

বছর চারেক হলো বাবার চালচলনের ব্যতিক্রম দেখছে সকলে। কংকালমালী ভৈরব এখানেই আছেন। আর যান না কোথাও। তাঁর শ্মশানের সেই ডেরা একবার তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভেঙে আরো অনেক বড় আর মজবুত করে ঘর তুলে দিয়েছেন মোহিনী ভট্চায্। দরকারও হয়ে পড়েছিল। কারণ. তারও তিন বছর আগে অর্থাৎ সাত বছর আগে ভৈরববাবার ডেরায় একজন বাসিন্দার আবির্ভাব দেখেছে সকলে। তিনি এক ভৈরবী। বয়েস বেশি নয়, অপূর্ব রূপসী। সেবারে বাবা এক বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। ফিরলেন যখন, সঙ্গে এই ভৈরবী। ভৈরববাবা কোথা থেকে এই ভৈরবী সংগ্রহ করেছেন, সঠিক কেউ জানে না। কিন্তু ভৈরবীকে নিয়ে কিছু কানাঘুষা শোনা যায়। তিনি নাকি বীরভূমেরই বড় কোনো ঘরের ঘরণী। অত্যাচারী লম্পট স্বামীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না বলে কলকাতায় বাস করতেন। তবে সবই শোনা কথা। এই ভৈরবীকে আগে চাক্ষুষ কেউ কখনো দেখেনি। আর এই কানাঘুষাও একটুও সরব হয়ে ওঠেনি ভয়ে। কারণ, যে ভৈরবীকে নিয়ে কথা, তাঁর ভৈরব স্বয়ং কংকালমালী— যিনি জাগ্রত শিব। কানাঘুষোয় বেশি কান দিয়ে কে তার রোষের মুখোমুখি হতে চায়?

ভৈরবীর আবির্ভাবের পরে ও গোড়ার বছর তিনেক কংকালমালী ভৈরব নিয়মিত সাত আট মাস করে অদৃশ্যই থাকতেন। ভৈরবী মায়ের দেখাশুনোর ভার তখন সম্পূর্ণই মোহিনী

ভট্চাযের। তিনি তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করেন।...কিন্তু গত চার বছরে কংকালমালী ভৈরব আর ঠাঁই বদল করেননি। বক্রোমুনির থানে অর্থাৎ শ্মশানেই ভৈরবীকে নিয়ে আছেন।

রামপুরহাটে থাকাকালীন প্রবোধচন্দ্র এ-সব সমাচার শুনেছিল তারাপীঠের এক বৃদ্ধ ভক্তর মুখে। তখন রামপুরহাট থেকে রোজই তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে একবার করে তারাপীঠে আসত। তখনই এই বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ। পরের জীবনের কালীকিংকর অবধূতের বিশ্বাস এ-ও এক সাজানো ঘটনা। নইলে ওই বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর এমন অন্তরঙ্গ যোগাযোগের আর কোনো তাৎপর্য নেই।

বৃদ্ধটিকে প্রবোধচন্দ্রের ভারী ভালো লেগেছিল।...সে বামাক্ষ্যাপার পঞ্চমুণ্ডির আসনে ধ্যানস্থের মতো বসেছিল। ফোঁস ফোঁস দীর্ঘনিশ্বাস কানে আসতে দেখে পাশে ওই বৃদ্ধ বসে। পর পর তিন চারদিন একই ব্যাপার। কথায় কথায় আলাপ। বৃদ্ধের বড় দুঃখ তারা-মা কতজনকে তরিয়ে দিল, কিন্তু তাঁর প্রতি কৃপা আর হলো না। কোন্ কৃপার প্রত্যাশী তিনি?...

কিছু না। কেবল মা আছেন, এই বদ্ধ বিশ্বাসটুকুই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, এটুকুরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দেখতে চান। ভদ্রলোক রেলের ভালো চাকরি করতেন। প্রৌঢ় বয়সে বউ মারা যায়। সংসার বলতে তিন ছেলে। রিটায়ার করার পর কলকাতায় বাড়ি করেছিলেন। ছেলেরা তখন সংসারী। রিটায়ার করার পরে মনে হয়েছিল তাঁদের সংসারে তিনি অবাঞ্ছিত। মনে হওয়া মাত্র সব ছেড়েছুড়ে পনেরো বছর ধরে তারাপীঠে পড়ে আছেন। পেনসনের টাকা ক'টি সম্বল। তা-ও সব নয়, পেনসনের তিন ভাগের একভাগ ছেলেরা মাসে মাসে পাঠায়। সেই রকমই নির্দেশ ছিল তাঁর। দিব্বি চলে যায়।... কিন্তু মা দয়া করছেন না।

ভদ্রলোককে এত ভালো লেগেছিল যে প্রবোধচন্দ্র নিজের হতাশার কথাও তাঁকে বলেছিল। শুনে আন্তরিক পরামর্শই দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বাবা, তুমি একবার বক্রোমুনির থানে গিয়ে কংকালমালী ভৈরবের শরণ নাও না— হয়তো যাঁকে খুঁজছ তাঁর মধ্যেই পেয়ে যাবে।

যতটুকু জানেন, কংকালমালী ভৈরবের সমাচার তিনি বলেছেন। প্রবোধচন্দ্রের খুব আগ্রহ হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও এক ভৈরবীর অবস্থান শুনে হতাশ হয়েছিল। বলেছিল, ভৈরবী-টৈরবী নিয়ে যাঁরা সাধনা করছেন তাঁদের সংস্রবে আর যেতে চাই না।

— কেন গো। তিনি অবাক।— আ-হা, সাক্ষাৎ মা জগদ্ধাত্রী তিনি—আমি নিজে গিয়ে একবার বাবাকে আর ভৈরবীকে দেখে এসেছি। ভৈরবী মা তো কেবলমাত্র লোককে ওষুধ দেওয়া ছাড়া আর কোনো ক্রিয়া-কলাপ করেন না— ভৈরব নিজের সাধন নিয়ে থাকেন, নিজে আর কাউকে ওষুধ দেন না— ওই ভৈরবী মা দেন।

শুনে আবার কৌতূহল হয়েছিল।— তাঁর ওষুধে লোকের অসুখ সারে ?

— নিশ্চয়ই সারে। নইলে মঙ্গলবারে ওষুধের জন্য হাজারের ওপর লোকের লাইন পড়বে কেন?

— ভৈরবী মায়ের বয়েস কত হবে?

— এঁদের বয়েস তো ঠিক ধরা যায় না। মনে হয় তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে।

— আর কংকালমালী ভৈরবের?

— সেটা বলা অসাধ্য। কেউ বলে দেড়শ পৌনে দু'শ বছর, আবার কেউ বলে পঁচাত্তর-আশী। আমি কেবল দেখেছি বেশ শক্ত মজবুত দেহ।

...ভৈরবী মা অপূর্ব রূপসী আর বয়েস মাত্র তেত্রিশ শুনে প্রবোধচন্দ্রের আবার দ্বিধা। ভৈরবীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা কখনো ভালো ছিল না। তার মধ্যে নিজেরও কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।...হ্যাঁ, কামাখ্যা থেকে পালিয়েই আসতে হয়েছিল। সেখানে এক ভৈরবের করুণা পাবে আশা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ শুরু হয়েছিল তাঁর ভৈরবীর কাছে। তার থেকে কম করে বিশ বছরের বড়। আরো বেশি হতে পারে। ভৈরবীদের বয়েস সত্যিই আঁচ করা শক্ত।...সেই ভৈরবী প্রথমেই তাকে কামাচারের পাঠ দিতে এগিয়েছিলেন। তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে আর নিজে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তার কোলে বসে হর-পার্বতীর এই রূপ ধ্যান করতে বলেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেখান থেকে সেই রাতেই পালিয়েছিলেন। বক্রেশ্বর যাবে কি যাবে না স্থির করতে দুই একটা দিন কেটে গেল। একবার ভাবল, রামপুরহাটে মোহিনী ভট্চাযের সঙ্গে আগে গিয়ে দেখা করলে কি হয়? তার থেকে আগে নিজের চোখে গিয়ে একবার দেখে আসাই ভালো মনে হলো। এই ভৈরবী মাতাজী এত লোককে ওষুধ দেন, সে-ও কেন যেন এক বাড়তি আকর্ষণের মতো মনে হলো তার।

এক মঙ্গলবার ভোরেই বক্রেশ্বরে এলো।...তারাপীঠের বৃদ্ধ খুব অত্যুক্তি করেননি। সেই সকাল থেকেই ওষুধের আশায় কাতারে কাতারে লোক লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনল সুপুর-রামপুর-ইলামবাজার-বোলপুর-সাঁইথিয়া-রামপুরহাট-নলহাটি-সিউড়ী থেকে তো বটেই, ওষুধের আশায় মুর্শিদাবাদ-সাঁওতাল পরগনা-বর্ধমান এমন কি কলকাতা থেকেও লোক আসার বিরাম নেই। বক্রো বাবার থানে ভৈরবী মায়ের ওষুধের কথা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কানে কোনো না কোনো ভাবে পৌঁছেই যায়।

সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে প্রবোধচন্দ্র ভৈরবী মায়ের ওষুধ দেওয়া দেখল। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেখানে শৃঙ্খলার তদারক করছেন যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তিনিই কংকালমালী ভৈরবের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত মোহিনী ভট্চায্। অন্যরা তাঁরই ভাই-ভাইপো অথবা তাদের লোক।...ভৈরবী মা উঁচু বাঁধানো দাওয়ার আসনে বসে। তাঁর দু'হাতের মধ্যে কাগজ কলম নিয়ে বসে আর একটি লোক। পিছনে একটা লাল কম্বলের ওপর নানা আকারের ডালার মধ্যে ছোট বড় কাগজের মোড়ক। সেখানেও আর একটি লোক বসে। ভৈরবী মায়ের দাওয়ার দশ গজ তফাতে ছোট্ট একটা কাঠের গেট। সেটা সরিয়ে একজন করে লোক মায়ের সামনে আসছে। তার হয়ে গেলে সে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, লাইনের পরের লোক আসছে। বিশ গজ ফারাক থাকার দরুন কারো ব্যাধির কথা অপরে শুনতে পাচ্ছে না।...হ্যাঁ, অনির্বচনীয় রূপই বটে মাতাজীর। কিন্তু বড় স্থির, স্নিগ্ধ। অন্য ভৈরবীদের মতোই পরনে রক্তাম্বর বেশবাশ— এটুকুই শুধু মেলে, আর কিছু মেলে না।... কি মেলে না প্রবোধচন্দ্র সব ঠাওর করতে পারল না, কেবল মনে হলো রূপ তো নয়ই, কোনো কিছুই মেলে না।

ভৈরবী মা পারত-পক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। যে আসছে স্থির চোখে শুধু তাকে

দেখছেন, তার নিবেদন শুনছেন। শোনা হলে একটু ঘুরে পিছনের লোক তাঁর ইশারায় ডালা সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। তিনি ওষুধ তুলে আলতো করে প্রার্থীর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে ফেলে দিচ্ছেন। ওষুধ কি-ভাবে খেতে হবে খুব সম্ভব মোড়কের গায়ে বা ভিতরে লেখা থাকে। ওষুধ পেলে প্রার্থী যুক্ত হাতে প্রণাম করে সামনের কাঠের বাক্সে একটি সিকি ফেলে চলে যায়। সমস্ত ওষুধেরই এই এক প্রণামীমূল্য। সকলেই জানে এটুকু শুধু ওষুধ সংগ্রহের খরচ। অর্থাৎ বিনা মূল্যেরই ওষুধ। মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার রীতি নেই। দু'পা ঢেকে মা যোগাসনে বসে থাকেন। ওষুধ পেলে হাত জোড় করে প্রণাম করে চলে যেতে হয়। সকলেই ওষুধ পায় বা সকলেরই ওষুধ মজুত থাকে এমন নয়। যে পায় না বা যার ওষুধ মজুত থাকে না, নিবেদন শোনার পর মা আঙুলের ইশারায় ও-দিকে কাগজ কলম নিয়ে বসা লোকটিকে দেখিয়ে দেন। সেই লোক দু'চার কথায় কিছু লিখে রেখে তাকে এক বা দু'সপ্তাহ পরে আসতে বলে দেয়।

ভোর সাতটা থেকে বিকেল প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত একদিকে ঠায় দাঁড়িয়ে লোকের এই ওষুধ নেওয়ার পর্ব দেখে গেল প্রবোধচন্দ্র। এর মধ্যে লেখার লোক আর ওষুধের ডালা এগিয়ে দেবার লোক বদল হয়েছে, একমাত্র মোহিনী ভট্চায্ ছাড়া অন্য সব তদারকি লোকদেরও পালা করে এক-দেড় ঘণ্টার জন্য অনুপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। শুধু মোহিনী ভট্চায্ একভাবেই তাঁর কাজ করে গেছেন, আর আসন ছেড়ে একবারও নড়েননি কেবল ভৈরবী মা।

...আর অনতিদূরে এই একটি ছেলে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে কেবল দেখে গেছে— এটুকু লক্ষ্য করেছেন ভৈরবী মা-ও। চোখ তুলে দুই একবার সোজা তাকিয়েছেনে তার দিকে। প্রবোধচন্দ্রের তখন মাথা নিচু।

তখনও যারা আসছিল মোহিনী ভট্চায্ তাদের হাতের ইশারায় চলে যেতে বললেন। অর্থাৎ আর হবে না, ভৈরবী মা তাঁর আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন। পয়সার কাঠের বাক্স, ওষুধের ডালা দাওয়া থেকে ঘরে রেখে এলেন। অন্য সকলে বাইরে দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে। ভৈরবী মা দাঁড়িয়ে দুই এক মিনিট ভট্চাযের সঙ্গে কথা বললেন। প্রথমে দোরগোড়ায় পরে ভৈরবী মা-কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সকলকে নিয়ে অদূরে দাঁড়ানো একটা মোটরে উঠলেন তিনি। যাবার সময় একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন। ঘুরে দেখলেন ভৈরবী মা-ও এই ছেলেটির দিকেই তাকিয়ে আছেন। কিছু না বলে তিনি চলে গেলেন।

বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। দাওয়ায় ভৈরবী মা দাঁড়িয়ে। গজ পনেরো তফাতে প্রবোধচন্দ্র। তার মাথা নিচু।

একবার মুখ তুলতে চোখাচোখি হলো। মনে হলো ভৈরবী মা মাথা নেড়ে তাকে কাছে আসতে ইশারা করলেন।

মাথা নিচু করে প্রবোধচন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। দাওয়ার তিন হাতের মধ্যে দাঁড়ালো।

— তোমার কি?

প্রবোধচন্দ্র মাথা নাড়ল। কিছু না।

— কিছু না তো সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

নিরুত্তর।

— কিছু বলবে?

মুখ না তুলে মাথা নাড়ল। কিছু বলার নেই।

ভৈরবী মা স্থির চোখে দেখছেন।— তাহলে না খেয়ে সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি চাই?

— ভৈরব বাবার দর্শন। তাঁর কৃপা।

আবার নিরীক্ষণ করছেন।— তিনি কাউকে দর্শন দেন না, কারো সঙ্গে কথা বলেন না। প্রবোধচন্দ্র নির্বাক।

ভিতর থেকে বিরক্ত গম্ভীর গলা শোনা গেল।— বাইরে কে দাঁড়িয়ে— কার সঙ্গে কথা বলছ?

— একটি ছেলের সঙ্গে।

— কি চায়?

— আপনার দর্শন আর কৃপা।

এবারে হুঙ্কার।— চলে যেতে বলো।

প্রবোধচন্দ্র ভয়ে ভয়ে ভৈরবী মায়ের দিকে তাকালো।

তিনি স্থির চোখে তাকেই দেখছেন। একটা হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরলেন। এক হাতের চেটোয় শালপাতা, অন্য হাতে মাটির গেলাস।

— ধরো।

প্রবোধচন্দ্র মুখ তুলল। শালপাতায় খানিকটা মেওয়াগোছের কিছু। গেলাসে দুধ।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় গলা-বুক শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে খেয়াল ছিল না। দেখে তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়ালো। ভৈরবী মায়ের হাত থেকে আগে শালপাতা নিল। শুকনো গলা বুক, তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে বিষম খেল।

— আগে খানিকটা দুধ খেয়ে গলা ভিজিয়ে নাও।

প্রবোধচন্দ্র তাই করল। খাওয়া শেষ হতে মাটির গেলাস আর শালপাতা হাতে দাঁড়িয়েই রইলো।

ভৈরবী মা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখছেন। গলা খাটো করে বললেন, কাল সকাল ছ'টার আগে এসো, দর্শন পাবে। কৃপা কতটা পাবে তিনি জানেন।

একটু এগিয়ে গিয়ে হাতের শালপাতা আর মাটির গেলাস ফেলে প্রবোধচন্দ্র একবার ফিরে তাকালো।

ভৈরবী মা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। চেয়ে আছেন।

রাতটা প্রবোধচন্দ্র মন্দিরের চাতালে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল। ঘুম প্রায় হলোই না। আধো ঘুমের মধ্যে কতবার ভৈরবী মায়ের মুখখানা দেখল ঠিক নেই। আধো ঘুমের মধ্যেই এক-একবার মনে হলো সে যেন বিশেষ কোনো আনন্দের উৎসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই

উৎসের মধ্যেও ভৈরবী মায়ের মুখের ছায়া দুলছে। আর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়ও থেকে থেকে মনে হয়েছে সে এই জীবনের কিছু একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাত চারটেয় মন্দিরের চাতাল ছেড়ে নেমে এসেছে। ছোট সুটকেসটা সেখানেই একজনের জিম্মায় রেখেছিল। একপ্রস্থ জামা-কাপড় বার করে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে স্নানাদি সেরে ফেলল। তারপর অধীর প্রতীক্ষা। শ্মশানের কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কংকালমালীর ডেরার সামনে এসে দাঁড়ালো যখন, সকাল তখন সোয়া পাঁচটা হবে। ফাল্গুনের শেষ সেটা। ভোরের আলো তখনো খুব ভালো করে জাগেনি। তবে ফাঁকা শ্মশানের ভোর একটু তাড়াতাড়িই হয়।

ডেরার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালো। সদ্য স্নান সেরে ভৈরবী মা দাওয়ার তারে ভেজা বসন শুকুতে দিচ্ছেন। আদুড় গায়ে শুকনো রক্তাম্বর জড়ানো। দু'হাত তুলে তারে ভেজা কাপড় মেলে দিতে গিয়ে বুকের বসন অনেকটা স্খলিত।

কাপড় মেলে ভৈরবী মা থমকে দাঁড়ালেন। পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে গত সন্ধ্যার সেই ছেলেটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

দেখলেন একটু। তারপর ভিতরে চলে গেলেন। মিনিট তিন-চারের মধ্যে আবার বেরুলেন। রক্তাম্বর বেশ-বাস সুবিন্যস্ত। মাথা নেড়ে ডাকলেন।

প্রবোধচন্দ্র পায়ে পায়ে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো। অপলক চোখে ভৈরবী মা তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। যাকে দেখছেন তার চোখ নিজের পায়ের দিকে।

মাটির দেয়ালের পেরেকে টাঙানো দুটো কুশাসন নামিয়ে দাওয়ার মেঝেতে মুখোমুখি পাতলেন।— ভিতরে এসে বোসো, তুমি একটু আগে এসে গেছ, বাবা মাঝ-রাত থেকেই শ্মশানে, এখনো ফেরেননি।

প্রবোধচন্দ্র দাওয়ায় উঠে আসনে বসল। হাত দুই তফাতে তিনিও আসনস্থ হলেন। প্রবোধচন্দ্রের মনে হয় মহিলার চাউনি স্নিগ্ধ, কিন্তু বড় বেশি স্থির আর অপলক।

— কাল রাতে তুমি ঘুমোওনি?

স্নানাদি সেরে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, তবু আঁচ করলেন কি করে জানে না।— তেমন ভালো না...।

— এখানে কোথায় থাকো?

— এখানে থাকি না।

— কাল কোথা থেকে এখানে এসেছিলে?

— তারাপীঠ থেকে।

— তারাপীঠে থাকো?

— না।

— তাহলে?

— কোথাও থাকি না, যেখানে ঠাঁই মেলে থেকে যাই। একবারও মুখ না তুলে জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

ভৈরবী মায়ের দু'চোখ তার মুখের ওপর তেমনি স্থির, অপলক।— তোমার নাম কি? বললো।

— তোমার বাবা মা ঘর বাড়ি নেই?

— বাবা মা আছেন, কলকাতায় তাঁদের ঘর বাড়িও আছে।

— তাঁদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই?

— না।

— তুমি কতদিন তাঁদের কাছ-ছাড়া?

— চার বছর।

— তোমার বয়স কত এখন?

— পঁচিশ।

— মায়ের অনুমতি নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলে?

— না।...নিজের মা নয়।

আবার থমকে চেয়ে রইলেন। মার দিকে সে একবারও মুখ তোলেনি।—

পড়াশুনো কত দূর করেছ?

— এম. এ. পড়ছিলাম।... পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

পরের প্রশ্ন করতে সময় নিলেন একটু। সেই ফাঁকে দেখে নিচ্ছেন।

— চার বছর তুমি কোথায় কোথায় ঘুরেছ?

— ভারতবর্ষের প্রায় সব সাধন-ভজনের জায়গায়।

— গুরু পাওনি?

— পেয়েছি... টিকে থাকতে পারিনি... নিজেকে সমর্পণ করার মতো কাউকে পাইনি।

— তন্ত্র সাধনার গুরু খুঁজছ?

— হ্যাঁ।

— কেন?

প্রবোধচন্দ্র বাঁধা বুলি কিছু বল'ত পারত। কিন্তু সে চেষ্টা করল না। মুখ না তুলেও তার মনে হচ্ছিল ভৈরবী মা তার ভেতর-বার সবই দেখতে পাচ্ছেন। সত্যি জবাবই দিল।— জানি না...।

— কিন্তু এখানে এসে তোমার কি সুবিধে হবে, ভৈরব বাবা কাউকে সাধন দেন না, কৃপাও করেন না।

— আপনি কৃপা করলে হতে পারে।

ভুরুতে ভাঁজ পড়ল একটু।— আমি বললেও হবে না, তাছাড়া তিনি যা করেন না, আমি তাঁকে তা বলতে যাব কেন?

— সে-কথা বলছি না...আপনার কৃপাই চাইছি।

থমকালেন।— আমার কাছ থেকে সাধন নেবে?

ঘাড় গোঁজ করেই সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিল।

— *কিন্তু আমার তুমি কতটুকু জানো?*

অকপটে মনের কথাই বললো প্রবোধচন্দ্র।— আপনাকে আমার ভালো লেগেছে...।

— কি ভালো লেগেছে?

— সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এত লোককে ওষুধ দেওয়া। উপকার না পেলে এত লোক আসত না।...এই সাধনটুকু পাওয়া আমার কোনো কিছু থেকে কম মনে হলো না।

অন্তত মিনিটখানেক আর সাড়াশব্দ নেই। ভৈরবী মায়ের দু'চোখ এই ছেলের মধ্যে কি দেখছে তিনিই জানেন।

— মুখ তোলো।

প্রবোধচন্দ্র চেষ্টা করে দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর তুললো।

— তুমি আমার কাছ থেকে সাধন নেবে কি করে, তন্ত্র সাধনে দৃষ্টির সাধনা বড় জিনিস— তুমি তো আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতেও পারছ না?

দ্বিধান্বিত জবাব, আপনি কৃপা করলে পারব।

— আমি কৃপা করলে পারবে মানে? এখন পারছ না কেন?

নিরুত্তর। আবার মাথা নিচু।

— কেন পারছ না?

— ভয়ে ...।

হতবাক একটু।— কিসের ভয়, কেন ভয়?

দ্বিধান্বিত জবাব।— কামাখ্যায় আমার সাধনের ভার সেখানকার ভৈরব-বাবা ভৈরবী-মাকে দিয়েছিলেন।...তাঁর আচরণে আমাকে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

হতভম্ব একটু।— কেন, তাঁর মেজাজ খুব কড়া?

— না...।

— তাহলে?

নিরুত্তর।

— কথার জবাব একবারে দেবে, তাহলে তোমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে কেন? প্রবোধচন্দ্র মরিয়া হয়েই বলে ফেলল, ও-সব হর-গৌরীর আসন-টাসন আমার বিচ্ছিরি রকম নোঙরা মনে হয়েছিল...তাই।

ভৈরবী-মা হতভম্ব প্রথম। তারপর বিড়ম্বনা আর হাসি চাপার তাড়নায় সমস্ত মুখ লাল। গালে হাত রাখার মতো করে এক হাতে মুখ চাপা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, সেই ভৈরবী-মায়ের বয়েস কতো?

— চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হতে পারে।

— মুখ তোলো। এবারে নিজের মুখ সদয়।

প্রবোধচন্দ্র মাথা তুলল। এই মূর্তি অনির্বচনীয় মনে হলো তার।

— সত্যিকারের কোনো সাধনেই নোঙরামির জায়গা নেই, তুমি ভুল লোকের কাছে গেছলে।...সে ভৈরবী নয়, পিশাচী...ভয়ে মুখ তুলতে চাও না কেন— আমাকে দেখেও

তোমার সে-রকম মনে হয়?

প্রবোধচন্দ্র অপরাধী মুখে একটু জোরেই মাথা নাড়ল। মনে হয় না।

উনি উঠে গেলেন। মিনিট তিন-চারের মধ্যে মাটির ছোট মালসার মতো পাত্রে বড় দুটো সাদা বাতাসা, দুটো নারকেলের নাড়ু, আর কিছু ভেজানো মুগের ডাল নিয়ে ফিরলেন। অন্য হাতে মাটির জলের গেলাস। সামনে রেখে বললেন, খাও— ।

প্রবোধচন্দ্র তক্ষুণি খেতে লাগল। গতকাল সকাল থেকে তার পেটে অন্ন পড়েনি।

খাওয়া শুরু করেই সচকিত। কঙ্কালমালী ভৈরব-বাবা আসছেন। পরনে সামান্য কৌপীন, হাতে লম্বা চিমটে। দূর থেকে তাকে দেখেই বিরক্ত রুষ্ট মুখ।

দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই ভৈরবী-মা আসন ছেড়ে উপুড় হয়ে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলেন, এ ছোঁড়া আবার কে?

প্রবোধচন্দ্রের বিড়ম্বনার একশেষ, এক হাত এঁটো, প্রণাম করারও উপায় নেই। ভৈরবী-মা জবাব দিলেন, কালকের সেই ছেলেটি...আপনার দর্শন আর কৃপার আশায় কাল সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল।

যে-ভাবে তাকালেন ভৈরব-বাবা, প্রবোধচন্দ্রের মনে হলো হাতের চিমটে দিয়েই মেরে বসবেন। তার বদলে গলা দিয়ে চাপা হুংকার বেরুলো।— দূর হ— দূর হ!

ঘরে ঢুকে গেলেন। ভৈরবী-মায়ের সদয় মুখ।— তুমি খাও বাবা।

খাওয়া শেষ হতে ভৈরবী-মা জিগ্যেস করলেন, দুপুরে খাবে কোথায়?

— ঠিক নেই।

— খাবার টাকা-পয়সা আছে?

তাড়াতাড়ি জবাব দিল, সে-জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মাটির পাত্র আর গেলাস হাতে উঠে দাঁড়ালো।

— ব্যবস্থা এখানেই হবে।...সাড়ে বারোটা-একটার মধ্যে এসে বাবার প্রসাদ নিয়ো।

প্রবোধচন্দ্র দাওয়া থেকে নামল। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আমার খাওয়াটা বড় কথা নয়, অনেক দিনই না খেয়ে কাটে... আমার আরজি আপনি মনে রাখবেন।

চেয়ে আছেন। আরো সদয় মুখ। বললেন, আমি নিজে তো তোমার আরজি মঞ্জুর করার মালিক নই... দেখি চেষ্টা করে— দুপুরে এসো কিন্তু, আমি অপেক্ষা করব।

প্রবোধচন্দ্র মাথা নেড়ে জানালো, আসবে। একটু দূরে মাটির পাত্র মাটির গেলাস ফেলে বড় বড় পায়ে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এলো।... আরজি মঞ্জুর করার মালিক, কংকালমালী-বাবা। তাঁর মেজাজও স্বচক্ষেই দেখল। তবু প্রবোধচন্দ্রের বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাথর সরে যাচ্ছে। মন বলছে সে ঠিক জায়গায় এসেছে। এখানে আশ্রয় মিলবে। মিলবেই।

বেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে আসার কথা। কিন্তু বারোটার মধ্যেই এসে হাজির। ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায় আদৌ নয়। ভৈরবী মায়ের আকর্ষণে। নিজের মা-কে মনেও পড়ে না। কিন্তু সমস্তক্ষণ এক মা-পাওয়ার আনন্দে ভিতরটা ভরপুর। মা নেই সে-দুঃখ কোনোদিনও ছিল না। কিন্তু এই মা-কে না পেলে যেন সর্বনাশ।

জুতো জোড়া খুলে নিঃশব্দে দাওয়ায় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে একটা রুষ্ট-গম্ভীর ঝাপটা কানে এসে লাগল। কংকালমালী-ভৈরবের গলা।

— ও-সব ঝামেলা আমার ভালো লাগে না, দূর হয়ে যেতে বলো। তন্ত্রের সাধনায় ও খুব কিছু এগোবে না।

— যেটুকু এগোয়, তাছাড়া ওষুধ শেখার ব্যাপারেই ওর বেশি আগ্রহ দেখলাম, আপনাকে বিরক্ত না করে ওর ভার আমিই নেব।

আবার হুংকার।— কেন, তোমার এত গরজ কিসের?

— ছেলেটির লক্ষণ বেশ ভালো। আমি খুব ভালো করে দেখে নিয়েছি।

— তা বলে যত লোকের লক্ষণ ভালো সকলকে তুমি এখানে ডেকে আনবে? আমাকে তুমি এখান থেকে তাড়াতে চাও?

— সকলের কথা বলিনি। সকলের তৃষ্ণা আর এই ছেলের তৃষ্ণা এক নয়— আমি শুধু একে নেব।

— হুঁঃ! স্পষ্ট অসন্তোষ।

— তাছাড়া আপনার ওষুধে লোকের কত উপকার হচ্ছে। এত বড় একটা জিনিস আমার পরেই শেষ হয়ে যাবে? আমি কি এই নিয়ে এখানে চিরদিন আটকে থাকব?

— হুঁঃ! এবারের হুঁ-টা তেমন জোরালো নয়।

প্রবোধচন্দ্র বাইরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে।

— ও-মা, তুমি এসে গেছ! একটা গামছা টেনে নিতে গিয়ে দরমার কাছে এসে ভৈরবী-মা তাকে দেখেছেন। তাঁর মুখে চাপা হাসি। আরো একটু এগিয়ে এসে খাটো গলায় বললেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ভিতরের কথা শুনছিলে বুঝি?

প্রবোধচন্দ্র মাথা নাড়ল। শুনছিল।

— ঠিক আছে, ভিতরে এসো। এবারে সহজ স্বাভাবিক গলা।— বাবাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ চাও।...বাবা রাগ করে পা ছুঁড়লে সেটাও কিন্তু আশীর্বাদ ভেবো। এসো—

ভিতরে ঢুকল। বাবার পরনে এখন কৌপীনটুকুও নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন। ঘরের দিকে চেয়ে মনে হলো এক্ষুণি তাঁর আহার শেষ হলো। মায়ের হাত থেকে গামছা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু ওটা না দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে মা যত্ন করে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলেন। পিছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দু'পা ছড়িয়ে চাটাইয়ের ওপর আধশোয়া হলেন তিনি।

প্রবোধচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁর পায়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল। বাবার এখনো রুষ্ট মুখই, কিন্তু মায়ের ওই-রকম বলার দরুনই বোধহয় পা ছুঁড়লেন না। প্রণাম সেরে উঠতে বললেন, যা শালা, খুব বেঁচে গেলি।

বাইরে দাওয়ায় বসে তার আহার সমাধা হলো। সামনে মা বসে। আহারের আয়োজন যৎসামান্য। মোটা চালের ভাত, কড়াইয়ের ডাল, আর একটু তরকারি। প্রবোধচন্দ্রের ধারণা ছিল, ভৈরব-ভৈরবীদের কারণ আর মাংস ভিন্ন আর কিছু রোচে না। কিন্তু এই খেয়ে তার মনে হলো তৃপ্তিভরে এমন পরমামৃত কোনো কালে খায়নি।

মা বললেন, তোমার দু'বেলার খাওয়ার ব্যবস্থা এখন থেকে এখানেই হবে— আর অসুবিধে না হলে রাতে এই দাওয়াতেই শুয়ে থাকতে পারো— সঙ্গে রাতে শোবার ব্যবস্থা আছে?

মুখের দিকে চেয়ে প্রবোধচন্দ্র অল্প হেসে নিঃসংকোচে জবাব দিল, আমার শোবার ব্যবস্থার দরকার হয় না— মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই পেলেই হলো।...বাবার মেজাজ যেমনই দেখি না কেন, আমি ঠিক জানতাম আপনার আশ্রয় পেয়েই গেছি।

মায়ের জবাবে একটা ইংরেজী শব্দও বেরুলো।— অত সিওর হয়ে কাজ নেই, কয়েকটা দিন আরো দেখি তোমাকে।

প্রবোধচন্দ্রের সব থেকে আশ্চর্য লাগে ভৈরবী মায়ের পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে। রাতে দু'আড়াই ঘণ্টার বেশি ঘুমোন না। ভৈরব-বাবার সেবা তাঁর সব থেকে বড় কর্তব্য। কিন্তু বাবার সেবার চাহিদা এত কম যে মা-কে সেজন্য বেশি সময় দিতে হয় না। সকাল থেকে রাতের বেশিরভাগ সময় কাটে ওষুধ সংগ্রহ আর ওষুধ তৈরির কাজে। বনে জঙ্গলে আর নানা জায়গায় ঘুরে শেকড় বাকড় অনুপানাদি আর দ্রব্য আনার জন্য তিন চারজন লোক আছে। মা প্রত্যেকটা জিনিস যাচাই করে দেখে নেন। সন্দেহ হলে ভৈরব-বাবাকে দেখিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হন। প্রবোধচন্দ্রকে এক-একটা জিনিস বার বার দেখিয়ে নাম-গুণ ইত্যাদি মনে রাখতে বলেন। এক-একটা জিনিস কত রকমের ব্যাধিতে লাগে লিখে রাখতে বলেন। ওষুধ সালশা বা চূর্ণ ইত্যাদি বানাবার সঙ্গে তাঁর শিক্ষা দেওয়া চলতে থাকে।

দিন তিনেক বাদে রামপুরহাটের মোহিনী ভট্চায্ এলেন। ভৈরব বাবার ঘরে এক মা ছাড়া তাঁরই কেবল অবাধ যাতায়াত। ঘণ্টাখানেক বাদে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রবোধচন্দ্রের সামনে দাওয়ায় বসলেন। সস্নেহে তিনি বললেন, মায়ের আশ্রয় পেয়েছ তোমার বড় ভাগ্য বাবা...জেনে রেখো ভৈরব-বাবার সমস্ত শক্তির আধার এখন মা...মা তোমার প্রশংসা করলেন।

প্রবোধচন্দ্র হেসে বলল, আর বাবা?

— বাবার কথা ছেড়ে দাও, তিনি স্বয়ং রুদ্র, কিন্তু অন্তরে সদা প্রসন্ন।

এই মানুষটিকেও প্রবোধচন্দ্রের বড় ভালো লাগল।...ইনিই নাকি একদিন স্বেচ্ছাচারী ভোগী অত্যাচারী মানুষ ছিলেন। বাবার মহিমা প্রবোধচন্দ্র মনে মনে স্বীকার করে বৈকি। কিন্তু বাবার মনোভাব বাইরে অন্তত তার প্রতি একটুও প্রসন্ন নয়। এখনো বেশিরভাগ রাতই শ্মশানে কাটান। আসতে যেতে বলেন, শালা কোথা এসে জুটেছে!

মা বেরিয়ে এসে ভট্চায্ মশাইয়ের হাতে একটা লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দিলেন। প্রবোধচন্দ্র দেখলেন সাদা কাগজে মুক্তোর মতো হাতের লেখা। এ-গুলোও ওষুধেরই নানা উপকরণ। বললেন, রামপুরহাটে সব-কিছু পাবেন না বাবা— আপনাকে কলকাতায় লোক পাঠাতে হবে।

— আজই পাঠাবো...মায়ের যখন দরকার, সবই এসে যাবে।

ভৈরবী মায়ের উদ্দেশে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে ভট্চায্ মশাই বললেন, মঙ্গলবার ঠিক সময়ে ওদের নিয়ে এসে যাব মা। মা মাথা নাড়তে তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। পুলিশের জিপ গাড়ি।

মঙ্গলবারে আসবেন কারণ সেদিন ওষুধ দেবার আর নেবার দিন।

অদ্ভুত ভালো লাগছে প্রবোধচন্দ্রের। বুকের তলায় এমন শান্তি আর যেন অনুভব করেনি। কাজ না থাকলে নিজের মনেই এদিক-ওদিক বেড়ায়। এমন শান্ত নীরবতারও একটা বিশেষ রূপ আছে। পথের দু'দিকে বড় বড় গাছ। অর্জুন-অশ্বত্থ-পাকুড়-কাঁঠাল-তেঁতুলগাছ গুলোও যেন পরম আত্মীয়ের মতো তাকে গ্রহণ করেছে।

...আবার মঙ্গলবারে সেই ওষুধ দেবার দিন। বেশ ভোরেই মোহিনী ভট্‌চায্‌ জিপে তাঁর লোকজন নিয়ে এসে গেলেন। ও-দিকে লাইনে লোক দাঁড়ানো আরও আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে। আরো আধ-ঘণ্টার মধ্যে স্নান সেরে মা তাঁর উঁচু দাওয়ার সামনে বসলেন। তাঁর নির্দেশে প্রবোধচন্দ্রও স্নান সেরে প্রস্তুত। অন্য লোকের বদলে এবারে ওষুধের ডালাগুলোর সামনে তার আসন। সে-ই ডালা এগিয়ে দেবে। কে কি রোগ বা কার কি অসুবিধের কথা বলে মা তা-ও মন দিয়ে শুনতে বলেছেন।

মোহিনী ভট্‌চায্‌ ছোট কাঠের গেটের দড়ি খুলে দিতে ওষুধ প্রার্থীরা একে একে আসতে লাগল। একসঙ্গে দু'জনের আসার রীতি নেই। তবে কেউ অশক্ত বা অথর্ব হলে তার সঙ্গের চলনদার রোগী নিয়ে আসতে পারে। প্রবোধচন্দ্র রোগীর নিবেদন শোনার থেকে মায়ের মুখই বেশি লক্ষ্য করছে। মনে হলো, মা-ও নিবেদন শোনার থেকে স্থির চোখে দেখে নিয়ে রোগীর হাল বেশি বুঝতে পারছেন।

আজও বিকেল পর্যন্ত এই পর্ব চলল। এইদিন মা আর মোহিনী ভট্‌চায্‌ ছাড়া আর একজন সারাক্ষণের মধ্যে জায়গা ছেড়ে নড়ল না বা উঠল না। সে প্রবোধচন্দ্র। মা-ও তাকে একবারের জন্য উঠতে বললেন না, এটুকুও যেন তাঁর করুণাই মনে হলো। এই দিনে বাবার খাওয়া-দাওয়া বা সেবার ব্যবস্থা কি হয় প্রবোধচন্দ্র জানে না।

অবশ্য পরে জেনেছে। বাবা এমনিতেই সপ্তাহে দু'দিন বা বড় জোর তিন দিনের বেশি মুখে অন্ন তোলেন না। এক মঙ্গলবারের ছাড়া রান্না রোজই হয় বটে। কিন্তু বেশির ভাগ দিন তিনি হাত দিয়ে অন্ন-ব্যঞ্জন স্পর্শ করে দেন শুধু। যে-দিন ইচ্ছে হয় দুই এক গরাস মুখে তোলেন। রাতের আহার বহুকাল ধরেই ত্যাগ। মঙ্গলবারে মা-কে রান্নার কোনো আয়োজনই করতে হয় না।

এখানে প্রবোধচন্দ্রের রাতের খাওয়া কোনোদিন দু'খানা রুটি একটু গুড় আর দুধ। । কোনোদিন বা ফল আর দুধ। মোহিনী ভট্‌চাযের ব্যবস্থায় দুধ একজন রোজই দিয়ে যায়। এ-ছাড়া ভক্তদের কাছ থেকে যে-দিন যেরকম জোটে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ভৈরবী-মা তাকে বললেন, কাল শনিবার রাতে তোর দীক্ষা হবে।

মা খুব সহজে তাকে আরো আপনার করে নিয়েছেন। তুমি ছেড়ে তুই করে বলেন। দীক্ষা হবে শুনে প্রবোধচন্দ্রের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত।

—রাতে কখন দীক্ষা দেবেন মা?

— বাবা থাকতে আমি দীক্ষা দিতে যাব কেন! তিনিই দেবেন —

প্রবোধচন্দ্র স্তব্ধ একটু। কথা যেন জ'টা শিরশির করে কানের ভিতর দিয়ে দেহের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

— আমাকে কি করতে হবে?

— দু'হাত তুলে নাচতে হবে। মা হেসে ফেললেন, কি আবার করতে হবে, স্নান সেরে লাল চেলি পরে তাঁর কাছে গিয়ে সামনে বসতে হবে।

— লাল চেলি কই?

— ভট্‌চায্‌ মশাইকে দিয়ে আনিয়ে রেখেছি।

রাত আর পরের দিনটা অধীর প্রতীক্ষায় কাটল। রাত বারোটাও এগিয়ে এলো একসময়। স্নান সেরে রক্তাম্বর পরে প্রস্তুত হতে মা তাকে বাবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ভৈরব-বাবা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়ার মতো কম্বলের ওপর বসে। সম্পূর্ণ নগ্ন। এই রাতের আঁধারে তাঁর মুখখানা আদৌ তুষ্ট মনে হলো না প্রবোধচন্দ্রের। চাউনি দেখে মনে হলো যেন আক্কেল দেবার অপেক্ষায় আছেন।

প্রবোধচন্দ্র তাঁর সামনে পাতা আসনে বসল। ভৈরব-বাবা সোজা হলেন। তার দিকে স্থির চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। প্রবোধচন্দ্রের সর্বাঙ্গে অদ্ভুত শিহরণ। মনে হলো ওই চোখের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো একটু কিছুর ধাক্কায় এ-রকম হচ্ছে।

চিমটেটা তুলে নিয়ে ভৈরব-বাবা তার দু'কাঁধে একটু জোরেই দু'টো ঘা বসিয়ে দিলেন। তারপর আবার চোখের দিকে তেমনি খানিক চেয়ে থেকে জলদগম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, কালীকিংকর!

কিছু না বুঝে প্রবোধচন্দ্র এ-দিক ও-দিক তাকালো। ভৈরবী-মা বললেন, আগের নাম ভুলে যাও— এখন থেকে বাবার দেওয়া কালীকিংকর নামেই তোমার পরিচয়। বলতে বলতে একটা থ্যাবড়া কৌটো খুলে বাবার সামনে ধরলেন। ওতে রক্তবর্ণ সিঁদুর।

বুড়ো আঙুলটা সেই সিঁদুরে ডুবিয়ে ভৈরব-বাবা নাকের ওপর থেকে কপালের শেষ পর্যন্ত সোজা একটা সিঁদুরের দাগ তুলে দিলেন— যা শালা, এবার লুটেপুটে খাগে যা!

ভৈরবী-মা বললেন, বাবাকে প্রণাম করে উঠে এসো।

সে উপুড় হয়ে বাবার ছড়ানো দু'পায়ে কপাল মাথা ঘষে মায়ের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো।

মা জিগ্যেস করলেন, বাবা কি আশীর্বাদ করলেন, বুঝতে পারছ?

মাথা নাড়ল, বুঝতে পারেনি।

মা বুঝিয়ে দিলেন।— জগৎ আনন্দময়। নিরানন্দের মধ্যেও আনন্দ ছড়িয়ে আছে। তুমি সেই আনন্দ লুটে নাও।

মায়ের দিকে চেয়ে আছে। চোখের পাতা পড়ছে না। আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসল। মায়ের দু'পায়ে মাথা রাখল। দু'হাতে পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে মাথা রেখে পড়ে থাকল।

...জীবনে কি কখনো কেঁদেছে? মনে পড়ে না। তার চোখের জলে মায়ের দু'পা ভেসে যাচ্ছে। কেঁদে এত আনন্দ তা-ও কি কখনো কেউ অনুভব করেছে?

— কালীকিংকর, ওঠো...।

প্রবোধচন্দ্রের অস্তিত্ব ঘুচে গেছে। সেই খোলসেই যাঁর আবির্ভাব তিনি অন্য একজন। তিনি কালীকিংকর। কালীকিংকর অবধূত।

এই নতুন জীবনে মায়ের বাধা অনেক সময় আশ্চর্য রকমের স্পষ্ট এবং গম্ভীর। অমান্য করার জো নেই। যেমন অবধূতের সংকল্প, চুল দাড়ি রাখবেন, আর কাটবেন না, কামাবেন না। মায়ের স্পষ্ট আদেশ, চুল দাড়ি রাখতে হবে না। ওসব কেটে আগের থেকেও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। মোহিনী ভট্চায্ একদিন দরজি এনে কালীকিংকরের মাপ নিতে এলো। ভৈরবী-মা সামনে বসে। অবধূত বুঝলেন, তাঁর নির্দেশেই দরজি আনা হয়েছে। মাপ নেওয়া হতে দু'জোড়া কাপড়ের কথাও মা বলে দিলেন। সেই জামা, কাপড় আসতে কালীকিংকর অবাক। তার ধারণা রক্তাম্বর ধুতি আর জামা আসছে। তার বদলে বেশ মিহি জমিনের ধুতি আর ভালো কাপড়ের পাঞ্জাবি! মা-কে বলেই ফেলল, এ-সব আর পরব কেন?

মা-ও আবাক একটু।— তাহলে কি পরবি?

— আমার তো রক্তাম্বর পরার কথা।

— এমন কথা কে বলেছে?

কালীকিংকর চুপ। কেউ বলেনি। নিজেই ভেবেছিলেন।

মা ফতোয়া দিলেন, রক্তাম্বর ধুতি চাদর এক-প্রস্থ থাকলেই হবে, কাজে-কর্মে পরবি— সব-সময় পরবার দরকার নেই।

এ-ব্যবস্থা কালীকিংকরের খুব মনঃপূত হয়নি। ভৈরবী-মা যেন অনেকটা গৃহস্থবাড়ির ছেলের মতোই রাখতে চান। কিন্তু তাঁর নির্দেশ অমান্য করা চলে না।

মানুষের আদি-ব্যাধি নিরাময় করার বিদ্যে মা তাঁকে যত যত্ন করে শেখান, অন্যান্য বিষয়ে সাধন দেবার ব্যাপারে তাঁর অত আগ্রহ নেই। তন্ত্র সাধনার অনেক নিগূঢ় ক্রিয়া-কলাপ জপ-তপ আছে কালীকিংকর জানেন। কিন্তু তিন-মাস যাবৎ ভৈরবী-মা কেবল তাঁকে মনঃসংযোগ আর দৃষ্টি-সঞ্চালনের বিদ্যেয় রপ্ত করে তুলছেন। বলেন, মানুষের সেবা করতে হলে এ দুটোই সব থেকে বেশি দরকার। মনের স্থির সংযোগ হলে নিজের অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায়। আর দৃষ্টি সঞ্চালন আয়ত্তে এলে মানুষের ভিতরের অদেখা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত ঘুরে আসা যায়। ভৈরবী-মায়ের হাব-ভাব আর শিক্ষা দেখে কালীকিংকরের মনে হয়, নিজের মনঃসংযোগ এবং মানুষের আধি-ব্যাধির সেবা, আর মুখ দেখে লক্ষণ জানা বা চেনাই তাঁর কাছে অন্তসার।

মাস আড়াই তিনের মাথায় এক সকালে এখানকার বাঁধা-ধরা ছকে বেশ একটু বৈচিত্র্যের রঙ ধরতে দেখলেন কালীকিংকর। তিনি দাওয়ার সিঁড়িতে বসে দুটো লোকের আনা শিকড়-বাকড় লতা-পাতা দেখছিলেন। ভৈরবী-মা সেগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। কোন্‌টা কি, কোন্ কাজে লাগে ইত্যাদি। লোক দুটো নতুন সাধুকে মায়ের এই জেরার মুখে পড়তে দেখে মজা পাচ্ছিল।

দশ হাতের মধ্যে একটা জিপ এসে দাঁড়ালো। মোহিনী ভট্চাযের চেনা জিপ। এই জিপে মেয়েছেলে আসতে দেখেও দু'চোখ অনভ্যস্ত নয় কালীকিংকরের। ভট্চায্ মশায়ের আর তাঁর ভাইয়ের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে আসেন। কিন্তু এই সকালে জিপ থেকে নামল যে মেয়েটি তার প্রতি

দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না, চোখের ওপর এমন শাসন-ক্ষমতা কারো আছে কিনা কালীকিংকর জানেন না। তাঁর অন্তত নেই।

বছর ষোল সতেরোর মধ্যে হবে বয়েস। বেশ লম্বা। সুডোল স্বাস্থ্য। দুধে-আলতা গায়ের রং। আয়ত টানা চোখ। টিকলো নাক। সকালে স্নান করে এসেছে, আধা-কোঁকড়া চুল পিঠের ওপর ছড়ানা— সেই চুলের গোছা কোমর ছাড়িয়ে হাঁটুর দিকে নেমেছে।

জিপ থেকে নেমে হাসি-হাসি মুখে অতি পরিচিতের মতো দাওয়ার দিকে এগুলো। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কালীকিংকর দাওয়ার সিঁড়িতে বসেই ছিলেন, শশব্যস্তে উঠে সিঁড়ি ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। এগিয়ে আসতে আসতে মেয়েটি তাঁর মুখখানা একদফা দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করে নিল। দাওয়ায় উঠতে কালীকিংকরও ঘুরে তাকালেন। ভৈরবী-মায়ের আর লোক দুটোরও হাসি-হাসি মুখ।

দু'হাত কোমরে তুলে মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করে দাওয়ার শিকড়-বাকড় লতাপাতাগুলো দেখল। তারপর ভৈরবী-মায়ের দিকে চেয়ে বলল, তোমাদের জ্বালায় এ জায়গা থেকে ডাক্তার বদ্যিরা সব পালাবে দেখছি—

ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর ঘরের বাসিন্দা অর্থাৎ কংকালমালী ভৈরবের উদ্দেশে একটু গলা চড়িয়ে যা বলল, শুনে কালীকিংকরের কান খাড়া, শিরদাঁড়া সোজা।

— কই গো শিবঠাকুর, ঠিক-ঠাক মতো আছ? ভিতরে ঢুকব?

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ভৈরবের দরাজ গলার শব্দ, আমি ঠিক-ঠাক মতোই আছি, তোর অসুবিধে হলে একটু দাঁড়া, আমি বাঘ-ছালটা কোমরে জড়িয়ে নিই।

— জড়াও বাপু, আমার ক্ষমতা থাকলে তোমাদের হিমালয়ের মাথায় বসিয়ে রাখতাম, লোকালয়ে আসতে দিতাম না।

ঘরে হা-হা হাসির শব্দ।

কালীকিংকর দেখছেন, ভৈরবী-মায়ের ঠোঁটে হাসির আভাস। আর লোক দুটোর মুখে হাসি ধরে না।

ঘরের ভিতর থেকে ভৈরব বাবার হাঁক শোনা গেল, আ যা মেরে চৌদরী কা চাঁদ— দু'চোখ ভরে দেখি তোকে—

মেয়েটি হাসি মুখে ভিতরে চলে গেল। একটা থলে হাতে মোহিনী ভট্চায্ দাওয়ায় উঠে এসেছেন। কালীকিংকরকে বললেন, জিপে দইয়ের হাঁড়ি আর মিষ্টির হাঁড়ি আছে, নামিয়ে আনো তো বাবা— এই থলেতে মাংস আছে মা—বাবার কাছেই নিয়ে যাই?

ভৈরবী-মা জিগ্যেস করলেন, এত-সব কেন?

— কল্যাণী মায়ের হুকুম, বলল, শিবঠাকুরকে আজ এ-সব ঘুষ দিতে হবে।

তাঁরা দু'জনে হাসিমুখে দরজার দিকে এগোলেন। কালীকিংকর এ-টুকু শুধু বুঝলেন মেয়েটির নাম কল্যাণী। চটপট দই আর মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এলেন। ভিতরে না ঢুকে ও-দুটো হাতে করে তিনি দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ভিতরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

জানু-আসনে বসে কল্যাণী ভৈরব বাবার পায়ে উপুড় হয়ে কপাল ঠেকিয়ে পড়েই আছে। কংকালমালীর গোঁপ-দাড়ি-বোঝাই মুখে খুশি উপচে উঠছে। তিনি তার পিঠে হাত বোলাচ্ছেন। ওই মেয়ের পা ছেড়ে ওঠার নাম নেই, যেন মনের সুখে আদর খাচ্ছে।

দাবড়ানির সুরে ভৈরব বাবা বলে উঠলেন, ওঠ্ ওঠ্— খুব হয়েছে— আড়াই মাস না দেখে দু'চোখ অন্ধ হতে বসেছে— আর শালী এতদিন বাদে এসে খুব ভক্তি দেখাচ্ছে।

পা থেকে মাথা না তুলেই ঝাঁঝের গলায় মেয়ে জবাব দিল, তোমার ভৈরবীর হুকুম শুনে মুখ বুজে ছিলে কেন?...পরীক্ষার আগে আর আসতে হবে না আদেশ শুনেও তো ভেজা বেড়ালখানার মতো মুখ করে বসেছিলে!

—আচ্ছা আমারই দোষ, ওঠ্।

উঠল। তাঁর মুখোমুখি মাটিতেই বসল। ভৈরবী-মা আর মোহিনী ভট্চাযের হৃষ্ট মুখ।

ভৈরব-বাবার দু'চোখ তার মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত ওঠা-নামা করল একবার।— তা পরীক্ষা দিয়ে দিগ্‌গজ হয়ে এলি?

— হলাম কি হলাম না তুমি জানো। পাশ করলে আমার ক্রেডিট, ফেল করলে তোমার দোষ।

— কেন, ফেল করলে আমার দোষ কেন?

—ফেল করলে লোককে বলব, তোমাদের ভৈরব-বাবা আমার মন কেড়ে নিয়ে বসেছিল, পড়াশুনায় মন দিতে পারি নি। শিবঠাকুরকে না দেখে পার্বতী কি তার বাপের বাড়িতে খুব সুখে ছিল? তাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হলে মজা টের পেত।

ভৈরব বাবার অট্টহাসি।— তোকে ফেল করায় কোন্ শালার বাপের সাধ্যি! তুই সবেতে পাশ করেই বসে আছিস।

কালীকিংকর স্থান কাল ভুলে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ দিয়ে দেখবেন না কান দিয়ে শুনবেন! চোখ-কান দুই-ই এমন আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি করেও ভরাট হয়!

ভৈরব-বাবার চোখ হঠাৎই দরজার দিকে। ঝুঁকে চিমটেটা তুলে নিয়ে ছোঁড়ার ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলে হুংকার ছাড়লেন, এই ও শালা! ওখানে দাঁড়িয়ে তুই হাঁ করে আমার পার্বতীর রূপ গিলছিস— এত সাহস তোর! এ-দিকে চোখ দিলে তোকে আমি বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব না! ভাগো হিঁয়াসে!

দৈয়ের হাঁড়ি আর মিষ্টির হাঁড়ি মাটিতে নামিয়ে রেখে কালীকিংকর উঠে দাঁড়ালেন। এই মেয়ের সামনে এ-রকম ধমক খেয়ে তাঁর জিভেও কোন সরস্বতী ভর করল কে জানে! হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন, বাপের নাম আমি এঁকে দেখার অনেক আগেই ভুলেছি বাবা—

দাওয়ার মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে চেয়ে শিকড়-বাকড় যোগাড়ের লোক দুটো হাসছে। ভিতরের কথা-বার্তা স্পষ্ট শোনা যায়।

ভৈরব বাবার হুংকার শোনা গেল। তাঁর পার্বতীকেই শাসাচ্ছে।— শালা সেয়ানা কত দেখলি? খবদ্দার ওর কথায় ভুলবি না— ও-শালা আমার বুক ঝাঁঝরা করে দেবার মতলবেই এখানে এসে জুটেছে!

রসালো জবাবও শোনা গেল। কল্যাণী বলছে, অত দুশ্চিন্তায় থেকে কাজ কি, তোমার কপালের আগুনে ভস্ম করেই ফ্যালো না।

লোক দুটো শব্দ না করে হাসছে। ওদের একজনের নাম হারু। কালীকিংকরের সঙ্গে তারই বেশি ভাব। সে-ও অনেক গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় চেনায় তাঁকে। ইশারায় তাঁকে ডেকে দাওয়া থেকে নামলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, এতদিনের মধ্যে দেখিনি, এই মেয়েটি কে?

হারু জানালো, এই দিদিমণির সঠিক পরিচয় সে জানে না। তবে এ-টুকু জানে, ভট্‌চায্ মশাইয়ের কোনো আত্মীয়ের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই বাপ-মা-হারা। ভট্‌চায্ মশাই তাকে নিজের ছেলে-মেয়ের থেকেও বেশি স্নেহে মানুষ করছেন। তার কারণ, ভৈরব-বাবা এই মেয়েকে দারুণ স্নেহ করেন। দশ বছর বয়সে বাবা তাকে নিজের কোলে বসিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন। তাদের ধারণা, এই মেয়ে অশেষ শক্তির আধার। কালে দিনে বাবার আশীর্বাদে ভৈরবী-মায়ের থেকেও অনেক বেশি শক্তির অধিকারিণী হবে।

সময়টা যেন একটা বিভ্রমের মধ্যে কাটতে লাগল কালীকিংকরের। না, কল্যাণী নামে ওই মেয়ে দুপুরের খাওয়ার আগে একবারও ঘর থেকে বেরোয়নি। অথচ কালীকিংকর যেন সারাক্ষণ তার মুখ দেখছেন, হাসি দেখছেন আর কথা শুনছেন।

দুপুরে দাওয়ায় খাওয়ার তিনখানা আসন পাতা হলো। একখানা কালীকিংকরের। মুখোমুখি দুটো কল্যাণী আর মোহিনী ভট্‌চাযের। এত খাবার এসেছে, তাঁরাও প্রসাদ পেয়ে যাবেন বোঝা গেল।

খেতে বসে আরো যেন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেন কালীকিংকর। ওই মেয়ে মাঝে মাঝে সোজা তাকিয়ে তাকে দেখছে। সামনে ভৈরবী-মা, পাশে ভট্‌চায্ মশাই, কিন্তু এ-জন্যে যেন কোনো দ্বিধার কারণ নেই। খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাচ্ছে। নিঃসংকোচে দেখে নিয়ে আবার খাচ্ছে।

কল্যাণী একবার মুখ তুলে ভৈরবী-মায়ের দিকে তাকালো। ভৈরবী-মাকে সামনা-সামনি সকলেই মা বলে। গম্ভীর মুখে মন্তব্য করল, মা, তোমার এই শিষ্যের কিস্‌সু হবে না, এখনো টনটনে জ্ঞান।

হাসি চেপে ভৈরবী-মা জিগ্যেস করলেন, কি টনটনে জ্ঞান?

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে কল্যাণী আবার বলল, বাবার সেই শুকদেব ব্যাসদেব আর অপ্সরাদের গল্পটা ওঁকে শুনিয়ে সেই মতো তালিম দাও।

হাব-ভাব আর কথা শুনলে কে বলবে এই মেয়ে সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। বয়েস ষোল সাড়ে ষোলর বেশি হবে না। কালীকিংকর আড়চোখে লক্ষ্য করলেন, ভৈরবী-মা গালে হাত দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করছেন। আর হাসি চাপার চেষ্টায় মোহিনী ভট্‌চাযের খাওয়ার দিকে আরো বেশি মনোযোগ। গোঁ-য়ের দিক থেকে বিচার করলে কালীকিংকরকে কেউ সাদা-মাটা মানুষ বলবে না। এই বয়সের একটা মেয়ের— তা সে যত রূপসীই হোক— তির্যক উপহাসের পাত্র হয়ে মাথা গোঁজ করে বসে খেয়ে যাবার পাত্র নন। মুখ তুলে সোজা তাকালেন।

— মায়ের এই শিষ্য বলতে কে— আমি?

— আপনি ছাড়া মায়ের আর দ্বিতীয় শিষ্য নেই।

আপনি করে বলতে গিয়েও মুখে আটকালো কালীকিংকরের। বললেন, মায়ের শিক্ষার ত্রুটি তুমি বেশ ধরে ফেলেছ— আমার টনটনে জ্ঞান বিদ্ধ করার মতো মুনি-ঋষি-অপ্সরাদের গল্পটা বলে তুমিই আমাকে একটু এগোতে সাহায্য করো।

পিঠ টান করে মেয়ে সোজা হয়ে বসল একটু। দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে থাকল কয়েক পলক। এই বয়সের মেয়ের এই দৃষ্টি সঞ্চালন বিদ্যেটা ভৈরব-বাবার কাছ থেকে পাওয়া কিনা কালীকিংকর জানেন না। কিন্তু এ-টুকুতেই যেন বেশ পর্যুদস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। সেটা অস্বীকার করার তাড়নায় সোজা চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইলেন।

মেয়ের বসার ভঙ্গি আবার শিথিল হলো একটু। আলতো সুরে বলল, গল্পটা এমন কিছু নয়, তবে আপনাদের মতো ভাবী যোগী-পুরুষদের শিক্ষার বিষয়।...ব্যাসদেব তাঁর ছেলে শুকদেবের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। দূর থেকে দেখলেন, রূপসী অপ্সরারা এক সরোবরে স্নান করছে। ছেলে তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। তারা ভ্রূক্ষেপও করল না। কিন্তু একটু বাদেই বৃদ্ধ বেদব্যাস সেখান দিয়ে যেতেই অপ্সরারা ত্রস্ত—যে যার বসন সামলাতে ব্যস্তসমস্ত। বেদব্যাস অবাক হয়ে তাদের জিগ্যেস করলেন, এই একটু আগে যৌবনে ঝলমল আমার যুবক ছেলে এখান দিয়ে চলে গেল, তোমরা এতটুকু চঞ্চল হলে না, ভ্রূক্ষেপ করলে না—অথচ আমার মতো বৃদ্ধকে দেখে তোমাদের এত লজ্জা—কি ব্যাপার?

...অপ্সরারা করজোড়ে নিবেদন করল, ভগবান শুকদেব তো শিশু, তাঁর নারী-পুরুষ জ্ঞান লোপ হয়ে গেছে...কিন্তু আপনার, এই জ্ঞানটুকু এখনো যে টনটনে প্রভু—তাই আমাদেরও লজ্জা।

কতটুকু আহত করা গেল নির্লিপ্ত চোখে একবার দেখে নিল। তারপর আহারে মন দিল। একটু ধমকের সুরে ভৈরবী-মা বললেন, বাবার আস্কারা পেয়ে তুই দিনে দিনে বড় বাচাল হয়ে যাচ্ছিস কল্যাণী। ওর কথায় কান না দিয়ে তুমি খাও তো বাবা—

শেষেরটুকু কালীকিংকরের উদ্দেশে।

বিকেলের দিকে মোহিনী ভট্‌চাযের সঙ্গে জিপে উঠে চলে গেল। আর কালীকিংকরের মনে হলো তার চার দিকে সত্যিই শ্মশান। শোভা কিছু নেই। এ-রকম মনে হওয়া মাত্র কাল্পনিক কশাঘাতে নিজেকে সংযত করতে চাইলেন। মনে মনে সন্ত্রস্ত একটু। পাছে ভৈরবী-মা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভেতর দেখে ফেলেন। আরো ভয়, ঘরে সেঁধিয়ে থাকলেও ভৈরব-বাবা সত্যিই যদি সর্বদ্রষ্টা হন, আর ওখানে বসেই তাঁর দিকে চোখ চালান, তাহলে রক্ষা নেই। বার বার নিজের পক্ষে জোরালো রায় দিলেন, তিনি দোষ কিছু করেননি, পাপ তাঁর মনের কোণেও উঁকিঝুঁকি দেয়নি।... ভালো লাগার মতো একটা মেয়ে এসেছিল। ভৈরবী-মায়ের ভালো লেগেছিল।... কংকালমালী মহাভৈরব-বাবারও খুব ভালো লেগেছিল। সেটা যেমন দোষের নয়, তাঁরও একটু ভালো লাগা কক্ষণো দোষের নয়।

পরের মঙ্গলবারে ওষুধ দেবার দিনে ভট্‌চায্‌-মশাই আর অন্য সকলের সঙ্গে কল্যাণীকেও জিপ থেকে নামতে দেখে কালীকিংকর নিজের মনের ওপর কড়া প্রহরী বসিয়ে দিলেন।

দেখলেন ওই মনের গায়ে যেন এক ঝলক দক্ষিণের বাতাস লাগল। স্নায়ু টান করে কড়া হাতে তিনি ওই মনের চারদিকের জানালা দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলেন।...সুন্দরী রমণী যুগে যুগে কত মহাতপার চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়েছে, ধ্যান ভঙ্গ করেছে। তাঁর সামনেও এ এক পরীক্ষা বৈ আর কিছু নয়। খুব সামান্য, সাধারণ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে বক্সোমুনির এই শ্মশানেই তাঁর গতি হোক। দেহের সঙ্গে সব কিছু ছাই হয়ে যাক।

রোগীদের প্রথম ক'ঘণ্টার ভিড়ের সময় এই মেয়েও সাহায্য করে গেল। তাঁর দু'হাতের মধ্যে একই কম্বলে বসে তাঁর সঙ্গে ওষুধের ডালা এগিয়ে দিতে লাগল। ফলে কালীকিংকরকে এই দিনে বার বার জায়গা ছেড়ে উঠতে হলো না। ওষুধ না পেলে যে লোকটি কলম দিয়ে লিখে রাখছে সে, আর ওষুধের তাগিদে যারা আসছে তাদেরও অনেকে এই মেয়েকে চেনে দেখা গেল। ভৈরবী-মায়ের পিছনে ওই মেয়েকে দেখে অনেক রোগীর মুখে হাসি। ভৈরবী-মায়ের জয়ধ্বনির সঙ্গে তারা কেউ কেউ কল্যাণী-মায়েরও জয়ধ্বনি করছে। আর এ-দিকে এই মেয়ে মাঝে মাঝে চাপা গলায় বলছে, আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন, ওষুধ খেয়ে যমের টানাটানি বন্ধ করতে পারো কিনা দেখো।

বেলা একটা দেড়টার সময় অনেকের মতো সে-ও উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেল। তফাৎ, অন্যের বেলায় বদলি কেউ এসে দায়িত্ব নিয়েছে। কল্যাণীর বদলি কে আসবে? ঘণ্টা দেড় দুই বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বসল। একটু বাদে ভৈরবী-মায়ের হাতে একটা ডালা এগিয়ে দেবার ফাঁকে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, কি হলো, যতক্ষণ এই উৎসব চলবে তোমার এই শিষ্যেরও নিরম্বু উপোস নাকি!

কল্যাণীর হাত থেকে এবাব ওষুধের ডালা নিয়ে ভৈরবী-মা একবার কালীকিংকরের দিকে তাকালেন। তারপর নিজের কাজে মন দিলেন।

বিকেলের শেষ রোগী বিদেয় করে ভট্চায্ মশাই গেটে দড়ি বেঁধে দিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। তিনি স্পষ্টই শ্রান্ত। শ্রান্তির লেশমাত্র নেই ভৈরবী-মায়ের মুখে। কালীকিংকরের ধারণা তাঁর নিজের মুখেও নেই।

সকলেই দাওয়ায় দাঁড়িয়ে এখন। মোহিনী ভট্চায্ এগিয়ে আসতে কল্যাণী শূন্যে ঝাপটা মেরে বসল একটা।—মাঝে খাওয়া-দাওয়া আর একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা না থাকলে পরের মঙ্গলবার থেকে মেসোমশাইকে আর আমি এখানে আসতে দিচ্ছি না।

ভৈরবী-মা জবাব দিলেন, খেতে না চাইলে আমি কি করব?

—তুমি হুকুম করে দেখেছ—এখানে তোমার হুকুম অমান্য করার কারো সাধ্যি আছে?

মা হেসে জবাব দিলেন, আর কারো না থাক, ভৈরব-বাবার জোরে সেটুকু তোর আছে।

ধমকের সুরে মোহিনী ভট্চায্ বললেন, এই মেয়ে, আমার হয়ে তোকে উমেদারি করতে বলেছি? এই একটা দিন আমার কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরই পাই না।

—পুণ্যির হাওয়ায় ভেসে কেটে যায়।...আর এই যোগী ব্রহ্মচারীও ভৈরব-বাবার কাছ থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবারণী মন্ত্র নিয়েছেন নাকি—পুণ্যির তোড়ে মুখ শুকিয়ে যে আমসি একেবার!

ভৈরবী-মায়ের মুখে সস্নেহ হাসি।—সবার পিছনে লাগিস কেন, তোর খাওয়া হয়েছে না হয়নি?

—আমার খাওয়া হবে না কোন্ দুঃখে, শিবঠাকুরের ঘরে ঢুকে দুধ কলা আম সন্দেশ চেটেপুটে খেয়েছি, তারপর শিবঠাকুরের গলা জড়িয়ে ধরে এক ঘণ্টা ফিসফিস গুজগুজ করে বিশ্রাম নিয়ে আবার এসেছি।

—এই শালী, মিথ্যেবাদী। ঘরের ভিতরথেকে ভৈরব-বাবার হুংকার।—তুই একবারও আমার গলা জড়িয়ে ধরিসনি!

কল্যাণী হাসি মুখে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।—ধরিনি! এইরকম মহাভৈরব তুমি। হাত দিয়ে গলা জড়ানো বুঝতে পারো, আর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে গলা জড়ানো বুঝতে পারো না?

ঘরে কংকালমালীর অট্টহাসি।

স্থান-কাল ভুলে এই মেয়েকেই দেখছেন কালীকিংকর। ষোল সতেরো বছরের মেয়ের ভিতরে ঐশ্বর্যের যেন শেষ নেই। এর সবটুকুই কি কংকালমালী ভৈরবের কৃপা—তাঁর বিভূতি?

মোহিনী ভট্চায্ প্রতি মঙ্গলবার ছাড়াও সপ্তাহে মাঝে একদিন করে আসেন। ভৈরবী-মা অথবা ভৈরব-বাবার প্রয়োজন বুঝে নিতেই আসা। কিন্তু এই দিনেও এখন আর তিনি একলা আসেন না। সঙ্গে কল্যাণী থাকেই। আর এই দিনে তাদের সঙ্গে ভালো মাছ বা মাংসও আসেই। অন্য খাবার দাবারও থাকে। কল্যাণী এখানে সমস্ত দিন থাকে আর খেয়ে যায় বলেই নয়, আগেও সপ্তাহের এই ফাঁকা দিনে ভট্চায্ মশাইয়ের সঙ্গে কিছু না কিছু খাবার আসত। কিন্তু ইদানীং আরো বেশি আসছে। ভৈরবী-মা বলেন, এত কেন?

ভট্চায্ মশাই ওই মেয়েকে দেখিয়ে দেন।—এত না হলে ওর মন ওঠে না।

মাঝের এই দিনে এসে কল্যাণী বেশিরভাগ সময় ভৈরব-বাবার ঘরেই কাটায়। আবার এক-একবার দাওয়ায় এসে ভৈরবী-মায়ের পাশে বসে তাঁকে একটু আধটু সাহায্য করে। ওষুধের জিনিসপত্র হাতে হাতে গোছগাছ করে দেয়। মা-কে কিছু বলতে হয় না—এ-কাজে যেন অনেকদিন ধরেই অভ্যস্ত।

ভৈরবী-মায়ের শিষ্যকে যাচাইও করে একটু আধটু। নতুন কোনো শিকড় লতা বা ধাতুগুণের জিনিস দেখলে সেটা তুলে ধরে জিগ্যেস করে, এটা কি বলুন তো?

জানা থাকলে কালীকিংকর জবাব দেন।

—কি কি কাজে লাগে?

কি জিনিস চেনা থাকলে এই জবাবও জানাই থাকে।

—ভেরি গুড।

জানা না থাকলে কালীকিংকর চুপচাপ মায়ের দিকে তাকান। মা বলেন, কি জিনিস আর কি কাজে লাগে এবার ওকে জিগ্যেস করো।

মেয়ে কোনোদিন হেসে ফেলে। কোনোদিন বা আত্মরক্ষার পথ দেখে। আমি বলতে যাব কেন, আমি কি তোমার কাছে এ-সবের পাঠ নিচ্ছি।

চটপট উঠে বাবার ঘরে চলে যায়।

খেতে বসেও এক-একদিন কম মজা করে না। কল্যাণী আর মোহিনী ভট্চাযের আসন পাশাপাশি। মুখোমুখি আসনটা কালীকিংকরের। ভৈরবী-মা পরিবেশন করেন।

খেতে খেতে সেদিন হাত গুটিয়ে কল্যাণী কালীকিংকরের পাতের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বলল, তপস্বী আর তপস্বিনীদের শুনেছিলাম সকলের ওপর সম-দৃষ্টি।

মেসোমশাইয়ের অর্থাৎ মোহিনী ভট্চাযের স্বাভাবিক প্রশ্ন।—কেন, কি হলো?

একটা আঙুল তুলে কালীকিংকরের পাত দেখিয়ে দিল।—ভালো ভালো মাংসের পীসগুলো সব ওই পাতে—তুমি আমি হাড় চিবুচ্ছি।

ভট্চায্‌মশাই হেসে উঠলেন। কালীকিংকরের খাওয়া আপনি থেমে গেল। বকুনির সুরে ভৈরবী-মা বললেন, খাওয়ার সময়েও তুই পিছনে লাগতে ছাড়বি না—বেচারার খাওয়া থামিয়ে দিলি।

—আ-হা, বেচারা...ভালো করে খান।

কথা-বার্তা শুনে আর হাব-ভাব দেখে কে বলবে এই মেয়ে তাঁর থেকে বয়সে ন'বছরের ছোট। কালীকিংকর এতটা হজম করতে রাজি নন। গম্ভীর মুখে ভৈরবী মা-কে বললেন, মা, আমি যদি একবারটি আসন ছেড়ে উঠি আবার বসতে পাব তো?

না বুঝে ভৈরবী-মা জিগ্যেস করলেন, কেন?

—আপনি সত্যি ভুল করেছেন দেখছি, ওর পাতে বেশির ভাগই হাড় পড়েছে, হাত ধুয়ে এসে আমি নিজে একটু মাংস বেছে দিই, বাচ্চা মেয়ের নজর লাগলে নিজে তাকে কিছু দিতে হয় শুনেছি।

—কোথায় শুনেছেন? আর এখানে বাচ্চা মেয়ে কে? কল্যাণীর সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ।—নজর কে কার দিকে দেয় আমি জানি না?

মোহিনী ভট্চায্‌ খাচ্ছেন আর মিটিমিটি হাসছেন। শেষের কথা শুনে ভৈরবী মা-ও হেসে ফেললেন।—বিতণ্ডা থামিয়ে যে-যার খেয়ে ওঠ্‌ তো এখন। কালীকিংকরের দিকে চেয়ে বললেন, ও হাড় বেশি পছন্দ করে তাই ওর পাতে হাড় বেশি।

কল্যাণীও হেসে ফেলল। তার ।রেই গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, ও শিবঠাকুর, শুনছ? জেগে আছ না ঘুমোচ্ছ?

ঘরের ভিতর থেকে গম্ভীর জবাব এলো, ...গে আছি। ও-ছোঁড়ার পাখা গজিয়েছে, হাড় চিবুতে হলে আগে পাখ্‌না ছেঁটে দিতে হবে।

সময়ে কল্যাণীর পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। কালীকিংকর শুনলেন ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। কিন্তু আর নাকি পড়ার ইচ্ছে নেই। মেসোব ইচ্ছে এবারে কলেজে পড়ুক। সেই ইচ্ছে কল্যাণী ভৈরব-বাবাকে দিয়ে বরবাদ করিয়েছে। তাঁর কথার ওপর কার কথা? কিন্তু কালীকিংকরের এটা পছন্দ হয়নি। দুপুরে ভৈরবী... য়র সঙ্গে বসে ওষুধ বানাচ্ছিলেন। দু'হাত ফারাকে বসে কল্যাণীও কি ঝাড়-বাছ করছিল। নিজের কাজের দিকে চোখ রেখেই কালীকিংকর বললেন, ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে আর না পড়ার কোনো মানে হয়

না—আপনাদের জোর করা উচিত ছিল।

মন্তব্য ভৈরবী-মায়ের উদ্দেশে। কিন্তু ফোঁস যার করার সে করেই উঠল।

—আমাকে বিদ্যেধরী বানিয়ে আপনার কি সুবিধে হবে?

—আমার আর কি সুবিধে হবে, তোমার নিজেরই সুবিধে হবে।

—কি সুবিধে, চাকরি করতে বেরুবো?

—না বেরুলেও বেরুনোর যোগ্যতা থাকা ভালো। না পড়ে কি করবে?

—এম-এ পড়তে পড়তে আপনি পড়া ছাড়লেন কেন? আপনিই বা না পড়ে কি করছেন?

রাগ না করে কালীকিংকর বুদ্ধিমানের মতো হাসলেন।—নিজেকে আমি মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, কি করছি না করছি মা জানেন।

—নিজেকে আমি বাবার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, কি করছি না করছি বাবা জানেন।

মায়ের হাত চলছে, কিন্তু নিঃশব্দে হাসছেন। কালীকিংকর টিপ্পনীর সুরে বললেন, তুমিও তাহলে আমার মতোই ভেরেণ্ডা ভাজবে।

—আপনার মতো কেন, আমি তো কোনো মেয়ের আঁচলের তলায় বসে নেই—বাবার কাছে ক্রিয়া-কলাপ শিখে হাড় চিবুনোর বিদ্যেটাই ভালো করে রপ্ত করব!

কালীকিংকর অনেক দিন নিজেকে সমঝেছেন, এমন কি নিজের ওপর চাবুক চালিয়েছেন। এই মেয়েকে সকলেরই ভালো লাগে। যাঁদের সঙ্গে আসে তাঁদের ভালো লাগে। যাদের জন্য আসে অর্থাৎ রোগীদেরও ভালো লাগে। ভৈরবী-মায়ের ভালো লাগে। আর ভৈরব-বাবার তো চোখের মণি। ওপরওয়ালার কারিগরি বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে ভালো লাগার মতো মেয়ে করেই তাকে পাঠানো হয়েছে। কালীকিংকরেরও শুধু ভালো লাগলে সেটা দোষের ভাবতেন না। কিন্তু ভালো লাগা এক আর সমস্ত চিত্ত সংগোপনে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা আর এক। নিজের কাছে এই আকর্ষণ যত স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কালীকিংকরের ততো অস্বস্তি। কল্যাণী মঙ্গলবারে তো আসেই, আর মাঝের একদিন বলতে শনিবারেই বেশি আসে। কালীকিংকরের মনে হয় সপ্তাহের এই দুটো দিনই যেন বড় বেশি দেরিতে আসে। আর দিন দুটো ফুরোয়ও বেশি তাড়াতাড়ি। কিন্তু কোনো শনিবারে না এলে মনে হয় এমন বর্ণশূন্য দিন জীবনে আর যেন কখনও আসেনি। ভট্চায্ মশাইকে জিগ্যেসও করতে পারেন না কেন এলো না। তখন ভৈরবী-মায়ের ওপরই রাগ হয়, কেন উতলা হন না, কেন জিগ্যেস করেন না এলো না কেন।

—এলো না তাতে তোর কি? তোর কি? তোর কি? নিজের ভিতর থেকেই এই গর্জন শুনতে পান কালীকিংকর। আক্রোশে নিজেকেই ফালা ফালা করে দিতে চান।—তোর কি আশা? তোর কেন এত দুরাশা?...তুই না খোঁজার জগতের পথ পাড়ি দিতে চেয়েছিলি? এই পথের কেউ দোসর হতে পারে? তোর এই খোঁজার জগতে এখন কে ঘুর ঘুর করছে? শেষে কিনা একটা মেয়ে? তার থেকে তুই মরে যা! মরে যা, মরে যা, মরে যা!

ক্ষিপ্ত হয়েই নিজেকে শাসন করতে চেষ্টা করেন। তখন তাঁর হাব-ভাব-আচরণ দেখে ভৈরবী-মাও এক-এক সময় চুপচাপ চেয়ে থাকেন।

একটা দুটো করে একে একে চারটে বছর কেটে গেল। তাঁর বয়েস ঊনত্রিশ। কল্যাণীর কুড়ি। ভৈরবী-মা একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, বাবা নাকি কুড়িতে বিয়ে দিতে বলেছিলেন ওই মেয়ের।...সেই কুড়ি। কালীকিংকর এমন নির্ভুল হিসেব রাখতে গেছেন কেন? কল্যাণীর কুড়ি বছর বয়সটা একটা যন্ত্রণার মতো এগিয়ে আসছে তো আসছেই। তবু হিসেব ভুলতে পারেন না কেন? এই মেয়ে এখন আরো নিটোল আরো স্থির-যৌবনা। চাল-চলন স্বভাবের অস্থিরতা আগের থেকে কমেছে মনে হয়। কমেছে কারণ, সে যেন তার কদর জানে। জানে দুনিয়া তার বশ।...খুব মিথ্যে জানে কি? এই মেয়েকে দেখিয়ে মোহিনী ভট্‌চায্‌ যার দিকে আঙুল নাড়বেন সে-ই বর্তে যাবে, পরম সমাদরে নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে।

কিন্তু সংগোপনে এ কি যন্ত্রণা পুষছেন কালীকিংকর? বাসনার কোন্ অতলে নিঃশব্দে ডুবতে চলেছেন তিনি? একটি মেয়ের এমন ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে আছেন তিনি? এই মৃত্যু থেকে তাঁর যে সত্যিকারের মৃত্যু ভালো ছিল।

আর না। এবারে তিনি এই মৃত্যুর গহ্বর থেকে নিজেকে টেনে তুলবেন। তুলবেনই। বুদ্ধিনাশের এই জালে নিজেকে আর জড়াবেন না। ভৈরবী-মায়ের সঙ্গে কাজে বসে সেই দুপুরেই প্রস্তাব পেশ করলেন।—মা, চার বছর আপনার আশ্রয়ে কাটিয়ে দিলাম, এবার কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে...

ভৈরবী-মায়ের হাতের কাজ থেমে গেল। তিনি চেয়ে রইলেন।—শিক্ষা-দীক্ষা সব শেষ হয়েছে ভাবছিস্?

—শুরু হয়েছে কিনা তাই জানি না মা, আপনার কাছে থেকে লোকের উপকার করার শিক্ষা কিছু পেয়েছি হয়তো—কিন্তু ভিতর থেকে এক পা-ও এগোইনি...।

—পা বাড়ালেই ভেতর থেকে এগুনো হবে?

—আপনি আশীর্বাদ করলে হবে।

—কাপুরুষকে আশীর্বাদ করব কি করে? অনেক দিন ধরেই তোকে অন্যরকম দেখছি...পালানোর পথ কি কোনো পথ? কোথা থেকে কোথায় পালাতে চাস তুই?

ভৈরবী-মায়ের মুখে এ কি কথা! তিনি কি তাঁর ভিতরের কাটা-ছেঁড়া সব দেখতে পাচ্ছেন? তাঁকে বাসনার সমুদ্রে ডুবতে দেখছেন?

একটু চুপ করে থেকে আদেশের সুরে ভৈরবী-মা বললেন, অঘ্রাণ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

...এটা ভাদ্রের শেষ। মাঝে আশ্বিন কার্তিক। অঘ্রাণে কল্যাণীর বিয়ে তাহলে।... ভৈরবী-মা তাঁর ভিতর দেখেছেন। তাই এই অমোঘ আদেশ। দাঁড়িয়ে থেকে কল্যাণীর বিয়ে দেখে এই ক্রীতদাসত্বের মায়া থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে।

...তাই হোক। তিনি বলেছেন সব ঠিক হয়ে যাবে, এ-টুকুই সান্ত্বনা।

বিয়ে জানে বলেই হয়তো কল্যাণী শনিবারে আসা ছেড়েছে। সাহায্যের দরকার হয় তাই শুধু মঙ্গলবারে ওষুধ দেবার দিনে আসে।...সে কংকালমালী ভৈরবের বড় আদরের শিষ্যা।...বাবার কৃপায় তারও কি ভিতর দেখার চোখ হয়েছে? নইলে মুখের দিকে ভালো করে না তাকিয়েও

মনে হয় কেন, রমণীর চোখে মুখে কৌতুক উপচে উঠছে। কালীকিংকর পারতপক্ষে তার দিকে তাকান না। কথা তো বলেনই না। তবু রোগী দেখা ওষুধ দেওয়ার পর্ব শেষ হতে কৌতুকে ডগমগ মুখের দিকে কালীকিংকরের চোখ পড়েই।

—তোমাদের অবধূতের কি এখন বাক্-সংযমের ব্রত চলেছে নাকি গো মা?

কোনোদিকে না তাকিয়ে কালীকিংকর দাওয়া থেকে নেমে চলে এসেছেন।

নিজের হাত থাকলে অগ্রহায়ণ মাসটাকে কালীকিংকর টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে নিয়ে আসতেন। তাড়াতাড়ি আসুক। তাড়াতাড়ি চলে যাক। মা বলেছেন, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

...সেই দিনটা জন্মাষ্টমী, কালীকিংকরের খেয়াল থাকার কথা নয়। ছিলও না। জিপ থামতে দেখল মোহিনী ভট্‌চাযের সঙ্গে কল্যাণী নামছে। ভট্‌চাযের হাতে দুটো মিষ্টির হাঁড়ি। আর কল্যাণীর হাতে বড়সড় একটা ফুলের ডালা। ফুল ছাড়া তাতে একটা চূড়ার মতো দেখা যাচ্ছে—সঙ্গে আরো কি।

ঘরের সামনে এসে গলা চড়ালো। শিবঠাকুর ঠিক-ঠাক আছ? আসব?

আয়, তুই হঠাৎ কোন্ টানে?

ভিতরে ঢুকল। বাইরে দাঁড়িয়ে কালীকিংকর জবাব শুনলেন।—আজ জন্মাষ্টমী, ইচ্ছে হলো তোমাকে একটু সাজাবো—তাই।

হা-হা হাসি। জন্মাষ্টমীতে তুই ভৈরবকে সাজাবি! এই মতি হলো তোর। ...ফুলের সঙ্গে এ-সব কি—মুকুট, চূড়া, বাঁশী!

—আমার হাতে পড়ে তুমি আজ মুরলীধর হবে।

—আর রাধিকা?

—আমি ছাড়া কে আবার তোমার রাধিকা হতে যাবে! যেমন কপাল।

—ঠিক আছে, সাজা। তারপর তোকে আমার কোলে বসে আমার সঙ্গে বাঁশি ধরতে হবে—যা ডবকাখানা হয়েছিস—রাধিকাও এমন ছিল না।

মোটা গলা আর সুরেলা গলার সরব হাসি। কালীকিংকরের দাওয়া থেকে নেমে দূরেকোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। তাঁর বিষাক্ত মনে এমন সহজ রসিকতারও বিষ-ক্রিয়া। কিন্তু পা দুটো মেঝের সঙ্গে আটকে আছে।

দাওয়ার ও-মাথায় দাঁড়িয়ে ভৈরবী-মা নিচু গলায় ভট্‌চায্ মশাইয়ের সঙ্গে কি কথা বলছেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ভৈরব-বাবার হাঁক শুনে কালীকিংকর সচকিত।—অবধূত! এই শালা ভূত—

ত্রস্তে ঘরে এসে দাঁড়ালেন। বাবাকে ফুল-সাজে সাজানো হয়েছে। ফুলের মালা, ফুলের বালা, ফুলের বাজুবন্ধ। মাথায় শিখি-চূড়া। হাতে বাঁশী।

—দ্যাখ্ ভালো করে দ্যাখ্—রাধিকা বলল, হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাবে—ডেকে দেখাও।...ঠিক বলেছে, জ্বলছিস—হা-হা-হা—এই শালা! আমার দিকে না তাকিয়ে তুই আমার রাধিকার রূপ গিলছিস? চোখ দুটো গেলে দেব না তোর। দূর হ, দূর হ!

কালীকিংকর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সকলেই কি পরীক্ষার জালে কষে বাঁধছে

তাঁকে? তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হবে—হতেই তো হবে! দাওয়া থেকে নেমে এলেন। লক্ষ্যহারার মতো শ্মশানের ভিতরের দিকে এগিয়ে চললেন। এটা ভাদ্রর শেষ।... অগ্রহায়ণের যে আরো অনেক দেরি!

সেই অঘ্রাণ মাস এলো। কালীকিংকর আরো স্থির আরো সংযত। বিয়ের দিন কবে জানা নেই। জানার আগ্রহও নেই। যে দিনেই হোক, তিনি গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু ভৈরবী-মা হঠাৎই এক বে-খাপ্পা আদেশ করে বসলেন। বললেন, আজ বিকেলের দিকে ভট্চায্ বাবার জিপ্ এসে তোকে নিয়ে যাবে—তোর সঙ্গে কথা আছে, তৈরি থাকিস।

তাঁর সঙ্গে ভট্চায্ মশাইয়ের কি কথা থাকতে পারে কালীকিংকর ভেবে পেলেন না। হয়তো লোক-বল কম, সাহায্য দরকার।

জিপ এলো। তিনি উঠলেন। ফেরার সময়েও জিপ পাবেন আশা করা যায়। নইলে রামপুরহাট থেকে বাসে ফেরা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। না, কালীকিংকরের মনে এখন কোনো দুশ্চিন্তার ঠাঁই নেই।

ড্রাইভার বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে জিপ নিয়ে চলে গেল। কড়া নাড়তে দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণী।

খুব অমায়িক গলা করে বলল, অবধূতজীর আসতে পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?

—না।...এ-মাসেই তোমার বিয়ে শুনলাম...কংগ্র্যাচুলেশন্স।

—শুনলেন! চাউনি বিস্ফারিত প্রায়।—এ-মাসেই আমার বিয়ে আপনি শুনলেন?

চাপা হাসিতে ঝকমক করছে সমস্ত মুখ। কালীকিংকর হঠাৎ জবাব দিতে পারলেন না।

—ঠিক শুনেছেন—থ্যাংক্ ইউ। ও মেসোমশাই ইচ্ছে করে আসতে দেরি করছ কেন—?

দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। হঠাৎ এমন মজার ব্যাপারটা কি হলো কালীকিংকর বুঝলেন না। মোহিনী ভট্চায্ এসে পরম আদরের অতিথির মতোই ব্যবহার করলেন তাঁর সঙ্গে। জলখাবারের আয়োজন ভোজের আয়োজনের মতোই। জিপ পাঠিয়ে হঠাৎ বাড়িতে ডেকে আনা হলো কেন কালীকিংকর তার কোনো হদিস পেলেন না। আপ্যায়নের পর ভট্চায্-গৃহিণী উঠে যেতে আর ধৈর্য থাকল না।—মা বলছিলেন, কি দরকারি কথা আছে...

—হ্যাঁ, এইবার বলি। আজ পাঁচ তারিখ। সামনের চৌদ্দ তারিখে বিয়ের দিন ঠিক করলাম, অবশ্য ভৈরব-বাবাকে একবার জিগ্যেস করে নিতে হবে। ...মা বলছিলেন, কল্যাণীর ব্যাপারটা তোমাকে খোলাখুলি সব জানাতে, জানাবার ভারও তিনি আমাকেই দিয়েছেন, তাই তোমাকে ডেকে আনা।

কালীকিংকর বিমূঢ় হঠাৎ।—কল্যাণীর ব্যাপার আমাকে জানাতে বলেছেন...। আমাকে কেন? মোহিনী ভট্চায্ মিটিমিটি হাসছেন।—বিয়েটা হতে যাচ্ছে তোমার সঙ্গে, আর জানাতে যাব অন্য লোককে ডেকে এনে?

দীর্ঘ চার বছর ধরে বিশাল একটা অনুভূতির বন্যাকে বুঝি কাঁচা মাটির বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার জন্য যুঝছিলেন কালীকিংকর অবধূত। কটা মাত্র কথায় সেই বাঁধ হুড়মুড় করে ভেঙে

পড়ল। সেই তোড়ে নিজেরই হাবু-ডুবু দশা।

মনের সেই অবস্থাতেই মোহিনী ভট্চায্ যা বলে গেলেন, তিনি বোবার মতো বসে শুনলেন।

...কল্যাণীর বাবার নাম পরমেশ চক্রবর্তী, মায়ের নাম মহামায়া। মহামায়াই এখন কংকালমালী ভৈরবের ডেরার ভৈরবী-মা। কল্যাণী তাঁর একমাত্র সন্তান। রামপুরহাটেই পরমেশ চক্রবর্তীর বাপের মস্ত অবস্থা ছিল। জমিজমা আর প্রাসাদের মতো বাড়ি ছিল। কলকাতায় বাড়ি ছিল। অল্প বয়সে অগাধ বিত্তের অধিকারী হয়ে পরমেশের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আগেও তাঁর স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না। তাঁর চরিত্র শোধরানোর জন্য বাপ-মা অনেক বাছাই করে রূপসী মেয়ে মহামায়াকে ঘরে এনেছিলেন। তাঁকে পেয়ে পরমেশ বিকৃতির পথে আরো বেশি এগিয়েছেন। তাঁর ভোগের লালসা অত্যাচার ব্যভিচার বেড়েই চলেছিল। কিন্তু মহামায়ার ভিতরেও আগুন কম ছিল না। শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পরেই একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তিনি কলকাতার বাড়িতে চলে এসেছেন। এমন বাপের চোখের সামনে তিনি মেয়েকে রাখতে রাজি নন।

...নিজের এই চরিত্র পরমেশের। তার ওপর সন্দেহ রোগ। রামপুরহাটে থাকতে স্ত্রীকে ঘর-বন্দী রেখেছিলেন। চাকর-বাকরকে পর্যন্ত অন্দরমহলে ঢুকতে দিতেন না। স্ত্রীর এমন বিদ্রোহ তিনি বরদাস্ত করেন কি করে? রামপুরহাট থেকে কলকাতা আর কত দূরে। মাতাল হয়ে আসতেন, অত্যাচার আর উৎপীড়নও দিনে দিনে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহের কীট তাঁর মাথায় প্রথম ঢোকে রামপুরহাটে প্রায় সমবয়সী নিজের খুড়তুতো ভাইকে নিয়ে। এই দেওরটিকে মহামায়া পছন্দ করতেন। সেই দেওরও তখন কলকাতাবাসী। নিজে সেধে এসে মহামায়ার দেখাশুনোর দায়িত্ব নিয়েছেন। এমন দরদের একটাই অর্থ জানেন পরমেশ চক্রবর্তী। আর নিজের স্ত্রীর কলকাতায় এসে থাকার কারণও তাঁর কাছে জলের মতো স্পষ্ট।

...ক্রমে তাঁর দিকে চেয়ে নিজের মৃত্যুর ছায়া আর সর্বনাশের ছায়া দেখতে লাগলেন মহামায়া। মানুষটা সেই যে কলকাতায় এসে বসেছেন, আর নড়েন না। বাড়িতে যাদের নিয়ে ভোগের আসর বসে, অন্তঃপুরের দিকে তাদের হাঙরের দৃষ্টি। বিদ্রোহের আগুন নিয়ে আবার স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। পরমেশের চোখে মুখে ক্রূর বিকৃত হাসি। বলেছেন, ভয় করছে? স্বামীকে বাতিল করে কেবল একজনের আনন্দের খোরাক যোগাচ্ছ ...সেই একের জায়গায় পাঁচ জন হলে অত ভয়ের কি আছে? ওই অ্যালসেসিয়ানগুলোকে এবার একদিনে ছেড়ে দেব ভাবছি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বেচারারা পাগল-পাগল করছে।

মহামায়ার মনে হলো সেই রকমই কিছু করতে পারে। রমণীর দেহ ছিঁড়ে খেতে দেখার উল্লাস দু'চোখ দিয়ে যেন গলগল করে উপচে উঠছে।...আর শেষে এই লোকের হাতে তাঁর মৃত্যু অবধারিত।

পরদিন মেয়েকে আয়ার সঙ্গে স্কুলে পাঠালেন না। তাকে প্রস্তুত করে নিজে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলেন। পরমেশ জিগ্যেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

মহামায়া জবাব দিলেন, হেডমিসট্রেস দেখা করতে বলেছেন, মেয়ের সম্পর্কে কিছু

বলবেন হয়তো...।

স্ত্রীর শান্ত মেজাজ দেখে পরমেশ হাসলেন। সেই বিকৃত হাসি।—ফেরার সময় একবার শিবুর সঙ্গে দেখা করে আসবে না—কবে আবার সুযোগ হয় ঠিক কি...।

শিবু সেই খুড়তুতো দেওর। সন্দেহের কীট-দংশনে এখন সমস্ত মস্তিষ্ক ঝাঁঝরা। মহামায়া মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। পরমেশের চোখে এটা নতুন কিছু নয়। মেয়েকে নিয়ে অনেক দিনই তাঁকে স্কুলে যেতে দেখেছেন।

...মহামায়া নিজেও আর ফেরেননি। মেয়েও না।

কবে কিভাবে বক্রেশ্বর শ্মশানের কংকালমালী ভৈরব বাবার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ মোহিনী ভট্‌চায্‌ জানেন না। বাবার তলব পেয়ে একদিন ছুটে গিয়ে দেখেন, ঘরে একটি মহিলা আর সাত আট বছরের মেয়ে বসে। মেয়েটিকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বাবা হুকুম করলেন, এই মেয়ে তোমার কাছে গচ্ছিত থাকল, নিজের ছেলে মেয়ের থেকেও বেশি যত্নে একে প্রতিপালন করবে। কেউ জিগ্যেস করলে আত্মীয় পরিচয় দেবে।

মেয়েটিকে নয়, ওই মহিলাকে কি মোহিনী ভট্‌চায্‌ কখনো কোথাও দেখেছেন? ঠাওর করতে পারলেন না। এরকম এক তাজ্জব দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হলো বলেই আরো অবাক। করজোড়ে জিগ্যেস করলেন, ইনি কে বাবা?

সঙ্গে সঙ্গে হুংকার।—তোর তা দিয়ে কি দরকার রে শালা! আমার ভৈরবী—কেন, চোখে ধরেছে?

কল্যাণীকে নিয়ে মোহিনী ভট্‌চায্‌ প্রস্থান করে বেঁচেছেন।

রামপুরহাটে ভৈরবীকে নিয়ে একটা চাপা কানাঘুষো একটু একটু করে বেড়েছে। বছর ঘুরতে কিছু কানে গেছে পরমেশ চক্রবর্তীরও। তিনি এই শ্মশানে এসেছেন, দূর থেকে স্ব-চক্ষে ভৈরবীকে দেখেছেন।...হ্যাঁ, তখন তো তাঁর ভৈরবীরই বেশ।...দিনকতকের মধ্যে রামপুরহাটের বাড়িতে সাতটি নতুন মুখ দেখা গেছে।

...রাতে মদের নেশায় পরমেশ চক্রবর্তীর নীরব সংকল্প নিজেদের অগোচরেই হয়তো কিছুটা সরব হয়েছিল। একে পুলিশের চাকরি মোহিনী ভট্‌চাযের তায় কংকালমালী ভৈরবের এমন ভক্ত—তাঁরও কানে আসা খুবই স্বাভাবিক।...বাবার থানে বড় রকমের কিছু হামলা ঘটতে যাচ্ছে, রক্তাক্ত কাণ্ড কিছু হতে যাচ্ছে।

জিপ ছুটিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ভৈরব বাবার কাছে এসেছেন তিনি। পুলিশের বড় চাকরিতে বহাল, বাবার হুকুম হলে সক্কলকে অ্যারেস্ট করে থানায় পুরতে অসুবিধে নেই।

ভৈরব বাবা নির্বিকার।—কিচ্ছু করতে হবে না, সময় হয়েছে, শালা নিজেই মরবে।

তবু সকলের অজান্তে বাড়িটাকে বেশ কড়া প্রহরায় রেখেছিলেন মোহিনী ভট্‌চায্‌।

ঠিক তিন দিন পরের যা সমাচার, পুলিশের চোখে ঘটনার দিকে থেকে তা অভিনব কিছু নয়। তবু কণ্টকিত শুধু মোহিনী ভট্‌চায্‌। বাবার নিরুদ্বেগ ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়েছে।

...সকালে রক্তাক্ত মৃত অবস্থায় পরমেশ চক্রবর্তীকে তাঁর শোবার ঘরে পাওয়া গেছে। ঘরের সিন্দুক হাঁ-করা খোলা। সাতজন নতুন মুখের মধ্যে দু'জন উধাও। পুলিশের জেরায় বাকি

পাঁচজন কবুল করেছে, আগের দিন সকালে পরমেশ চক্রবর্তী সাত জনকে দেবার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে একুশ হাজার টাকা তুলে ওই সিন্দুকে রেখেছিলেন। লোক দুটোর সঙ্গে সেই টাকাও উধাও।

...পরের এই তেরো বছরের সমাচার সংক্ষিপ্ত। নিজের মেয়ের মতোই কল্যাণীকে বড় করেছেন মোহিনী ভট্চায্। অবশ্য বাবার কৃপাই এই মেয়ের সব থেকে বড় সম্পদ। বাবার নির্দেশে পরমেশ চক্রবর্তীর রামপুরহাটের বাড়ি-ঘর, জমি-জমা আর কলকাতার বাড়ি বেচে নগদ টাকা সব কল্যাণীর নামে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। সুদে আসলে সে টাকা ছ'লক্ষর ওপর দাঁড়িয়েছে। সে সাবালিকা হতে সব এখন তার হেপাজতে।

সেই দিনে ওই টাকার অঙ্ক শুনে কালীকিংকরের মাথাটা ঝিম-ঝিম করে উঠেছিল। ভট্চায্ মশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিপে ওঠার পরেও ভেবেছিল, বাবার ডেরায় ফিরে না গিয়ে একেবারে সটকান দেবে কিনা। ছ'লাখ টাকার ওশরে মালিক—বাপরে বাপ! রূপের ডালি এত বড়লোক মেয়ের জন্য এঁরা তাঁকে বাছাই করে নিলেন কেন কালীকিংকর ভেবে পেলেন না।...কিন্তু পালানোর চিন্তা বেশিক্ষণ মাথায় ঠাঁই পেল না। আজ চার বছর ধরে যে-মেয়ে তাঁর মন জুড়ে বসে আছে, সেই মনের সঙ্গে ওই মেয়ের কোনো টাকার যোগ ছিল না। ওই মেয়েকেই কেবল তাঁর মস্ত ঐশ্বর্য বলে মনে হয়েছিল। টাকার লোভের ছিটেফোঁটাও ছিল না, এখনো নেই।...এ-মাসেই বিয়ে বলে অভিনন্দন জানানোর জবাবে কল্যাণীর সেই মুখ, সেই বিস্ফারিত চাউনি, আর সেই কথাগুলো চোখ কান জুড়ে বসল। বলেছিল, শুনলেন! এ-মাসেই আমার বিয়ে, আপনি শুনলেন।

...তার মানে কার সঙ্গে বিয়ে এ কেবল অবধূতই জানতেন না। আর সকলেরই জানা ছিল।

বিয়ে হয়ে গেল। ভট্চায্ মশাইয়ের বাড়িতেই হিন্দু মতে বিয়ে। আবার সেই বাড়িতেই বউ-ভাত, ফুলশয্যা। এ-বিয়েতে তেমন আড়ম্বর বা জাঁকজমক কিছুই হলো না।

ফুলশয্যার রাতে কল্যাণীকে নিরিবিলিতে পাওয়ার পরেও নিজের এই ভাগ্য কালীকিংকর যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তখনো ভাবছেন এমন ঘটনার বুনোট সম্ভব হলো কি করে? কে ঘটালো?

বলেই ফেললেন, ব্যাপারখানা কি রকম হলো?

নব-বধূর মুখের হাসিতে চাউনিতে বা কথায় লজ্জাটজ্জার লেশমাত্র নেই। —কেন, এ-রকমই হবে তুমি জানতে না?

—আমি একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে, শ্মশানে ভৈরবী মায়ের কাছে পড়ে থাকি—আমার জন্য রাজত্বসুদ্ধ রাজকন্যা সেজে বসে আছে কি করে জানব।...তুমি জানতে?

—চার বছর আগে প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম সে-দিনই জানতাম।

—কি করে—কি করে? কালীকিংকর ব্যগ্র উন্মুখ।

—সে-দিনই দই-মিষ্টির হাঁড়ি হাতে তোমাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিবঠাকুর হুংকার ছাড়লেন মনে নেই? বললেন, তুমি তাঁর বুক ঝাঁঝরা করে দেবার মতলবেই

এখানে এসে জুটেছে—আমি তক্ষুণি বুঝে নিয়েছি, ব্যাপারখানা এই দাঁড়াবে।...এর অনেক পরে অবশ্য শুনেছি, মায়ের সঙ্গে তোমার প্রথম সকালের ইন্টারভিউতে তুমি ফার্স্ট-ক্লাস নম্বর পেয়ে গেছলে।

—কিন্তু আমার তো তুমি কিছুই জানতে না—মায়ের মতলব বুঝে তুমি খুব ধাক্কা খাওনি?

—কি বুদ্ধি তোমার—বললাম না, প্রথম দিন শিবঠাকুরের ওই কথা শুনেই যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি! মায়ের মনে যা-ই থাক, তাঁর ভৈরব-বাবার মত না হলে কারো এক পা এগোবার সাধ্য ছিল নাকি?...আর তিনি মত দিলে আমি ধাক্কা খেতে যাব কেন—আমার ভালোমন্দ তাঁর থেকে বেশি কে জানে—কে বোঝে?

পরদিন সকালে জিপে করে দু'জনে এলেন কংকালমালী ভৈরব আর ভৈরবী-মা-কে প্রণাম করতে। ভট্চায্ মশাই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও সেখানেই করেছেন।...বউ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ভৈরব বাবার বজ্র হুংকার।—শালা বেইমান! শালা নেমকহারাম! তো বেটীকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম না, এ-শালা আমার বুক ঝাঁঝরা করে দেবার মতলবেই এখানে এসেছে!

তাঁর পায়ের কাছে কল্যাণী জানু-আসনে বসল। আঁচলের গ্রন্থিতে টান পড়তে কালীকিংকর পিছনে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা যতটা সম্ভব বেজার করে কল্যাণী ভৈরব-বাবার দিকে তাকালো।...বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেব?

—তাতে আর কতটুকু জুড়োবে—তুইও এমন নেমকহারাম—অ্যাঁ? আমাকে ছেড়ে ওই শালাতে মজে গেলি?

—অবলাকে তুমি রক্ষা করলে না, কি করব...?

আস্তে আস্তে তাঁর দু'পায়ের ওপর মাথা রাখল। পায়ের ওপর নিজের কপাল মুখ আর দু'গাল বুলোতে লাগল। এই প্রণাম দেখে কালীকিংকরের বুকের তলায় অদ্ভুত এক আবেগের ঢেউ। কংকালমালী ভৈরব হাসছেন মিটিমিটি। জটাজুট চুল-দাড়ি বোঝাই রুক্ষ মূর্তি ভৈরব বাবার এমন কোমল মুখ কালীকিংকর আর দেখেননি।

প্রণাম করে উঠতে ভৈরবী মায়ের দিকে বাবা হাত বাড়ালেন। সিঁদুরের পাত্র হাতে তিনি প্রস্তুত। বাবা মোটা মোটা তিনটে আঙুল সিঁদুরে ডুবিয়ে কল্যাণীর কপালে আর মাথায় লেপে দিলেন। সে উঠে সরে বসতে কালীকিংকব হাঁটু মুড়ে বসে বাবার পায়ে মাথা রাখলেন। দশ সেকেণ্ড না যেতে বাবা দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন, খুব ভক্তি দেখিয়েছিস শালা—এবারে ওঠ্!

উঠতে বাবা তাঁর কপালে সিঁদুর দিয়ে একটা ত্রিশূল মতো কিছু এঁকে দিলেন মনে হলো। পরে আয়নায় দেখেছেন ত্রিশূলই। ভৈরব কটমট করে খানিক সোজা তাঁর দিকে চেয়ে থেকে কল্যাণীর দিকে ফিরলেন।—এ শালা তোকে খুব ভোগাতে আর জ্বালাতে চেষ্টা করবে—তুই কিছু পরোয়া করিস না, যত চেষ্টা করবে শালা নিজে ততো ভুগবে আর জ্বলবে!

কল্যাণী আলতো করে বলল, জ্বালাতে আর ভোগাতে চেষ্টা যাতে না করে তুমি তাই করে দাও—দু'জনেরই বাঁচোয়া।

ভৈরব-বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন, আমি কি ঈশ্বর যে যা বলবি তাই করে দেব—ও-শালার

খেলা না খেলে কারো পার আছে? ঝামেলায় পড়লে ওই শালাকেই ডাকবি—দেখবি এই শালারও নাকে আপনা থেকেই দড়ি পড়ে গেছে।

ও-শালা মানে ঈশ্বর, আর এ-শালা মানে কালীকিংকর।

বিয়ের দশদিন যেতেই ভৈরবী-মা জামাইকে তাড়া দিতে শুরু করলেন, আর বসে থাকিস না—দেখে-শুনে একটু জমি কিনে দু'খানা ঘর তুলে নে—ভট্‌চায্ মশাইয়ের ওখানে আর কতদিন পড়ে থাকবি?

—কিন্তু ভট্‌চায্ মশাই যে ছাড়তে চান না, বলেন হবে'খন, যাক কিছু-দিন।

—তিনি অন্য আশায় বলেন, শিগগীরই নিজের ভুল বুঝবেন।...ভৈরববাবা কোন্নগরে গঙ্গার কাছাকাছি নিরিবিলিতে একটু জমি নিয়ে ঘর তুলতে বলেছেন তোদের।

ভট্‌চায্ মশাইয়ের কি আশা বা কি ভুল আর মাথায় থাকল না কালীকিংকরের। জিগ্যেস করলেন, হুগলীর কোন্নগর? সেখানে কেন?

—জায়গাটা খুব পছন্দ, প্রথম জীবনে ভৈরব-বাবা সেখানকার শ্মশানেই কাজ করেছিলেন। কল্যাণীকে বলতে সে-ও সায় দিল, হ্যাঁ, শিবঠাকুর মুখ ফুটে বলেছেন যখন, সেখানেই জমি দ্যাখো।

—কিন্তু এত তাড়ার কি আছে! আচ্ছা, এ-দিকে ভট্‌চায্ মশাই আমাদের ছাড়তে চান না, ও-দিকে মা বলেছেন, উনি অন্য আশায় আছেন, শিগগীরই নিজের ভুল বুঝবেন...কি ব্যাপার বলো তো?

—ব্যাপার আর কি, মেসোমশাই ভাবছেন আমাদের বাড়ি ঘর না হওয়া পর্যন্ত মা আর তাঁর ভৈরব-বাবাকে আটকে রাখা যাবে—কিন্তু তা তো আর যাবে না, ওঁরা খুব শিগগীরই চলে যাবেন।

আকাশ থেকে পড়লেন কালীকিংকরও।—ওঁরা চলে যাবেন মানে—কোথায় যাবেন?

—তা কি করে জানব! তাছাড়া কত জায়গায় যাবেন ঠিক আছে!

—আর ফিরবেন না?

—মনে হয় না। আমার বিয়ের জন্যেই এতদিন এখানে আটকে ছিলেন, এখন যে কোনো দিন দেখব তাঁরা চলে গেলেন।

এ-খবর শুনে কালীকিংকর যত না অবাক, তার থেকে বেশি অবাক কল্যাণীর দিকে চেয়ে। না, ওই মুখে এতটুকু বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই। আর ফিরবেন না জেনেও এমন নির্লিপ্ত থাকতে পারে কি করে? মায়ের প্রতি না হোক, ভৈরব-বাবার প্রতি তার আকর্ষণ তো নিজের চোখেই দেখা। জিগ্যেস না করে পারলেন না, তোমার মন খারাপ হচ্ছে না—কষ্ট হচ্ছে না?

তেমন সাদাসিধে জবাব, মন খারাপের কি আছে, আর কষ্টই বা হবে কেন—সেই দশ বছর বয়সে দীক্ষা নেবার পর থেকে শিবঠাকুর কি এক মুহূর্ত আমার কাছ-ছাড়া নাকি!

সত্যি দিন-কতকের মধ্যে ভৈরবী-মা আর কংকালমালী ভৈরব বক্কোমুনির থান ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন কেউ জানল না।

কল্যাণী তেমনি নির্লিপ্ত, সহজ। বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল কেবল মোহিনী

ভট্চাযের। আর কালীকিংকর অবধূতের। কল্যাণী তাঁর মনের অবস্থা আঁচ করে হেসেই মন্তব্য করল, তোমার সত্যিকারের অবধূত হতে ঢের দেরি।

জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হলো কালীকিংকর অবধূতের। এই অধ্যায়ে তাঁর সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিনী নিজের স্ত্রী কল্যাণী।

কোন্নগরে জমি কেনা হয়েছে। কালীকিংকর আর ভট্চায্ মশাইয়ের তৎপরতায় তিন ঘরের এক-তলা দালান উঠতেও সময় লাগেনি। তিনি আর তাঁর গৃহিণী এসে তাঁদের সংসার পেতে দিয়ে গেছেন।... তারপর দিনে দিনে নিজের স্ত্রীটিকেই আবিষ্কারে ঝোঁক নেশা এমন কি অসহিষ্ণুতাও কালীকিংকরের। তাঁর সহজ নির্লিপ্ততার আবরণ তিনি ভাঙতে চেয়েছেন। এর সবটুকুই একেবারে সহজাত এ তিনি কিছুতেই ভাবতে পারেন না, বা ভাবতে চান না।

এত টাকা যার দখলে তার মন যাচাই করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয় খুব।—এত টাকা তোমার,স্বামীকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখছ, আমি তো তোমার ক্রীতদাস।

দু'চোখে সহজ কৌতুক উপচে উঠতে দেখেছেন।—ক্রীত নয় তবে দাস বলতে পারো।

—কি রকম?

—তুমি তো আমার কাছে আসো নি, শিব-ঠাকুরের ইচ্ছে, বুঝে আমি নিজে সেধে তোমার কাছে গেছি—তাই ক্রীত আর কি করে হবে। আর, শুধু দাস তুমি নিজে হতে পারো যদি সেই রকম ভাবো—এর সঙ্গে টাকার কোনো সম্পর্ক নেই।

—নিজেকে আমি তোমার দাস ভাবি?

—মাঝে মাঝে এই রকমই মনে হয়, বেশি মনে হয় যখন বীরত্ব ফলাতে চেষ্টা করো। আসলে নিজেই তুমি সহজ হতে পারছ না।

নিজেকে জাহির করার তাড়নায় আর সেই সঙ্গে এক অমোঘ আকর্ষণে আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে ডুবতে চেয়েছেন। সেই ভোগ অনেক সময় প্রায় নির্দয় নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে চেয়েছে। কারণ, ভোগের দোসরের তখনো কোনো প্রতিবাদের আভাস মাত্র নেই। সর্বংসহার মতো অচঞ্চল, চোখে কৌতুক, ঠোঁটে হাসি। প্রত্যাখ্যানের অসহিষ্ণুতা নেই। আবার দিনের পর দিন এই ভোগ-পর্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েও দেখেছেন। তখনো কোনো আহ্বান নেই।

...এক এক সময় মনে হতো, সত্যি তিনি এক রমণীর দাস হয়ে পড়েছেন। এই রমণী তাঁর স্নায়ু সত্তা সব গ্রাস করে বসে আছে। বন্ধনের এই শেকল তাঁকে ছিঁড়তে হবে। জীবনটাকে তিনি এই মোহনায় টেনে এনেছেন এমন পরিণতির জন্য নয়। তখনই বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছেন। প্রথমে তিন-চার দিন, তারপর এক সপ্তাহ, তারপর এক দেড় তিন চার মাসের জন্যও উধাও হয়েছেন।...আবার এক বিচিত্র তৃষ্ণা তাঁকে ঘরের দিকে টেনেছে। তৃষ্ণাই শুধু নয়, সেই সঙ্গে একটা শূন্যতাবোধও। প্রতিবারই আশা করেছেন, ফিরে এসে স্ত্রীর দুশ্চিন্তাকাতর ম্লান মুখ দেখবেন। কিন্তু তার বিপরীত। হাসিমুখের টিপ্পনী শুনতে হয়েছে, অবধূতজীর ধৈর্য ফুরোলো? মনের এই অবস্থায় একটা ভাঙচুরের নেশায় পেয়ে বসত কালীকিংকরকে। রক্তমাংসের এই রমণীর দেহই ভেঙে-চুরে রহস্য উন্মোচনের লক্ষ্য। তখনো প্রত্যাখ্যান নেই, বিরক্তি নেই। টানা বিরতির পরে আহ্বানও নেই। শেষে হাল ছেড়ে জিগ্যেস না করে পারেননি, আচ্ছা এতদিন আমি

ছিলাম না—তোমার ভাবনা হয়নি?

দু'চোখে কৌতুক উপচে উঠতে দেখেছেন। জবাবটুকুও তেমনি সরস—ভাবনা না হলে তুমি ফিরে এলে কি করে—ভাবনার টান পড়তেই তো এসে হাজির হলে।

একটু বাদে আবার বলেছে, আচ্ছা, আমার শিবঠাকুরের কাছে চার বছর থেকেও তুমি সহজ হতে পারো না কেন—উনি বলেছিলেন, তুমি আমাকে অনেক ভোগাতে আর জ্বালাতে চেষ্টা করবে, আর ঠিক তাই করতে গিয়ে নিজেই ভুগছ জ্বলছ—সুখে থাকতে তোমাকে এমন ভূতে কিলোয় কেন?

বছরের পর বছর কেটে যায়। কিন্তু কালীকিংকরের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আপনা থেকেই কি করে ভক্ত জুটছে—জোটে—জানেন না। নিজের কাজ অনুশীলন, তন্ময়তা নিয়ে বেশ কিছুদিন হয়তো বিভোর হয়ে রইলেন। তারপরেই ভিতর থেকে আবার একদিন ছোটার তাড়া। পালানোর তাড়া। কেউ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে মনে হলেই বন্ধন ছেঁড়ার তাগিদ। পরে অবশ্য ভেবে দেখেছেন এটা নতুন কিছু নয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর এই স্বভাব। এখন বন্ধনের রকম-ফের হয়েছে শুধু। এখন স্ত্রীই বন্ধন। সোনার শিকল হলেও শিকলই। মনের একটা দিক এই শিকলে বাঁধা পড়ে আছে মনে হলেই বেরিয়ে পড়েন। এই করে দেশের অনেক জায়গায় আবার অনেক বার করে ঘোরা হয়ে গেল। অর্থের জন্য স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। অর্থের যোগানদার আপনা থেকেই এগিয়ে আসে। কিন্তু তখনো তাঁর মনে হয়নি, ঘটনার আসর সাজানো আছে বলেই, আর সেই আসরে কিছু ভূমিকা আছে বলেই তাঁর টান পড়ে। তিনি ঠাঁই-নাড়া হন। কিন্তু নিজে ভাবেন, বন্ধন-দশা ঘোচানোর তাগিদেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।

...শেকল ছিঁড়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বেরিয়ে পড়ার শেষ প্রহসন সাত বছর আগের। তখন নানা দিকে তাঁর অনেক ভক্ত, অনেক কদর। কিন্তু ঘরে স্ত্রী যেমন বন্ধন, এ-সবও যেন তেমনিই বন্ধন। কেবলই মনে হতো সব-কিছু ছেড়ে, সব-কিছু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যদি কেউ-না কিছু-না বা কারো-না গোছের একজন হতে পারতেন, তাহলে নিজেকে পেতেন। কংকালমালী ভৈরব বাবা হয়তো এই পাওয়াই পেয়েছেন, সত্যিকারের সাধন-পথের যাত্রীদেরও হয়তো এই পাওয়াটুকুই লক্ষ্য।

...কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অভিমান বা অভিযোগ না রেখেই সেবারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঘর ছেড়েছিলেন। তিনি কেউ-না হবেন, কিছু-না হবেন, কারো-না হবেন।...বিহারে দ্বারভাঙ্গা জেলার কাকুরঘাটির মহাশ্মশানে এক অজানা অবধূত হিসেবে টানা তিন বছর কাটিয়েছিলেন।...তারপর এক ঘটনার ধাক্কায় আবার ছিটকে বেরিয়ে পড়েছেন। ঘরে ফিরে এসেছেন। মনে হয়, তাঁর চোখ খুলেছে! তখনই মনে হয়েছে সেখানকার সাজানো ঘটনায় তাঁর একটা বড় ভূমিকা ছিল বলেই টান পড়েছিল। তারপর থেকেই তাঁর জিজ্ঞাসা, এমন-সব ঘটনা কেন ঘটে, কে ঘটায়, কে সাজায়?

...এরপর থেকে স্ত্রীকেও আর তিনি শেকল ভাবেন না। বরং শক্তি ভাবতে চেষ্টা করেন। চার বছরের মধ্যে আর ঘর-ছাড়ার টান অনুভব করেননি।

৪

আমার কোন্নগর যাতায়াতের একটা বছর ঘুরে গেল। যে দুটি মানুষকে কেন্দ্র করে এখানে অনেক মুখের মিছিল, তাঁদের একজন মাতাজী, অন্যজন অবধূত। অপরের চোখে যাঁরা গড্-ম্যান বা গড্-মাদার, তাঁদের প্রতি আমার একটা প্রতিকূল মনোভাব ছিল। কারণ নিজের ব্যথার জায়গায় তাদেব কারো আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি কোনো কাজে লাগেনি। উল্টে আমাকে হতাশা আর বিভ্রমের অন্ধকারে ঠেলেছে। কিন্তু এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসার ফলে আমার মনোভাব কিছুটা বদলেছে।...মনে হয়েছে, এই পথের সকলেই নিজেদের গড-ম্যান বা গড্-মাদার ভাবেন না। কালীকিংকর অবধূত আর মাতাজী অন্তত ভাবেন না। অবধূত তাঁর সাধ্যমতো মানুষের বিপদ আপদ নিরসনের পথ খোঁজেন। ব্যাধির হদিস পেলে ওষুধ দেন। অন্য-রকম আপদ বিপদে যাঁর যাঁর স্বভাব চরিত্র তলিয়ে দেখে নিয়ে আর বুঝে নিয়ে তাকে নিজের মনের ঘরে আর বিশ্বাসের ঘরে ফেরাতে চেষ্টা করেন। ফল যারা পায় তারা যদি তাঁকে গড্-ম্যানের আসনে বসিয়ে পুজোই করে—সেটা তাঁর অপরাধ নয়।

...মাতাজীরও তাই। মানুষের মঙ্গল লক্ষ্য। সেই মঙ্গল যদি ভক্তি বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই আসে, তাকে তুচ্ছ ভাবার কারণ নেই। নিজে যে তিনি এমন স্থির শান্ত সুন্দর—জীবনের মহিমার এ-ও তো একটা দিক। এত ধৈর্য এত সহিষ্ণুতা তিনি পেলেন কোথা থেকে? পরিপূর্ণতার মধ্যেও এমন সহজাত নির্লিপ্ততার শ্রী হাজারে একজনের মধ্যে কি দেখা যায়? একান্নোতেও অনায়াসে যিনি একত্রিশের রূপ ধরে রাখেন, তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য মানুষকে টানবে এ বেশি কথা কি?

অবধূত হেসেই একদিন বলেছিলেন, আপনার চোখে পড়েনি বলেই এখনো মান বাঁচছে। লেগে থাকলে দেখবেন ভণ্ড জোচ্চোর ঠকবাজ এইসব ভালো ভালো কথা আমাদেরও শুনতে হয়—আমাদের সব থেকে বড় দোষ আমরা ভগবান নই।

এতটা না হোক, একটা মজার ব্যাপারের সাক্ষী আমি নিজেই। সেদিন কালীপুজো। পথের বাজীর সংকট এড়াতে আমরা বিকেলের মধ্যেই কোন্নগর চলে এসেছি। আমরা বলতে স্ত্রী আর মেয়েও সঙ্গে। আজ রাতে আর ফেরাব প্রশ্ন নেই। কারণ পুজো শেষ হতে মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। আমি এই পুজো-পার্বণের খুব সমঝদার নই। মাতাজীর বিশেষ অনুরোধে আর স্ত্রীর আগ্রহে এসেছি। তাছাড়া অবধূত বলেছেন, আমিও আপনার মতোই দর্শক এ-দিন, পুজো মাতাজীর—আসবেন, আমরা না-হয় গপ্প-সপ্প করব।

এটুকু লোভনীয়।

মাতাজীর পুজোর এক বিশেষ ব্যতিক্রম দেখলাম। পুজো শুরু হবে রাত এগারোটার পরে। আমন্ত্রিতের সংখ্যা কম করে পঞ্চাশজন। পুজোর আগে সকলকেই বেশ করে খাইয়ে দিলেন। খাওয়ার আয়োজন খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পবম উপাদেয়। পোলাও, মাছ-ভাজা, মাংস আর চাটনি। নিরামিষাশীদের পোলাও বেগুন-ভাজা ছানার ডালনা আর চাটনি। মাতাজীর যুক্তিটি সুন্দর। মায়ের পুজো, আর তাঁর ছেলে-মেয়েরা সমস্ত রাত মুখ শুকিয়ে পুজোয় অংশ নেবে—এ কি কোনো মা চাইতে পারেন? তাই সকলকেই আগে খেয়ে নিতে হবে।

অবধূত আমার কানে কানে কিছু বললেন। আমি উঠে গিয়ে একটা কথা আছে বলে মাতাজীকে একদিকে ডেকে নিয়ে বললাম, মায়ের এমন পুজোই সর্বত্র চালু হওয়া উচিত—কিন্তু পুজোর আগে সকলকে খাইয়ে আপনি নিজেও খেয়ে নিচ্ছেন তো?

হেসে ফেললেন।—আপনার বন্ধু উসকে দিয়েছেন বুঝি? আর-গুণ নেই ছার-গুণ আছে—কোনো অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাতে আমি খাই কিনা জিগ্যেস করে আসুন তো।

খেতে বসার আগে অবধূত এক প্রৌঢ় দম্পতীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। গলা খাটো করে বললেন, একটু খোরাক পেতে চান তো ওঁদের, বিশেষ করে ওই মহিলার ওপর নজর রাখুন—লোকের মধ্যে ওই মহিলাই কেবল আমার স্ত্রীটিকে বরদাস্ত করতে পারেন না—আবার তাঁর ভদ্রলোককে আঁচল-ছাড়াও করতে পারেন না।

বছর ছাপ্পান্ন সাতান্ন হবে ভদ্রলোকের বয়েস, আর তাঁর স্ত্রীটির হয়তো পঞ্চাশ বাহান্ন। মহিলা এককালে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। এখন বয়সের ছাপ একটু বেশি স্পষ্ট। সেটুকু ঢাকার প্রয়াসে পরিপাটি প্রসাধন খুব সুচারু মনে হলো না। শুনলাম তাঁরা শ্রীরামপুরে থাকেন। অবস্থাপন্ন পরিবার। মাতাজীর প্রতি ভদ্রলোকের গদ-গদ ভক্তি। তিনি একলাই শিষ্য। কারণ তাঁর পরিবারটির বুদ্ধি-বিবেচনা এ-সবের অনেক উর্ধ্বে। মাতাজীর প্রতি স্বামীর এত ভক্তিশ্রদ্ধা তিনি খুব সরল চোখে দেখেন না। তাঁর ধারণা, স্বামীর রূপের টানই বড় টান। শুধু স্বামীর কেন, পুরুষ ভক্তদের সকলেরই। নইলে আদিখ্যেতা করে কেউ এখানে দীক্ষা নিতে আসে? বিশ্বস্তজনদের এই নিগূঢ় সত্যটা তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই বিশ্বস্তজনেরা আবার কানে আঙুল দেবার মতো করে শুনে মাতাজীর গোচরে এনেছেন। তাঁদের মতে স্ত্রী যাঁর এমন, সেই শিষ্যকে মাতাজীর বাতিল করাই উচিত। অবধূতের মন্তব্য, মহিলা ষোল আনা ভ্রান্ত এ-কথা বলা যায় না। সৃষ্টির জগতে ফুলের রূপ আর রমণীর রূপে খুব তফাৎ নেই। যাকে টানার, দুই-ই টানে।

...ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আমাদের থেকে আট-দশ হাত তফাতে পাশাপাশি খেতে বসেছেন। পেটো কার্তিক আর তার বন্ধুরা যোগান দিচ্ছে। মাতাজী নিজে পরিবেশন করবেন। সেই ভদ্রমহিলা চারদিকে একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে সকলের শোনার মতো করেই প্রশ্ন ছুঁড়লেন, মায়ের পুজোর আগে সকলকে খেয়ে নিতে হবে এটা কি কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ না মাতাজীর নিজের নির্দেশ?

তাঁর ভদ্রলোকটি হাঁসফাঁস করে উঠলেন, মাতাজীর নির্দেশ মানেই শাস্ত্রের নির্দেশ।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মহিলা জবাব দিলেন, এত ভক্তি-বিশ্বাস তোমার থাকতে পারে—সকলের না-ও থাকতে পারে।

তক্ষুনি আর এক-দিক থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, না থাকলে আমরা খেতে বসে গেলাম কেন?

মহিলা সেদিকে তাকালেন শুধু। জবাব দিলেন না, কিন্তু তাঁর চোখের ভাষা প্রাঞ্জল। অর্থাৎ কোন্ টানে এসে জুটেছে আর কেন খেতে বসে গেলো তা-ও বলে দিতে হবে?

এবারে আর এক মহিলা হাল্‌কা হেসে বললেন, শুধু আমরা কেন—আপনিও তো বসেছেন...।

ঈষৎ ঝাঁঝালো জবাব, আমি ভক্তি বিশ্বাসের কদর বুঝি না তাই অনায়াসে বসতে পেরে গেছি—কিন্তু আপনাদেরও কি তাই? জানতে কৌতূহল হলো তাই মাতাজীকে শাস্ত্রের কথা জিগ্যেস করেছি—তাতে আপনাদের আপত্তি কেন?

যাঁকে নিয়ে কথা সেই মাতাজী কিন্তু হাসছেন আর বেশ মজাই পাচ্ছেন। প্রসঙ্গ একটু তপ্ত হয়ে উঠছে মনে হতে তাড়াতাড়ি বললেন, না মা, এটা কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ নয়, মায়ের ছেলে-মেয়েরা উপোস করে মাকে ভোগ খেতে দেখবে এ আমার ভালো লাগে না বলেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু ভদ্রমহিলা যেন ফোঁড়ন কাটার আরো বেশি সুযোগ পেলেন। —মাতাজীদের ব্যবস্থায় তাহলে শাস্ত্রের ব্যবস্থা বদলে যেতে পারে?

মাতাজীর সুন্দর মুখ তেমনি সপ্রতিভ।—আপনার যে গোড়াতেই একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে মা—শাস্ত্রে খেয়ে পুজোর কথাও নেই, না খেয়ে পুজোর কথাও নেই—মানুষের অভিরুচিটাই সংস্কার আর নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি তো নিজেও সংস্কার মানেন না, তাহলে আর আপত্তিটা কি?

মুখ লাল করে ভদ্রমহিলা পোলাওয়ে হাত দিলেন। পাশ থেকে তাঁর ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কি বলছেন শুনতে পেলাম না। জবাবে মহিলা রুষ্ট নেত্রে একবার তাঁর দিকে তাকালেন শুধু।

না, রাত জেগে কালীপুজো কখনো দেখিনি। এই রাতে দেখছি। ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছি তা নয়। মাতাজীর পুজোর নিষ্ঠা আর সাবলীল নমনীয়তাটুকুই দেখার মতো।

মাঝের মস্ত হলঘরে পুজোর আয়োজন। দেয়ালের কাছে ছোট্ট দক্ষিণা কালীমূর্তি। সামনে নানা সরঞ্জাম, ভোগসামগ্রী। মাঝখানের লাল আসনে মাতাজী। তাঁর পিছনে বৃত্তাকারের প্রথম দুই সারিতে মেয়েরা বসেছেন। তাঁদের পিছনে তেমনি বৃত্তাকারে পুরুষেরা। ঘরে তিনটে আলো জ্বলছে। অবধূত খুব মিথ্যে বলেন না হয়তো। পুজো দেখতে বেশি ভালো লাগছে কি পূজারিণীকে নিশ্চয় করে বলা শক্ত। অর্চনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর ক্রিয়াকলাপ, নড়াচড়া, অর্ঘ্যদান সবই যেন ভারী সুলোলিত ছন্দে বাঁধা।

...প্রথম সারিতে শ্রীরামপুরের সেই বিগত যৌবনা রূপসী ভদ্রমহিলাও বসে। লক্ষ্য করছি মাঝে মাঝে তাঁর ঢুলুনি আসছে। পিছনে তাঁর স্বামী রত্নটি যেখানে তদগতচিত্ত বিগলিত—তাঁকে ফেলে তিনি নড়েনই বা কি করে? এক-আধবার পিছন ফিরে তাঁর ভাববিহ্বল মুখখানা দেখে নিচ্ছেন। অবধূতের আধঘণ্টা অন্তর সিগারেটের তৃষ্ণা। তিনি উঠে উঠে যাচ্ছেন। এক-একবার আমিও তাঁর সঙ্গ নিচ্ছি। পাঁচ-সাত-দশ মিনিট দু'জনে গল্প করে আবার এসে বসছি। শেষ বারে উঠে আসার খানিক বাদে ঘণ্টা বাজার শব্দ কানে এলো। অবধূত বললেন, চলুন, এবারে আরতি হবে...আপনার ভালো লাগবে।

গিয়ে বসলাম। পেটো কার্তিক ঘরের আলোগুলো সব নিভিয়ে দিল। দু'দিকে দুটো প্রদীপের আলো টিমটিম করছে। হলঘর আবছা অন্ধকার। দুটো প্রদীপের আলোয় মাতাজীকেই শুধু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নিজের ডান হাতে মাতাজী বেশ খানিকটা ঘি বা তেল কি ঢেলে নিলেন জানি না। বাঁ হাতে তাতে এক-ডেলা তুলো ফেলে বেশ করে ভিজিয়ে নিলেন। তারপর সেটা ডান হাতের তালুতে রেখেই টিপে টিপে তুলোর ডেলাটাকে ছোট্ট একটা পিরামিডের আকার দিলেন। প্রদীপটা টেনে নিয়ে ডান হাতে রাখা তুলোর মাথায় আগুন ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথার দিকটা আর একটা প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠল। বাঁ-হাতে মাটির প্রদীপটা জায়গায় রেখে, ডান হাত মায়ের দিকে বাড়িয়ে আর বাঁ-হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে এই তুলোর প্রদীপে আরতি করতে লাগলেন। সুঠাম বাহু মায়ের দিকে উঠছে নামছে ঘুরছে ফিরছে—হাতের তালুতে তুলোর প্রদীপ জ্বলে জ্বলে ছোট হচ্ছে।

আমার কেন, সকলেরই বোধ হয় রুদ্ধশ্বাস। ফিসফিস করে অবধূতকে জিগ্যেস করলাম, কি কাণ্ড, ওঁর হাত পুড়ে যাচ্ছে না?

জবাব দিলেন, পুড়ে গেলে আর আরতি করছে কি করে?

তুলো প্রায় দেখা যায় না। এই আরতি শেষ হতে আমিই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু তারপরই আবার অস্বস্তি। হাত বেশ করে মুছে নিয়ে মাতাজী তেমনি ত্রিকোণ আকারের একখণ্ড কর্পূরের ডেলা নিলেন। তাতে প্রদীপের আগুন ধরিয়ে ডান-হাতে তালুতে রেখে ঘণ্টা বাজিয়ে আবার আরতি শুরু করলেন। এ-ও দু'চোখ ভরে দেখার মতো, কিন্তু হাত সত্যিই পুড়ে যাচ্ছে না কেন ভেবে না পেয়ে আমার আতঙ্ক!

যাক, খানিক বাদে কর্পূর প্রদীপের আরতিও শেষ হলো। এরপর মিনিট দেড় দুই চামর দোলানোর মতো করে শূন্য হাতে আরতি। শেষে নিজের শূন্য হাতখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। খুব আস্তে আস্তে সেই শূন্য হাত আর হাতের আঙুল শঙ্খমুদ্রায় পরিণত হলো। সেই মুদ্রার শঙ্খারতি শেষে আবার এক চমক। শূন্য হাতের সেই মুদ্রা-শঙ্খ নিজের মুখে ঠেকালেন। তারপরেই গমগম করে যেন সত্যিকারের শঙ্খই বেজে উঠল। একবার নয়, দীর্ঘ রবে তিন বার। চোখ চেয়ে থেকেও কারো মনে হচ্ছে না সত্যিকারের শঙ্খ বাজছে না।

আলো-আঁধারিতে এত বড় হলঘরের বিচিত্র গম্ভীর পরিবেশ। মাতাজী ঘুরে বসে ঘট থেকে শান্তিজল ছিটোলেন। শশব্যস্তে সকলে পা ঢেকে বসেছেন। সবশেষে প্রদীপের আশিস সকলের মাথায় ছোঁয়ানো। এক হাতে প্রদীপ নিয়ে অন্য হাতের তালু তার শিখার ওপর ধরে মাতাজী সেই হাতখানা এক-একজনের মাথায় রাখছেন। মেয়েরা সামনে। অতএব তাঁদের মাথাতেই আগে।

...কিন্তু প্রদীপ-শিখায় তপ্ত হাত শ্রীরামপুরের সেই ভদ্রমহিলার মাথায় রাখতেই এমন এক কাণ্ড ঘটল যা আমি জীবনে ভুলব না। ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন, কি হলো! কি হলো! আমার কি হলো।

তারপরেই পাশের মহিলাদের কোলে ঢলে পড়লেন। প্রথমে হতভম্ব বিমূঢ় সকলে। তারপরেই মাতাজীর তৎপর হাতের শুশ্রূষা। পুজোর ঘটি থেকে জল নিয়ে তাঁর চোখে মুখে জোরে জোরে কয়েকটা ঝাপটা দিলেন।

একটু বাদে ভদ্রমহিলা চোখ মেলে তাকালেন। পেটো কার্তিক ততক্ষণে হলঘরের সব আলো জ্বেলে দিয়েছে। মাতাজী তাঁর মুখের সামনে ঝুঁকলেন।—কি হয়েছে?

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে আতঙ্ক। মাতাজীর দিকে চেয়ে আছেন। আরো দু'বার জিগ্যেস করতে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। ভয়ার্ত গলায় বললেন, আপনি মাথায় হাত রাখতেই আমার ভিতরে মনে হলো বিদ্যুতের মতো কিছু যাচ্ছে। বলেই উপুড় হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। অবধূত আর আমি সামনের বারান্দায় বসে। প্রথমে জিগ্যেস করলাম, আপনার স্ত্রী এ-রকম আরতি শিখলেন কার কাছে?

জবাব দিলেন, জিগ্যেস করিনি কখনও...কংকালমালী ভৈরবের কাছ থেকেই হবে।

আবার জিগ্যেস করলাম, শেষে ওই ভদ্রমহিলার ব্যাপারখানা কি হলো?

হাসলেন।—কি হলো আমিও তো আপনার মতোই দেখলাম।...কিন্তু কেন হলো? কি করে হলো? কে এমন ব্যাপারখানা করালো?

পরদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আগে আমি স্ত্রী আর মেয়ে ছাড়া পাইনি। তাই জেরার সুযোগ পেয়েছি। কল্যাণী দেবীকে ডেকে প্রথমে বলেছি, আপনার ডান হাতখানা দেখি?

হাসি মুখে তিনি ভালো হাত আমার দিকে প্রসারিত করলেন।—হাত-টাত দেখা শুরু করলেন নাকি?

অবধূত টিপ্পনী কাটলেন, কেবল মেয়েদের হাত দেখবেন ঠিক করেছেন উনি, তোমাকে দিয়ে শুরু করছেন।

হাতে কোনোরকম পোড়া দাগের চিহ্নও নেই। লালচে কর-পদ্মকমল। বড় নিশ্বাস ফেলে হেসে বললাম, হাত দেখার শেষও ওঁকে দিয়েই করব।... এবারে বলুন, শ্রীরমপুরের ওই ভদ্রমহিলার এ কি কাণ্ড হলো?

হাসতে লাগলেন।—আপনি তো মনস্তত্ত্ববিদ লেখক—আপনিই বলুন না কি কাণ্ড হলো?

—আমার মনস্তত্ত্বের বিদ্যে অতদূর পৌঁছচ্ছে না। আপনি বলুন—

হাসি মুখে যে ব্যাখ্যা দিলেন তা অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বললেন, মানুষের মন সবল হতে সময় লাগে, দুর্বল সহজেই হয়। পুজোর সময় এতগুলো মানুষের তন্ময়তার প্রভাবও কিছু আছেই। এই প্রভাবে মন যত দুর্বল হয়েছে, নিজের ভিতরের অপরাধ-বোধ ততো বেড়েছে। এই অবস্থায় স্নায়ু তো স্পর্শকাতর হতেই পারে। আমি মাথায় হাত রাখতে নিজের স্নায়ুর সঙ্গে নিজেই আর যুঝতে পারেননি, এতে আমার কোনো কেরামতির ছিটে-ফোঁটাও নেই।

উনি স্ত্রী আর মেয়ের কাছে চলে যেতে অবধূত হাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, কি হলো?

—কিছু হলো না। আমার সেই এক কথা...ওঁর কোনো কেরামতি নেই, কোনো ব্যাপারে আমাদের কারো কোনো কেরামতি নেই...কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে একেবারে কারোরই কি নেই? কেন এমন হয়...কে করে...কে ঘটায়?

এ-রকম কথা অবধূতের মুখে অনেকবার শুনেছি। এ নিয়ে আমি কোনো আলোচনার

মধ্যে ঢুকিনি। কারণ আমার ধারণা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-ও এক ধরনের ঈশ্বর স্তুতি—শক্তির স্তুতি।

মাস দেড়েক পরের কথা। এর মধ্যে আর কোন্নগর যাওয়া হয়নি। রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় হন্ত-দন্ত হয়ে পেটো কার্তিক আমার বাড়িতে হাজির। আমি তখন খেতে বসার উদ্যোগ করছি।

কলকাতা এলে পেটো কার্তিক আমার বাড়িতে একবার ঢুঁ দিয়ে যায়ই—আর খাওয়া-দাওয়া করে যেতে বললে এক-কথায় রাজি হয়ে যায়। কিন্তু রাতে কখনো আসেনি।

—কি ব্যাপার? এত রাতে তুমি?

—বাবা পাঠালেন, কাল সক্কালের প্রথম ট্রেনে আমাকে নিয়ে যেতে হবে—

ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।—কেন? বাবার কি হয়েছে? আর ট্রেনেই বা কোন্নগরে যেতে হবে কেন?

সর্বদা আমি নিজের গাড়িতেই গিয়ে থাকি এটা অবধূত জানেন।

আমাকে এমন উতলা হতে দেখে পেটো কার্তিক অপ্রস্তুত একটু।—না না, বাবার আবার কি হবে—উনি বহাল তবিয়তে আছেন—কোন্নগরে নয়, সকালের প্রথম ট্রেনে আপনাকে নিয়ে যাব তারকেশ্বরে—দু'দিন যাবত বাবা সেখানেই আছেন, এই নিন বাবার চিঠি।

কয়েক লাইনের চিঠি।...ঘটনার সাজানো আসরে আমার ভূমিকার সব থেকে তাজ্জব নজির দেখতে চান তো চলে আসুন। আশা করি পস্তাবেন না। দিন চারেক সময় হাতে নিয়ে আসবেন। অবশ্যই আসুন।—অবধূত।

আমি অবাক।—চার দিনের সময় নিয়ে যেতে বলছেন...কি ব্যাপার বলো তো? দৈব কিছু নাকি?

পেটো কার্তিকের সপ্রতিভ জবাব, দেবতা সহায় যখন বাবার তো সর্ব ব্যাপারই দৈব...কিন্তু বাবা তো চার দিনের কথা আমাকে কিছু বলেন নি—ওনার কি আরো চারদিন সেখানে পড়ে থাকার মতলব নাকি!

জিগ্যেস করলাম, তোমাদের মাতাজীও তারকেশ্বরেই নাকি?

—না, তিনি কোন্নগরে, তারকেশ্বরে কেবল আমি আর বাবা।

একসঙ্গে খেতে বসে এ-ভাবে ডাকার কারণ বুঝতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখা গেল পেটো কার্তিক কিছুই জানে না। পুণ্যার্থীদের ভিড় আর কিছু মেয়ে-পুরুষের ভোলে বাবার থানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার বিশেষ আর কিছুই চোখে পড়েনি।

—তাহলে দু'দিন ধরে তোমাদের বাবা কি করছেন?

—খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ বিকেলের দিকে একটু ব্যস্ত দেখলাম, এই চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে সকালের মধ্যে আপনাকে ধরে আনার জন্য পাঠালেন।

ড্রাইভার ছেড়ে দিয়েছি। অত সকালে তাকে আসতেও বলিনি। খুব ভোরে পেটো কার্তিকই ট্যাক্সি ধরে আনলো। হাওড়া স্টেশনে এসে ছ'টার গাড়ি ধরলাম। পেটো কার্তিককে ফার্স্টক্লাসের টিকিট কাটার টাকা দিয়েছিলাম। কথায় সময় নষ্ট না করে চার-চার আট টাকা দিয়ে

দুটো সাধারণ ক্লাসের টিকিট কেটে বাকি টাকা আমাকে ফেরত দিল। বলল, শেওড়াফুলির পর থেকেই এটা ভোলে বাবার গাড়ি হয়ে যায়, তখন ফার্স্টক্লাস থার্ড ক্লাস সমান—মিথ্যে অর্থদণ্ড দেবেন কেন।

যা-ই হোক, গাড়ি মোটামুটি ফাঁকাই। তারকেশ্বর যাত্রীর মৌসুম নয় এটা। জানলার ধারে দু'জনে মুখোমুখি বসে চলেছি। খানিক বাদে যাত্রীর ভিড় বাড়তে লাগল। হরেক রকমের বেসাতি নিয়ে গাড়ির মধ্যে হকারের উৎপাতও কম নয়। উঠছে, কলে দম দেওয়ার মতো করে গড়-গড় করে লেকচার দিচ্ছে—গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে খেয়ে বেসাতি দেখাচ্ছে। কামরায় এক একবার এক-জোড়া দেড়-জোড়া করেও হকার উঠছে। একজন থামলে অন্যজন তৎপর। পেটো কার্তিক দেখলাম অনেক কিছুই কিনে ফেলল। লিমন লজেন্স, রং পেন্সিল, চিরুনি, চাবির রিঙ, চটি বই, বাচ্চাদের মজাদার খেল্‌না, ছোট রঙিন পিকচার অ্যালবাম, টুকিটাকি আরো কিছু। মনে মনে বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করলাম, এ-সব দিয়ে কি হবে, তোমার হাত আর পকেট যে বোঝাই হয়ে গেল!

লজ্জা পেয়ে জবাব দিল, কিছু হবে না, তারকেশ্বরেই বিলিয়ে দেব।... ব্যাপার কি জানেন, লোকগুলো কি ভীষণ গরীব, সমস্ত দিন গলাবাজী করে এক একটা জিনিস বিক্রি পিছু বড়জোর দু'চার পয়সা পায়। দিনের শেষে যা ওঠে তাই দিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আধ-পেটা খেয়ে সংসার চালায়—ওদের দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়, তাই না কিনে পারি না।

এবারে আমি লজ্জা পেলাম।...বোমাবাজী করা এই ছেলের বুকের ভেতরটা কি অবধূতই এমন সোনা করে দিয়েছেন?

অবধূত যেখানে আছেন, স্টেশন থেকে সাত আট মিনিটের হাঁটা পথ। তিন ঘরের ছোট এক-তলা বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী দেখলাম না। এখানকার আপাত বাসিন্দা কেবল তিনি আর পেটো কার্তিক। আমাকে দেখে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি—

ছোট সুটকেসটা নামিয়ে রেখে বললাম, এ-ভাবে ডেকে পাঠানোর কৈফিয়ত দাখিল করুন আগে—আমার তর সইছে না।

হাসছেন।—কি দিন-কাল বুঝুন—উপকার করতে চাইলেও কৈফিয়ত দাখিল করতে হবে...।

—উপকার মানে কার উপকার?

—আপনাকে যখন ধরে এনেছি আপনার ছাড়া আর কার!

—কি উপকার?

—উপকার নয়? আপনার লেখা যখন ছাপার অক্ষরে বই হয়ে বেরুবে আমাকে কি তার রয়েলটির ভাগ দেবেন?

থমকালাম। এক বছর ধরে মগজে যে রূপ আকার নিচ্ছে তার পরিণাম এ-ই বটে। কিন্তু মুখ ফুটে কোনোদিন তা ব্যক্ত করা দূরে থাক—আভাসও দিইনি। অবশ্য এক বছর ধরে এঁর সঙ্গে লেগে আছি.. মতলব বোঝা এই চতুর মানুষের পক্ষে খুব কঠিন নয়।

হেসেই বললাম, তা বলে সব জায়গা ছেড়ে এই তারকেশ্বরে তলব কেন?

—ক্লাইম্যাক্সের খোঁজে লেখকরা জলজঙ্গল বনবাদাড় মরুভূমি কত জায়গায় ছোটে—সে-তুলনায় তারকেশ্বর তো ভালো জায়গা মশাই।

আবার থমকালাম। অবধূতের কোনো কথা কখনো তাৎপর্যশূন্য মনে হয়নি আমার। পেটো কার্তিক আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে আর এগোলাম না। তাঁর সংক্ষিপ্ত চিঠির প্রথম ছত্র মনে পড়ল—'ঘটনার সাজানো আসরে আমার ভূমিকার সব থেকে তাজ্জব নজির দেখতে চান তো চলে আসুন।'

অতএব বুদ্ধিমানের মতো অপেক্ষা করাই ভালো।

অবধূত জিগ্যেস করলেন, চা-টা কিছু খাওয়া হয়নি তো?

—চা হয়েছে, টা হয়নি। কিন্তু এখানে তো আর কাউকে দেখছি না, এটা কার বাড়ি?

—এক ভক্তকে দিন-কয়েকের জন্য থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, সে-ই জুটিয়ে দিয়েছে।...আপনি স্নান সেরে নিন, সকাল ন'টার মধ্যে আমাদের স্টেজে হাজির হতে হবে—কার্তিক, তুই হোটেলে গিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট রেডি করতে বল্।

পেটো কার্তিক চলে গেল। জিগ্যেস করলাম, স্টেজ বলতে?

হাসছেন।—এই নাটকখানা হচ্ছে রিভলভিং স্টেজে। প্রথম ঘটনার মঞ্চ সমস্তিপুর-দ্বারভাঙার কাঁকুড়ঘাটি, সেটা ঘুরে কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মশানে—পাঁচ বছর বাদে এবার সেটা ঘুরে বাবা তারকনাথের মন্দিরে। ব্যস্ত হবেন না, চান সেরে আসুন—

বেশ আগ্রহ নিয়েই স্নান সেরে প্রস্তুত হলাম। অবধূত অযথা বাগাড়ম্বর করেন না। আশা, সে-রকম কিছুই দেখব শুনব বা জানব।

ছ'সাত মিনিটের হাঁটা পথে মন্দির। কাছেই এখানকার সব থেকে বড় যে আমিষ হোটেল তার নাম অন্নপূর্ণা হোটেল। দেখলাম, বড় শুধু নয়, বেশ পরিচ্ছন্নও। কার্তিক সেখানেই অপেক্ষা করছে। হোটেলের মালিক অবধূতকে খুব খাতির করে বসালেন। বেশ ভারী প্রাতরাশই রেডি দেখলাম। অবধূত বললেন, ভালো করে খেয়ে নিন, আবার কখন জুটবে বলা যায় না—

—কেন?

সহাস্য জবাব, নাটকের নিয়ন্তা তো আর আমি নই মশাই, আর্টিস্টের হাজিরার অপেক্ষায় এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে কি তিন-চার ঘণ্টা, জানব কি করে?

খাবার ফাঁকে পেটো কার্তিক আবার মন দিয়ে তার বাবার মুখখানা দেখছে। মনে হয় কিছু একটা রহস্যের গন্ধ সে-ও পাচ্ছে। অতএব আমি যথাসম্ভব নির্লিপ্ত।

খাওয়া শেষ হতে অবধূত একেবারে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বেরুলেন। যখনই আসুন, খাবার গরম চাই। ভাত ডাল বেগুনি মাছ মাংস চাটনি দই পেলে ভদ্রলোক আর কমের দিকে যাবেন কেন? বেরিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে চললাম। পিছনে পেটো কার্তিক। সে আর এখন আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না জানা কথাই।

মন্দিরে আর চত্বরে মেয়ে-পুরুষের গিসগিস ভিড়। তাদের নিয়ে পুরুত-পাণ্ডারা তৎপর। সকলে যেন বিষম কিছু তাড়া খেয়ে এখানে এসেছে। কাকে ঠেলে কাকে ফেলে যেমন ভিতরে

যাওয়ার তাগিদ, তেমনিই আবার বেরিয়ে এসে বাঁচার তাগিদ। আমার আতঙ্ক, তিন মাস ছ'মাসের বাচ্চা নিয়েও কিছু মেয়েছেলে ভিতরে ঢুকেছে, মনে হয়েছে পুণ্যির তাগিদে ওদের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। বললাম, চলুন, ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়াই, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

অবধূত জবাব দিলেন না। মনে হলো ভিড়ের মধ্যে তাঁর দু'চোখ কিছু খুঁজছে বা কাউকে খুঁজছে। পায়ে পায়ে দুধকুণ্ডের দিকে তিনি এগিয়ে চললেন। দুধকুণ্ড বলতে মন্দিরের গায়ের বিশাল পুকুর। সেখানে মেয়ে-পুরুষের স্নানের সমারোহ। বছর চৌদ্দ পনেরো আগে একবার তারকেশ্বরে এসেছিলাম। তখন এই পুণ্য-পুকুরের জলে হাত দিতেও ঘেন্না করত। পুকুরটার আমূল সংস্কার হয়েছে, পরিষ্কার টলটলে জল।

অবধূত স্নান-রত মেয়ে পুরুষদের একবার দেখে নিয়ে বললেন, এত ভিড়ে আসবে না জানা কথাই, আসুন আমাদের এই দুধকুণ্ডের কাছাকাছি অপেক্ষা করতে হবে।

...অবধূত এধার-ওধার পায়চারি করছেন, একের পর এক সিগারেট ধরাচ্ছেন। পুণ্যার্থী-পুণ্যার্থীনীদের অনেকেই তাঁকে লক্ষ্য করছে। কেউ কেউ বা দু'হাত জুড়ে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে। রক্তাম্বর-পরা সাধু-সন্ন্যাসী এখানে আরো চোখে পড়েছে। শুধু পরিচ্ছদে নয় ভিতরেও যেন তাঁরা বিবর্ণ মলিন। দেখলেই মনে হয় প্রাপ্তির আশাটুকুই তাঁদের বড় আশা। এঁদের মধ্যে সিল্কের লাল চেলি, সিল্কের টকটকে লাল ফতুয়া আর তেমনি সিল্কের লাল উত্তরীয় পরা কালীকিংকর অবধূত ঝকঝকে ব্যতিক্রম। তাঁর এই ব্যক্তিত্ব আর চাল-চলন দেখার মতো সন্দেহ নেই। পাণ্ডারাও অনেকে নত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছে।

আমার ভিতরটা কৌতূহলে টই-টম্বুর। বাইরে ওই অবধূতের মতোই শান্ত থাকতে চেষ্টা করছি, মন্দিরের সামনের বাঁধানো মণ্ডপের মেঝেতে অনেক মেয়ে পুরুষ হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। তাদের বেশির ভাগেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। শুনলাম চার-পাঁচ সাত-আট দিন ধরেও অনেকে এমনি হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। মাঝে-সাজে বাবার চরণামৃত ছাড়া আর কিছু মুখে ছোঁয়ায় না। এ-দৃশ্য দেখে বুকের ভেতরটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। শুনেছি কেউ কেউ এরা বাবা তারকনাথের আদেশ পায়। পেলে মুশকিল আসানও নাকি হয়।...আমিও অনেক হারিয়েছি। বুকের তলার এই বিশ্বাসের ঠাঁই হলে কি সেই সংকট এড়ানো যেত? জানি না। শুধু এটুকু জানি, আমার দ্বারা এ-ভাবে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা কোনোদিন সম্ভব হতো না। কারণ এই বিশ্বাসের পুঁজি আমার নেই।

...ঘড়ি দেখলাম। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। এখনো বেশ ভিড়, কিন্তু আগের তুলনায় কম। একটু বাদে দেখি অবধূত আমাকে আঙুলের ইশারায় ডাকছে। কাছে যেতে চাপা গলায় বলেন, ঘাটের এ-দিকটায় সরে এসে লক্ষ্য করুন, আমরা যার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সে ওই আসছে...। খুব ভাল করে দেখে যান।

তাঁর ইশারা-মতো আমি ফিরে তাকালাম। ঘাটের দিকে আসছে একটি মেয়ে। বছর ছাব্বিশ-সাতাশ হবে বয়েস। বাঙালী নয়। ভারী সুন্দরী। ধপধপে ফর্সা রং, লম্বা, নিটোল স্বাস্থ্য। পাতলা শাড়ির ওপরে কাঁধে বুকে জড়ানো একটা গামছা আর কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো আর একটা গামছা। তার মানে আদুড় গায়ে শুধু শাড়ি পরে তার ওপর ও-ভাবে দুটো গামছা

জড়িয়ে স্নানে আসছে। আসতে আসতে চার-দিকে তাকাচ্ছে। মনে হলো, আকৃতি-মাখা উদভ্রান্ত চাউনি। তার সঙ্গে একটি মাঝবয়সী মেয়েছেলে। পরিচারিকা হবে। আর বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে আধা ভদ্রলোক গোছের একজন অবাঙালী পুরুষ। একজন পাণ্ডা শশব্যস্তে তাদের সঙ্গে আসছে। মেয়েটির গায়ে কোনো গয়না, এমন কি হাতে কাচের চুড়িও নেই। তবু দেখামাত্র মনে হয় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে বা বউ হবে।

পাশে তাকিয়ে দেখি অবধূত নেই। মন্দিরের পিছনের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন। আমি ভেবে পেলাম না, উনি ওখানে গিয়ে আড়াল নিলেন কিনা।

মেয়েটি ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়ি কটা পার হয়ে আগে দুধকুণ্ডের জল হাতে তুলে নিজের কপালে মাথায় ছিটিয়ে দিল। তারপর এক-পা এক-পা করে নেমে কোমরজলে দাঁড়ালো। সঙ্গের পরিচারিকাও জলে নেমেছে। লক্ষ্য করলাম, সিঁড়ির এক-পাশে দাঁড়ানো লোকটির হাতেও কোনো শুকনো বসন নেই। অর্থাৎ স্নানের পর অনুষ্ঠান যদি কিছু হয় তো ভিজে কাপড়েই হবে।

স্নান সেরে পরিচারিকা পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে উঠে পড়ল। তার গায়ে পিঠেও একটা বড় গামছা জড়ানো। সঙ্গের লোকটিকে ইশারা করতে পাণ্ডাকে নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। মেয়েটি স্নান করছে। উঠছে, ডুব দিচ্ছে। ডুব দিচ্ছে, উঠছে। না, স্নানবিলাস আদৌ নয়। কিছু একটা তন্ময়তায় বিভোর যেন। গুনিনি, গুনলে হয়তো দেখতাম শতেকের ওপর ডুব দেওয়া হয়েছে। পর পর ডুব দিয়ে যাওয়া নয়। একবার ডুব দিচ্ছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, মন্দিরের দিকে ফিরে দু'চোখ বুজে স্থির কয়েক মুহূর্ত—তারপর আবার ডুব দিচ্ছে।

এই স্নান দেখতে এরই মধ্যে ঘাটে বেশ ভিড় হয়েছে দেখলাম। রূপসী যুবতী রমণীর এই স্নান অনেকের চোখের ভোজ তো বটেই। পৃথিবীর কোনো গীর্জা বা মন্দির মসজিদ কি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি আনতে পেরেছে? উল্টে যেখানে যত বেশি সমর্পণ সেখানে ততো হাঙর-কুমিরের আমন্ত্রণ।

মেয়েটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জল পেরিয়ে প্রথম ধাপে উঠে দাঁড়ালো। দুটো গামছা সিক্ত-বসনা এই রমণীর যৌবন আবৃত করে রাখার মতো যথেষ্ট নয় আদৌ। পরনের ভেজা শাাড়ি আর গামছা দুটো দুধ-বরণ অঙ্গে লেপ্‌টে যাওয়ার ফলে সর্ব অঙ্গের যৌবন আরো স্পষ্ট, আরো মুখর। জোড়া জোড়া চক্ষু ওই রমণী-অঙ্গে বিদ্ধ।

কিন্তু রমণীর কারো দিকে চোখ নেই। এমনি আত্মস্থ তন্ময় যে পারিপার্শ্বিক লোভাতুর জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

...কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি ভোজের আরো অনেকটাই বাকি তখনো।

পরিচারিকা এগিয়ে গিয়ে তার হাতে ভিজে মাটির ঢেলার মতো কি একটা দিল। সেটা হাতে নিয়ে রমণী আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে উপুড় হয়ে বুকের ওপর শুয়ে পড়ে দু'হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে যুক্ত করল। সিঁড়ির মেঝেতে কপাল রেখে হাত দুটো-যে পর্যন্ত পৌঁছুলো সেখানে মাটির ঢেলা দিয়ে একটা দাগ কাটল। এর নাম দণ্ডি-কাটা। উঠে সেই দাগের ওপর দাঁড়িয়ে আবার বুকের ওপর শুয়ে দু'হাত টান করে দণ্ডি কাটল। এমনি বার তিনকে দণ্ডি কাটতে সিঁড়ি

শেষ। এবার সে সমান মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে। আবার উপুড় হয়ে বুকের ওপর শুয়ে দণ্ডি কেটে কেটে মন্দিরের দিকে এগোতে লাগল। অনেক দর্শক ঘাটেই দাঁড়িয়ে, অনেকে আবার রমণীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে। রমণী তখনো জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ, উদাসীন।

মন্দিরের রেলিং পর্যন্ত আসার পর তেমনি দণ্ডি কেটে কেটে বাঁদিক-থেকে বেষ্টন প্রদক্ষিণ শুরু হলো।...হাঁটুর ওপর বসছে, বুকের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ছে, দু'হাত যতদূর যায় বাড়িয়ে দিয়ে যুক্ত করছে, মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে কয়েক পলক স্থির হয়ে পড়ে থাকছে, মাটির ঢেলায় দণ্ডির দাগ দিচ্ছে, দাঁড়িয়ে সেই দাগে পৌঁছে আবার শুরু করছে।

অবধূত এদিকেই দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এখন নেই।

দণ্ডি কেটে সমস্ত মন্দির প্রদক্ষিণ প্রায় শেষ হয়ে এলো। দণ্ডি কাটতে কাটতে রমণী মন্দিরের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।...দরজার কাছে অবধূত দাঁড়িয়ে। প্রসন্ন প্রশান্ত মুখ। রমণী দোরগোড়ায় পৌঁছুলো। পাণ্ডা আর তার পাশের সেই লোকও দাঁড়িয়ে। পাণ্ডার হাতে মস্ত একটা পুজোর ডালি। তাদের সামনে আরো জনাকতক পাণ্ডা। দু'দিক থেকে তারা পুণ্যার্থীর ভিড় সামলে রাখছে। মন্দিরের ভিতরেও কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বাবা তারকনাথকে দর্শন এবং স্পর্শনের এই স্পেশ্যাল ব্যবস্থা হয়তো রমণীর টাকার জোরে হয়েছে। নইলে পাঁচ সাত মিনিটের জন্যে হলেও এত খাতির কারো পাওয়ার কথা নয়। দরজার সামনেই পাণ্ডারা ছাড়া আর দাঁড়িয়ে কেবল অবধূত। শুধু তাঁকেই তারা বাধা দিচ্ছে না বা সরে যেতে বলছে না। শেষ দণ্ডি কাটা হতেই মন্দিরের দরজা। উঠে দাঁড়িয়েই টকটকে লাল ধুতি ফতুয়া পরা আর তেমনি চাদর গায়ে অবধূতকে সামনে দেখে রমণী চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো কয়েক পলক। তারপর আমার মনে হলো, হঠাৎই একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে।

কিন্তু তার আগে একখানা হাত তুলে অবধূত বাধা দিলেন। রমণী থমকে দাঁড়ালো। আমার মনে হলো আশা উৎকণ্ঠা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। পাণ্ডারা আর অদূরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে তারাও বিমূঢ় বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখছে।

অবধূত এবারে দু'হাত দরজার দিকে বাড়িয়ে মন্দিরের দরজা দেখিয়ে পরিষ্কার হিন্দীতে বললেন, যাও—আগে বাবার পুজো দিয়ে এসো।

রমণী দিশেহারার মতো ভিতরে ঢুকে গেল, পিছনে তার পরিচারিকা, পুজোর ডালি হাতে পাণ্ডা আর পুরোহিত। একটু বাদে পুজো শেষ করে রমণী ব্যগ্র মুখে ফিরে এসে আবারও অবধূতের পায়ে পড়তে গেল। অবধূত আবার বাধা দিলেন। গম্ভীর অথচ নরম গলায় স্পষ্ট হিন্দীতে বললেন, এখানে না, ব্যস্ত হয়ো না, তুমি যে-জন্য এসেছ—পাবে। ভেজা জামা-কাপড় বদলে তোমার চটির ঘরেই অপেক্ষা করো—আমি আসছি। রমণী স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। অবধূত ফিরে চললেন। হঠাৎই আত্মস্থ হয়ে রমণী সেখান থেকে ছুটে বেরুতে চাইলো। সঙ্গে তার পরিচারিকা আর পুরুষটিও।

সে যে-দিকে গেল তার উল্টোদিকের রাস্তার বাঁকে প্রশান্ত মুখে অবধূত দাঁড়িয়ে। আমি কাছে যেতে হাসলেন একটু। বললেন, চলুন, আগে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

বেলা তখন বারোটা বেজে গেছে। কাছেই একটা চায়ের দোকানে ভাঁড়ের চা খেলাম। পেটো কার্তিক আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। সে-ও হাজির। তারও চোখে মুখে আগ্রহ উপচেপড়ছে। তার বাবার ক্ষমতার সে যেন তল-কূল পাচ্ছে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অবধূত এক-দিকে এগোলেন। আমি পাশে। অবধূত বললেন, এবার নাটকের পরের দৃশ্য দেখবেন চলুন।

—কিন্তু এই দৃশ্যই তো ভালো করে বুঝলাম না।...মেয়েটি কে?

— পার্বতী প্রসাদ।

—কোথাকার মেয়ে?

—সমস্তিপুর-দ্বারভাঙার কাঁকুড়ঘাটির।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছি।—এখানে কবে এসেছে?

—কাল বিকেল তিনটেয় দুধপুকুরে স্নান করে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে দেখলাম...কালই এসেছে।

—আপনি জানতেন মেয়েটি আসবে?

অবধূত হাসলেন।—না জানলে কোন্নগর ছেড়ে আমি আগে থাকতে এখানে এসে বসে আছি কেন? আগে এসে পাণ্ডা আর পুরুতদের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি—তাদের বলেছি, বাবার আদেশ পেয়ে একজন বড়ঘরের বিশিষ্ট অবাঙালী মহিলা বিহার থেকে এখানে আসছেন—আর বাবার আদেশে আমারও এখানে আসা। মহিলা যেন নির্বিঘ্নে তাঁর কাজ আর পুজো দিতে পারেন—কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে—তিনি এমনিতেই সকলকে অনেক দিয়ে যাবেন। মনে মনে ভাবলাম, প্রাপ্তির আশা ছাড়াও কালীকিংকরের এই ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা বা অবহেলা করার মতো পুরুত বা পাণ্ডা এখানে বোধ হয় নেই।

একটা মস্ত পুরনো দালানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এটাই এখানকার সব থেকে বড় যাত্রীনিবাস বোধহয়। নিচের তলাটা নোঙরা। সিঁড়ি ধরে আমরা দোতলায় উঠতে লাগলাম। সেই পরিচারিকা এবং পুরুষটি ছুটে এলো। হাত জোড় করে দু'জনে এক-সঙ্গে বলে উঠল, আইয়ে মহারাজ, আইয়ে—

দোতলার কোণের দিকে একটা ছোট্ট ঘর। যাত্রীনিবাসের সব ঘরই এমনি ছোট ছোট। মেঝেতে চাটাইয়ের ওপর একটা সুন্দর পুরু গালচে পাতা। এটার মালিক ঘর যার অধিকারে সেই, বোঝা যায়। যাত্রীনিবাসে চাটাই ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না। ঘরের কোণে ছোট বড় দুটো সুটকেস, সুটকেসের ওপর চকচকে একটা হোল্ডঅল ভাঁজ করা।

সেই রমণী উদ্‌গ্রীব মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। পরনে চওড়া কালো-পেড়ে সাদা জমিনের শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউস—আধ-ভেজা চুল পিঠে ছড়ানো। রমণীর শুচিসুন্দর আর এক রূপ। প্রত্যাশা আর উৎকণ্ঠায় ফর্সা মুখ লাল।

অবধূতকে দেখেই সসম্ভ্রমে কয়েক পা পিছনে সরে গেল। তিনি ভিতরে এসে দাঁড়াতে দুই পায়ের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। শুভ্র দুই বাহুতে পা দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।—আপ হি বাবা তারকনাথ হ্যায়, মিলা দিজিয়ে প্রভুজী—মিলা দিজিয়ে—

গম্ভীর গলায় অবধূত বললেন, মুঝে ভি বাবা তারকনাথ ইহাঁ ভেজা—ম্যায় উনকো দাস হুঁ—রো মাত্ পার্বতী, উঠো—জরুর মিল যায়গা।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসল, কিন্তু দু'হাতে পা দুটো ধরাই থাকল। এই লোকের মুখে নিজের নাম আর যে আশার কথা শুনল দুইই বোধহয় এমন চমকের কারণ। কোনো রমণীর চোখেমুখে এমন আর্তি এমন করুণ আকৃতি আর দেখিনি।

হিন্দীতে কথা বেশিরভাগ অবধূতই বললেন। উনি এমন পরিষ্কার হিন্দী বলতে কইতে পারেন জানা ছিল না।

—তুমি পার্বতী প্রসাদ তো?

—হাঁ প্রভুজী...!

—রতনলালের মেয়ে?

—হাঁ প্র ভুজী—হ্যাঁ!

—রতনলালবাবু কোথায় এখন?

একবার ওপরের দিকে চেয়ে জবাব দিল, পিতাজী গুজর গয়া মহারাজ...।

—কত দিন হলো মারা গেছেন?

—দো মাহিনা...।

—আর বেনারসীলাল? সে কোথায়?

কোনো রমণীর মুখে বিস্ময়ের এমন কারুকার্যও কি আর দেখেছি! ফ্যালফ্যাল করে একটু চেয়ে থেকে জবাব দিল, উও তো বহুত দিনসে কোই জেল মে হোগা...এক খুন কা আসামী বন্ গয়ে থে...উন্‌কা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হো চুকা।

নিজের দু'হাত জোড় করে একবার কপালে ঠেকালেন অবধূত। গলার স্বর আরো গম্ভীর, গভীর। —তোমার বাবা বা বেনারসীলাল নাগালের মধ্যে পেলে তোমার ছেলে বাঁচত না—এই জন্যেই তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাবা তারকনাথ তাকে রক্ষা করেছেন....আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ?

অবধূতের চাউনিতে সত্যিই কি জাদু আছে। উত্তেজনা উৎকণ্ঠা আকৃতি ভুলে পার্বতী তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সামান্য মাথা নাড়ল। বুঝতে পারছে। অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, লেকিন মেরা বচ্চা কাঁহা? আপ্ কওন্?

—আমি বাবা তারকনাথের দাস। তোমার ছেলে ভালো আছে। নিজের রিস্টওয়াচের ব্যাণ্ডে গোঁজা দুটো কাগজের টুকরো বার করলেন অবধূত। একটার ভাঁজ খুলে সামনে ধরলেন।—তোমরা আজই কলকাতায় গিয়ে রাতের গাড়িতে নিজের মুলুকে চলে যাও। সেখান থেকে বারো মাইল দূরের এই গ্রামে গিয়ে এই ঠিকানার মানুষদের কাছে যাবে। কাগজটা পার্বতীর হাতে দিয়ে দ্বিতীয় কাগজটার ভাঁজ খুললেন। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম ওটা একটা পাঁচটাকার নোটের আধখানা। ঠিক আধখানা করে কেটে নেওয়া। সেটাও বিমূঢ় পার্বতীর হাতে দিয়ে বললেন, গাঁয়ের সেই বাড়ির মালিক বা মালকানের হাতে এটা দেবে। তারা বাকি আধখানা নোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তোমার ছেলে দিয়ে দেবে।...সেই ছেলের

গলায় লাল সুতোয় বাঁধা একটা সোনার লকেট দেখতে পাবে। সেটা ভাঙলে তার মধ্যে তোমার ছেলের জন্মের তারিখ পরিচয় সব পাবে। কিছু খেয়ে আজই যাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও।

শুধু পার্বতী নয়, আমরাও চিত্রার্পিত। অবধূত ফিরে দাঁড়াতে পার্বতীরই প্রথম হুঁশ ফিরল। দু'হাত জোড় করে আকুল গলায় বলে উঠল, কৃপা করকে আপ সাথ চলিয়ে মহারাজ...মুঝে বহুত্, ডর লাগতা—

—বাবা তারকনাথের কৃপা আছে তোমার ওপর—কিচ্ছু ভয় নেই। আমি তোমার জন্য কয়েকটা দিন এখানেই অপেক্ষা করব—ছেলেকে পেলে তাকে নিয়ে সেই দিনই কলকাতা রওনা হতে চেষ্টা কোরো—এখানে এসে তার কল্যাণে ভালো করে পুজো দিয়ে যাবে—পাণ্ডা পুরুতদেরও খুশি করে যাবে। জয় বাবা!

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে আমি আর পেটো কার্তিক নিচে নেমে এলাম। রাস্তায় নেমে অবধূত পেটো কার্তিককে বললেন, আমরা হোটেলে গিয়ে বসছি—এরা কখন রওনা হয় দেখে তুই আয়।

হোটেলের টেবিলে মুখোমুখি বসার সঙ্গে সঙ্গে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বললাম, দেখুন এর পর আমার হার্টের ব্যামো ধরে যাবে—সব মিলিয়ে ব্যাপারখানা কি?

অবধূত বিমনার মতো হাসলেন একটু। বললেন, সব মিলিয়ে একটা ঘটনার শেষ। আমি ভাবছি...

আবার অন্যমনস্ক দেখে তাড়া দিলাম।—কি ভাবছেন?

—এমন কেন ঘটে?...কি করে হয়?...কে করে?

অর্ডার মতো আমাদের খাবার এসে গেল। একটু বাদেই পেটো কার্তিক হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত।—ওঁরা আর খাবার জন্যও অপেক্ষা করলেন না, সুটকেস আর হোল্ডঅল রিক্সয় তুলে তিন জনেই স্টেশনের দিকে চলে গেলেন।

অবধূত বললেন, ঠিক আছে, তুই বসে যা। খেতে খেতে আমার দিকে মুখ তুললেন একবার। হাসলেন।—খাবার বেশ গরম আছে, ব্যস্ত হবেন না, খেয়ে নিন, আপনাকে শুধু নাটকের শেষটুকু দেখা আর শোনার জন্য কলকাতা থেকে ধরে আনিনি।

...রাত্রি। কোন্ প্রহর উত্তীর্ণ আমার বা পেটো কার্তিকের হুঁশ নেই। দুটো চৌকিতে আমি আর অবধূত মুখোমুখি বসে। পেটো কার্তিক মেঝেতে বসে তার বাবার পা টিপেই চলেছে। হাত চলছে থামছে চলছে, দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর। উদগ্রীব, দু'কান উৎকর্ণ।

আমারও তাই।

একটার থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বড় প্যাকেটের আধখানার ওপরে খালি। ঢিলে তালে ধীরে-সুস্থে অতীতের এক বিচিত্র ঘটনার যবনিকা তুলেছেন কালীকিংকর অবধূত।

৫

মনে মনে আর না ফেরার সংকল্প নিয়ে কালীকিংকর ঘর ছেড়েছিলেন এখন থেকে আরো আট

বছর আগে। ফিরতেই যদি হয়, একই মানুষ ফিরবে না—ফেরা না ফেরা সমান এমন মানুষই ফিরবে। কারো ওপর রাগ অভিমান বা অভিযোগ ছিল না। নিজের কাছে নিজেই তিনি সব থেকে বড় বিঘ্ন।এই বয়সেও ভোগ তাঁকে টানে, প্রবৃত্তির আকর্ষণ অমোঘ হয়ে ওঠে। দেশে দেশে তাঁর ভক্তসংখ্যা অনেক। এত ভক্ত জুটিয়ে দিয়ে কেউ যেন আড়াল থেকে মজা দেখছে। তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠার লোভ মনের তলায় বাসা বেঁধেছে বই কি। এই সব বন্ধন তাঁকে ছিঁড়তে হবে, শিকল ছিঁড়ে বেরুতে না পারা পর্যন্ত মুক্তি নেই। সেই মুক্তির রূপ কেমন জানেন না। ভোগ-প্রবৃত্তি লোকমান্য সব একদিকে ফেলে রেখে ঝাড়া হাতে-পায়ে শুধু বেরিয়ে পড়ার তাগিদ। কোথায় যাচ্ছেন কত দিনের জন্য যাচ্ছেন কল্যাণীকে বলেননি। কল্যাণীও কিছু জিগ্যেস করেননি। এটাই তাঁর রীতি। তবু এবারে বোধহয় মনে একটু খটকা লেগেছিল। মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিগ্যেস করেছিলেন, কি আশায় যাচ্ছ...কি পেতে চাও?

—আশার শেষ করতে। পেতে চাই না, ছাড়তে চাই।

আবার জিগ্যেস করলেন, কি ছাড়তে চাও?

পরিহাসের মতো করে সব থেকে বড় সত্যি কথাটাই বললেন। হ্যাঁ, ভিতরে ভিতরে এই বন্ধনের শিকলটাই ছেঁড়ার বেশি তাড়া। এই একজন যেন তাঁর জীবনে স্থির জলাশয় একখানা। ভোগের আর প্রবৃত্তির তাড়নায় তাঁর বুকে আলোড়ন তুললে ঢেউ ওঠে, তরঙ্গ ছড়ায়। তারপর আবার যেমন স্থির শান্ত—তেমনি। হেসে জবাব দিলেন, সব থেকে আগে তোমাকে।

হাসলেন কল্যাণীও।—পালিয়ে গিয়ে পালানোই হয়,. ছাড়া হয় নাকি? ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেই ঐশ্বর্য ছাড়তে হয়, পালালে সেটা তোমাকে আরো বেশি টানবে।

মনে দাগ ফেলার মতোই কথা। এমন ছাড়ার মর্ম অবধূতও জানেন। কিন্তু বিবাহিত জীবনের প্রায় চব্বিশটা বছর কেটে গেছে, ভোগের মধ্যে থেকেও নিবৃত্তির শক্তি তিনি অর্জন করতে পারেননি। চোখের বার মনের বার—এ-ও তো একটা কথা। তিনি বেরিয়েই পড়লেন।

বিহারের দিকে কেন রওনা হলেন তার স্পষ্ট কোনো কারণ নেই। কেবল মনে হয়েছে ও-দিকটাতেই খুব কম যাওয়া হয়েছে। চেনামুখের উৎপাত ওখানেই সব থেকে কম হবে। ট্রেনের জনসাধারণের কামরায় গাদাগাদি ভিড়। টিকিট কেটেছেন, রিজারভেশনের বালাই নেই। এতো লোকের মধ্যে একেবারে বিচ্ছিন্ন থকেই চললেন তিনি। এই বেরুনোর প্রস্তুতি অনেক দিন ধরেই চলছিল। ছ'মাস আগেথেকে চুল-দাড়ি কাটেননি, মাথায়ও তেলের ছোঁয়া পড়েনি। দিব্বি শনের মতো চুলদাড়ি জটাজূট গজিয়েছে। পব নর বা গায়ের রক্তাম্বরও নজর কাড়ার মতো ঝকঝকে সিল্কের নয়। বরং মলিন। কাঁধের মস্ত গেরুয়া ঝোলায় আরো দু'প্রস্থ জামা-কাপড়—সুযোগ-সুবিধে পেলে এ-ও ত্যাগ করার ইচ্ছে আছে। ঝোলাতে কিছু টাকা অবশ্য আছে কিন্তু খুব বেশি নয়। সঙ্গে একটা চিমটে আর ত্রিশূল। সব মিলিয়ে কারো চোখ প্রসন্ন হবার মতো মূর্তি নয়, উল্টে হয়তো বিমুখ হবার মতো। টিকিট চেকার তো ভিড়ের মধ্যে উঠে তাঁকেই প্রথম অব্যর্থ শিকার ভেবে হামলার মূর্তি ধরেছিল— ওই ' উতর যাও। অর্থাৎ এ-রকম ভণ্ড সাধু তার অনেক দেখা আছে।

—কাঁহে জী?

—টিকিট হ্যায়?

ঝোলা থেকে টিকিট বার করে দেখালেন। ভালো করে সেটা পরখ করে ফেরত দিতে অবধূত করুণাপ্রার্থীর মতো জিগ্যেস করলেন, উতরনে পড়েগা সাব?

—নহি, ঠয়ের যাও।

পরদিন সমস্তিপুর ছাড়িয়ে ট্রেন দ্বারভাঙায় আসতে কি ভেবে নেমে পড়লেন। ঘটনার আসরে বিশেষ কিছু ভূমিকা আছে বলেই নেমেছেন এমন চিন্তা কোনো কল্পনার মধ্যেও নেই। নিজের ইচ্ছে আর নিজের খেয়ালটুকুই সব ভেবেছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর যেখানে এলেন তার নাম কাঁকুরঘাটি। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বিশ্রামের জন্য একটা বড় অশ্বত্থ গাছ পছন্দ হলো। কিন্তু খিদে পেয়েছে। একটা দোকান থেকে কিছু মুড়ি আর গুড় কিনে আর ঝোলার কমণ্ডলুতে খাবার জল নিয়ে গাছতলায় বসলেন। যাতায়াতের পথে লোকজনেরা সাধুকে দেখছে, কিন্তু লক্ষ্য করার কোনো কারণ নেই। হামেশাই এ-রকম সাধু দেখে অভ্যস্ত তারা।

সন্ধ্যার পর আবার গুটি-গুটি এগোতে লাগলেন। ভিখিরি গোছের একটা লোককে জিগ্যেস করলেন, শ্মশান কোন্ দিকে, কত দূরে। সে জানান দিল সোজা গেলে আধক্রোশ দূরে, কমলাগঙ্গার ধারে।

গ্রামের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে উত্তরমুখী কমলাগঙ্গা বয়ে চলেছে। কমলাগঙ্গার উৎস নেপাল পর্বতমালা। দূরে পারাপারের রেলব্রিজ। জয়নগর পেরিয়ে আরো এগোলে নেপাল-বর্ডার। গঙ্গার দক্ষিণদিকে মস্ত এলাকা জুড়ে শ্মশান। পাঁচ-ছ'বিঘে হবে। এ-দিকে লোকালয় বা জন-বসতি নেই। খানিক দূরে চালাঘরে খুব গরিব মানুষদের সংসার। শ্মশানে বড় বড় অনেক বট অশ্বত্থ আর দেবদারু গাছের সারি। এ-ছাড়া বেল আর অন্য কিছু ছোট গাছও আছে। এই নির্জন শ্মশান ভারী পছন্দ হলো অবধূতের। এ-মাথা ও-মাথা একবার ঘুরে দেখলেন। পরে জেনেছেন, এখানকার লোকের কাছে এই শ্মশান মহাশ্মশান। তারা একে মুদ্দাঘাট বলে। কিন্তু ঘাট বলতে বোঝায় সে-রকম কিছু নেই। তবে যে জায়গায় বেশি দাহ হয় সে-জায়গার চেহারা একটু অন্যরকম। দিনমানেও এই শ্মশানে লোক যাতায়াত কম, রাতে যারা শবদাহ করতে আসে তারা দল বেঁধেই আসে। এই নিথর নির্জন মুদ্দাঘাট সাধারণ লোকের কাছে গা-ছমছম-করা ভয়ের জায়গা হওয়াই স্বাভাবিক।

রাত বোধহয় বেশি নয়। হাত-ঘড়ি কলকাতাতেই বিসর্জন দিয়ে এসেছেন অবধূত। কিন্তু মনে হয় অনেক রাত। একটা জোড়া বট আর অশ্বত্থ গাছ এক হয়ে বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছটাই পছন্দ হলো অবধূতের। আর কিছু না হোক, কোথাও গেলে অবধূতের সঙ্গে ছোট টর্চ একটা থাকেই। ঝোলায় আছে। ঝোলায় অনেক কিছুই আছে। হঠাৎ দরকার হতে পারে এমন কিছু সাধারণ রোগের ওষুধ-বিষুধও। ক্ষুধা, তৃষ্ণা তো আর একটুও ত্যাগ হয়ে যায়নি। এ-জন্যে খুব নিরাসক্তভাবে লোক টানতেই হবে। লোক টানার এগুলোই বড় সম্বল। মুশকিল আসান হলে লোকের বিশ্বাস সহজে গজায়।...টর্চের জন্য ঝোলায় হাত ঢুকিয়েও সেটা আর বার করলেন না। শীতের মাঝামাঝি সময় এটা। কার্তিকের শুরু। এখানে

বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। শীত জয় করার অভ্যাস তারাপীঠে থাকার সময় থেকেই। ভৈরবী মায়ের গায়ে ভরা শীতেও কখনো গরম জামা বা ভারী আচ্ছাদন দেখেননি। আর বাবা তো শীত-গ্রীষ্মে নির্বিকার। ভৈরবী মা বলেছিলেন, এটা অভ্যাসের ব্যাপার বাবা, একটু একটু করে অভ্যাস করলে সকলেই পারে। অবধূত অভ্যাস করেছিলেন। তাই ঠাণ্ডার ভয়ে কাতর নন তিনি। মাথায় যা এসেছে রাতের মধ্যেই সেটুকু সম্পন্ন করবেন। এই বেশ-বাসও ছাড়ার তাগিদ। টর্চ বার করলেন না, কারণ চারদিকে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। তাছাড়া অন্ধকারে সাধারণ লোকের তুলনায় তাঁর অনেক বেশি চোখ চলে বইকি। এ-দিক ও-দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকালেন। খানিকটা দূরে একটা নিভু-নিভু চুল্লির কাছে কিছু চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলেন। যা ভেবেছিলেন তাই। মড়ার বড়সড় ফেলে-দেওয়া চাটাই একটা। চাটাই আর চুল্লি থেকে একটা আধা-জ্বলা চেলা-কাঠ নিয়ে গাছতলায় ফিরলেন।

গাছতলায় চাটাই পেতে তার ওপর ঝোলা থেকে বড় একটা লাল কম্বলের আসন বার করে ওটার ওপর বিছিয়ে গদি করলেন। আসন প্রস্তুত। এরপর সম্পূর্ণ নগ্ন, উলঙ্গ তিনি। ঝোলা থেকে একটা চওড়া কৌপীন বার করে পড়লেন। মলিন লাল-বসন ঝোলায় পুরে আবার সেই প্রায়-নিভু চুল্লির কাছে চললেন। চুল্লি থেকে তপ্ত ছাই তুলে তুলে কপালে বাহুতে বুকে আর দু'পায়ে মেখে ফিরে এসে আসনে বসলেন। চিমটেটা পাশে রেখে ত্রিশূল মাটিতে পুঁতে দিলেন।...একটা মড়ার মাথার খুলি পেলে ভালো হতো। কাল দিনের বেলায় খোঁজ করবেন।

দূরের এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে এটা অনুমান করার কোনো কারণ নেই। হঠাৎই মনে হলো একটা লোক এ-দিকে এগিয়ে আসছে। এলো। সামনে এসে দাঁড়ালো। বেশ মজবুত কাঠামোর একটা মানুষ। মিস-কালো গায়ের রং। চওড়া জুলফি চিবুকের কাছে নেমে এসেছে। পুরুষ্টু গোঁপ। গোল চোখ। পরনে খাটো ধুতি। উর্ধ্ব অঙ্গে একটা ছেঁড়া-খোঁড়া গরম কম্বল জড়ানো। হাতে লম্বা একটা নিভনো মশাল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বয়েস চল্লিশের ও-ধারে। কম্বল সরাতে দেখা গেল গায়ে হাঁটুসমান একটা ছেঁড়া গরম কোর্তা। পকেট থেকে দেশলাই বার করল। তেলে ভেজানো মশালটা জ্বেলে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেখতে লাগল। মশালের উষ্ণ তাপ খুব আরামের মনে হলো অবধূতের।

—তুম্ কওন? লোকটা জি' ্যস করল।

গুরুগম্ভীর গলায় অবধূত পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুম্ কওন?

এর পরে— এব পরে কেন, অবধূতের এই শ্মশানে তিন বছর অবস্থানকালে সকলের সঙ্গে সব কথাবার্তাই দেশোয়ালি হিন্দীতে। কিন্তু এই লেখকের হিন্দীর বিদ্যে এতই সীমিত যে এরপর থেকে সব কথাবার্তার ভাবই বাংলায় বিস্তার করছি।

লোকটা দাপটের সঙ্গে জবাব দিল, আমার নাম কাল্লু— কাল্লু কি চীজ্ এ মুলুকের সকলেই জানে, দূর থেকে তোমাকে আমি কৌপীন পরে ছাই মেখে সাধু বনতে দেখলাম— কোথায় কি করে এসে ভোল বদলাচ্ছ?

ঠাণ্ডা মুখে অবধূত বললেন, আমার ভোল নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, যাও এখন এখান থেকে!

এই শ্মশানের লাগোয়া কাল্লুর ডেরা এবং সংসার। এখানে তাঁর একচ্ছত্র দাপট। গাঁয়ের মানুষদের বেশির ভাগই গরিব। তাদের বিপদে কাল্লু শস্তায় কাঠ যোগান দেয়। অবস্থাপন্ন ঘরের শব এলে টাকার জন্য জোরজুলুম করে। টাকার বিনিময়ে সে আর তার সাগরেদরা সাহায্য করে। মোট কথা কাল্লু সর্দারকে কেউ খুব তুচ্ছ করে না। তার মধ্যে একটা উটকো লোক এখানে এসে সাধু সেজে এমন আস্পর্ধার কথা বললে সে বরদাস্ত করে কি করে। তাছাড়া এখানকার মানুষদের মতিগতি জানে। শ্মশানে ছাই-মাখা সাধু বসে আছে দেখলে পাঁচ দশ পয়সা বা বড়লোক হলে সিকি আধুলি টাকা ফেলে পুণ্যি করে যাবে। এ-যেন তারই ভাগে থাবা বসানো। তার মেজাজ আরো উগ্র, কারণ পেটে হাড়িয়া পড়েছে।

হাতের মশাল তাঁর দিকে বাড়িয়ে হুমকি দিল, এক্ষুণি এখান থেকে ভেগে পড়বে তো পড়ো—নইলে কাল্লু সর্দার এই শ্মশানেই তোমার সৎকার করবে। জলদি ভাগো!

এ-সব লোককে বশ করার মতো কিছু ক্ষমতা এতকালে অবধূতের হয়েছে বইকি। মশালের আলো দাড়ি-গোঁপ জটাজুট ছাওয়া মুখের ওপর পড়তে আরও সুবিধে হলো। দু'চোখের অগ্নিদৃষ্টি লোকটার মুখের ওপর বিদ্ধ হয়ে রইল। না, সম্মোহন বা বশীকরণ বিদ্যে বলে কিছু যদি থেকেও থাকে অবধূত তা জানেন না। কিন্তু এই দৃষ্টির আঘাতে অনেক জোরালো মানুষকেও বিভ্রান্ত হতে দেখেছেন। এই লোকটাও একটু থমকেছে বটে, তবু ফিরে চেয়ে থেকে দাপটের সঙ্গেই যুঝছে। হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ত্রিশূলটা তুলে নিলেন অবধূত। দাপট যারা দেখায় তারা দাপটের কাছেই নত হয়। সজোরে যেন ছুঁড়েই মারলেন ওটা—কাল্লু এক-লাফে তিন পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু না...ত্রিশূল ছোঁড়া হয়নি, সামনেই মাটিতে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

শ্মশান কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন অবধূত। এই হাসিতে লোকটার শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত নামার কথা কিছুটা। তাই হলো বটে। বিস্ফারিত চোখে দেখছে তাঁকে। চেয়ে আছেন অবধূতও। হাসিটা এবারে তাঁর চোখে আর দাড়ি-গোঁপে নিঃশব্দে এঁটে বসতে লাগল। খুব কোমল গলায় বললেন, তুই তো ভালো লোক রে কাল্লু, তোর এই মেজাজ কেন—খুব হাড়িয়া টেনেছিস বুঝি—সেরকম লোকের পাল্লায় পড়লে তো জানে মরবি!

কাল্লু চেয়েই আছে। লোকটার সাহস দেখছে, তাই ক্ষমতা যাচাইয়ের চোখ।

—ভয় নেই, এ-দিকে আয়—মশালটা ত্রিশূলের পাশে পুঁতে দে।

—পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। এখনো অবিশ্বাস আবার সংশয়ও। জোরে ঘাঁই দিতে মশালের অপেক্ষাকৃত সরু দিকটা মাটিতে বসে গেল। কংকালমালী ভৈরবের ডেরায় চার বছরে প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড তাপে দেহ অকাতর রাখার অভ্যাস অনেকটা রপ্ত হয়েছিল। কিন্তু অনেক কালের অনভ্যস্ততার ফলে নদীর ধারের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে বিঁধছিল। সেই অভ্যাসের মধ্যে ফিরে যাওয়া আর সেই সঙ্গে নিজেকে সংস্কারমুক্ত করার তাগিদেই অবধূত বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন।...মশালের এই তাপটুকু ভালো লাগছে।

—বোস্।

কাল্লু সর্দার সামনে বসল।

অবধূত আবার স্থির অপলক চোখে খানিক চেয়ে রইলেন। মায়ের এই শিক্ষাটুকু ব্যর্থ তো

হয়ইনি, অভ্যাসে অভ্যাসে উল্টে অনেক ধারালো হয়েছে। উপলব্ধি স্বচ্ছ হয়েছে। স্নায়ুর ষষ্ঠ অনুভূতিও প্রখর।

—দাপট দেখিয়ে বেড়াস, ভিতরে তো তুই এক নম্বরের ভীতু রে—দেখি হাত দুটো বাড়া তো—

সঠিক না বুঝে দু'হাত উল্টো করে বাড়ালো। এখনো সংশয়টা ঘোচেনি।

—হাত সোজ কর্ বুদ্ধু কোথাকারের।

বুদ্ধু শুনে চনমন করে উঠল একটু। তবু হাত সোজা করল।

অবধূত দেখলেন খানিক।—তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে তোর?

এবারে বিমূঢ় একটু। মাথা নাড়ল। তাই।

—বউটা তো দেখছি রোগে ভুগে আধ-মরা—নিজে নেশা-ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকিস—বউ-ছেলে-মেয়েকে দেখিস না? এবারে ধমকের সুর।

কাল্লু সর্দার বিলক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর দু'চোখ বিস্ফারিত। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দু'হাতে দুই পা আঁকড়ে ধরল।—হাঁ বাবা, আমি বহুত্ পাপী—আমার বহুর বেমার সারছে না—তুমি কৃপা করে তাকে আরাম করে দাও বাবা—আমার গোস্তাকি মাফ করে দাও—এই আমি কান মলছি—

—ঠিক আছে, আমাকে দেখে তুই ক্ষেপে গেছলি কেন সত্যি করে বল্?

উঠে বসল। নেশা ছুটে গেছে। জোয়ান লোকটা এখন ভয়ে কাঁপছে। হাত জোড় করে জানান দিল, লাল জামা-কাপড় খুলে ফেলে কৌপীন পরে আর ছাই মেখে তাঁকে সাধু বনে যেতে দেখে সে ভণ্ড ভেবেছিল— লোকে এসে না বুঝে পয়সা দেবে, তাতে তার ক্ষতি হবে ভেবে তার মেজাজ বিগড়ে গেছল।

অবধূত হাসলেন—ঠিক আছে যা, তোর রোজগার আগের থেকে ঢের বাড়বে—কিন্তু তুই দেখবি আমাকে যেন কেউ বেশি বিরক্ত না করে।

হাত জোড় করেই আছে কাল্লু সর্দার, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, সে জরুর দেখবে।

কাল্লু সর্দারের রোজগার ঢের বাড়বে এটা অবধূতের কোনো দৈববাণী নয়। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু জ্ঞান তাই থেকেই বলেছেন। বাসনা-ত্যাগ লক্ষ্য, মানুষের সেবা-ত্যাগ নয়। উপকার পেলে লোকে আসবেই। এই কাল্লুই এরপর প্রচারের কাজ করবে। শ্মশানের সাধুকে তারা টাকা পয়সা দিয়ে যাবে জানা কথাই। তাঁ্ন তো কেবল জীবনধারণ নিয়ে কথা, টাকা-পয়সার লোভ নেই। নির্লিপ্তভাবে মানুষের উপকার করার ইচ্ছে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কারো মায়ায় জড়ানোর ইচ্ছে আদৌ নেই। তাই প্রথম চেলা কাল্লু সর্দারকে এ-ভাবে হুঁশিয়ার করা।

—তোর বহুকে কাল নিয়ে আসিস, দেখব কি করা যায়।

আশ্বাস পেয়ে কাল্লু সর্দারের মুখে কথা সরে না। জোড়-হাত করেই রইলো।

অবধূত চার-দিকে তাকালেন। এদিকে-ওদিকে বড় বড় কালো পাথর পড়ে আছে। ষষ্ঠ স্নায়ু আবার প্রখর। তাঁর যে জীবন তাতে মানুষের বিশ্বাস আসল পুঁজি। এই বিশ্বাস সংস্কারাবদ্ধ তা-ও জানেন। কিন্তু নিরাপদে এখানে কিছু-কাল কাটাতে হলে খুব নিরাসক্তভাবে এই পুঁজিও

ভাঙানো দরকার। বললেন, শোন্, এখানে কোথাও শ্মশান-কালীমাতাজী নিজেকে গোপন করে রেখেছেন। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এখানে আসা। তুই আর নিজেকে পাপী বলে পাপ বাড়াবি না— তোর অনেক পুণ্যি, তোর এখন অনেক কাজ, আজ যা, কাল বলব।

জোড়-হাত করে যেন করুণা ভিক্ষা করল কাল্লু সর্দার।— মহারাজের সেবার কি ব্যবস্থা হবে?

ক্ষুধা তৃষ্ণা আর তেমন নেই অবধূতের। কিন্তু মশালের আলো কমে আসতে বেশ শীত-শীত করছে।— তোর ঘরে হাড়িয়া আছে?

কাল্লু বিগলিত।—জি মহারাজ।

আবার একটু ভাবলেন।—গাঁজা?

কাল্লু সর্দার ছুটল। গাঁজা এলো, নতুন কল্কে এলো। সঙ্গে তিন-চারজন সাঙ্গ-পাঙ্গ। যে সাধুকে দেখে সর্দারের বুকের তলায় আনন্দের কাঁপুনি আবার ভয়ও, সে-যে পয়-লম্বর গোছের একজন তাতে আর সন্দেহ কি? পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে কাঁকুড়ঘাটি শ্মশানের সাধুর আবির্ভাব রাষ্ট্র হয়ে গেল। নিচু শ্রেণীর, নিম্নমধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্তদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল।...সাধুর আশ্চর্য ক্ষমতা, শ্মশানের মাটি খুঁড়ে শ্মশানকালীকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই শ্মশানকালী সুন্দর মসৃণ একখণ্ড কালো পাথর। অবধূত তেল-সিঁদুরে তাকে মায়ের আকারে এনে পুজো শুরু করেছেন। মা যে জাগ্রত তাতে আর সন্দেহ কি, সাধুকে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে কাল্লু সর্দার শুনেছে, তার সাকরেদরা শুনেছে। বাবার শীত তাপ জ্ঞান নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ নেই। মায়ের ওষুধে কাল্লু সর্দারের অমন বেমারি বউটাকে প্রায় সারিয়ে তুলেছে। এ-সব কথা বাতাসে তিনগুণ হয়ে ছড়ায়।

নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য, বন্ধনমুক্ত হবার জন্য পাহাড়ের গুহা-গহ্বরে আশ্রয় খোঁজেননি অবধূত। পরিচিতের বেষ্টনী ছেড়ে তিনি অপরিচিতের বেষ্টনীতে এসেছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ বেশি কাম্য। এদের মধ্য থেকে নিজের অনুশীলন যতটা এগোয়, নিবৃত্তির পথ যতটুকু প্রশস্ত হয়। নিজের ভিতরটাকে যদি পদ্মপত্রের মতো করে তুলতে পারেন—এরা যত-খুশি তার ওপর দিয়ে জলের মতো গড়িয়ে যাক— কোনো-রকম দাগ পড়তে না দেওয়াই তাঁর নিবৃত্তি সাধনা।

নিজেকে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই সেবার ধারা একটু বদলেছেন অবধূত। কেউ আবেদন নিবেদন বিস্তার করতে বসলে রেগে যাবার ভান করেন। যারা আসে, কাল্লু সর্দার বুঝিয়ে দেয়, বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই। বাবা অন্তর্যামী। কৃপা হলে বাবা নিজেই ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই কৃপা যদি চাও, বাবার কাছে এসে চুপচাপ বসে থাকো। বাবা শুধোলে বলবে। না শুধোলে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতেও যেও না।

...বক্রেশ্বরে মানুষের সেবার ব্যাপারে ভৈরবী-মায়ের যা ছিল সব থেকে বড় পুঁজি— সেই মনঃসংযোগ আর দৃষ্টি সঞ্চালন বিদ্যের ওপরেই সব থেকে বেশি নির্ভর করতে চাইলেন অবধূত। মা বলতেন, মনের স্থির সংযোগ হলে নিজের অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়, দৃষ্টি সঞ্চালন আয়ত্তে এলে মানুষের ভিতরের অদেখা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত ঘুরে আসা যায়। মুখ

দেখে লক্ষণ জানা আর চেনাটাই এখন তন্ত্রসার অবধূতের কাছেও।

প্রতিদিন এই মহড়াই চলেছে। কোন্ রোগের কি লক্ষণ, দেহে বা মুখে তার প্রকোপ আর চাপ মোটামুটি তাঁর আয়ত্তের মধ্যেই। তবু চট করে কাউকে বিধান দিয়ে বসেন না, ধৈর্য পরীক্ষার অছিলায় সময় নেন। তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ সেই দৃষ্টি সকলে সহ্যও করতে পারে না, ভিতরের যন্ত্রণা বা ব্যাকুলতা তাতে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন নিশ্চিন্ত জোরের সঙ্গেই মুশকিল আসানের পথ বাৎলে দেন।—এই রোগ পুষলি কি করে? আরো এতদিন ভোগান্তি আছে তোর—মায়ের কৃপায় সেরে যাবে—এই এই করগে যা।

অন্যত্র যা, এখানেও তাই। রোগ আর ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরই ভিড় বেশি। ফলে অবধূতের সুবিধেও বেশি। দেখতে দেখতে ধন্বন্তরী হয়ে উঠলেন গাঁয়ের মানুষদের কাছে। কিন্তু এখানে সাধুর আচরণ দেশের মানুষদের কাছে যেমন, তেমন নয়। এখানে নিজের চারধারে এক নির্লিপ্ত কঠিন আচারণ রচনা করে সকলের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন তিনি। ভক্তরা ফলমূল দুধ চিঁড়ে গুড় ছাতু দই সিকি আধুলি টাকা রেখে যায়। অবধূত ফিরেও তাকান না। আঙুলের ইশারায় সে-সব কাল্লু সর্দার তুলে নিয়ে যায়। তার দিন ফিরছে বটে। সেই সঙ্গে বাবার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা তুঙ্গে। বাবার আহার নাম-মাত্র। তা-ও প্রায় একাহারী। রাতে মদ গাঁজা সামান্য ভাজাভুজি ছাড়া আর কিছু রোচে না। কোনো অমাবস্যার রাতে বাবার একটু মাংস খাবার সাধ হলে কাল্লু সর্দার আনন্দে নৃত্য করে। বাবার কল্যাণে সর্বদা তার ঘরে তো কত কি মজুত এখন, বাবাকে মনের সাধে খাওয়াতে পারলে সে বর্তে যায়। কিন্তু তার কি জো আছে! একবার মাথা নাড়লে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার হিম্মত নেই। এমন তাকাবেন যে আত্মারাম ত্রাসে থরো-থরো। কেবল অরুচি নেই মদে গাঁজায়। এ-দুটি রোজ রাতেই চলে। টাকার আমদানি বেশি হলে কাল্লু সর্দার দিশি জিনিস না এনে গঞ্জের বড় দোকান থেকে ভলো মদ কিনে নিয়ে আসে। বাবার খাওয়া হলে সে-ও প্রসাদ পায়। নেশা বেশি হয়ে গেলে আর ঘরে ফেরারও শক্তি থাকে না—বাবার পায়ের কাছে সটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু সকলেই তা বলে রোগের তাড়নায় সাধুর কাছে আসে না। অভাবের তাড়নায় বা ভাগ্য ফেরানোর তাগিদে যারা তাঁর কাছে আসে অবধূত তাদের মুখ দেখলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু এ-ছাড়াও মানুষের সমস্যার শেষ নেই, সংকটেরও শেষ নেই। মুখের লক্ষণ দেখে এই সমস্যা বা সংকট আঁচ করার পরীক্ষার মধ্যেও অবধূত নিজেকে ফেলেছেন। ফেলছেন।

পর পর পরীক্ষায় তিনি আশ্চর্যভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে একটাই নিজের ক্রেডিট ভাবেন। এক-জোড়া মেয়ে-পুরুষ আসছে দশ-বারো মাইল দূর থেকে। স্বামী-স্ত্রী। অনন্তরাম আর লাজবন্তী। ছেলেটির বছর বত্রিশ-তেত্রিশ বয়েস, আর মেয়েটির সাতাশ-আটাশ। বর্ধিষ্ণু চাষী পরিবার, নিজেদের টাট্টু-ঘোড়ার গাড়িতে আসে। নিজে যেচে সমস্যা বা সংকট জানানোর রীতি নেই। সাধুর কৃপা হলে তিনি দেখবেন, বুঝবেন, দরকার হলে প্রশ্ন করবেন। এই দম্পতী একে একে তিন দিন এলো। দু'দিন একঘণ্টা ধরে চুপচাপ বসে থেকে চলে গেছে।... অবধূত তাদের দেখেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন। না, দু'জনের কারো কোনো ব্যাধির হদিস পান নি, আর্থিক অনটনেরও না। দু'দিনই পাঁচ টাকা করে প্রণামী রেখে গেছে। যেখানে পাঁচ-দশ পয়সা

বা সিকি আধুলিই বেশি পড়ে সেখানে পাঁচ টাকা অনেক। মেয়েটির বেশ মিষ্টিমুখ, লক্ষ্মীশ্রী, অথচ ভিতরে কোনো অপূর্ণ বাসনায় কাতর বোঝা যায়। ...কে? কি প্রত্যাশা?

তৃতীয় দিনে একটু সতর্ক হয়েই সাধু তাদের দিকে মনোনিবেশ করলেন। ঝকঝকে দু'চোখ তুলে লাজবন্তীর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। তারপর গলার স্বর খুব নরম করে বললেন, মায়ি, তোমার ভিতরে মায়ের স্নেহ, এই স্নেহ দিয়ে অন্যের ছেলে-মেয়েদের কাছে টেনে নেওয়া যায় না, নিজের ছেলে-মেয়ে ভাবা যায় না?

অনুমানে ভুল হয় নি। লাজবন্তী সাধুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বাবার আর্শীবাদে তার নিজের কি কোনো সন্তান হতে পারে না?

অবধূত স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এর পরে আর সমস্যা কিছু নেই।—বাঁ-হাতখানা দেখাও তো?

দেখলেন। মাথা নাড়লেন। তুমি অপরের ছেলে-মেয়ের মা হবে। তাইতেই তোমার মাতৃস্নেহ সার্থক হবে। গরিব ছেলে-মেয়েদের কাছে টেনে নাও—আনন্দ পাবে।

লাজবন্তীর এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে সন্তান আসে নি। সাধুর কথায় অখণ্ড বিশ্বাস, আর আসবেও না। তাঁর বিধান শিরোধার্য করে সেই আনন্দের পথেই পা ফেলেছে। অতি দুস্থ অনাথ তিনটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে নিজের কাছে এনে সন্তান-স্নেহে প্রতিপালন করছে। তাদের জন্য

আবার বাবার আর্শীবাদ প্রার্থনা করতে এসেছে। সাধুর ছেলেমানুষের মতো আনন্দ দেখে সকলে অবাক। ওই শিশুদের আর্শীবাদ করার জন্য বাবা নিজের আসন ছেড়ে উঠেছেন। বলেছেন, তুই সত্যিকারের মা হয়েছিস রে বেটি, তোর ঘরে গেলেও পুণ্য, চল্, তোর ঘরে গিয়ে তোর ছেলেদের আর্শীবাদ করব।

সকলকে হতবাক করে সত্যি সাধু তাদের টাট্টু ঘোড়ারগাড়িতে চেপে লাজবন্তীর ডেরায় এসেছেন। বাচ্চাগুলোকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে মঙ্গল কামনা করেছেন। সাধুব এই কৃপা পেয়ে লাজবন্তী আর অনন্তরাম জন্ম সার্থক ভেবেছে। সকলে তাদেরও ধন্য ধন্য করেছে। বছর ঘুরতে সাধুর নাম অনেক দূরে দূরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মোটামুটি অবস্থাপন্ন যারা, দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে না পড়লে তারা সাধারণত ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। চট করে দৈবের পিছনে বা সাধুর পিছনে ছোটে না। এরা এলে বুঝে নিতে হয় এদের প্রত্যাশা অন্য কিছু। রোগাক্রান্ত হলে তো মুখ দেখেই অবধূত অনেকটা বুঝতে পারেন। দু'বছরের মাথায় এ-পর্যায়ের একজনের যাতায়াত শুরু হতেই কাল্লু সর্দার বাবাকে সাবধান করেছে। লোকটির নাম শান্তাপ্রসাদ। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। এক-কালে বড় অবস্থার মানুষ ছিল। ব্যবসায় নেমে তার অনেকটাই খুইয়েছে। জমিজমার অনেক বন্ধকে চলে গেছে। অনেক টাকা ঋণ। কিন্তু এখনো ঠাট বজায় রেখেই চলে ভদ্রলোক। শান্তাপ্রসাদ রাতের দিকে নির্জনে আসে সাধুর কাছে। পায়ের কাছে একটা করে বিলিতি মদের বোতল রাখে। এই জিনিসটি পেলে সাধু সব থেকে খুশি হন সে বুঝে নিয়েছে। নিজের কোনো আর্জি পেশ করে না। এসে প্রণাম করে চুপচাপ বসে থাকে আবার এক সময় প্রণাম করে চলে যায়।

কাল্লু সর্দার তার আনা মদের ভাগ অর্থাৎ প্রসাদ অপছন্দ করে না। কিন্তু মানুষটার ওপর সন্দিগ্ধ। বাবার ভালো-মন্দের থেকে তো আর মদ বেশি নয়। তাই বাবাকে সতর্ক করেছে, শান্তাপ্রসাদ যদি তার শত্রুকে ঘায়েল করার মতলব নিয়ে এসে থাকে তাহলে বাবার তাকে পাত্তা না দেওয়াই ভালো। কারণ সেই শত্রু বড় ভীষণ শত্রু। এই শত্রুর নাম রতনলাল। সমস্ত কাঁকুড়ঘাটিতে তার মতো বড় অবস্থার মানুষ আর একজনও নেই।

রতনলাল দৌলতরামের ছেলে। আসলে বাপের নাম ছিল রামলাল। তার এত দৌলত আছে বলেই লোকের মুখে মুখে সে দৌলতরাম হয়ে গেছল। রতনলালের বাবা দৌলতরাম আর শান্তাপ্রসাদের বাবা সরযূপ্রসাদ খুব বন্ধু ছিল। সরযূপ্রসাদ ছিল বেপরোয়া দিলদরিয়া গোছের মানুষ। তার অনেক রকমের আধুনিক ব্যবসার প্ল্যান মাথায় গজাতো। বড়লোক হতে গিয়ে বন্ধু দৌলতরামের কাছে অনেক টাকা ঋণ করেছিল। শেষে অর্ধেকের বেশি জমিজমা বন্ধক দিয়ে আবার নতুন ব্যবসায় নেমেছে। তাতেও মার খেয়ে হঠাৎ হার্টফেল করে মরেছে। ফলে শান্তাপ্রসাদের ঋণ এখন গলা পর্যন্ত। সুদে আসলে এই ঋণ বাড়ছেই। কিন্তু বেঁচে থাকতে দৌলতরাম বন্ধুর ছেলেকে সেজন্য কোনোদিন বিপাকে ফেলেনি। বরং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বাপের ঋণ শোধ করার পরামর্শ দিয়েছে।

শান্তাপ্রসাদ বিপাকে পড়েছে দু'বছর আগে দৌলতরাম মারা যেতে। কর্তৃত্ব এখন তার একমাত্র ছেলে রতনলালের হাতে। এই ছেলেকে দৌলতরাম কোনোদিন বিশ্বাস করত না। ছেলেবেলা থেকেই সে মন্দ রাস্তায় হাঁটা শুরু করেছে। বাপ অনেক চেষ্টা করেও তাকে বশে আনতে পারেনি। চরিত্র শোধরানোর জন্য দৌলতরাম অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। একটা মেয়ের জন্ম দিয়ে সেই বউটা অকালে মরেছে। ছেলের চরিত্র শোধরাবে না ধরে নিয়েই দৌলতরাম আর বিয়ের তাগিদ দেয়নি। ছেলেও বিয়ে না করে ফুর্তির রাস্তাই বেছে নিয়েছে। বিরাট ধনীর একমাত্র চরিত্রহীন বদমেজাজী ছেলে হলে যা হয় রতনলাল তাই। দৌলতরামের একমাত্র সম্বল তার নাতনী পার্বতী—বুড়োর চোখের মণি।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ রতনলাল কিছুটা টিট তার এই বাপের কাছে। ছেলের তুলনায় বাপের বুদ্ধি অনেক বেশি ক্ষুরধার। নত হলে এই ছেলে তাকেই ছোবল মারবে জানে। তার ওপর সর্বদাই ছড়ি উঁচিয়ে চলত। কাজের সুবাদে আট দশটি যোয়ান লোক তকে ঘিরে থাকত। এক কথায় পাহারা দিত। কোতোয়ালির সঙ্গেও দৌলতরামের বন্ধু সম্পর্ক। যত বেপরোয়াই হোক, এই বাপের সঙ্গে রতনলাল এঁটে উঠতে পারত না খুব। তাছাড়া আসল জিনিস অর্থাৎ দৌলতরামের সমস্ত দৌলতের চাবির নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত কোমর বেঁধে লাগার সুযোগ বা সাহসও নেই। বাপ মুখে তো সর্বদাই হুমকি দিচ্ছে ত্যাজ্যপুত্র করবে, কাজেও কখন তা করে বসে ঠিক নেই। তাই বুদ্ধিমানের মতো রগচটা বাপকে না ঘাঁটাতেই চেষ্টা করে। তাঁর হুকুম-মতো ব্যবসা আর কারবার দেখে। সপ্তাহের মধ্যে চার পাঁচদিন তাকে দ্বারভাঙায় গিয়ে থাকতে হয়। সেখানে দৌলতরামের সারের ব্যবসা, আর মস্ত স্টেশনারি দোকান। অনেক বিশ্বস্ত লোকজন কাজে বহাল আছে—কিন্তু ছেলেকে সেখানেও দৌলতরাম তাদের মনিবের জায়গায় বসায়নি। মনিব দৌলতরাম নিজে, ছেলে সব থেকে বেশি মাইনের কর্মচারী মাত্র। কিন্তু অন্য বিশ্বস্ত

কর্মচারীরাও কি তাবলে নিজেদের ভবিষ্যৎ বোঝে না? ভবিষ্যতে এই ছেলেই যে সব-কিছুর সর্বেসর্বা হবে কে না জানে। তাই তলায় তলায় এরা প্রায় সকলেই রতনলালের অনুগত।

দৌলতরাম কাঁকুড়ঘাটির মস্ত গোডাউন আর তেজারতি অর্থাৎ সুদের কারবারটি সম্পূর্ণ নিজের হাতে রেখেছিল। সারের ব্যবসা আর স্টেশনারি দোকান ছাড়াও এই সুদের কারবার থেকেই তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা।

...দৌলতরাম মারা যাবার পর থেকেই শান্তাপ্রসাদের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। শান্তাপ্রসাদকে রতনলাল কোনোদিনই দু'চক্ষে দেখতে পারত না। লেখাপড়া জানা মানুষ হিসেবে বাপ তাকে স্নেহ করত বলে তার ওপর আরো রাগ। ধারদেনা শোধ করার জন্য সে এখন প্যাঁচ কষছে— হুমকির পর হুমকি দিচ্ছে। রতনলালের সমস্ত কর্মের দোসর বেনারসীলাল। এই বেনারসীলাল রতনলালের সব থেকে বড় হাতিয়ার।

বেনারসীলালকে ভয় করে না গাঁয়ে হেন লোক নেই। সকলের ধারণা, বেনারসীলাল করতে পারে না এমন কুকর্মও নেই। বয়সে বেনারসীলাল রতনলালের থেকে কম করে দশ বারো বছরের ছোট। কিন্তু আসল বয়েস সত্ত্বেও দু'জনে হরিহর আত্মা। তার প্রধান কারণ মাত্র আঠেরো বছর বয়সে দামাল ছেলে বেনারসীলাল অব্যর্থ মৃত্যু থেকে রতনলালকে বাঁচিয়েছিল।...বর্ষায় এক-একবার কমলাগঙ্গা ভীষণ রূপ ধরে। সেই ভয়ংকর সময়ে একটা বড় নৌকাডুবি হয়েছিল। রতনলাল সাঁতার পর্যন্ত জানে, জানা সত্ত্বেও সেই অঘটনে অনেক লোক মরেছে। অবধারিত মৃত্যুযোগ ছিল রতনলালেরও। কিন্তু একজন সাগরেদের সাহায্যে বেনারসীলালই তাকে বাঁচিয়েছিল। বাঁচাতে গিয়ে বেনারসীলাল মরতেই বসেছিল।...এই ঋণ রতলনালের বাবা দৌলতরামও অস্বীকার করতে পারেনি। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ওই ছেলেকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিল। তার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। তেমন সুমতি থাকলে এই ছেলে কালে দিনে দৌলতরামের ডান হাত হয়ে বসতে পারত। তার বদলে বেনারসীলাল তার মহাশ্রদ্ধার দাদার অর্থাৎ রতনলালের ডান হাত হয়ে বসতে পারাটাই অনেক বেশি কাম্য ভেবেছিল।...পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালো ছিল, কিন্তু নিজের চরিত্রগুণে আর সঙ্গদোষে বেশি এগোতে পারে নি। দু'বছর না তিন বছর দৌলতরাম তাকে ডাক্তারি পড়িয়েছিল। সমস্ত খরচের দায় তার। কিন্তু ততদিনে সে স্ব-মূর্তি ধরেছে। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে রতনলালের যোগ্য সাগরেদ হয়ে বসেছে।... রতনলাল আর বেনারসীলাল—এই দুই লালের দাপটে গাঁয়ের মানুষ দারুণ তটস্থ। শুধু গাঁয়ের মানুষ কেন, দ্বারভাঙার সারের ব্যবসা আর স্টেশনারি দোকানের কাজের লোকেরাও।

সেখান থেকে বাপের চোখে ধুলো দিয়ে ফি-মাসে রতনলাল যদি নিজের বরাদ্দ ছাড়াও মোটা টাকা টেনে নেয়, কার হিম্মত আছে সেটা খোদ মালিককে জানিয়ে দেবে? উল্টে দুই লালের হুকুমমতো তাদের দু'নম্বরি হিসেবের খাতা তৈরি রাখতে হয়। সকলে জানে, রতনলালের অর্থ-বল আর বেনারসীলালের গুণ্ডা-বল—এই দুই বলের রাজ-যোগে তারা একেবারে অজেয়। কাল্লু সর্দার অবশ্য এত কথা তার বাবা মহারাজকে গুছিয়ে বলতে পারেনি। কিন্তু অবধূত যতটুকু বোঝার বুঝে নিয়েছেন। চেলার মতে রতনলাল মানুষটা ক্ষেপে না গেলে

অত ভয়ংকর নয়, কিন্তু বেনারসীলাল যাকে বলে কালকেউটে। তাই শান্তাপ্রসাদ যদি ওই শত্রুদের ঘায়েল করার মতলবে বাবার কাছে ভিড়ে থাকে, বাবার তাহলে তাকে বর্জন করাই ভালো—কারণ, ওই দুই লাল রুষ্ট হলে আগুন জ্বলতে সময় লাগে না। তাদের অসাধ্য কর্ম নেই।

...ডাক্তার না হয়েও বেনারসীলাল গাঁয়ের গরীব মানুষদের কাছে ডাক্তার হয়ে বসেছে। মেজাজের মাথায় চিকিৎসা করে, ওষুধ দেয়, সুঁই চালিয়ে নিজের হাত পাকায়। বড় বড় ফোড়াও ফালা-ফালা করে কেটে দেয়। তার হাতে পড়ে অনেক গরীব লোক মারা পড়েছে। অনেকে ক্ষত-ঘা বিষিয়ে মরেছে। কিন্তু কার সাহস আছে মুখে রা কাটে? তাছাড়া কেন কি হয় গরিব মানুষেরা বোঝেই বা কতটুকু? রোগ সারলে তারা বরং দু'হাত তুলে বেনারসীলালের সুখ্যাতি করে।...কিন্তু কাল্লু সর্দারের মতো অনেকেই আবার জানে, নিজের বউকেই সুঁই ফুটিয়ে মেরেছে বেনারসীলাল। ওষুধের বদলে ইচ্ছে করে বিষ দিয়েছে। এই শ্মশানেই ওই বউয়ের দাহ হয়েছে। কাল্লু সর্দার কাঠ যুগিয়ে রতনলালের কাছ থেকে মোটা বকশিশ পেয়েছে। বেনারসীলালের বিপদে আর শোকে রতনলাল তো পাশে থাকবেই। ছিলও।

...কিন্তু কাল্লু সর্দার হলপ করে বলতে পারে বিষে নীল বর্ণ হয়ে গেছল বউটার সব্ব-অঙ্গ। মরার সময়েও চোখ চেয়ে মরেছে। মরার পরেও নাকি সেই চোখে ভয় ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

কিন্তু শান্তাপ্রসাদকে কেন যেন অবধূতের আদৌ খারাপ লাগত না। লোকটা ভিতরে ভিতরে বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তায় কাতর। হতাশায় ডুবতে থাকলে মানুষ যেমন কাউকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, এই লোকও আর কোনো পথ না পেয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরে আছে মনে হয়। তাছাড়া অবধূত অনেক কিছু ছাড়তে পেরেছেন—কিন্তু মদের নেশা তাঁর বেড়েই চলেছে। শান্তাপ্রসাদ বোতল নিয়ে এলে সেদিন খুব আনন্দে মুখ বদলানো হয়। নেশায় চুর হয়ে থাকেন।

এমনি মৌজের মাথায় একরাতে শান্তাপ্রসাদকে সাফ বলে দিলেন, যতই সরাব খাওয়াও আমার দ্বারা কারো দুশমনি করা সম্ভব হবে না—তোমার মতলবও হাঁসিল হবে না—এই মতলব নিয়ে এসে থাকলে কেটে পড়ো।

হাত জোড় করে শান্তাপ্রসাদ বলল, আমি কারো দুশমনি করতে চাই না বাবা, তুমি কেবল একটি ছেলেকে আর একটি মেয়েকে রক্ষা করো।...আমি তোমাকে কয়েক দিন লক্ষ্য করার পর রাতে স্বপ্ন দেখেছি, তুমিই তাদের রক্ষা করেছ, তাদের মিলিয়ে দিয়েছ—তার পর থেকেই তুমি ওদের কৃপা করবে আমি সেই আশায় আছি।

সেই তৃতীয় অবস্থায় অবধূত মন দিয়েই তার আর্জি শুনেছেন। কারণ এরকম আবেদন অপ্রত্যাশিত।

...ছেলেটি শান্তাপ্রসাদের ভাইপো রুদ্রপ্রসাদ। নিজের দুটো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—তার ছেলে বলতে এই ভাইপো। রুদ্রপ্রসাদ এম. এ. পাশ, দ্বারভাঙার এক সরকারী অফিসে ভালো চাকরি পেয়েছে। কালে দিনে অনেক উন্নতি হবে।... মেয়েটি হলো রতনলালের মেয়ে পার্বতী। তার বয়েস এখন কুড়ি পেরিয়েছে। এবারেই বি. এ. পাশ করেছে। ওই মেয়ের ষোলো বছর বয়সে দাদু দৌলতরাম তার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পার্বতী বেঁকে বসেছিল বিয়ে

করবে না। দৌলতরাম তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ব্যবসার চৌদ্দ আনা এই নাতনীর নামে উইল করে রেখেছিল। ছেলের মতিগতি জানত বলেই তাকে ব্যবসা আর বিষয়সম্পত্তির দু'আনার বেশি দেয়নি। উইলে স্পষ্ট নির্দেশ, পার্বতীর বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে ব্যবসা আর বিষয়সম্পত্তির চৌদ্দ আনা ভাগ বুঝিয়ে দিতে হবে। ষোলো বছর বয়সে পার্বতী বিয়ে করতে রাজি হয়নি বলেই দৌলতরামের এই কড়া নির্দেশ। উইল রেজিস্ট্রি হয়ে আছে। শান্তাপ্রসাদ সেই উইলের একজন সাক্ষী। অতএব রতনলাল চেষ্টা করেও সেই উইল নাকচ করতে বা কোনোরকম কারচুপি করতে পারছে না। তার মেয়ের বিয়ে দেবারও কিছুমাত্র আগ্রহ নেই, কারণ বিয়ে দিলেই ব্যবসা আর বিষসম্পত্তির চৌদ্দ-আনা হাতছাড়া।

কিন্তু ষোলো বছরের মেয়ে পার্বতী কেন অবাধ্য হয়ে বিয়েতে আপত্তি করেছিল দৌলতরাম তলিয়ে ভাবেনি। আর রতনলালের তো তা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত নেই।...ভাইপো রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে পার্বতীর ছেলেবেলা থেকেই ভাবসাব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রগাঢ় প্রণয়ের দিকে গড়িয়েছে। কিন্তু বাপের চরিত্র জানতো বলেই পার্বতী সেটা কখনো প্রকাশ করেনি। তার আশা ছিল, বছর কয়েক সময় পেলে সে বি. এ. পাশ করবে আর তার মধ্যে রুদ্রপ্রসাদও পাশ-টাশ করে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আর এ বিয়েতে বাধা থাকবে না, ব্যাপার বুঝলে দাদুর রাগও পড়ে যাবে। দাদু সহায় থাকলে বাবা বড় রকমের বাধা কিছু দিতে পারবে না।

...কিন্তু সকলেরই ভাগ্য মন্দ। দাদু দৌলতরাম চোখ বুজে বসল।

এখন বিয়েতে বাধা নেই। কিন্তু সব থেকে বড় বাধা রতনলাল আর তার সহচর বেনারসীলাল। এদের প্রণয়ের ব্যাপারটা তারা জানতে পারলেই বিপদের সম্ভাবনা। এমন কি ভাইপো রুদ্রপ্রসাদের প্রাণসংশয় হতে পারে। শান্তাপ্রসাদের বেশি দুর্ভাবনা বেনারসীলালকে নিয়ে। এই শয়তান রতনলালের অন্ধ বিশ্বাসের মানুষ। কিন্তু পার্বতী তার মতলবের আভাস পেয়েছে অনেক আগে। বয়সে সে পার্বতীর থেকে তেরো -চৌদ্দ বছরের বড়। বাবার অন্তরঙ্গ সহচর হিসেবে আগে তার আচরণ ছিল এক-রকম। অনেকটা কাকার মতো। এখন তার হাব-ভাব বদলাচ্ছে। নানাভাবে সে পার্বতীর মন পাবার চেষ্টা করছে। কারণ দাদুর উইলের ব্যাপারটা খুব বেশি রাষ্ট্র হয়নি, রতনলাল যথাসাধ্য সেটা গোপন রাখতে চেষ্টা করছে— কিন্তু তা বলে বেনারসীলালের তো আর জানতে বাকি নেই। সাক্ষীদের বাদ দিলে সে সবার আগে জানে। তার মতলব বুঝেও পার্বতীকে চুপচাপ সহ্য করে যেতে হচ্ছে। হৃদ্যতার ভাবও বজায় রাখতে হচ্ছে। কারণ এতটুকু বিদ্রোহের আভাস পেলে সেই শয়তান কোন্‌দিক থেকে বজ্রাঘাত হানবে ঠিক নেই।

...পার্বতী আর রুদ্রপ্রসাদ এত বড় বাধা সত্ত্বেও এখন বিয়ে করতে চায়। যে-কোনোভাবে একবার বিয়েটা হয়ে গেলে পরের ব্যবস্থা পরে। বিয়ের পরে তারা রতনলালের সঙ্গে ব্যবসা আর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আপোস মীমাংসায় আসতে চাইলেও সে বাধ্য হয়ে রাজি হবে। শান্তাপ্রসাদের আবেদন সাধুজীকে এই বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে হবে। এখানে এই শ্মশানকালীর সামনে তন্ত্রমতে সাধুজীকে নিচু শ্রেণীর মধ্যে তিন-চারটে বিয়ে দিতে দেখেছে। নিচু শ্রেণীর বিয়ে হতে পারলে উঁচুশ্রেণীরই বা হতে পারবে না কেন? আর সাধুজী ছাড়া গতি নেই, কারণ

কাঁকুড়ঘাটিতে এমন কারো বুকের পাটা নেই যে রতনলাল আর বেনারসীলালকে উপেক্ষা করে এমন বিয়ে দিতে রাজি হবে। তাই সাধুজীই ভরসা।

...শান্তাপ্রসাদের প্ল্যান ছকাই আছে। সপ্তাহের মধ্যে চার দিন রতনলাল বেনারসীলালকে নিয়ে দ্বারভাঙায় থাকে। পার্বতী ছেলেবেলা থেকে জানকীবাঈয়ের কাছে মানুষ। সে তার দাসীও বটে আবার মায়ের মতোও বটে। সে-ও চায়, যে-কোনোভাবে রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে পার্বতীর বিয়েটা হয়ে যাক। সাধুজী রাজি হলে রতনলাল আর বেনারসীলালের অনুপস্থিতিতে সংগোপনে এই বিয়ে হয়ে যেতে পারে। যতদিন দরকার এই বিয়ে গোপন রাখার দায়িত্ব শান্তাপ্রসাদ রুদ্রপ্রসাদ আর পার্বতীর। বাবা দয়া করে বিয়েটা দিয়ে দিন।

...কাঁকুরঘাটির মহাশ্মশানে বসে মদের নেশায় তিনিও তক্ষুণি রাজি হয়ে গেছলেন। কেবলমাত্র মদের নেশায় বললে ঠিক হবে না। এমন দুটি ছেলে মেয়ের মিলন কাম্য মনে হয়েছিল তাঁর। নিজের আপদ বিপদ ভয়ডরের বালাই কোনোদিনই বিশেষ ছিল না।

দশ দিনের মধ্যে মহাশ্মশান কালীর সামনে সেই বিয়ে তিনি দিয়েছেন। বিয়ের সাক্ষী সপরিবারে কাল্লু সর্দার আর তার জনাকতক অনুচর। শান্তা প্রসাদ আর তার স্ত্রী। আর রদ্রপ্রসাদের খুব বিশ্বস্ত একজন ফটোগ্রাফার বন্ধু। সাধু আগেই বলে দিয়েছিলেন, মালাবদল আর শুভদৃষ্টির সময় যেন বর-কনের ফোটো তুলে রাখা হয়—ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে।

...বিয়ের কনে পার্বতী কৌপীন-পরা জটাজূটধারী সাধুর দিকে ভালো করে তাকাতেও পারেনি। আর সাধুও আকণ্ঠ মদ গিলে শুভ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

বিয়ের তিন মাসের মধ্যে সাধুর মাথাতেই যেন বজ্রাঘাত।...তাঁর বিশ্বাস, মুখ দেখে তিনি আয়ুর লক্ষণও বুঝতে পারেন। অন্তত সমূহ ফাঁড়া-টাড়া থাকলে তাঁর মনে ছায়া পড়ে। কিন্তু বিয়ে দেবার সময় মদের নেশায় এই ছেলে অর্থাৎ রুদ্রপ্রসাদের দিকে কোনো বিচারের চোখ নিয়ে তাকাননি। বিয়ে দেবার উদ্দীপনাই তাঁর বড় হয়ে উঠেছিল।...আর হয়তো বা কেউ কোনোরকম গণ-অঘটনের বলি হলে তার আভাস তিনি পান না। সেইরকম অঘটনই ঘটেছে তিন মাসের মধ্যে। রুদ্রপ্রসাদের কর্মস্থল দ্বারভাঙায়। সে বাসে যাতায়াত করত। সেই যাতায়াতের পথে প্রহরাশূন্য লেভেল-ক্রসিং পড়ে একটা। এ-রকম লেভেল-ক্রসিং-এর সংখ্যা ভারতে কম নয়। অঘটন না ঘটা পর্যন্ত কারো টনক নড়ে না। ফেরার সময় আবছা অন্ধকারে বাস-ভর্তি যাত্রী অঘটনের বলি হয়েছে। ছুটন্ত ট্রেন-এঞ্জিনের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিরিশ--পঁয়ত্রিশটি প্রাণ গেছে। তাদের মধ্যে রুদ্রপ্রসাদ একজন।

...শান্তাপ্রসাদ সাধুর কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। না, তখনো পর্যন্ত পার্বতীর বিয়ের খবর রতনলাল বা বেনারসীলাল জানে না। মেয়ের উন্মাদ দশা দেখে তারা প্রণয়ের ব্যাপারটাই শুধু বুঝেছে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এমন একটা ব্যাপার চলছিল, ফলে এতবড় একটা অঘটনের দরুণ তারা অখুশি হয়নি। কিন্তু তাদেরও টনক নড়েছে আরো দু'তিন মাস যেতে। পার্বতী অন্তঃসত্ত্বা। আর তখনো পাগলের মতোই অবস্থা তার।

রতনলাল আর বেনারসীলালের নিষ্ঠুর জেরার মুখে পড়ে জানকীবাঈ সত্যি কথা প্রকাশ করেছে। তিন মাস আগে শ্মাশানের সাধুজী নিজে পার্বতীর সঙ্গে রুদ্রপ্রসাদের বিয়ে দিয়েছেন—

সে -কথা বলেছে। আর মালিকের অনুপস্থিতিতে রুদ্রপ্রসাদ ফি সপ্তাহে এখানে এসে দুই এক রাত থাকত তা-ও কবুল করেছে।

রতনলাল আর বেনারসীলাল দুজনেরই মাথায় খুন চেপেছিল। তবু রতনলালের মাথা আগে ঠাণ্ডা হয়েছে। দুজনেই শান্তাপ্রসাদের বাড়ি এসে শাসিয়ে গেছে, এ বিয়ে কোনো বিয়েই নয়—যদি প্রাণের মায়া থাকে তো সে যেন এনিয়ে টুঁ-শব্দও না করে। ধনে-প্রাণে বধ হবার ইচ্ছে যদি না থাকে, তাকে মুখ সেলাই করে থাকতে হবে। পার্বতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে তখন কর্তব্য বিবেচনা করা যাবে। আর বেনারসীলাল হুমকি দিয়েছে, ওই সাধুকে কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মশানেই দেহ রাখার ব্যবস্থা সে করবে—তবে তার নাম বেনারসীলাল।

...না, তখনো অবধূত নিজের এই জীবনটার জন্য খুব উতলা বোধ করেননি। পার্বতীর দুরবস্থার কথা ভেবেই তাঁর ভিতরটা দুমড়ে ভেঙেছে।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন শান্তাপ্রসাদ মাঝে মাঝে আসে। সাধু তাকে আশ্বাস দেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভেবো না। কেন আশ্বাস দেন, কি করে দেন নিজেও জানেন না। মনে হয়, তাই বলেন। শান্তাপ্রসাদের খবর, প্রতিবেশীদের কাউকে কিছু জানতে বুঝতে না দিয়ে অর্ধ-উন্মাদ মেয়েকে রতনলাল তার এক খামারবাড়িতে নিয়ে রেখেছে। জান্‌কীবাঈয়ের জবাব হয়নি, কারণ সে পালিয়ে গেলে মুখ খুলবে। তার থেকে বহাল রেখে সর্বদা তাকে ত্রাসের মধ্যে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। মুখ খুললেই মৃত্যু অনিবার্য, এটাই তাকে বোঝানো হয়েছে।

... রতনলাল আর বেনারসীলালের মতলব পরে বোঝা গেছে। তারা পার্বতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায় ছিল। রতনলাল আশা করছিল, পার্বতীর যা দশা তাতে পেটের সন্তান বাঁচবে না। আর বাঁচলেও এই সন্তানকে বেশিক্ষণ সে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখতে দেবে না। কারণ এই সন্তানই রতনলালের এখন সব থেকে বড় দুশমন। তাকে বাঁচতে দিলে বা বাড়তে দিলে তো ধনদৌলত সব-কিছুর চৌদ্দ আনার অধিকার এই সন্তানের আর তার মায়ের। ভবিষ্যতের এই কাঁটা রতনলাল জিইয়ে রাখবে এমন নির্বোধ সে নয়। বিশেষ করে যাকে সে শত্রু ভাবে, এই সন্তান সেই শান্তাপ্রসাদের ভাইপোর ছেলে। তাকে বিয়ে করাটাই নিজের মেয়ের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ভাবে সে।

...কিন্তু এই দুনিয়ায় ঘটনার সাজ বড় অদ্ভুত। কে ঘটায় কে সাজায় অবধূত জানেন না। সেইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কারো বুদ্ধির চমক দেখা দেয়, কারো বা মতিভ্রম হয়, বুদ্ধিনাশ হয়। এমন কি চরম মুহূর্তে বিচিত্র খেয়াল চাপে মাথায়। এই সবকিছুর সমাবেশ সেই এক ভীষণ দুর্যোগের রাতে।

...রাতে বারোটার পরে, পার্বতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মৃত নয়, জীবিত। খামারবাড়িতে উপস্থিত ছিল জান্‌কীবাঈ। কিন্তু সে তখন অঘোর ঘুমে। তার ঘুমের ব্যবস্থা সময় বুঝে বেনারসীলাল করে রেখেছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ করানোর দায়িত্ব পুনিয়ার মা নামে এক দাইয়ের। তার পাকা হাত পাকা মাথা, কিন্তু তেমনি লোভী আর বেপরোয়া মেয়েছেলে। টাকা পেলে কোনো কাজই অসাধ্য ভাবে না।

...জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে দুটো আঙুলের চাপে তার শ্বাসরুদ্ধ করতে কতক্ষণ? আরো

সুবিধে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে পার্বতী এমনিতেই বেহুঁশ। তবু বেনারসীলালের নির্দেশে তাকে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই শিশুর গলায় হাত দিতে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আর ঘুমন্ত মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কেন যেন পুনিয়ার মায়ের হাত বার বার কেঁপে উঠতে লাগল। মৃত সন্তান প্রসব হলে তাকে কমলাগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি। দোরগোড়ায় গাড়িও প্রস্তুত।

...কিন্তু পুনিয়ার মায়ের হাত বার বারই কাঁপছে। শ্মশানের সেই মহাযোগী ভীষণ সাধুর কথা পুনিয়ার মা-ও জান্‌কীবাঈয়ের মুখে শুনেছে। নিজেও তাঁকে দেখেছে। শ্মশানকালীর সামনে সেই সাধুই নাকি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। জান্‌কীবাঈয়ের আশা, স্বামী মরলেও সাধুর কৃপায় এই সন্তান নিয়ে পার্বতী আবার ভালো দিনের মুখ দেখবে। পুনিয়ার মায়ের বার বার মনে হতে লাগল, পাপ হাতে এই শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করলে শ্মশানের সাধুর কোপে তার সর্বনাশ অবধারিত।

...আর ঠিক সেই সময়েই এক বিচিত্র খেয়াল ভর করল বেনারসীলালের মাথায়।

...কমলা-গঙ্গায় যখন এই শিশুকে ভাসিয়ে দিতে যেতেই হবে, তাকে আর মারার দরকার কি? একে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগার মতো শীত, তার ওপর বৃষ্টি। কমলাগঙ্গায় যাবার পথেই ওই শিশু আপনি মরবে। ...তার পরেই আবার এক খেয়ালের চমক মাথায়। কমলাগঙ্গাতেই যদি যাবে, তাহলে শ্মশানে নয় কেন? একই সঙ্গে সেখানকার সেই সাধুর মাথাতেই বা চরম দিন ঘনাবে না কেন? এমন মওকা আর কি জীবনে আসবে?

বেনারসীলাল পুনিয়ার মা-কে হুকুম করল, মারার দরকার নেই। যেমন আছে তুলে নিয়ে শ্মশানঘাটে আসতে হবে। নিজে প্রস্তুত হয়ে চারজন সাগরেদকে সঙ্গে নিয়ে রতনলালের পুরনো মোটরগাড়িতে উঠল। মোটরগাড়ি এ তল্লাটে একমাত্র রতনলালেরই আছে। এই সময় সেটা সমস্তক্ষণই বেনারসীলালের হেপাজতে।

এই দুর্যোগের রাতে অবধূতের চোখে ঘুম নেই কেন জানেন না। তিনি তাঁর ছাপরাঘরে বসেই আছেন। প্রথম শীতেই কাল্লু তার জন্য ঘর তুলে দিয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি বছরই বর্ষা আর শীত আসার আগে এই ঘর সংস্কার করে দেয়—বাবার যাতে কষ্ট না হয়।

দুর্যোগের রাত বলেই অবধূতের নেশার মাত্রা বেশি চড়েছিল। কিন্তু এই গভীর রাতেও তাঁর চোখে ঘুম নেই। ...না, নেশার দরুন হোক বা যে-কারণে হোক, কোনো গাড়ি-টাড়ির শব্দ তাঁর কানে আসেনি। হয়তো বা ঝিমুনি এসেছিল, হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে দেখেন ছোরা আর লাঠি হাতে চার-পাঁচজন গুণ্ডাগোছের লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অন্য রকমের একটা ছুরি হাতে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে সে-ই যে একদা ডাক্তারি-পড়া বেনারসীলাল তা-ও জানেন না। চোখের ইশারায় লোকগুলো সাধুকে চেপে ধরল, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বেনারসীলাল তাঁর হাত উল্টে কনুইয়ের তলার দিকের শিরার ওপর ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিয়ে সজোরে টেনে আনলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

ব্যাপারটা ঘটতে বোধহয় এক মিনিটও লাগল না। সঙ্গের মেয়েটাকে হুকুম করল, ওটাকে এই ব্যাটার সামনে শুইয়ে দাও এবার—দশ মিনিটের মধ্যেই ঠাণ্ডায় জমে মরবে।

সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, হাতের বড় শিরা কেটে দিয়েছি—ব্লিডিং হয়ে হয়ে রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। সকালে যারা এসে দেখবে তারা ধরে নেবে, তান্ত্রিক-ক্রিয়া করার জন্য এই ব্যাটা কারো সদ্যজাত শিশু চুরি করে এনেছে। কিন্তু সেই ক্রিয়া করতে গিয়ে ব্যাটা নিজেও মরেছে, শিশুও মরেছে। বেনারসীলালের সঙ্গে টক্কর দেবে এমন সাধু এখনো মায়ের পেটে।

...এ ক্ষেত্রেও আবার ঘটনার সাজ। বেনারসীলাল নিজেও দেদার মদ গিলে এসেছিল, কিন্তু তা বলে তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না। সেই দুর্যোগের রাতে সে ওই শিশুকে আর সাধুকে তাদের নিশ্চিত পরিণামের দিকে ঠেলে দিতে পারা বিশ্বাস নিয়েই ফিরে গেছে। আর সাধু যদি দৈবাৎ নাও মরে, তাহলে রুষ্ট জনতার মারেই মরবে। কারণ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য শিশু চুরি করে আনাটা কেউ বরদাস্ত করবে না। নেশার ঝোঁকে সে-যে নিজের পরিচয় জাহির করে গেল, এ-খেয়াল তার বা অন্য কারো নেই।

অবধূত প্রথমে এতই হতচকিত যে তিনিও চোখের সামনে অবধারিত মৃত্যুই দেখেছেন। কিন্তু আত্মস্থ হতে খুব সময় লাগেনি। ঘরের কোণে চেলা-কাঠের আগুন জ্বলছে এখনো। কিন্তু তার আলো স্পষ্ট নয় খুব। ক্ষিপ্র হাতে অবধূত ঝোলা থেকে টর্চ বার করলেন। হাতের ক্ষত কনুইয়ের তলা পর্যন্ত গভীর। কিন্তু বেনারসীলাল যা ভেবেছে তা নয়। শিরা কাটেনি। ছুরি পিছলে এসেছে। কেবল গভীর ক্ষত দিয়েই গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

সেই রক্তাক্ত হাতে শিশুটাকে টেনে এনে কম্বল চাপা দিলেন। আধা-জ্বলা চেলা-কাঠগুলো সামনে এনে যথাসাধ্য তাপের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করলেন। তারপর নিজের শুশ্রূষায় মন দিলেন। বড় রকমের কাটা-ছেঁড়ার ওষুধ তাঁর কাছে মজুত থাকেই। ওষুধ লাগিয়ে একটা কৌপীন দিয়ে খুব শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতে দেখলেন, রক্ত চুঁইয়ে ব্যাণ্ডেজ ভিজে যাচ্ছে।

আপাত আর কিছু করার নেই।

ঝোলা থেকে সেই পুরনো লাল চেলি আর ফতুয়া বার করে পরলেন। লোকের দেওয়া দু'তিনটে ছোট বড় মোটা কম্বল পড়ে আছে। একটা তুলে নিজের গায়ে জড়ালেন, অন্যটাতে শিশুটিকে মুড়ে বুকে তুলে নিলেন। বৃষ্টি নেই, কিন্তু জোর বাতাস দিচ্ছে। রাস্তায় বেরুলে এই শীতের কামড় থেকে শিশুটাকে বাঁচানো যাবে কিনা কে জানে। তিনি শুধু চেষ্টাই করতে পারেন। ...শীত আর দুর্যোগের একটাই সুবিধে। পথে মানুষ ছেড়ে কুকুর বেড়ালও নেই। একবারও না থেমে একটুও না বসে প্রায় তিন ঘণ্টা হেঁটে ছ'ক্রোশের ওপর পথ পেরিয়ে এলেন।

...এখানেই অনন্তরাম আর লাজবন্তীর বাড়ি।

... ঘটনা কে সাজায়? নইলে তিন বছরের মধ্যে অবধূত কোনোদিন শ্মশান ছেড়ে নড়েননি। তার মধ্যে এসেছিলেন কেবল এই অনন্তরাম আর লাজবন্তীর বাড়ি—তাদের পালিত ছেলেমেয়ে তিনটেকে আশীর্বাদ করতে। না এলে আজ নিশুতি রাতে তাদের এই ডেরার হদিস পেতেন কি করে? সে-দিন কার খেলা কে খেলেছিল? রাত তখন সাড়ে চারটে প্রায়, কিন্তু ভোর হতে অনেক দেরি। এই শীতে ছ'টার আগে আলো জাগে না। ঠুক-ঠুক করে দরজায় ঘা দিতে লাগলেন। কোনোরকম হৈ-চৈ কাম্য নয়।

অনন্তরাম দরজা খুলে আঁতকে চেঁচিয়েই উঠল, কে? এই রাতে কে তুমি? অন্ধকারে আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দেওয়া সাধুজীকে তার এখানে কল্পনা করারও কথা নয়। গলা শুনে লাজবন্তী হারিকেন হাতে আলুথালু অবস্থায় ছুটে এসেছে।

—চুপ! চেঁচাস না! আমি কমলাগঙ্গার মুন্দাঘাটের সাধু—আমাকে ভিতরে নিয়ে চল।

অনন্তরাম আর লাজবন্তীর দেহের রক্ত-চলাচল থেমে যাবার উপক্রম। হারিকেন মুখের ওপর তুলে দেখে সত্যিই সেই সাধু। তাঁকে ভিতরে এনে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে এসে কম্বলের আড়াল থেকে বুকের শিশুকে লাজবন্তীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন—নে ধর, এটাকে যদি বাঁচাতে পারিস তাহলে তোর মাতৃত্বের জোর বুঝব!

অনন্তরাম আর লাজবন্তী ভয়ে বিস্ময়ে দিশেহারা। হাড়কাঁপানো শীতের ভোররাতে বারো মাইলের ওপর পথ ভেঙে শ্মশানগাটের সাধু এই শিশুকে বুকে করে তাদের ডেরায় এসে উপস্থিত হয়েছেন—এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করে কি করে।

—নে ধর—ঘাবড়াস না—তোদের হাত দিয়ে যদি এর বাঁচা কপালে থাকে তো বাঁচবে।

কলের পুতুলের মতো লাজবন্তী কম্বলে মোড়া শিশুটিকে নিল। অসাড় নীলবর্ণ মুখ। বেঁচে আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি আলোর কাছে এনে কম্বল তুলল। বেঁচেই আছে মনে হয়। বলে উঠল, ইস্, এখনো যে এর গায়ের ময়লা পরিষ্কার করা হয়নি... এ কতক্ষণ আগে জন্মেছে—একে আপনি পেলেন কি করে?

—জন্মেছে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি নয় বোধহয়। শীতের রাতে মরার জন্য একে ঠাণ্ডায় শ্মশানে কারা ফেলে গেল। সাক্ষী লোপ করার জন্য আমাকে তারা হাতের শিরা কেটে দিয়ে শেষ করে গেছে ভেবেছে...যাক, আমার জন্য না ভেবে আগে এটাকে বাঁচানো যায় কিনা দ্যাখ্।

এরপর লাজবন্তী শিশুটির আর অনন্তরাম সাধুজীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাঁর হাতের ক্ষত দেখে অনন্তরাম শিউরে উঠেছে। তক্ষুণি কোনো ডাক্তার ধরে আনার জন্য ছুটে বেরুতে চেয়েছিল। অবধূত বাধা দিয়েছেন, কিছু দরকার নেই, আমাদের মরা কপালে থাকলে ওদের এই বুদ্ধি হতো না, দুজনকে একসঙ্গে খতম করেই চলে যেত।

ডেটল তুলো গরমজলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে আবার ওষুধ লাগিয়ে এবারে অনন্তরামের সাহায্যে ভালো করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হলো। লাজবন্তী এর মধ্যে পরমযত্নে শিশুটিকে জীবনের তাপে ফিরিয়ে এনেছে। চুকচুক করে সলতের দুধ চুষে খাচ্ছে। দু'চোখ বোজা। সুন্দর একটি জীবনের কুঁড়ি।

অবধূত গভীর মনোযাগে ছেলেটাকে দেখলেন খানিক। বাবার এই দৃষ্টিসংযোগ দেখে অনন্তরাম আর লাজবন্তী নিস্পন্দের মতো বসে। বড় নিশ্বাস ফেলে অবধূত বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না, আরো ভালো করে দেখতে হবে—তোমরা আমার ব্যবস্থা কি করতে পারো?

তারা বুঝল না। হাতজোড় করে লাজবন্তী বলল, আপনি হুকুম করুন বাবা—

—আমি তান্ত্রিক। আমার শ্মশানের কাজ যেটুকু নির্দিষ্ট ছিল শেষ হয়েছে। দুই একদিনের মধ্যেই আমি চলে যাব... কিন্তু এই একটা দিন আমাকে তোমরা রাখতে পারবে? কেউ চিনবে না জানবে না—পারবে?...এই শিশুর জন্যেই বলছি। শ্মশান থেকে একে আমি তোমাদের

এখানে নিয়ে এসেছি, জানাজানি হলে একে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না।

অনন্তরামের মুখে কথা সরে না। লাজবন্তী জোর দিয়ে বলল, পারব—আপনি আমাদের শোবার ঘরের পিছনের ঘরে থাকবেন...আমি সে-দিকে কাউকে আসতে বা যেতে দেব না...অন্দরমহলেই কেউ আসবে না সেই ব্যবস্থা করব। কিন্তু এই শিশুর কি পরিচয় দেব বাবা...এ কে আপনি জানেন?

—বোধহয় জানি। কিন্তু এ কে জানলে শিশুর অমঙ্গল, তাই তোমাদেরও। ...দাঁড়াও, আমাকে ভাবতে হবে, আমার ঘর ঠিক করে এই শিশুকেও সেখানে রাখো—এর কথাও এক্ষুণি কারো না জানা ভালো।

লাজবন্তী এই দিন বাইরের কোনো লোককে অন্দরের দিকে ঘেঁষতেই দিল না। নিরিবিলি ঘরে বসে অবধূত অনেকক্ষণ ধরে আবার ওই শিশুকে দেখলেন। হাত উল্টে অনেকক্ষণ চোখের সামনে ধরে রাখলেন। তাঁর মনে হলো, কেন মনে হলো জানেন না, পাঁচ বছর না গেলে এই শিশুর জীবন অনিশ্চিত। হাত দেখে মনে হলো পাঁচ বছর পর থেকে আয়ুরেখা স্পষ্ট। কিন্তু রেখা-টেখা কিছু নয়, তাঁর মন বলছে, শিশুর মুখ বলছে, পাঁচ বছর পর্যন্ত এর জীবন বিপন্ন। কেন বলছে তিনি আজও জানেন না।

...দেখা হয়ে গেছে। এরপর কর্তব্যও স্থির। তিন বছর আগে কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়ার সময় ঝোলায় যে টাকা ছিল তা তেমনি পড়ে আছে। তার থেকে কিছু টাকা অনন্তরামের হাতে দিয়ে একটা ফাঁপা সোনার লকেট নিয়ে আসতে বললেন। ছোট্ট একটা কাগজে শিশুর আনুমানিক জন্মসময়, তারিখ আর কার ছেলে লিখলেন। লকেট আসতে কাগজের টুকরো ভাঁজ করে তার মধ্যে পুরে অনন্তরামকে আবার পাঠালেন স্যাকরার দোকান থেকে লকেট সীল করে আনতে।

পরের নির্দেশ, লাল সুতোয় বাঁধা ওই লকেট ঠিক পাঁচ বছর বয়সে শিশুর গলায় পরিয়ে দিতে হবে। এরপর ঝোলা থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করলেন। দু'ভাঁজ করে নোটটাকে ঠিক মাঝামাঝি দু'খানা করে ছিঁড়লেন। এক-ভাগ লাজবন্তীর হাতে দিয়ে বললেন, এটা খুব সাবধানে আর খুব যত্ন করে রাখতে হবে। এই নোটের বাকি আধখানা কেউ এনে তোমাদের দেখালে নম্বর আর জোড় মিলিয়ে দেখে তোমরা তার হাতে ছেলে দিয়ে দেবে। জানবে এ ছেলের ওপর তারই অধিকার।

...পাঁচ বছরের মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে, তিনি নিজেও ইহজগতে না থাকতে পারেন, পাঁচ টাকার নোটের আধখানা হারিয়ে যেতে পারে—কত কি হতে পারে—কিন্তু সেই দিন সেই মুহূর্তে অবধূতের যা মাথায় এলো তিনি তাই করলেন।...কেন করলেন, কে করালো, আজও কি জানেন?

অবধূত সেই শিশুর নাম রাখলেন, রাহুল।

...রাতের অন্ধকারে তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন। সাধু তাদের ছেড়ে চললেন বুঝে লাজবন্তী অঝোরে কেঁদেছে। অনন্তরামের চোখেও জল। অবধূত আশ্বাস দিয়েছেন তাদের মঙ্গল হবে, আবার দেখাও হবে। আরও বলেছেন, ওই পাঁচ টাকার নোটের আধখানা দেখিয়ে যদি

কেউ ছেলে নিতে আসে, তোমরাও তাদের সঙ্গে চলে এসো—আশা করছি তখন আবার দেখা হবে।

অনন্তরাম রাতের অন্ধকারে তার টাট্টু ঘোড়ারগাড়িতে তাঁকে দ্বারভাঙা পৌঁছে দিয়েছে।

...ঘরে ফেরার পর অবধূত আর কখনো কিছু ছাড়ার তাগিদ বা শেকল ছেঁড়ার তাগিদ অনুভব করেননি। এখন তাঁর কেবল মনে হয়, অমন একটা সাজানো ঘটনা ঘটবে আর তাতে তাঁর বিশেষ একটা ভূমিকা থাকবে বলেই তিনি ও-ভাবে ওই মন নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ফিরে এসে সেখানকার ঘটনার কথা কেবল কল্যাণীকে বলেছেন। ফিরে আসার পর মনে হয়েছে এতবড় ব্যাপারটা দ্বিতীয় একজন কারো জানা থাকা দরকার—তাই বলেছেন। পাঁচ টাকার নোটের বাকি আধখানা স্ত্রীর হাতে দিয়ে খুব যত্ন করে রাখতে বলেছেন। সেইসঙ্গে কবে পাঁচবছর পূর্ণ হবে তা-ও লিখে রেখেছিল।

...না, এই পাঁচ বছরে তিনি পার্বতী, তার ছেলে বা লাজবন্তীদের কারো খবর নেননি। অনেক সময়েই কৌতূহল হয়েছে, তবু না। কেবল মনে হয়েছে, সব ঠিক আছে। পাঁচ বছর পর্যন্ত পার্বতীর ছেলের কি বিপদ আর পাঁচবছর পরেই বা সে-বিপদ কি করে কেটে যাবে—সে-সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। এখন অবশ্য বুঝতে পারছেন, বিপদ কি করে কেটেছে। বেনারসীলাল খুনের দায়ে জেলে। আর মাত্র দু'মাস আগে পার্বতীর বাবা রতনলাল মারা গেছে। তাই পার্বতীর ছেলে বিপদমুক্ত।

... পাঁচ বছর কবে শেষ হবে কল্যাণী তার দুদিন আগে তাঁকে জানিয়েছেন। কিন্তু দিনের হিসেব অবধূতের বরাবরই মনে ছিল। কাঁকুড়ঘাটিতে পার্বতীকে চিঠি লিখেছেন। লিখেছেন তিনি বাবা তারকনাথের দীন সেবক। পাঁচ বছর আগে বাবা তারকনাথ পার্বতীর সদ্যজাত শিশুকে রক্ষা করেছেন। সেবকের ধারণা, পার্বতীর সেই সন্তান এখন বিপদমুক্ত। ছেলের হদিস পেতে হলে পার্বতী যেন পত্র-পাঠ পশ্চিমবাংলার তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বরে চলে আসে। এখানে এলে বাবা তারকনাথের এই দীন সেবকই তাকে খুঁজে নেবে।

...নাটকের পরিসমাপ্তির জন্য কেন অবধূত তারকেশ্বর বেছে নিলেন? জানেন না। কেবল এ-টুকু মনে হয়েছিল এই মিলনের জ ্য একটা ধর্মস্থানের পরিবেশ হলে ভালো হয়। মনে ডাক দিল, তারকেশ্বর। বাস, তারকেশ্বর।

৬

চারদিনের দিন ঘুম থেকে উঠেই অবধূত ঘোষণা করলেন, পার্বতী আজ সকালের গাড়িতেই ছেলে নিয়ে আসছে—চলুন স্টেশনে যাই। আজ আসার সম্ভাবনা আমিও জানি। তবু বললাম, আজ না এসে কালও তো আসতে পারে?

—না, আজই সে আসবে।...পার্বতীকে বলে দিয়েছিলাম ছেলে পেলে তারকেশ্বরে পুজো দেবার জন্য সেইদিনই কলকাতা রওনা হতে, আমি এখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করব। অবধূত

হাসতে লাগলেন, আমার নয়, পার্বতীর ভাবার কথা, আমার মুখ দিয়ে সে বাবা তারকনাথেরই হুকুম শুনেছে। চলুন দেখাই যাক।

এসেছে। গেলবারে পার্বতীর সঙ্গে ছিল একজন পরিচারক আর পরিচারিকা। এবারে তারা ছাড়াও পার্বতীর হাতে ধরা বছর পাঁচেকের একটি ফুটফুটে ছেলে। তারই হারানো ছেলে রাহুল। তাদের সঙ্গে আর যে দুজন সুশ্রী মেয়ে পুরুষ, দেখেই বুঝলাম তারা লাজবন্তী আর অনন্তরাম। তাদের সঙ্গে আট থেকে দশ বছরের মধ্যে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

...অনন্তরাম-লাজবন্তীর সেই পালিত তিন ছেলে-মেয়ে। দেখামাত্র আমারও মনে হলো তারা সত্যিকারের বাবা-মা হতে পেরেছে।

দূর থেকে রক্তাম্বর বেশে অবধূতকে দেখামাত্র পার্বতী ছেলের হাত ধরে ছুটে এলো। তারপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই অবধূতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। হাসছে, কাঁদছে, পায়ে চুমু খাচ্ছে। স্টেশনের মানুষেরা হাঁ হয়ে দেখছে।

আর অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে লাজবন্তী আর অনন্তরামও। স্টেশনে ভিড় জমে যাচ্ছে দেখে অবধূত সেখানে আর একটি কথাও বললেন না। সকলকে নিয়ে যে-বাড়িতে আমরা আছি সেখানে এলেন। পার্বতীর ছেলে রাহুল তাঁর কোলে।

এক-ঘণ্টার মধ্যে আমরা সকলে আবার তারকেশ্বরের মন্দিরে। এত সকালে লোকের ভিড় খুব বেশি না হলেও একেবারে কমও নয়। কিন্তু এই সকালে আমার মনে হলো, দেবতার পুজো শুধু কয়েকজনের। পার্বতীর আর লাজবন্তীর। আর তাদের চার ছেলেমেয়েদেরও হয়তো। সকলেই তারা দুধকুণ্ডে স্নান করেছে। তারপর পার্বতী ভিজে কাপড়ে সেই আগের বারের মতো দণ্ডি কেটে-কেটে উঠে আসছে। তার পিছনে রাহুল মা যা করছে সে-ও তাই করছে। তার পিছনে দণ্ডি কেটে আসছে লাজবন্তী। তারপর তার দুই ছেলে আর মেয়ে। সকলের পিছনে অনন্তরাম। দণ্ডি কেটে মন্দিরপ্রদক্ষিণের এমন উৎসব বেশি দেখা যায় কিনা জানি না। দু'চোখ ভরে দেখছি। দণ্ডি কাটতে কাটতেই পার্বতী কেঁদে ভাসাচ্ছে। কিন্তু মানুষের কান্না এত সুন্দর এত আনন্দের হতে পারে তা-ও কি জানতাম?....ঠাকুর দেবতা জানি না। বিশ্বাস কাকে বলে তা-ও অন্তর থেকে জানি না। দু'চোখ ভরে কেবল দেখেই যাচ্ছি। একটা আনন্দের ডেলা থেকে থেকে গলার কাছে ঠেকছে।

অনাড়ম্বর ঘটার মধ্যেই প্রদক্ষিণ আর পুজো শেষ হলো।...পার্বতীর কৃতজ্ঞঘন দক্ষিণেয় মন্দিরের পাণ্ডা আর পূজারীর দল সকলে খুশি। খুশির জোয়ার মন্দির-এলাকার সমস্ত ভিখিরির মুখেও। কাচ্চাবাচ্চা ছোট বড় মেয়ে পুরুষ প্রতিটি ভিখিরির হাতে একটা করে দশ টাকার নোট আসা সম্ভব নয়, ভিখিরির সংখ্যা শ আড়াই তিনের কম হবে না।

কিন্তু ফেরার সময় লাজবন্তী আর অনন্তরাম নড়ে না। কাউকে দেখতে পাওয়ার আশায় তারা চারদিকে তাকাচ্ছে। আগেও তাদের অনুসন্ধিৎসু চোখ এ-দিক ও-দিকে ঘুরতে দেখেছি।...চুল ছাঁটা দাড়ি গোঁফ কামানো সিল্কের রক্তাম্বর বেশ-বাশ পরা অবধূতকে দেখে তারা কৌপীনধারী ভস্ম-মাখা নগ্নদেহ জটাজুট বোঝাই শ্মশানঘাটের সাধুকে চিনবে কি করে?

ঘরে ফিরে জানার পরেও চেনা কঠিন। বিশ্বাস করাও। লাজবন্তী বা অনন্তরাম শুধু নয়,

প্রচণ্ড বিস্ময়ে স্তব্ধ পার্বতীও। অবধূত হেসে ডান হাত উল্টে অনন্তরাম আর লাজবন্তীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।—ভোল বদলালেও বেনারসীলালের ছুরির দাগ এই হাত থেকে কোনো দিন মিলাবে না—নিজের হাতে শুশ্রূষা করেছ—এই দাগটা মনে করতে পারছ?

ভাবাবেগের পরের প্রতিক্রিয়া পাঠকের অনুমান সাপেক্ষ।

পরিবেশ আবার সহজ খুশিতে ভরে উঠতে পার্বতী বলে উঠল, কমলাগঙ্গার শ্মশানঘাটে আপনিই তাহলে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন!...আজ চার বছর ধরে আমি নানা তীর্থস্থানে ঘুরে ঘুরে আপনাকে কত খুঁজেছি—বছরের মধ্য প্রায় ছ'মাস করে আমার আপনার খোঁজে কেটেছে—কিন্তু আপনি দয়া করে চিঠি দিয়ে আমাকে তারকেশ্বরে আসতে বললে আমি তো সামনা-সামনি দেখেও আপনাকে চিনতে পারতাম না।

শুনে অবধূত বেশ অবাক।—চার বছর ধরে নানা তীর্থে ঘুরে আমাকে খুঁজেছ—কেন?

সকলেই শুনলাম, কেন।...পার্বতীর সন্তান হওয়ার এক বছরের মধ্যে খুনের দায়ে বেনারসীলালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যায়। যে দাইয়ের হাতে রাহুল হয়েছে সেই পুনিয়ার মা খুব মানসিক চাপে ভুগছিল। সে-ই পার্বতীর পরিচারিকা জানকীবাঈকে সব ঘটনা বলেছে।...ওই ঘটনার পরদিনই সে শ্মশানে গেছল। সেখানে তখন সাধুও নেই, পার্বতীর ছেলেও নেই। তাই তার বিশ্বাস সাধু মরেননি—ছেলেও তাঁর কাছেই।...এরপর অনেক চেষ্টা করে পার্বতী জেলে বেনারসীলালের সঙ্গে দেখা করেছে। ছেলে বেঁচে আছে কিনা তাও সে জানে না, কিন্তু ঘটনার কথা অস্বীকার করেনি।

...সেই থেকে পার্বতী কমলাগঙ্গা ঘাটের সাধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আর মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে তার ছেলে বেঁচে আছে—কোনো একদিন তাকে পাবেই।...মহারাজের চিঠি পেয়ে তাই একটুও অবিশ্বাস করেনি। এতদিনে ঈশ্বরের দয়া হয়েছে ভেবে ছুটে এসেছে। এসে ছেলে পেয়েছে।

কলকাতায় নিজের বাড়িতে নয়, পেটো কার্তিক আর অবধূতের সঙ্গে কোন্নগরের বাড়ি এসেছি। ভদ্রলোকের সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। পরে মনে হয়েছে, সত্যিই কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি—না কি, অবধূত যে ব..লন, কে ঘটায় কে সাজায়—এই আসার পিছনেও তেমন কারো হাত ছিল?...তা না হলে যে-চিত্রটা সম্পূর্ণ হয়েছে ভাবছিলাম, না এলে সেটা যে কত অসম্পূর্ণ থেকে যেত তা কি আমার কল্পনার মধ্যে ছিল?

অবধূত বোতল গেলাস বার করে বসেছিলেন। হেসে বলছেন, ড্রিংক মানুষের সৎ-সত্তা টেনে বার করে, এই রাতটা পার্বতী তার ছেলে, আর লাজবন্তী অনন্তরাম আর তাদের ছেলে-মেয়ে অ্যাণ্ড কোম্পানীর জন্য সৎ-সত্তা দিয়ে শুভেচ্ছা কামনার রাত—কি বলেন?

আমি সানন্দে সায় দিয়েছি, নিশ্চয়ই।

কল্যাণী দেবী মাঝে মাঝে এসে মুখরোচক এ-সেটা সরবরাহ করে যাচ্ছেন। পেটো কার্তিক বাবার সেবার অছিলায় পা টিপছেন—আসলে তার দু'কান আর মন আমাদের কথাবার্তা গিলছে।

অবধূত প্রস্তাব করলেন, ওরা এত করে বলল, সকলে মিলে একবার কাঁকুড়ঘাটি যাওয়া যাক—কি বলেন?

আমি বললাম, অবিলম্বে প্রোগ্রাম করে ফেলুন—আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে।...কিন্তু বিহারের মাঝপথের স্টেশনে পোলাও-মাংস-কালিয়া যোগান দেবার মতো আপনার ভক্ত আছে তো?

পেটো কার্তিকের মন্তব্য, ওরা তো নিরামিষ ভক্ত, তিন ঘণ্টার নোটিস পেলেও ও-সবের ব্যবস্থা আমিই করে নিয়ে যেতে পারব।

তারকেশ্বরে পার্বতী আর লাজবন্তীর গ্রুপকে নিরামিষ খেতে দেখেছে পেটো কার্তিক। তাই অরুচি।

একটা থালায় মাংসের বড়া নিয়ে এলেন কল্যাণী দেবী। আমি বলে উঠলাম, বা-বা—ভোজনটাও এক অপূর্ব সাধনার অঙ্গ আগে জানতাম না!

কল্যাণী হাসিমুখে জবাব দিলেন, এটা ওঁর আর পেটো কার্তিকের সাধনার অঙ্গ—সকলের নয়। থালা রেখে চলে যাচ্ছিলেন, বাধা দিলাম—আচ্ছা, এই যে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল—এ-সম্পর্কে আপনি কিছু আলোকপাত করুন।

সহজ জবাব, এ-রকম ঘটনা ঘটবে এ-তো পাঁচ বছর আগেই জানা ছিল।...এতে কার কি বাহাদুরি?

—কারো নয়?

—কেউ কেউ ভাবতে পারেন তাঁর বাহাদুরি আছে। কিন্তু যিনি ঘটালেন আর ঘটনার শেষ করলেন তিনি হাসছেন।

—কে ঘটালেন? ঈশ্বর?

—আর কে? আর কার ক্ষমতা? চলে গেলেন।

আমি বিশ্বাস করি বা না করি, বিশ্বাসের ভারী একটা সুন্দর রূপ অনেক দেখেছি।... কালও পার্বতীর মুখে দেখলাম। লাজবন্তী আর অনন্তরামের মুখে দেখলাম।...পেটো কার্তিকের মুখেও বিশ্বাসের এক কমনীয় রূপ দেখেছি। কিন্তু কল্যাণী দেবীর সংশয়শূন্য এই সহজ বিশ্বাসের বোধ করি তুলনা নেই। তাঁর এই রূপের দিকে তাকালে মনে হবে, এ-বিশ্বাস ভিন্ন জগতে আর কোনো সত্যের অস্তিত্ব নেই।

...যে-কথাগুলো বলে গেলেন তাতে স্বামীর প্রতি ঠেস ছিল। কিন্তু অবধূতের দিকে চেয়েও বিশ্বাসের আর এক রূপ আমি একাধিকবার দেখেছি। এই মুহূর্তে হরিদ্বার থেকে ফেরার পথে ট্রেনে তাঁর সেই গভীর কথাগুলো আমার হুবহু মনে পড়ল। বলেছিলেন, 'আমার চোখে এই জগতের সব-কিছুই বড় আশ্চর্য লাগে। জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি ধ্বংস সবই যেন কেউ সাজিয়ে সাজিয়ে যাচ্ছে। মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীর এমন বায়োলজিকাল পারফেকশন কি করে হয়—কে করে? একটা ফুলের বাইরে এক-রকম রঙ ভিতরে এক-রকম, পাপড়ির গোড়ায় এক রঙ মাথার দিকে অন্য-রকম—এমন নিখুঁত বর্ণবিন্যাস কি করে হয়—কে করে?...বলেছিলেন, 'আপনারা লেখেন, কতটা দেখেন আপনারাই জানেন। আমি শুধু ঘটনা

দেখে বেড়াই, যা দেখি তা কোনো বইয়ে পাই না, কোনো চিন্তায় আসে না। যেখানে যাই, দেখি কিছু না কিছু ঘটনার আসর সাজানো—পরে মনে হয়েছে আমি নিজের ইচ্ছেয় আসিনি, কিছু ঘটবে বলেই আসার টান পড়েছে—আমার কিছু ভূমিকা আছে বলেই আমায় সেখানে গিয়ে হাজির হতে হয়েছে—এমন কেন হয়, কি করে হয় বলতে পারেন?'

আমি বিশ্বাস করি বা না করি, বিশ্বাসের এই কথাগুলো আমার মনে খোদাই হয়ে বসে গেছে।

...হঠাৎ মনে হলো, শান্তিই যদি এই জীবনের পরম প্রাপ্তি, আমি তার কতটুকু পেয়েছি? এই শান্তির পথ বিশ্বাসের পথ। এই পথ-যাত্রীদের তো কম দেখলাম না। সকলেই শান্ত, প্রসন্ন, কমনীয়। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়।

বলে ফেললাম, আমাকে একটু পথ দেখান—

—তার মানে? কি পথ?

—বিশ্বাসের পথ, শান্তির পথ।

অবধূত চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। বললেন, শান্তি জিনিসটা যার-যার মনের কাঠামোর ওপর নির্ভর করে।...কিন্তু কোন্ বিশ্বাসের কথা বলছেন?

—আপনাদের যা বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস।

আবার খানিক চেয়ে রইলেন। তারপর হাসতে লাগলেন। বললেন, শুনুন, আমার স্ত্রীকে দেখে আমার বিচার করবেন না।...আমার মতো টানাপোড়েনের মধ্যে দুনিয়ায় কতজন আছে জানি না।...অনেকে চোখ বুজে বিশ্বাস করে ঈশ্বর আছে। অনেকে চোখ বুজে অবিশ্বাস করে, ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর আছে কি নেই—এই সন্ধান কত জনে করে?

অবধূতের দু'চোখ মনে হলো কোথায় কোন্ দূরে উধাও। গলার স্বর গভীর। বললেন, আমি করি। করছি।...ঘটনার সাজ দেখে দেখে প্রশ্ন করি, কে ঘটায়? কেন ঘটে? কে সাজায়? কে করে? জবাব পাই না।... আমি খোঁজ করছি। খুঁজে যাচ্ছি। ঈশ্বর আছে কি নেই আমি আজও জানি না।

আমি নির্বাক বিমূঢ় চোখে চেয়ে আছি।

রাগশর

ঁমহেন্দ্র সরকার
শ্রদ্ধাভাজনেষু

দুর্যোগেরই রাত সেটা। ভাল করে সন্ধ্যে না হতেই রাত নেমেছে। দিনের চেহারা দেখে বিভূতিবাবু দুপুর থেকেই উতলা। সমস্ত আকাশে ঘন কালো ফরাশ বিছানো একটা। মেঘ যেন আস্ত সূর্যটাকে গিলে খেয়েছে, তারপর পৃথিবীটাকে দেখছে চেয়ে। দেখছে আর অপেক্ষা করছে।

বিভূতিবাবুর মন খারাপ। এই দিনটা এমন হল কেন ভেবে পান না। অন্যান্য বার থেকে এবারে একটু বেশি জাঁকজমকের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। খরচের দিকে তাকাননি। ছেলের দল মহা উৎসাহে তিন সপ্তাহ আগে থেকেই উদ্যোগে মেতেছে। নিজেরাই কোমর বেঁধে পঞ্চবটী সাজিয়েছে। গোটা আঙিনা জুড়ে এবারে প্যাণ্ডেল করেছে তারা। ক'দিন ধরে আকাশের রকম-সকম সুবিধের নয় দেখে আগে অবশ্য ত্রিপলে ছেয়ে নিয়েছে। তারা দুর্যোগের পরোয়া করে না। তাদের বিশ্বাস ঝড় হোক জল হোক সময় হলেই আশেপাশের গ্রাম শহর গঞ্জ থেকে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ পঞ্চবটীতে ভেঙে পড়বে। প্রত্যেকবার তাই পড়ে। অনেক দূর দূর থেকে লোক আসে এই দিনের উৎসবে। এবারের বিশেষ ঘটার ব্যবস্থার কথা লোকের মুখে মুখে আরো বেশি ছড়িয়েছে। গুণীরা আসছেন বারাণসী থেকে লক্ষ্ণৌ থেকে মাদ্রাজ থেকে গোয়ালিয়র থেকে।

কেমন ধারা গুণী গো তাঁরা, কেমন সাধক?

দেখবে। শুনবে। এসো পঞ্চবটীতে, এমনটি আর আগে হয়নি।

হয়নি ঠিকই। উৎসব নয়, উৎসব তো সন্ধ্যেয় শুরু। উৎসবের প্রচার। কলকাতা এখান থেকে প্রায় পঁয়তিরিশ মাইল দূরে। সেখানকার খবরের কাগজে খবর বেরুনোর পরে সেখান থেকেও অনেক অনুরাগীর অনুসন্ধান এসেছে, চিঠিপত্র এসেছে। চাঁদা অন্যান্য বার থেকে অনেক বেশি উঠেছে। আর বিভূতিবাবুও খরচ করছেন অন্যান্য বারের চার গুণ।

এর নিগূঢ় একটা কারণ আছে। বিভূতিবাবু হিসেবী মানুষ, বাপ দাদার তেজারতী কারবারের টাকা। তার ওপর নিজে একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। এ-ধরনের উৎসবে বেপরোয়া টাকা ছড়াবার মানুষ নন। প্রতিবারই উৎসব হয় একটা পরিমিত অঙ্কের টাকার মধ্যে। এবারে সেই টাকার গণ্ডীটা প্রশস্ত হয়েছে পঞ্চব টীর পঁচিশ বছর পূর্ণ হল বলে। সেটা অবশ্যই একটা কারণ। সব থেকে বড় কারণই।

কিন্তু একমাত্র কারণ নয় বোধ হয়...।

অনুশ্রীর সেদিনের কথাটা খট করে কানে বিঁধেছিল বিভূতিবাবুর। অনুশ্রী হেসেই বলেছিলেন আর বিভূতিবাবুও শুনে হেসেছিলেন। ও রকম হাসি মুখেই অনুশ্রী দেবী অনেক অশুভ কথা বলে থাকেন। আর বিভূতিবাবুও হা... । কিন্তু এবারের কথাটা শোনামাত্র তাঁর মনের মধ্যে অশুভ একটা ছায়া পড়েছিল কেমন। সেই ছায়াটা বুকের ভিতরের খানিকটা বাতাস টেনে নিয়েছিল।

আসন্ন উৎসবের কথা শুনে অনুশ্রী বলেছিলেন, করো, এবারেরটাও দেখব হয়ত। এরপর আর দেখব কিনা কে জানে।

ছুটির দিনে নিজের ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে অনুশ্রী হাসি মুখে বলেছিলেন কথা কটা। তাঁর সামনের তকতকে মেঝেতে বসে গুটি তিনেক উঁচু ক্লাসের মেয়ে অঙ্ক কষছিল। বিভূতিবাবুকে দেখেই মেয়ে কটা উঠতে যাচ্ছিল। তাদের মা-মণির নিষেধে পারেনি। তিনি ভুরু কুঁচকে বলেছেন, অমনি পালাবার ফাঁক পেলি বুঝি তোরা, অঙ্কটা কর দেখি আগে, নইলে ছাড়ান নেই।

একটি মেয়ে উঠে ভিতর থেকে মোড়া এনে বিভূতিবাবুকে বসতে দিয়েছিল। তারপর সকলে আবার মুখ গুঁজে অঙ্ক কষছিল।

কিন্তু উৎসব প্রসঙ্গে মা-মণির কথাটা কানে যাওয়া মাত্র তাদের হাতের পেন্সিল থেমে গিয়েছিল। বিষণ্ণ মুখে আড়চোখে তারা ভরসার আশায় মামাবাবুর দিকে তাকাচ্ছিল। বিভূতিবাবু তক্ষুনি বুঝেছিলেন, ওদের অঙ্ক আর মিলবে না। নিজেই ছুটি দিয়েছেন তাদের, বলেছেন, ছুটির দিনে বেশি অঙ্ক করলে বা করালে বুদ্ধি থেঁতো হয়ে যায়, তোমরা কেটে পড় এখন।

তারা চলে যেতে অনুশ্রী অনুশাসনের সুরে বলেছেন, ছোট মেয়েগুলোর সামনে আমায় সুদ্ধু ওভাবে টানলে কেন? আমার বুদ্ধি থেঁতো হচ্ছে?

মেয়েদের সামনে তুমিই বা ও-রকম বললে কেন?

অনুশ্রী হেসেছিলেন, কেন, মিথ্যে বলেছি? সামনের বছরও আবার দেখব নাকি!

বিভূতিবাবুও হেসেছিলেন। বলেছিলেন, না দেখলে বাঁচা যায়।

লঘু পরিহাসে অনুশ্রীর মুখখানা এই বয়সেও টসটসিয়ে উঠতে পারে। আড়াল থেকে শুনলে কোন্ বয়সের মেয়ে বলছে বোঝা যাবে না। অনুশ্রী ইজি-চেয়ার সুদ্ধ তাঁর দিকে ঘুরে বসেছিলেন আর একটু।

কেন, আর টানতে পারছ না?

না। আধমরা হয়ে গেছি।

কিন্তু আমি গেলেই বা তোমার কি আর আশা— বয়েস কত হল, দাঁড়াও, আটাশ আর পঁচিশে হল গিয়ে তিপ্পান্ন, মেয়ে দেবে কেউ?

বিভূতিবাবু হাসছিলেন আর দেখছিলেন। অনুশ্রীরও বয়স সাতচল্লিশ আটচল্লিশ হবে। কিন্তু বয়সের প্রতিপত্তি সাতাশী আটাশীতেও তাঁর ওপর খাটবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু সেই অশুভ কথাটাই ভুলতে পারছিলেন না। অনুশ্রীকে বিশ্বাস নেই তাঁর। ওর হাসির ওপরেও আস্থা নেই। অন্তিম মুহূর্তেও মুখখানা অমনি হাসির রসে ভিজিয়ে তাঁর দ্বারা হয়তো বলা সম্ভব, চললাম ভাই।

অন্তত বিভূতিবাবু সেই রকমই ভাবেন। অনুশ্রীর জীবনে সত্যিই আবার একটা বছর ঘুরে নাও আসতে পারে। গত দশ বছর ধরে চড়া ব্লাড প্রেসারে ভুগছেন তিনি। যত দিন যাচ্ছে ফর্সা মুখখানা তত লালচে দেখাচ্ছে। দু বছর আগে একবার বিছানা নিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনসংশয়

হয়নি তখন। চিকিৎসক খাওয়া-দাওয়া কমানোর নির্দেশ দিতে বিভূতিবাবু রোগিণীর সামনেই বলে বসেছিলেন, খাওয়ার মধ্যে একমাত্র বেশি খায় তো জল, তাও বন্ধ করে দেব?

তাঁর রাগ দেখে অনুশ্রী খুব হেসেছিলেন।

আর তার পরের বছর, অর্থাৎ গেল বছরেও হেসেছিলেন। অবশ্য সঙ্কটের মুহূর্তে নয়, পরে। গত বছর স্ট্রোক হয়েছিল অনুশ্রীর। তিন দিন অজ্ঞান হয়েছিলেন। হস্টেলের মেয়েরা দিনরাত মুখে আঁচল গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। গোটা বাড়িটায় মৃত্যুর অনড় ছায়া পড়েছিল একটা। তিন দিন তিন রাত। বিভূতিবাবু কলকাতা থেকে নামজাদা চিকিৎসক নিয়ে এসেছিলেন। তিন দিন সেই ডাক্তারকে আটকে রেখেছিলেন নিজের বাড়িতে। চিকিৎসা আর চিকিৎসকের পিছনে কত হাজার টাকা তাঁর খরচ হয়েছিল, অনুশ্রী হাজার বার জিজ্ঞাসা করেও সে অঙ্কটা জানতে পারেননি।

চার মাস লেগেছে সেই ধকল কাটিয়ে উঠতে। মা-মণির ওপর মামাবাবুর কড়া অনুশাসন হস্টেলের মেয়েরা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছে। সেই অনুশাসন এখনও খুব শিথিল হয়নি। অনুশ্রীর কাজকর্ম চলা-ফেরা প্রায় ছকে বাঁধা। কোনরকম অনিয়ম হলে ঠিক বিভূতিবাবুর কানে যায়। কি করে যায় অনুশ্রীদেবী ভেবে পান না। তবে অনুমান করতে পারেন। বিরক্ত হয়ে একসময় অনুযোগও করেন, মেয়েগুলোকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ।

বিভূতিবাবু হাসেন। কখনো বা বলেন, মা-মণির জন্যে দুর্ভাবনায় এটুকু প্রশ্রয় তারা নিজেরাই আদায় করে নিয়েছে, আমাকে দিতে হয়নি।

দুর্ভাবনা শুধু মেয়েদের নয়, বিভূতিবাবুরও। মেয়েরা তা জানে বলেই মা-মণির সমাচারটা তারা দোতলায় ওঠার মুখে নিচে থেকেই জানিয়ে দেয়। যদিও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সতর্কবাণী মেয়েরা জানে না, শুধু তিনিই জানেন। নেহাত আয়ুর জোরে প্রথমবারের ধাক্কা সামলে ওঠা গেছে। পরের ধাক্কায় সে আশা কম। স্ট্রোকের রোগীর পক্ষে সেটাই ভয়ের।

বিভূতিবাবুর মনে এই ভয়টাই থিতিয়ে আছে। একটু অনিয়ম দেখলেই রেগে যান। কোনরকম অস্বস্তি দেখলেই উতলা হন। তাছাড়া ওই ধাক্কার পর থেকে প্রেসারটাও আর এক দফা চড়েই আছে। অনেক কবিরাজী হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি করিয়েও সেটা আর নামানো সম্ভব হচ্ছে না।

পঞ্চবটীর পঁচিশ বছরের অনুষ্ঠানের জাঁকজমকের পিছনে বিভূতিবাবুর এবারের ব্যক্তিগত উদ্দীপনার এও একটা বড় কারণ। কে জানে সত্যিই এই শেষ অনুষ্ঠান কিনা অনুশ্রীর জীবনে। অনুশ্রীর সামনে সে সম্ভাবনা হেসে উড়িয়ে দিলেও সেই দিন যদি আসেই হেসে ঠেকানো যাবে না। তার থেকে পঁচিশ বছরের উৎসব এবারে উৎসবের মতই হোক। মুখে কিছু না বললেও অনুশ্রী মনে মনে খুশি হবেন জানেন। তাঁকে খুশি করার তাগিদটা এবারেই সব থেকে বেশি অনুভব করেছিলেন বিভূতিবাবু।

কিন্তু সবদিকে কি জানি গোলমেলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যা হবার নয় তাই হচ্ছে। গতকাল থেকে আজ দুপুরের মধ্যে তিনখানা টেলিগ্রাম পেলেন। নির্ধারিত সাধকদের একে

একে তিন জন এই শেষ মুহূর্তে যোগদানে অক্ষমতা জানালেন। একটা করে টেলিগ্রাম আসে উদ্যোগীদের মুখ শুকোয়। বিভূতিবাবু মুখে উৎসাহ দেন তাদের, তিন রাতের প্রোগ্রাম না-হয় এক রাতে শেষ হবে। গলা তো বাঁধা নেই কারো কাছে।

কিন্তু মনে মনে নিজেও তিনি ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন। কেউ না এলে শেকলে বেঁধে আনতে পারেন না। পারলে আনতেন। আসা অনিশ্চয় যদি, কথা দেয় কেন! কিন্তু এ ছাড়াও ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি কিসের, বিভূতিবাবু বুঝে ওঠেন না। আকাশে ওই অকাল দুর্যোগের ভ্রূকুটি দেখে হয়তো। পৌষের শীতে ওরকম হবার কথা নয় আকাশের অবস্থা। হল কেন?

এবারে নিজের ওপরেই বিরক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও স্নায়ুর জোর কমে আসছে হয়তো। নইলে ভিতরে ভিতরে বোধের অগম্য চাপা অস্বস্তি কেন একটা? যাঁদের আসার কথা তাঁরা সকলে আসছেন না বলে? নিজের ভিতরটা হাতড়ে দেখতে চেষ্টা করলেন বিভূতিবাবু। না, শিল্পী বা শিল্পকলা কারো ওপরই এমন কিছু টান নেই তাঁর। আর, অকালের দুর্যোগ কি এত বয়েস পর্যন্ত দেখেননি নাকি!

তাহলে ওই চাপা-অস্বস্তিটা কিসের?...অস্বস্তিও নয় ঠিক, অনাগত আশঙ্কার মত কিছু। বিভূতিবাবু হঠাৎ ঠিক করলেন, অনুশ্রীকে ঘণ্টা দুইয়ের বেশি থাকতে দেবেন না উৎসবের ভিড়ের মধ্যে। তাঁর শরীর খারাপ হতে পারে।

কিছুটা হালকা বোধ করলেন বিভূতিবাবু।

বিকেলের দিকে গোটা আকাশটা সিংহ-গর্জনে ভেঙে পড়ল একবারে। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল সেই গর্জন আর বর্ষণ। মেঘ-বৃষ্টিতে দশ দিক একাকার। হাড়কাঁপানো শীত। ঝড়ো বাতাসে পঞ্চবটীর গাছগুলো আলুথালু। উৎসব শুরু হবার আগে বাতাস আর বর্ষণ দুইই থামল বটে, কিন্তু সেই থামাটা সাময়িক বিরতিসূচক। আসন্ন নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় একটা তারার চিহ্নও নেই। সব যেন সভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। দ্বিতীয় তাণ্ডবে উৎসব লণ্ডভণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা।

বিভূতিবাবু খানিকক্ষণ আগেই এসেছেন। এসে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। দু'তিন দফায় মেয়েরা এসেছে। বাকি মেয়েদের সঙ্গে এবার অনুশ্রী আসবেন আশা করছেন। কিন্তু তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে।

বিভূতিবাবুর বাড়ি থেকে পঞ্চবটী মাইল তিনেক পথ। অনুশ্রীর হস্টেল থেকে আড়াই মাইল। এ জায়গাটা জঙ্গল ছিল এককালে। সে প্রায় সাতাশ আটাশ বছর আগে। নামও পঞ্চবটী ছিল না। কোনো নামই ছিল না। আশেপাশের লোকবসতি এখনো ঘন নয় খুব। শহর ছাড়িয়ে এদিকটায় পড়লেই খোয়া-বিছানো রাস্তা। দুধারে বনতুলসী আটিশ্বরী বিষকাটারির ঘন ঝোপ। মাঝে মাঝে অতিকায় এক একটা জংলা বট আর অশ্বত্থ মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

দূরে দূরে কয়েক ঘর হেলে কৈবর্ত আর জেলে কৈবর্তদের বাস। তারপর বাগ্‌দীপাড়া। এদিকে কাছাকাছির মধ্যে পঞ্চবটীর ওই তিন ঘরের দালানটা ছাড়া পাকা দালান এখন অবশ্য আরো হয়েছে অনেকগুলো। পঞ্চবটীর এই পাকা দালানের জায়গায় কুঁড়েঘর ছিল একটা। কার ঘর সেটা, কে বাস করত কেউ জানে না। বিভূতিবাবুও না। খুব সম্ভব যে তৈরি করেছিল সেটা,

চারদিকের গাছগাছড়ার তাড়া খেয়ে তাকে ছেড়ে যেতে হয়েছে। এই বিস্তৃত চত্বরটুকু ভারী অদ্ভুত। চারপাশে কতগুলো নিম্ব কাঁঠাল আর বেল গাছ। সেগুলো এমনভাবে দাঁড়িয়ে যে, এর ভিতরে এতবড় একটা আঙিনা পড়ে আছে বাইরে থেকে ঠাওর করা যায় না। পাকা দালানটার অস্তিত্বও না। এঁকেবেঁকে গাছগুলো অদ্ভুত একটা ধাঁধার মত সৃষ্টি করেছে। দুটোর ফাঁকে একটা করে গাছ, তিনটের ফাঁকে দুটো করে গাছ—এমনি।

অবশ্য এই পাকা দালান এমন ছিল না, সামনের এই প্রশস্ত আঙিনাটাও তকতকে ছিল না এমন। যে আঙিনা জুড়ে উৎসবের প্যাণ্ডেল করা হয়েছে, মঞ্চ বাঁধা হয়েছে, চেয়ার পাতা হয়েছে, ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভরতি ছিল জায়গাটা। সে অবশ্য বিভূতিবাবু নিজের চোখেই দেখেছেন। শুধু দেখেননি, সেই তরুণ বয়সে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজেও কোমর বেঁধে নামতে হয়েছিল। নিজের আগ্রহ ছিল না একটুও, বরং বাধাই দিয়েছিলেন। কিন্তু আর একজনের আগ্রহের বন্যায় কোনো বাধা টেকেনি।

এই পঞ্চবটীর অধিষ্ঠাতা সেই একজন।

চোখ বুজে ভাবলে বিভূতিবাবুর মনে হয় সেদিনের কথা। বিস্মৃতির অতলে কিছুই হারায়নি, কিছুই খোয়া যায়নি।

এমন কি সেই গাছ কটাও চেষ্টা করলে হয়তো চিনতে পারবেন বিভূতিবাবু। পঞ্চবটী নাম সার্থক করার জন্য এমন ঢালা বৃক্ষসজ্জার মধ্যেও যেসব গাছ নতুন করে এনে বসাতে হয়েছিল। অনেকে হেসেছিল তখন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের সেই পাগলামী দেখলে হাসারই কথা। কিন্তু সে সময় সেই একজনের ইচ্ছের মোহনায় আর সকলের ইচ্ছের ধারা যে আপনা থেকেই এসে মিলতে বাধ্য হত।

...পঞ্চবটী নামটিও সেই অধিষ্ঠাতারই দেওয়া।

নামকরণের মাধুর্য রোমন্থন সম্পূর্ণ না হতেই একটা কৌতুকের আঘাত। কোনো পুরাণ-নবীস ঠাট্টা করে থাকবেন, পুণ্য পঞ্চবৃক্ষের সমাবেশ না হলে পঞ্চবটী নাম হয় কেমন করে? অশ্বত্থ বট বিল্ব আমলকী অশোক— এই পাঁচ গাছ চাই যে!

প্রথম তিনটি ছিল, শেষের দু'টো ছিল না। কি ধকলই না গেছে ওই আমলকী আর অশোক সংগ্রহ করতে। ছোটো—কোথায় আছে অশোক, কোথায় আমলকী। সেও একটা দুটো হলে হবে না, অনেক চাই—যেমন বাকিগুলো আছে, প্রায় তেমনি।

দুই

পরিচিত হর্ন কানে আসতে বিভূতিবাবুর সংবিৎ ফিরল।

এবারে অনুশ্রী এলেন নিশ্চয়। গাড়িটা লোকের ভিড়ে এগোতে পারছে না।

একটানা হর্ন বাজিয়ে দুই-এক হাত করে এগোচ্ছে।

লোক যত আশা করা গিয়েছিল, আকাশের দুর্যোগের দরুন তত না হলেও খুব কম হয়নি।

প্যাণ্ডেল ছাড়িয়েও অনেকটা দূর পর্যন্ত শুধু চাপ-চাপ মাথা। এদিকের জোরালো আলোয় খানিক দাঁড়ালে বাইরের ওধারটা রীতিমত অন্ধকারই লাগে। বক্তা বা শিল্পী প্যাণ্ডেলের মঞ্চের উপর উঠে না দাঁড়ালে এখান থেকে কিছু দেখা যায় না। বাইরের জনতার মাইক ভরসা।

অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছিল। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর প্রধান অতিথির ভাষণ চলছে। তারপর সভাপতির ভাষণ হবে। তারপর দ্রষ্টা আর শ্রোতাদের আশার সূচী। পঞ্চবটীর কর্মকর্তারা কলকাতা থেকে একজন নামজাদা শিল্পানুরাগী প্রধান অতিথি আমদানি করেছেন। বিশেষজ্ঞের মতই তিনি সঙ্গীতের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য বিস্তার এবং বিশ্লেষণ করে চলেছেন।

আপাতত মহাদেব ও পার্বতীর সংযোগে রাগের উৎপত্তি থেকে শুরু করে শ্রবণ-মোহন কচ্ছপী বীণাধারী মহর্ষি নারদের পর সঙ্গীতাচার্য মহাতপা ভরতকে ছুঁয়ে সবে বৈদিক যুগের ঋষিদের পবিত্র গম্ভীর সঙ্গীত মন্ত্র-ধ্বনিতে এসে পৌঁছেছেন তিনি। সামবেদের জল-কলধ্বনির মত মন্ত্রের সঙ্গীতরূপায়ণ বিশ্লেষণ করছেন।

মঞ্চে আট-দশটি চেয়ার পাতা। সভাপতির পাশে ভাষণরত প্রধান অতিথি। অন্য চেয়ার কটিতে কয়েকজন প্রধান শিল্পী এবং বিশেষ আমন্ত্রিত দু-তিনজন গণ্যমান্য অভ্যাগত। শেষের দুটি চেয়ার খালি। একটি অনুশ্রী দেবীর, অন্যটি বিভূতিবাবুর। এঁদের পিছনে দুধারে দুটো উঁচু স্ট্যাণ্ডে দুখানা প্রমাণ আয়তনের ফোটো। ফোটোর ফ্রেম মোটা মোটা ফুলের মালায় ঢাকা। মূর্তি দুটি দেখা যাচ্ছে শুধু। একটি রুক্ষ শীর্ণ জটাজূটধারী সন্ন্যাসী মূর্তি— অনাবৃত বক্ষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

বিপরীতমুখী ফোটোটি এক সুশ্রী তরুণের। বছর আটাশ-উনত্রিশ হবে বয়স। ঝকঝকে জীবন্তদুটি চোখ। সেই চোখের গভীরে যেন অতল জলধি। ফোটোর মূর্তি দুটি যেন পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন। দেখছেন। এই দেখার বাইরে আর যেন কিছু নেই।

জনসমাবেশের চাপা গুঞ্জনের মধ্যেই প্রধান অতিথির ভাষণ গমগমিয়ে উঠছিল থেকে থেকে। কিন্তু বিভূতিবাবুর কানে একবর্ণও ঢুকছিল না, বাইরের প্যাণ্ডেলে প্রবেশপথের দিকটায় অপেক্ষা করছিলেন তিনি। নিজের গাড়ির হর্নের শব্দটাই শুধু কানে ঢুকল, ভিড়ে আর আবছা অন্ধকারে গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না।

বিভূতিবাবু দু'পা এগিয়ে গেলেন।

জনাকতক ভলান্টিয়ার দুদিকের ভিড়ের চাপ সরিয়ে অনুশ্রীকে গেটের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে।

এদিক থেকে এগোতে গিয়ে বিভূতিবাবুকেও থামতে হল। পিছনে আর আশেপাশে বেশ একটু শোরগোল উঠেছে। এদিক-ওদিক থেকে কটূক্তি আর টিকা-টিপ্পনীও কানে আসছে। ছোট ছেলেরা যেমন দল বেঁধে পাগল ক্ষেপায় তেমনি প্রগল্ভ হেই-হেই শব্দ উঠছে একটা। বিভূতিবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সাধু-সন্তজনের মত আলখাল্লা-পরা একটা লোক সঙ্গীত-রসের টানে বাইরের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ভিড়ের চাপে তার মেজাজ বিগড়ে গিয়ে থাকবে। দুই বাহুতে ভিড় ঠেলে পথ করে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। সেই ঠেলাঠেলির ফলে সাধুজনের এ জায়গায় পদার্পণ জনতার

সম্মিলিত বিরক্তি এবং রসের খোরাক হয়েছে। ওদিকে ভলান্টিয়াররা অনুশ্রীকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে অনেকটা। বুক পর্যন্ত একরাশ কাঁচা-পাকা দাড়ি আর পিঠ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল গেরুয়া-বসন পরা লোকটা অসহিষ্ণু নিষ্ক্রমণের তাড়নায় অনুশ্রীর গায়ের ওপরেই পড়তে যাচ্ছিল প্রায়।

দাঁড়িয়ে পড়ে সামলে নিল। তারপর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ানো বা পাস কাটানোর বদলে ঈষৎ-আরক্ত চোখ টান করে সরাসরি তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আবছা অন্ধকারে কোন পুরুষের, বিশেষ করে এই মূর্তির পুরুষের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার নিশ্বাস-স্পর্শের ব্যবধানে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়া আর এ ভাবে তাঁর দিকে তাকানো যেমন বিসদৃশ তেমনি দৃষ্টিকটু।

মুহূর্তের দৃষ্টি-বিনিময়। লোকটার অভব্যতায় স্পষ্ট বিরক্তিতে পাশ কাটাতে চেষ্টা করলেন অনুশ্রী। ওদিকে ভলান্টিয়ার আর আশপাশের লোকেরা মারমুখী হয়ে উঠল। বিরক্তিতে বিভূতিবাবুরও ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। তিনি সামনাসামনি দেখেন নি লোকটাকে, পাশ থেকে দেখেছিলেন। বয়স কম হলে ও পঞ্চাশের নীচে নয়— অস্পষ্ট আলো আর চুলদাড়িতে বয়স ঠাওর করা শক্ত।

অনুশ্রীকে সঙ্গে করে দু-পা এগিয়ে প্যাণ্ডেলের প্রবেশমুখের কাছাকাছি এসে আবারও ফিরে তাকালেন তিনি। পিছনে হট্টগোল বেড়েছে। কারো তর্জন, ধরে দাও দুটো ঝাঁকুনি— ভণ্ডামী বার করে দাও। কেউ বলছে, আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে দাও। কেউ চেঁচাচ্ছে, দাড়ি ছিঁড়ে নাও।

বিভূতিবাবু দেখলেন, দীর্ঘাঙ্গ সবল লোকটা নির্বিবাদে ভিড় কাটিয়ে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। যারা বলছে মুখেই বলছে—সত্যিকারের মারধোরের চেষ্টা করছে না।

প্যাণ্ডেলের ভিতরে আলোর ফোয়ারা। ফলে বাইরেটা আরো বেশি অন্ধকার দেখায়। জনা দুই ভলান্টিয়ারের সঙ্গে মঞ্চের দিকে এগোলেন তাঁরা। ভিতরে যে যার চেয়ারে বসে, ভিড় ঠেলার ব্যাপার নেই।

বাইরের গণ্ডগোল ভিতরে খুব বেশি শোনা যাচ্ছে না। এখানে মাইকে প্রধান অতিথির ভরাট গলার দাপট বেশি। গন্ধর্ব-কিন্নরদের সঙ্গীত-বৃত্তির দৃষ্টান্ত শেষ করে আবার কাশ্যপ-মতঙ্গ-পাষ্টি প্রভৃতি সঙ্গীত-সাধকে: মধ্যে ফিরে এসেছেন তিনি।

প্যাণ্ডেলের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে বাইরের দিকে তাকালেন অনুশ্রী। অনেকটা নিজের অগোচরে।

কি হল?

না, কিছু না। সামনের দিকে এগোলেন আবার।

কিন্তু বিভূতিবাবুর হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক মনে হল তাঁকে।

পাশাপাশি খালি আসন দুটোতে বসলেন তাঁবা। অনুশ্রী ঘাড় ফিরিয়ে মালা-লগ্ন ফোটো দুটো দেখলেন খানিক। তারপর সামনের দিকে ফিরে ভাষণে মন দিতে চেষ্টা করলেন।

বিভূতিবাবু থেকে থেকে লক্ষ্য রাখছেন তাঁর দিকে। লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। কি জানি কেমন

একটু ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে তাঁর। এত আলোর দরুন কিনা বলা যায় না, অনুশ্রীর মুখখানা একটু বেশি লালচে ঠেকছে। আর অন্যমনস্কও লাগছে। ঠিক এই মুহূর্তের এই উৎসবানুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর খুব একটা যোগ আছে, সে-রকম মনে হচ্ছে না।

তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে নীচুগলায় বিভূতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, শরীর খারাপ লাগছে?

উঁ? না। আবারও ভাষণে মন দিতে চেষ্টা করলেন অনুশ্রীদেবী।

ভারতীয় সঙ্গীতের মান আর সমাদরের দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলেন প্রধান অতিথি। য়ুরোপীয় সভ্যতা আর শিল্পকলার মাতৃভূমি প্রাচীন গ্রীস নাকি ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অতঃপর যস্মিন দেশে যাদৃশী রীতি অনুসরণ করে মার্গ-সঙ্গীত থেকে লোকানুরঞ্জক দিশী সঙ্গীতে পাড়ি দেবার উপক্রম করছেন তিনি।

কিন্তু বিভূতিবাবুর চোখ-কান দুইই অনুপস্থিত। অনুশ্রীর মুখ চোখের অবস্থা ভাল দেখছেন না। সামান্য ব্যতিক্রমও তাঁর চোখ এড়াবার নয়। ব্যতিক্রমটা সামান্য লাগছে না। পার্শ্ববর্তিনী অন্যমনস্ক নন শুধু, নিঃশব্দে কি একট অস্বস্তি ভোগ করছেন। অস্বস্তিটা ঠেলে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। সেটা বাড়ছেই। যাতনার ছাপ পড়ছে। অথচ এটা ঠিক দেহগত ক্লেশ মনে হচ্ছে না বিভূতিবাবুর।

আবারও ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

এবা রে আর অস্বস্তি গোপন করলেন না অনুশ্রী দেবী। অস্ফুট স্বরে বললেন, কি রকম যেন লাগছে...।

কি রকম লাগছে? সত্যিই খারাপ লাগছে কি স্মৃতির আলোড়ন কিছু, বুঝতে চেষ্টা করছেন বিভূতিবাবু।

অনুশ্রী জবাব দিলেন না। যতটা প্রকাশ হয়েছে তার থেকে সত্যি অনেক বেশি বিড়ম্বনা ভোগ করছেন তিনি। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠছে এক-একবার। অথচ বেরুবার সময় বা গাড়িতেও এমন হয়নি। বেশ সুস্থ ছিলেন। আসার আগ্রহ ছিল, উদ্দীপনা ছিল। কিন্তু হঠাৎ কি হল বুঝছেন না। অন্তস্তলে কি একটা আলোড়ন অনুভব করছেন শুধু। দুর্বোধ্য যাতনার মত, অর্থহীন আকৃতির মত।

বাড়ি যাবে? ভিতরে ভিতরে বেশ ঘাবড়েছেন বিভূতিবাবু।

অনুশ্রী মাথা নাড়লেন। এইভাবে এতদিনের প্রত্যাশিত অনুষ্ঠান ছেড়ে যাওয়া তিনি কল্পনা করতে পারেন না। আত্মস্থ হয়ে, শক্ত হয়ে, প্রস্তুত হয়ে বসলেন তিনি। নিজের অগোচরে অজ্ঞাত একটা দুর্বলতার প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন যেন। আর দেবেন না।

প্রধান অতিথির দীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহারে কাব্য-স্পর্শ লেগেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীতের মহাভাবে সমুদ্ভূত। সঙ্গীতের তরঙ্গে মেতে আছে গ্রহ-নক্ষত্র, সঙ্গীতের লীলায় বিভোর সমুদ্র-তরঙ্গ। তটিনীর কলকল, বিহঙ্গের কূজন, বিরহিণীর সন্তাপ, শিশুর হাসি-কান্না— সবই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি। জগৎ সঙ্গীতময়।

হাততালিতে কানে তালা। ভাষণের কদরেও হতে পারে, বক্তৃতা থামল বলেও হতে পারে।

এই শেষের খানিকক্ষণ পাশের দিকে খেয়াল ছিল না বিভূতিবাবুর। প্রথম ভাষণের সাড়ম্বর সমাপ্তি-পর্ব উপভোগ করছিলেন আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। হাতের স্পর্শে চমকে উঠলেন। ফিরে তাকাতে বিড়বিড় করে অনুশ্রী বললেন, আমি বাড়ি যাব।

বিভূতিবাবু দেখলেন, এই শীতেও অনুশ্রীর লালচে মুখ ঘামে ভেজা। কণ্ঠস্বরে নয় শুধু, সমস্ত চোখে-মুখে ফেরার আকূতি। আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করে তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সভাপতিকে বলে অনুশ্রীকে নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। দু দিক থেকে দুজন ভলান্টিয়ার দৌড়ে এল, হস্টেলের অল্পবয়সী দুজন টিচারও।

নিজে ঘাবড়ে গেলেও বিভূতিবাবু সেটা প্রকাশ করলেন না। বললেন, ভিড়েতে অস্বস্তি বোধ করছেন একটু। তাঁদের সঙ্গে ভলান্টিয়ার আর মেয়ে দুটিও প্যাণ্ডেলের বাইরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু অনুশ্রীর তেমন যেন হুঁশ নেই। আলোর থেকে অন্ধকারে এসে আরও বেশি ফাঁপর লাগছে। দুই চোখে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে চারিদিকে তাকাচ্ছেন তিনি।

হাতে ধরে তাঁকে গাড়িতে তুলে বিভূতিবাবুও উঠতে যাচ্ছিলেন। অনুশ্রীর দিশা ফিরল যেন। বাধা দিলেন. তুমি আসছ কেন, তুমি থাকো. ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসুক আমাকে—সবাই চলে এলে হবে কেন! কিছু ভাবনা নেই, আমি ভালই আছি।

এরকম নিষেধ শোনার কথা নয় বিভূতিবাবুর। কানে তোলার কথা নয়। অনুশ্রীকে পৌঁছে দিয়ে তক্ষুনি ডাক্তারের কাছে ছোটার কথা তাঁর। কিন্তু নিষেধটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হকচকিয়ে গেলেন কেমন। পা আপনি থেমে গেল। অসহিষ্ণু আদেশের মতই শোনাল প্রায়। মনে হল, নিষেধটা অনুষ্ঠানের তিনিই প্রধান কর্তাব্যক্তি বলে নন, অনুশ্রী একা থাকতে চান বলে। যে একার রাজ্যে দ্বিতীয় দোসোর নেই সেখানে ফিরে যেতে চান বলে। সেখানে আর কারো পদার্পণ সীমা-লঙ্ঘনের মত, আর কারো সঙ্গ অবাঞ্ছিত বাধার মত।

বিভূতিবাবুর দ্বিধার ফাঁকে মেয়ে দুটি কিন্তু গাড়িতে উঠে বসেছে। মা-মণির সঙ্গে ছায়ার মত ফেরে তারা। অনুশ্রীর তাও পছন্দ হয়নি হয়তো। কিন্তু তাদের আর বললেন না কিছু। বিভূতিবাবুর ইঙ্গিতে একজন ভলান্টিয়ার তাঁদের পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল।

বিভূতিবাবু প্যাণ্ডেলের ভিতরে ঢুকলেন না আর। ওই আলো আর ওই ভিড় ভালো লাগবে না। ভিড় বাইরেও। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ফাঁকায় দাঁড়ানো যায়। একটু সরে এসে পায়চারি করতে লাগলেন বিভূতিবাবু। হঠাৎ এ-রকম হল কেন অনুশ্রীর, ঠাওর করতে পারছেন না। গাড়ি থেকে নামলেন যখন তখনো তো সুস্থ স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। বছরের এই একটা দিনের প্রতীক্ষার জন্য অনুশ্রীর কত আগ্রহ, কত প্রতীক্ষা।

ওদিকে সভাপতির ভাষণও শেষ হয়েছে। পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠাতার কথাই বিশেষ করে

বলছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের কথা, সাধনার কথা, আদর্শের কথা, ত্যাগের কথা। সমবেত অতিথিবর্গের অনেকেরই সে কথা বহুবার শোনা হয়ে গেছে বোধহয়। বিভূতিবাবুও কান পেতে শুনছিলেন, মাঝে মাঝে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন।

...অনুশ্রীকে এভাবে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হল না। প্রেসার যে বেড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কত বেড়েছে কে জানে। কিন্তু এই দিনে এ-রকম হল কেন...!

ভলান্টিয়ার ছেলেটি গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে। তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিভূতিবাবু। দরকার হলে ডাক্তার ডাকতে বলেছিলেন। দরকার হয়নি। তবে বাইরে দাঁড়িয়ে দোতলায় অনুশ্রী দেবীর ঘরে বহুক্ষণ পর্যন্ত আলো জ্বলতে দেখেছে সে। আসার সময় দরোয়ানকে সজাগ থাকতে বলে এসেছে।

বিভূতিবাবুর জন্যে বাইরে একটা চেয়ার পেতে দিয়েছিল সে। বিভূতিবাবু বসছেন মাঝে মাঝে। আবার উঠে পায়চারিও করছেন। গান কানে আসছে। খুব সহজবোধ্য নয়। অন্তত বিভূতিবাবুর পক্ষে। কোনো নামকরা গায়কই গাইছেন। যে-ক'জন এসেছেন, সবাই নামকরা। কিন্তু পঞ্চবটীর সঙ্গে এতকাল ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জটিলতা দুর্ভেদ্য তাঁর কাছে।...অথচ, এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই তো তিনি কান পেতে শুনেছেন কত ঠিক নেই। কিছু বুঝুন না বুঝুন বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠেছে কত দিন, কত রাত। সেদিনও রাগের অঙ্গ-প্রকার জানতেন না, স্বর-ব্যাকরণের খোঁজ রাখতেন না, মিড়-গমক প্রক্ষেপ-বিক্ষেপ বুঝতেন না। কিন্তু নিরেট মাটি চুঁইয়ে জল চলার মত সেই অজ্ঞতা চুঁইয়েও অন্তস্তলে গান পৌঁছতো। বিভূতিবাবু এক একবার ভাবেন সেই গান নেই। কখনো বা ভাবেন গান নেবার সেই মন নেই। তাঁরই ভিতরটা বদলেছে।

এবার শীত করছে বেশ। বিভূতিবাবু শালটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। চারদিকের গাছগুলোয় চাপা সড়সড় শব্দ হচ্ছে একটা। বিকেলে যে দুর্যোগ গেছে মনেই ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ল। এর মধ্যে আবার যে এক পশলা হয়নি আশ্চর্য বলতে হবে। অন্ধকারে বিভূতিবাবু আকাশের সমাচার বুঝতে চেষ্টা করলেন। সর্বনাশ, ওই মেঘ যদি ভাঙে আবার, আকাশ ভাঙবে। চারকোণের নভশ্চর কালো পশুরা সব বেরিয়ে পড়ে একে অপরের সঙ্গে মিশে জমাট বেঁধে আছে। ঝটিকা-প্লাবনে দশ দিক ভাসিয়ে দেবার কথা এতক্ষণে। কিন্তু কার নিষেধে যেন থমকে আছে। অনাগত প্রলয়ের মত সেটা আরো ভয়াল।

এদিকে উৎসবে মগ্ন সকলে। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে বা বসে তাদেরও আকাশের দিকে চোখ নেই। মঞ্চে নতুন শিল্পী নতুন গান ধরেছেন কখন খেয়াল করেননি বিভূতিবাবু। সুরটা মিষ্টি লাগছে, বিস্তার করুণ লাগছে। চেনা চেনা লাগছে, বোধহয় দরবারী কানাড়া। এককালে গবেট ছেলের মাতায় অঙ্ক ঠেসে ঢোকানোর মত তাঁর মাথায়ও রাগ-রাগিণীর সংকেতগুলি ঠেসে ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছিল। মাথায় যাও বা দুই-একটা ঢুকেছিল, হৃদয়ে একটাও ঢোকেনি। ফলে মাথার দায় মাথা বহুকাল আগেই খালাস করে নিয়েছে।

কিন্তু সুরটা বাইরের এই গুমোট স্তব্ধতার মধ্যে যেন বুকের কাছাকাছি আসতে চাইছে।

বিভূতিবাবু কান পাতলেন। তাঁর হঠাৎ কেমন মনে হল এমনি এক মহাশূন্য স্তব্ধতার মধ্যে ডানা-ভাঙা একটা পাখি কোন্ এক দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যের শাখায় পৌঁছতে চাইছে। সেই চেষ্টায় সে কেবলই উঠছে আর নামছে। যত কাছে আসছে তত তার আকৃতি বাড়ছে। কারণ সত্যিই সে পৌঁছবে কিনা জানে না।

বিপুল করতালিতে অনেকক্ষণের একটা সম্মোহন ভেঙে গেল বিভূতিবাবুর। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন তিনি। উপলব্ধির দরবারে হাততালিটা ছন্দপতনের মত। শুচিতা ছড়ানো অর্চনার মধ্যে ছোটছেলের বড়সড় একটা কাচের বাসন আছড়ে ভাঙার মত। প্রাণে যদি তোদের দোলা লেগেছে, হাততালি দিস্ কেন!

বিভূতিবাবু ঘড়ি দেখলেন। এগারোটার কাছাকাছি। উঠে প্যাণ্ডেলের কাছে এসে একজন ভলান্টিয়ারকে ডেকে আকাশের অবস্থা দেখালেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আজকের প্রোগ্রাম শেষ করতে বলে গাড়িতে এসে উঠলেন। ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধহয়, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

সরোজিনী হস্টেলের পাশ দিয়েই যাবেন তিনি। ড্রাইভারকে বলার দরকার নেই কিছু, ওই একটাই পথ। সম্ভব হলে অনুশ্রীর খবর নিয়ে যাবেন একবার। চিন্তাচ্ছন্ন তিনি। এই গেল বছর স্ট্রোক হয়ে গেছে অনুশ্রীর, আবার সে রকম হলে তো হয়েই গেল। নিজেকে চোখ রাঙালেন বিভূতিবাবু, একটুতেই বড় বেশি ভাবতে শুরু করেছেন তিনিও আজকাল। নইলে কি এমন হয়েছে? মানুষের শরীরের ভাল মন্দ আছেই, একটুতেই সঙ্কটের কথা মনে হয় কেন তাঁর? তাছাড়া হলেই বা কি আর করতে পারেন, গেলবারেও তো অনুশ্রীর বাঁচার আশা ছিল না। পরমায়ু ছিল তাই বেঁচেছে।

নিজেকে শক্ত সবল করতে চেষ্টা করলেন বিভূতিবাবু।

এত রাতে সবাই ঘুমিয়েছে হয়তো, এক যদি দরোয়ান জেগে থাকে। তাকে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে যখন সে হয়তো সমস্ত রাত বসেই কাটাবে। ষাট বছরের জগুয়া। ইস্কুল আর হস্টেলের দরোয়ান হলেও তার প্রতিপত্তি কম নয়। বলতে গেলে সে-ই গার্জেন মেয়েদের। তার চোখে ধুলো দিয়ে একটা মেয়েরও ফটক পেরুনোর উপায় নেই। মেয়েদের ওপর রাগ যেমন, টানও তেমনি।

খোয়ার রাস্তা ছাড়িয়ে গাড়ি পাকা রাস্তায় পড়ল। পঞ্চবটী দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের স্তব্ধতা দ্বিগুণ চেপে বসল। বাতাসও তেমন বইছে না এখন, দূরে দূরে গাছগুলো এক এক চাপ কালো অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে। না, বিভূতিবাবুর কিছুই ভালো লাগছে না। ক্লান্ত লাগছে। এই দিনটা যেন সমস্ত প্রত্যাশার থেকে বড় বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এত উৎসাহ এত তোড়জোড় সব যেন বাইরের এই অন্ধকারের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেল। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে নির্লিপ্ত হতে চেষ্টা করলেন তিনি।

ফটকের কাছে গাড়ি থামতেই বিষম চমকে উঠলেন বিভূতিবাবু। শব্দ না করে গাড়ির দরজা খুলে নামলেন। দোতলায় অনুশ্রীর ঘরে সাদা আলো জ্বলছে। রাতে পড়াশুনা করা অথবা বিশেষ দরকার ছাড়া অনুশ্রী ওই কটকটে সাদা আলো জ্বালেন না। তাঁর ঘরে হয় সবুজ আলো

জ্বলে, নয়তো আলো নেভানো থাকে। শরীর অসুস্থ থাকলে সাদা আলো জ্বলেই না বলতে গেলে। সর্বদা সবুজ আলো জ্বলে।

জগুয়া জেগেই ছিল। গাড়ি থামার শব্দ কানে আসতে তাড়াতাড়ি ফটকের কাছে এগিয়ে এলো। সে যেন জানত 'সেক্রেটারী' বাবু আসবেন।

মা ভাল আছেন তো জগু? ঘরে আলো জ্বলছে কেন?

অন্ধকারে ফটকের তালা খুলতে খুলতে জগু অনুচ্চ জবাব দিল, আপনি একবার আসেন বাবু, মা-মণির শরীর অস্থির করেছে, দিদিমণিরা ভাবছে। মা-মণির ঘুম হচ্ছে না।

সিঁড়ির মুখে জুতো খুলে রেখে বিভূতিবাবু তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠলেন। বারান্দায় অনুশ্রীর ওধারের ঘরের মেয়েদুটি চুপচাপ বসে। স্কুলের অল্পবয়সী সেই টিচার দুজন। অনুশ্রীকে মায়ের মত দেখে। এই স্কুলেই তিনি তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কলকাতায় রেখে কলেজে পড়িয়েছেন।

মামাবাবুকে দেখে তারা প্রাণ পেল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে তারা ফিস্‌ফিস্ করে জানাল, পঞ্চবটী থেকে এসে পর্যন্ত মা-মণি ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়েছেন। একভাবে বেশিক্ষণ বসছেনও না, শুয়েও থাকছেন না, একটু পরে পরেই চোখে মুখে আর মাথায় জল চাপড়ে দিচ্ছেন। অথচ তারা ঘরে ঢুকলেই শুয়ে থাকার জন্যে ধমকে বার করে দিচ্ছেন। ভয়ে তারা ঘরে ঢুকতে পারছে না, নিজেদের ঘরেও যেতে পারছে না।

নিঃশব্দে তাদের আশ্বস্ত করে বিভূতিবাবু অনুশ্রীর ঘরের দিকে এগোলেন। মেয়েরা সরে গেল। বিভূতিবাবু ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু টোকা দিলেন কয়েকটা।

অনুশ্রী দরজা খুলে দিলেন। শব্দ শুনেই বুঝলেন কে। এত রাতে আসার জন্যে একটুও অবাক হলেন না, একবারও অনুযোগ করলেন না। বরং একটা দিশেহারা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সুনিশ্চিত আশ্রয়ের মত পেলেন যেন কিছু। উল্টে আরো অনেক আগে আসা উচিত ছিল যেন তাঁর। আসেননি বলেই অসহিষ্ণু কাতরতা অনুশ্রীর।

তাঁর সমস্ত মুখে কে যেন আলগা সিঁদুর গুলে দিয়েছে। চোখের দৃষ্টিও উদভ্রান্ত কেমন।

দুই হাতে তাঁর একখানা হাত আঁকড়ে ধরে ভিতরে নিয়ে এলেন।— এসো, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম—আমার এমন লাগছে কেন বিভুদা!

বিভূতিবাবু কথা না বলে তাঁকে শয্যায় বসিয়ে দিলেন। তারপর মোড়া টেনে নিয়ে সামনে বসলেন। নাড়ি দেখার জন্য অনুশ্রীর হাত ধরলেন।

কিন্তু দেখার আগেই হাত টেনে নিলেন অনুশ্রী। অসহিষ্ণু আবেগে ফিস্‌ফিস করে আবারও বলে উঠলেন, ও-সব ঠিক আছে, আমার এ-রকম লাগছে কেন সেই থেকে? এ-রকম হচ্ছে কেন?

বিভূতিবাবু চুপচাপ দেখলেন একটু, কি কষ্ট হচ্ছে?

ভয়ানক কষ্ট। কি যেন হল বিভুদা, কি যেন হয়ে গেল— আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ছোট মেয়ের মতই কাতরতা অনুশ্রীর।

কিচ্ছু হয়নি, বিভূতিবাবু জোর দিয়ে অভয় দিলেন তাঁকে, প্রেসারটা বেড়ে থাকবে। তখন

আসতে দিলে না, ডাক্তারকে খবর দেওয়া যেত।... তুমি ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে থাকো একটু, আমি দেখছি—

ওঠার উপক্রম করতেই অনুশ্রী তাঁর দু'হাত আঁকড়ে ধরলেন আবার। অধীর বিরক্তিতে বলে উঠলেন, আঃ, ডাক্তার চাইনে— বুঝছ না কেন— শরীর খারাপ নয়, শরীর খারাপে এরকম হয়নি কখনো। আমার ভালো লাগছে না, আমার পঞ্চবটীতে যেতে ইচ্ছে করছে, কি হচ্ছে আমি কি-চ্ছু বুঝতে পারছি না।

চাপা আর্তনাদের মত শোনাল। বিভূতিবাবু মূর্তির মত বসে। এতক্ষণের মানসিক তাড়নায় অনুশ্রী শ্রান্তহয়ে পড়েছিলেন। বিভূতিবাবু ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলেন তাঁকে। উঠে পাখাটা আরো জোর করে দিলেন। তারপর দেয়াল-আলমারী খুলে তাকের ওষুধগুলো দেখলেন একটু। কোন্‌টা কি ওষুধ, কোন্‌টা কখন দিতে হবে সবই জানেন।

নিজের হাতে একটা ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেন তাঁকে। অনুশ্রী আর বাধা দিলেন না। এতটা উত্তেজনার পরে অনেকটা যেন আত্মস্থ হয়েছেন। এতক্ষণের নিঃসঙ্গ তাড়নার পর সামনে আপন জন দেখে এখন নিজেরই কেমন মনে হল একটা স্নায়বিক দুর্বলতার ঘোরে অকারণ যাতনা ভোগ করছিলেন তিনি।

সবুজ আলো জ্বেলে চড়া সাদা আলোটা নিভিয়ে দিলেন বিভূতিবাবু। তারপর মোড়াটা আর একটু সামনে টেনে বসলেন।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে অনুশ্রী ক্লান্ত চোখ মেলে তাকালেন একবার। বললেন, বিভুদা, তুমি যাও এবার, আর রাত কোরো না, আমারও ঘুম পাচ্ছে—

বিভূতিবাবু উঠলেন। বললেন, আমি নীচে আছি, জগুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বারান্দায় শোবে। দরকার হলেই তাকে ডেকে আমাকে খবর দিতে বোলো।

অনুশ্রী জবাব দিলেন না বা নিষেধ করলেন না। এই ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়। নীচে তাঁর অফিসঘরের একধারে শয্যার ব্যবস্থাও আছে। অনুশ্রীর গেলবারের স্ট্রোকে রাতের পর রাত এখানেই থাকতে হয়েছে তাঁকে। আগে গুটি তিনেক ঘর নিয়ে সপরিবারে এই নীচের তলাতেই বাস করতেন বিভূতিবাবু। স্ত্রী যাবার পরেও ছিলেন কিছুকাল। বাড়িটা নিজের হলেও মেয়েদের হস্টেল, ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছিল— থাকাটা ভাল দেখায় না বলে পৈতৃক ভিটেতে নতুন বাড়ি তুলে উঠে গেছেন।

নীচে নেমে ড্রাইভারকে বিদায় দিতে এসে আবারও আকাশের দিকে চোখ গেল। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কালো আকাশটাকে চিরে চিরে দিয়ে যাচ্ছে। ভালোয় ভালোয় ওদিকে গানের আসর শেষ হলে হয়। বাতাস নেই, কালো মেঘের নীচে লালের আভা। একবার শুরু হলে রক্ষা নেই।

জগুয়াকে ওপরে পাঠিয়ে বিভূতিবাবু বিছানায় এসে বসলেন। রাতটা নিরুপদ্রবে কাটলে শান্তি, যত ভোরে সম্ভব ডাক্তারকে একেবারে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসতে বলে দিয়েছেন ড্রাইভারকে।

সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর দুর্ভাবনায় বিছানায় গা ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ ভেঙে

আসছিল বিভূতিবাবুর। অথচ ঘুম তেমন আসছে না। এই বিশ্রামটুকুই কাম্য ছিল, কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের উপর চিন্তার অসংলগ্ন আঁচড় পড়ছিল ক্রমাগত। সব দিন ছেড়ে এই দিনটাতেই কিনা যত দুর্যোগ! যার স্মৃতি নিয়ে এই সব কিছু, দুর্যোগের সঙ্গেই যেন চিরকাল নাড়ির যোগ তাঁর। অনুশ্রীর প্রেসার চড়ে থাকবে, মুখ অত লাল দেখেই বুঝেছিলেন তিনি।... অনুশ্রী অবশ্য বলছে প্রেসার নয়, শরীর খারাপও নয়, অথচ কি একটা হচ্ছে— কি একটা হয়ে গেল সে কিছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু বিভূতিবাবু নিঃসংশয়, প্রেসার ছাড়া আর কিছু না।... আজকের দিনের মানসিক প্রতিক্রিয়ার দরুনই প্রেসারটা অত বেড়েছে, আর ও-রকম লাগছে। প্রত্যেকবারই এই দিনটায় অনুশ্রীর মনের উপর দিয়ে একটা চাপা ধকল যায় বিভূতিবাবু জানেন তা। কিন্তু এবারে এতটা হতে পারে ভাবেননি।...এ রাতটার প্রত্যাশায় হয়তো ক'রাত ঘুমোয়নি...ভিতরে ভিতরে যাতনা ভোগ করেছে। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও আসলে চাপা স্বভাব— বিভূতিবাবু কিছুই টের পাননি।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন বোধহয়।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। সর্বাঙ্গে রোমে রোমে কাঁটা দিয়ে উঠল। ধমনীর রক্ত-চলাচল বুঝি হঠাৎই থেমে গেল একেবারে।

তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? স্বপ্নের ঘোরে ভুল শুনছেন? একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বিছানা থেকে নেমে এলেন তিনি, দুই চোখে অন্ধকার বিদীর্ণ করে বাইরের দিকে তাকালেন।...দূর থেকে এখনো কানের পরদায় কি বাজছে? এখনো কি শুনছেন তিনি?

'ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং
শিব আত্মা পরমাত্মা
অন্তরাত্মা ত্বম্।'

এই গলা, এই কণ্ঠস্বর, এই অতি-পরিচিত ভজন-স্তোত্র তাঁর ভুল হবে কেমন করে? এই গলা আর এই স্তোত্র যে অস্থি-মজ্জায় শিরায় শিরায় লেগে আছে। স্বপ্ন দেখছেন? ভুল শুনছেন?

ওরে কে এলি ? কে রে তুই? কোথায় তুই?

অব্যক্ত আর্ত আকৃতিতে উদভ্রান্তের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন বিভূতিবাবু। কিন্তু বাইরের ফটক বন্ধ, দরোয়ান ওপরে। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা তরল হাহাকার দাপাদাপি করছে। দু'হাতে বন্ধ ফটক আঁকড়ে আবারও কান পাতলেন তিনি। না, ভুল শুনছেন না— কণ্ঠস্বর আরো দূরে। ওই জঙ্গলের ধার ঘেঁষে...কানা দামোদরের দিকে বোধহয়। ভুল নয়, দুর্যোগের আকাশ আর বাতাসও উপলব্ধির ভারে টলটলিয়ে উঠল যে! আর কার জ্যোতি-ঘোষণায় দুর্যোগভরা নিশীথিনীর স্তব্ধতা এমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে!...

'ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং।
শিব আত্মা পরমাত্মা
অন্তরাত্মা ত্বম্।

রজঃ সত্ত্ব ত্বম্।'

ফটক ছেড়ে অন্ধকার ঠেলে প্রায় দৌড়েই ভিতরে চলে এলেন বিভূতিবাবু। উর্ধ্বশ্বাসে দোতলায় উঠতে লাগলেন।

প্রতিটি মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডের উপর মুগুরের ঘা পড়ছে।

কিন্তু মাঝ-পথেই পা থেমে গেল।

দোতলার বারান্দার আলো জ্বলছে। বুড়ো জগুয়ার আকৃতি কানে এলো। মা-মণিকে শান্ত হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসতে অনুরোধ করছে সে। বলছে, 'সেকেটারি' বাবুকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আসছে, মা-মণি শুধু একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘরে বসুন—

সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে অস্ফুট আর্তনাদ অনুশ্রীর, তুই আগে যা শিগগির জগু, ডেকে নিয়ে আয়—

চুপচাপ জগুকে তুলে চাবি নিতে এসেছিলেন বিভূতিবাবু। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উপরে এসে অনুশ্রীকে ধরলেন। অনুশ্রীও কাঁপছে থরথর করে, সমস্ত মুখখানা বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে রক্ত ঝরবে এক্ষুনি।

তাঁকে দেখামাত্র কাল ভুলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন অনুশ্রী।— বিভুদা, তুমি শুনেছ? ও কে গেল বিভুদা? কে গেল? বিভুদা যাও, দেখো কে গেল! পঞ্চবটীতে ও কে এসেছিল বিভুদা? ওরা তখন কাকে অপমান করল?

একরকম জোর করেই তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন বিভূতিবাবু। চৌকিতে বসিয়ে দিলেন। জগুয়াকে জল আনতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁকে যেতে বলেও দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন অনুশ্রী।—বিভুদা তুমি শুনলে? সে যে এসেছিল, বলেছিল আসবে— তাই এসেছিল। আমি যে তাকে দেখেও চিনলাম না বিভুদা. সবাই তাকে অপমান করছে দেখেও তাকালাম না— আর তারপর থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল. কি হয়ে গেল, কোথাও কিছু একটা হয়ে গেল, আর আমি চোখ চেয়ে দেখলামও না. বুঝলামও না—

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন তক্ষুনি, বাইরে আসতে চেষ্টা করলেন। বাধা পেয়ে অব্যক্ত অস্ফুট যাতনায় ভেঙে পড়লেন আবারও. বিভুদা, আমি ভুল শুনিনি, আমি ভুল করছি না— শিগগির গিয়ে দেখো কে চলে যাচ্ছে—

বিভূতিবাবু নিজেকে সংবরণ করে নিয়েছেন, সংযত করেছেন। ধমকের সুরেই বললেন, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বোসো চুপ করে, নইলে আমি এক পা নড়ব না।

জগু জল নিয়ে এসেছিল। গামছা ভিজিয়ে মাথায় জল চাপড়ে দিতে বললেন তাকে। বাইরে এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে পাশের ঘরের মেয়ে দুটিকে তুললেন। মা-মণির হঠাৎ অসুস্থতার খবর শুনে হকচকিয়ে গেল তারা।

ঘরে ফিরে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন বিভূতিবাবু। ভিজে গামছা হাতে জগুয়া ফ্যাল ফ্যাল করে মা-মণিকে দেখছে।

অনুশ্রী ভিজে মাথাতেই বিছানায় গা ছেড়ে দিয়েছেন— স্থির, নিস্পন্দ। জ্ঞান নেই।

বিভূতিবাবু বাড়ি গিয়ে ড্রাইভারকে তুলে আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার নিয়ে ফিরেছেন। রাত প্রায় দেড়টা তখন।

রোগিণী পরীক্ষা করে ডাক্তার আশ্বাস দিলেন, স্ট্রোক নয়, তবে প্রেসার খুবই বেশি বটে। এ অবস্থায় স্ট্রোক হওয়া বিচিত্র নয়।

পরিচিত রোগিণী। বিভূতিবাবুর মুখে সমাচার শুনে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। ব্যবস্থায় মন দিলেন। অন্য সকলে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

অনুশ্রীর একহাতে প্রেসার-মাপা যন্ত্রের ফেটি বাঁধা। রক্ত-চাপ কোথায় উঠে আছে বিভূতিবাবুও দেখছেন। অন্য হাতের শিরায় মস্ত সিরিঞ্জের নিড্‌ল ঢোকানো। রক্ত টেনে বার করবার দরকার হচ্ছে না, মুখ ঠেলে আপনিই রক্তে ভরে যাচ্ছে নলটা।

চারবার চার সিরিঞ্জ রক্ত ফেলা হল। সামনের ছোট গামলাটার অর্ধেক রক্তে ভরে গেল। মেয়ে দুটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, জগুয়া কাঠ— বিভূতিবাবু দেখছেন।

জ্ঞান না হলেও রোগিণী একটু সুস্থ বোধ করছেন মনে হল। ডাক্তার ইন্‌জেকশান দিলেন একটা। তারপর বাইরে এসে জানালেন, সকালের আগে পেসেন্ট চোখ খুলবেন মনে হয় না— কিন্তু তখন ঠাণ্ডা রাখতে হবে তাঁকে, শান্ত রাখতে হবে। কোনরকম উত্তেজনার কারণ না ঘটে।

বাইরের আবছা অন্ধকারে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে বিভূতিবাবু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন খেয়াল নেই। সামনের দরজা খোলা, ঘরে নীল আলো জ্বলছে। মেয়ে দুটি তাদের মা-মণির শিয়রের কাছে বসে। জগুয়া এধার ওধারের কোনো অন্ধকার কোণে আশ্রয় নিয়েছে হয়তো।

ডাক্তারকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি ফিরে নীচের ফটকের কাছে থামতে বিভূতিবাবুর হুঁশ ফিরল। ড্রাইভারকে ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। চুপচাপ দেখলেন একটু। তারপর বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে সিঁড়ি ধরে নীচে নামতে লাগলেন।

তিন

কাহিনীর গোড়ার উৎস চল্লিশ বছরের এক খণ্ডকালের এধারে।

সময়টা দীর্ঘ। যোগানন্দপুরের ভোল বদলেছে। বদলাচ্ছে। আজ যা নতুন, কাল তা পুরনো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনো প্রৌঢ় আর বৃদ্ধদের স্মৃতি-দর্পণ থেকে চল্লিশ বছর আগের সে যোগানন্দপুর মুছে যায়নি। বিস্মৃতির অনেক আস্তরণ পড়েছে, অনেক ধুলোবালি জমেছে। তবু একবার ঘষে মুছে দিলেই তাদের সেই দর্পণ থেকে চল্লিশটা বছরও অনায়াসে মুছে যেতে পারে।

ভাবতে বসলে মনে হবে সেদিনের কথা।

যোগানন্দপুরকে এখন আর ভুলেও গ্রাম বলবে না কেউ। শহরেরই একটা অংশ বলবে। দূরের অংশ। কিন্তু শহরের থেকে কমতি যায় না কিছুতে। শহরের অভিজাত ধমনীটি বরং দিনকে দিন এ দিকটাতেই প্রসারিত হচ্ছে এখন। যোগানন্দপুর শহরের সঙ্গে গোটাগুটি জুড়ে গেছে।

কিন্তু সেদিন কল-কারখানা মোটরগাড়ি বা পাকা রাস্তা দূরে থাক, পাকা দালান কটা ছিল হাতে গোনা যেত। দূরের মানুষেরা বর্ধিষ্ণু গ্রাম দেখার জন্যে যোগানন্দপুরে আসত সেদিন। যোগানন্দপুরের সেই ঘন সবুজের তারুণ্য অন্যরকম ছিল। কালের পলেস্তারা সরালে জায়গাটার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য অসংলগ্ন কথা কানে আসবে। কোনো অসাধারণ যোগীর যোগমাহাত্ম্যের সঙ্গে জায়গার নামের যোগ নাকি। সেই যোগী কোন্ যুগের কেউ হদিস দিতে পারবে না— বৈদিক যুগের হওয়াও বিচিত্র নয়।

অবশ্য, এখানকার বাতাসে আধ্যাত্মপ্রবণতার চাপ কিছু থাকাই স্বাভাবিক। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমতীর্থ ত্রিবেণী খুব বেশি দূর নয় এখান থেকে। সেটি যে বৈদিক ঋষিদের সাধনা-ক্ষেত্র ছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ নেই। ত্রিবেণীর ধারে কাছেই আবার সপ্তগ্রাম—অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুস্মান, জ্যোতিস্মান, দ্যুতিস্মান, সবন ও ভব্য প্রমুখ সাত-ঋষির তপঃস্মৃতির স্বাক্ষর সপ্তগ্রাম।

যাই হোক, মাত্র চল্লিশ বছর আগে যোগানন্দপুরের পথেঘাটে বটতলায় অশ্বত্থতলায় জটাজূটধারী সন্ন্যাসী বড় কম দেখা যেত না। অবশ্য তাঁদের দিন আর ছিল না। শিক্ষার বাহনে চড়ে শহর দ্রুত এগিয়ে আসছিল। তবুও ঘরে ঘরে গীতাপাঠ চণ্ডীপাঠের রেওয়াজ ছিল তখনো, যাগযজ্ঞ জপতপের ধারা এতটা শুকোয়নি। অনেক সংস্কার সত্ত্বেও একধরনের শুচিতার স্পর্শ ছিল সর্বত্র।

এ পথে কাহিনীর বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। কারণ এর সঙ্গে ওই আবহাওয়ার প্রত্যক্ষ যোগ অন্তত কিছু নেই। যাকে নিয়ে এই আখ্যান, তার বয়স তখন বারো কি তেরো। নতুন কালের নতুন যুগে পা দিয়েছে সে।

বড়তলার ত্রিকোণ বাড়ির মৃগাঙ্ক গোস্বামীর ছেলে শশাঙ্ক গোস্বামী। এটা পোশাকী নাম, ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা দু-একজন ছাড়া অন্য পরিবেশে এই নাম ধরে কেউ ডাকলে নামের মালিক নিজেই খেয়াল করে সাড়া দেবে কিনা সন্দেহ। শুধু অঙ্ক বা অঙ্কা শুনলে তার কান খাড়া হবে।

গোঁসাইবাড়ি বা ত্রিকোণবাড়ি বললেই বাড়িটা চেনে সকলে। ত্রিকোণাকার বাড়ি নয়। তার সামনের দুই বাহুর মত লাগোয়া আরো দুটো বাড়ি আছে বলে ওই নাম। সামনে বড়সড় ফাঁকা আঙিনা একটা। আঙিনার ভিতর দিয়ে তিন-বাড়ির সদর-পথ। বাড়ি তিনটের মধ্যে ওই ত্রিকোণ বাড়িটাই আবার সবচেয়ে বেশি জরাজীর্ণ। দালান-কোঠাই বটে, কিন্তু কোন্ কালের দালান-কোঠা বলা শক্ত। বাইরে থেকে ছাল-চামড়া ছাড়ানো একটা দালানের কাঠামো বয়সের ভারে ধুঁকছে মনে হয়। সে-তুলনায় সামনের বাঁয়ের দালানটাকে প্রাসাদ বললে অত্যুক্তি হবে না। তেজারতী মহাজন সনাতন ঘোষালের এই দালানও চেনে সকলে।

কমলার দাক্ষিণ্যের দরুনই চেনে, নইলে চেনার আর কোনো কারণ নেই। মহাজন ব্যক্তিটি চোখ বুজেছেন অনেককাল। যোগানন্দপুরে এবং শহরে তাঁর যত জমি-জমা ছড়িয়ে পড়ে আছে, শুধু সেগুলো দেখাশোনা করেই তিন পুরুষ চোখ বুজে কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু বর্তমান মালিক বৃন্দাবন ঘোষাল সে-ভাবে কাটাননি। মোটামুটি লেখাপড়া শিখে কাঠের ব্যবসা ফেঁদে

কমলার প্রাসাদ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর অপর দুই ভাই নিজেদের সম্পত্তির হিসাব বুঝে নিয়ে শহরবাসের পত্তন করেছেন। সেখানকার আদব-কায়দার মধ্যে বসে নিশ্চিন্ত মনে ঘড়ার জল খরচ করছেন তাঁরা।

বৃন্দাবন ঘোষালের একটিই ছেলে— বিভূতি ঘোষাল। ত্রিকোণ বাড়ির অঙ্কুর সমবয়সী আর সহপাঠী। অঙ্কুর শশাঙ্ক নামের মত বিভুর বিভূতি নামটাও তখন গোটাগুটি পোশাকী এবং সিকেয় তোলা। অঙ্কু তবু অঙ্কা হত, কিন্তু সমবয়সীদের হেলা-ফেলায় বিভু অনেক সময় ভূতোয় এসে ঠেকত। এই নাম-বিকৃতির গুরু অঙ্কু। ভূতো ডাক কানে এলেই কান জ্বলত বিভুর। ভূতো ভোলানোর চেষ্টায় এ পর্যন্ত তাকে বহু-রকমের ঘুষ দিয়েছে বিভু, এমন কি বাড়ি থেকে পয়সা চুরি করেও দিয়েছে কত ঠিক নেই। কিন্তু সামান্য বিবাদ বা সামান্য স্বার্থের ব্যাঘাতে অঙ্কু প্রতিশ্রুতি ভুলতো— গলা ছেড়ে ভূতো চালাতো।

পাড়া-পড়শী খুড়ো-জ্যাঠা খুড়ী-জেঠিদের কাছে অবশ্য ভূতো চালু হওয়ার আশঙ্কা কিছু ছিল না। কারণ পাড়ার আর বেপাড়ার দস্যি দজ্জালদের মধ্যে মানিকের টুকরো সোনার ছেলে একটিই দেখেছেন তাঁরা। সে বেনা ঘোষালের এই ছেলে—বিভু। বন্ধু-বান্ধবের সামনে তাঁদের স্নেহ-বচন আর গায়ে মাথায় হাত বুলানোর আতিশয্যে সোনার ছেলেটা অনেক সময় বিব্রত বোধ করত। বন্ধুদের বিশেষ করে অঙ্কুকে তুষ্ট রাখার জন্য বিভু আড়ালে ওই স্নেহশীল আর স্নেহশীলাদের উদ্দেশে ঘটা করে মুখ ভেঙচাতো, কু-কথাও বলত দু-চারটে। অর্থাৎ বোঝাতে চেষ্টা করত, তাকে যে ভালো বলে তাতে ওর সায় নেই— কিন্তু বললে ও কি আর করতে পারে। অতএব অঙ্কু যেন এই নিয়ে তাকে নাজেহাল না করে।

ইস্কুলের মাস্টারমশাইরাও একবাক্যে ভাল ছেলে বলতেন বিভুকে। ফলে মনে মনে নিজেও সে ভাল ছেলেই ভাবত নিজেকে। এই সুনাম বা স্নেহ আদরের সঙ্গে তার বাবার পয়সার যোগটা আবিষ্কার করার মত বয়স নয় সেটা। তার বাবার মোটা বাৎসরিক চাঁদাটা যে ইস্কুল-ভাণ্ডারের একটা বড় বল-ভরসা, সে খবর বিভু রাখত না। তাছাড়া বেনা ঘোষাল সুদে টাকা না খাটালেও লোকের বিপদে আপদে বিনা সুদে ধার-ধোর দিতেন। সেরকম বিপদগ্রস্তের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। বেনা ঘোষাল বিনা সুদে টাকা দেন বটে কিন্তু লেখাপড়ার কড়া-কড়ি না করে দেন না। আর টাকার জন্যে কড়া তাগিদ দিতেও ছাড়েন না। ফলে বড়তলার পড়শীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু ভয়ও করেন তাঁকে। এ হেন বেনা ঘোষালের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারীটি সকলের আদর-যত্ন একটু বেশি মাত্রায় কুড়োবে, সেটা এমন কিছু নয়।

ওদিকে ত্রিকোণ বাড়ির কর্তা মৃগাঙ্ক গোস্বামীকে বিদ্বান এবং পণ্ডিত বলে সমীহ করলেও খুব সুনজরে দেখতেন না বড়তলার পড়শীরা। কারণ মানুষটা বড় বেশি স্পষ্টভাষী আর রগচটা খিটখিটে ধরনের। ইস্কুলের হেড-পণ্ডিত তিনি। পড়শীদের ধারণা, সকলের ওপর পণ্ডিতি করার স্বভাবটা তাঁর মজ্জাগত। দু-পাঁচটা অবনিবনার কথা হলেই দুর্বলতম নাড়ি ধরে টান দিয়ে বসেন। সকলেই দাম্ভিক ভাবেন তাঁকে। তাঁদের আরো অসহিষ্ণুতার কারণ গোঁসাইয়ের ওই হাড়জ্বালানে ছেলে অঙ্কা। অমন লঙ্কা বুঝি আর দুটি দেখেনি কেউ।

বাপ খুব প্রশ্রয় দেন ছেলেকে এমন অপবাদ অবশ্য শত্রুও দেবেন না। বাপের সেই চণ্ডাল শাসন কত সময় চোখের ওপরেই দেখেন তাঁরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ছেলে এক দঙ্গল পাড়ার ছেলের মুণ্ডু চিবিয়ে খেলে তাঁরা বরদাস্ত করেন কেমন করে। দজ্জাল তো অনেক রকমের হয়, ওই বয়সের ছেলে একটু-আধটু দুষ্টু হতেই পারে— কিন্তু অমন ক্ষতিকারক দজ্জাল কটা হয়? বাপের শাসন? মা ওভাবে আঁচলে ঢেকে রাখলে শাসনের পরোয়া কোন ছেলে করে?

খুব মিথ্যে নয়। অন্ধা প্রশ্রয় যেটুকু পায় মায়ের কাছেই পায়। পর পর পাঁচ মেয়ের পরে এই একটিই ছেলে। তাও জন্মের পর থেকে দু-তিন বছর পর্যন্ত বাঁচবে কিনা সংশয় ছিল। কত পূজো-আর্চা যাগ-যজ্ঞ করতে হয়েছে এই ছেলে টিকিয়ে রাখার জন্য। বাপ অমন উগ্র রাগী না হলে মা বোধ করি এতটা বুক দিয়ে ছেলের দোষ ঢেকে রাখতে চেষ্টা করতেন না। কিন্তু যে শাসন দেখেন এক-এক সময়, মায়ের ত্রাস হয়, এই বুঝি শেষই হয়ে গেল সব। আর বড় হলে ছেলেটা যে কি হবে ভেবে অনেক সময় আতঙ্কে শিউরে ওঠেন মা— এই বয়সেই ছেলেটা বাপের দ্বিগুণ গোঁয়ার। যেমন জেদী তেমনি রাগী। বয়সকালে কি যে হবে ঠাকুর জানেন। এই ছেলে পাথর দিয়ে পর পর তিন বোনের মাথা ফাটিয়েছিল একবার। অমন রাগী বাপকেও নিরুপায় মনে হয়েছিল সেদিন। স্ত্রীকে বলেছিলেন, ছেলে তোমার মানুষ খুন করে জেলে যাবে একদিন, দেখো।

বালাই ষাট। মায়ের হাড়ে কাঁপুনি ধরেছিল। মুখে না বললেও স্বামীর ওপর রাগ হয়েছিল তাঁর। স্বামীর ক্রোধের রিপুটাই যে ছেলে দ্বিগুণভাবে পেয়েছে, তাতে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। এই এক কারণেই তো ছেলের অপরাধটা যত বড়, মায়ের তা বুক দিয়ে ঢেকে রাখার তাড়না তত বেশি। তার পরেও ধরা পড়লে অবশ্য ছেলের দুর্ভোগ আর মায়ের গঞ্জনার একশেষ। কাউকে অব্যাহতি দেবার মানুষ নন মৃগাঙ্ক গোস্বামী।

কিন্তু বড়তলার পড়শীদের সেই ঘরের শাসন বড় করে দেখার কোন কারণ নেই। ফলে পরিচয়— ফল তো নৈমিত্তিক দেখছেন সকলে। ওই ক্ষুদ্র লাঙুলবিহীন হনুমানের প্রকোপে পড়ে কোন বাড়ির ছেলেটির এক-আধবার অন্তত হাত-পা ভাঙেনি বা পুকুরে নাকানি-চোবানি খেয়ে প্রাণান্ত দশা হয় নি ? এ ছাড়া ফুলবাগান ফলবাগানের বা মাছ-জিয়নো পুকুরের ছোটখাট ক্ষতিগুলো তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এর ওপর সম্প্রতি আবার দল বেঁধে বে-পাড়ায় যায় হামলা করতে। যে-যার নিজের ছেলে আগলে রাখবেন? রাখবেন কোন্ ভরসায়? রাখতে গেলেও তো ছেলের প্রাণান্ত হবে।

ভরসাটা গোড়ায় একটু-আধটু বেনা ঘোষালের আছে আশা করেছিলেন কেউ কেউ। পুরুষেরা বেনা ঘোষালের কাছে, মেয়েরা বেনা ঘোষালের বউয়ের কাছে। কিন্তু বউটি আবার অন্য প্রকৃতির ভালমানুষ। সকলের দুঃখেই সায় দেন, সকলের সমস্যাটাকে সমস্যা মনে করেন। তাঁর ছেলেটি রত্ন শুনে খুশি যেমন হন, পাশের বাড়ির দুরন্ত ছেলেটা দিন কে দিন পাকাপোক্ত ডাকাত হয়ে উঠছে শুনে তেমনি চিন্তিত হন। আবার গোসাঁইদিদি যখন ছেলের চিন্তায় কাঁদ-কাঁদ মুখে এটা-সেটা এসে বলেন, তখনো যথার্থ দরদেই সান্ত্বনা দেন, একটু বড় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে দিদি, কিচ্ছু ভেবো না।

বেনা ঘোষালেরও বোধহয় সেই রকমই ধারণা— বড় হলে শুধরে যাবে। এই ধারণার ফলেই তাঁর ভরসার আশায় যাঁরা থাকতেন, তাঁরা অনেকটাই নিরাশ হতেন। তাঁরা শ্রীমান বিভু কতবড় রত্ন একবাক্যে সেই ব্যাখ্যাই করতেন প্রথম। বড় হয়ে সে যে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে তাতে তাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু রত্নের গায়ে ধুলোবালি লেগে না থাক, ধুলোবালি পড়ে তো! এই ধুলোবালি থেকে বেনা ঘোষালের রত্নটিকে একটু আগলে রাখতে পারলেই আর দেখতে হবে না। যে রকম সৃষ্টিছাড়া দজ্জাল হয় এক একটা ছেলে-পুলে আজকালকার, ইত্যাদি।

বেনা ঘোষালের মুখ থেকে এতটুকু দুশ্চিন্তা বা অভিযোগের আভাস পেলে শ্রীমান বিভু যাতে ওই অক্কার সঙ্গে না মেশে সেটা স্পষ্ট করেই বলতে পারতেন তাঁরা। বলে নিজের নিজের ছেলেটিকেও মিশতে না দেবার মত বল সংগ্রহ করতে পারতেন। বেনা ঘোষালের সমর্থন পেলে ওই একটা দামাল ছোঁড়া বা তার দাম্ভিক বাপের পরোয়া কে করত?

কিন্তু তা তাঁরা পাননি কখনো। বেনা ঘোষাল অগ্রজের মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করেন মৃগাঙ্ক গোঁসাইকে। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি বা নিরহঙ্কার স্পষ্টবাদিতার অনুরাগী তিনি। শত প্রয়োজনেও এই একজন কোনো দিন এসে হাত পাতেননি তাঁর কাছে। জায়গা জমি বিক্রি করে একে একে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, তবু না। ইচ্ছে থাকলেও তাঁকে সরাসরি কখনো এতটুকু সাহায্য করতে পারেননি বেনা ঘোষাল। সেই চেষ্টাটাও অসম্মান করার মত মনে হত।

আড়তের কাজে বা কাঠের গোলার ব্যবসার তাগিদে অনেক সময়ে দু-চার দিনের জন্যে বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। নিশ্চিন্ত মনেই বাইরে কাটান তিনি. অগ্রজ অভিভাবকের মতই তখন মৃগাঙ্ক গোস্বামী এ-বাড়ির দেখাশুনা খোঁজখবর করেন। তাছাড়া উপকার বরং তিনিই করেন প্রকারান্তরে। ছেলেটা পড়াশুনায় ভালোই, কিন্তু বৃন্দাবনবাবু দেখাশুনার সময় পান না একটুও। বাড়িতে মাস্টার রাখার রেওয়াজটাও তখন তেমন ছিলই না বলতে গেলে। আর তার দরকারও হয়নি। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ছেলেকে পড়াতে বসেন গোঁসাইদা. বিভুকেও তখন ডেকে নেন। অক্কুর থেকেও বিভুকেই বরং বেশি পড়ান তিনি। অন্য লোকে তাঁর ছেলেকে দশবার করে রত্ন বললেও খুব একটা খুশি হন না তিনি। কিন্তু গোঁসাইদা যখন বলেন, তোমার ছেলেটা পড়াশুনায় ভালই হবে হে— তখন সত্যিকারের আনন্দ হয় তাঁর। তাছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে সায় দিয়ে জোট পাকাবেন কি, ছেলেশাসনের বহরটা তো হামেশা নিজের চোখেই দেখছেন তিনি। ধরেন যখন আধমরা করে ছাড়েন, দৌড়ে গিয়ে বরং ছেলেটাকে রক্ষা করে আনতে হয় তখন।

এই সেদিনের কথা। মৃগাঙ্ক গোঁসাই ছেলে পিটছেন টের পেয়েছেন অক্কুর মায়ের চেঁচামেচি শুনে। ত্রাসে মুখ শুকিয়ে মহিলা তাঁর স্ত্রীকেই ডাকাডাকি করছিলেন ঘোষাল ঠাকুরপোকে খবর দেবার জন্য। নইলে টের পেতেন না, কারণ ছেলেটা আধমরা হলেও কাঁদে না। ফলে গোঁসাইদার রাগ বাড়ে, মার বাড়ে, হুঙ্কার বাড়ে। কিন্তু এইদিন তাঁর হুঙ্কারও শোনা যাচ্ছিল না। অক্কুর মায়ের চাপা আর্তনাদ কানে এলো, শিগগির একবার ঠাকুরপোকে খবর দাও দিদি, আজ বোধহয় ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে।

বেনা ঘোষাল গিয়েছিলেন। সেই মার দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। ছেলেটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর গোঁ গোঁ শব্দ করছে, আর গোঁসাইদা তাঁর পাকা বাঁধানো লাঠি দিয়ে কুকুর-পেটা পিটছেন তাকে। যে কোনো একটা আঘাত একেবারে শেষ আঘাত হতে পারে। কিন্তু মৃগাঙ্ক গোস্বামীর হুঁশ নেই, সেদিন যেন একেবারে শেষ করবেন বলেই বদ্ধপরিকর তিনি। তাঁকে থামাতে গিযে বিপদ ঘটল। রক্তচক্ষু করে চাপা গর্জন করে উঠলেন তিনি, সরে দাঁড়াও। শেষ হয়ে গেলে থানায় খবব দিও।

যাই হোক, অনেক ধকলের পর থামানো গেল তাঁকে। কিন্তু ছেলেটা প্রায় অজ্ঞান তখন। বাপকে টানতে টানতে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। মনে মনে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ। ছেলের মাকে বললেন, শিগগির জলটল দিন, দেখুন আবার কিছু হয়ে গেল কিনা। রাগের মাথায় গোঁসাইদাকে বললেন খুন-খারাপি দেখার থেকে এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আর কোথাও গিয়ে থাকব ভাবছি।

সত্যিই মার দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঘুলিয়ে উঠেছিল।

মৃগাঙ্ক গোস্বামীর দু'চোখ জ্বলছিল তখনো। চৌকিতে বসে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। তাকালেন একবার। তারপর উঠে চাদরটা কাঁধে ফেললেন, বললেন, তোমার সময় আছে একটু? সঙ্গে আসতে পারবে?

বৃন্দাবন ঘোষাল বুঝলেন না কোথায় যেতে বলছেন। গোঁসাইদা ততক্ষণে এগিয়ে গেছেন। তিনিও সঙ্গ নিলেন। বাইরে বেরিয়ে চুপচাপ তাঁরা পাড়ার যে-বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন সেটা ধূর্জটি পুরুতের বাড়ি। ঘোষাল দেখলেন বাড়ির সকলেরই মুখ গম্ভীর, ভার-ভার। তাঁর সঙ্গে গোঁসাইকে দেখে আরো গম্ভীর হয়েগেলেন বাড়ির সকলে। গোঁসাইদা শুকনো মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছে?

বিরস মুখে বিড়বিড় করে ধূর্জটি পুরুত জবাব দিলেন, আর আছে, খই-ফোটা জ্বর, কবরেজ মশায় বলল, বিষিয়ে গেছে। গরুর গাড়ি করে শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেছে ওরা, বাঁচলেও যে-রাজ্যে বাস, আবার মরতে কতক্ষণ।

সঙ্গে বেনা ঘোষাল আছেন বলেই এই সুরের কথা শোনা গেল। নইলে আপ্যায়নটা অন্যরকম হত বোধহয়।

গোঁসাইদা শুকনো মুখে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন ধূর্জটির হাতে, কি আর বলব, আমার অদৃষ্ট। টাকাটা রাখো, খরচ আরও যা লাগে দেব—

অতঃপর ঘটনা যা শুনলেন বৃন্দাবন ঘোষাল, গোঁসাইদার ওপর রাগ করবেন কি, এই ছেলের সমস্যা যে কি-ভাবে সমাধান করা যায় তিনিও ভেবে পেলেন না।

গত দিন বিকেলে ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম : মৃগাঙ্ক ঘোষাল ছেলেকে হুকুম করেছিলেন কেরোসিন তেল কিনে নিয়ে আসতে। ছেলে অন্তু তখন বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হুকুম শুনে বিরক্ত হল। কিন্তু কেরোসিনের বোতল হাতে বেরুতে হল তাকে। দোকান অনেকটা দূর। তেল কিনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মাঠে পৌঁছুতে পৌঁছুতে খেলা অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এদিকে এসে দেখে, পাঁচিলের ওপর পুরুতের ছেলে পা ঝুলিয়ে

বসে কামরাঙা চিবুচ্ছে। অঙ্কুর সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সে তাকে হুকুম করল, কেরোসিন তেল কিনে বাড়িতে মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে।

কিন্তু পুরুতের ছেলেও মনে মনে খেলা দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত। অতএব সে ঘাড় নাড়ল, তার দ্বারা হবে না। সে খেলা দেখতে যাবে। এই থেকে বচসা। অঙ্কু বলল, পুরুতের ছেলে পূজো শেখ্‌গে যা, খেলা দেখবি কি! রাগের মাথায় পুরুতের ছেলেও জবাব দিল, পণ্ডিতের খড়ম-পিটুনি খা-গে যা, তুই খেলা দেখবি কি!

সমবয়সী কোনও ছেলের এমন স্পর্ধা হতে পারে ভাবা যায় না। নিজের বাড়ির চত্তরে ছিল বলেই এত সাহস। অঙ্কু হাতের বোতলের একটা ঘা বসিয়েছিল তার হাঁটুর ওপরে। সেই এক ঘায়ে পাঁচিল থেকে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল ছেলে। কি হল দেখার জন্য অঙ্কু আর দাঁড়ায়নি। তার তখন আবার একটা বোতল সংগ্রহের চিন্তা। বোতল খান-খান। বড় দু-তিনটে কাচের টুকরো ছেলের হাঁটুর ওপরের মাংসের গভীরে ঢুকে গেছে। এমন ঢুকেছে যে সেগুলো নিজেরা বার করতেও পারেনি। আর ফিনকি দিয়ে এত রক্ত ছুটেছে যে ছেলেটা বেহুঁশ প্রায়। ওদিকে কবরেজের কাছে লোক ছুটেছে, আর এদিকে আজ সকালে একজন এসে মৃগাঙ্ক গোঁসাইকে ডেকে নিয়ে গেছে।

ত্রিকোণ বাড়ির দক্ষিণ বাহু অর্থাৎ ডাইনের ছোট একতলা দালানটার প্রসঙ্গ বাকি এখনো। এটাও ঘোষালবাড়ি, কিন্তু এই নামে সকলে মুখোমুখি বড় বাড়িটাকেই চিনবে। বড়তলার ছোট দালান বললে এই ছোট ঘোষালবাড়িটা চিনবে সকলে। তবে এ-দালানের চেনার মত বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। ওটা আছে এই পর্যন্ত। বড় ঘোষালবাড়ির দিকে তাকালে চোখ আটকে থাকে। তার পাশে গোঁসাইবাড়ির নিতান্ত জরাজীর্ণ বার্ধক্য-দশা হলেও এককালে ওটা যে মাথা উঁচিয়ে ছিল বোঝা যায়। কিন্তু সামনের এই একতলা দালানটা নিতান্তই যেন মাথা নুইয়ে আছে।

বংশপঞ্জী ঘাঁটলে এই দুই ঘোষালবাডির মধ্যে বহুদূরেব শাখা-প্রশাখার একটা আত্মীয়তার যোগ হয়তো খুঁজে বের করা যেতে পারে। তা নইলে আত্মীয়তার সম্পর্ক কিছু নেই। ঘরের লাগোয়া পড়শী হিসেবেই সম্পর্কটা আপনজনের মত।

এ-বাড়ির প্রসঙ্গ উঠলে সকলেই বলেন, আ-হা! আ-হা'র কারণ, গেল বছর মর্মান্তিক শোকের ব্যাপার ঘটে গেছে বাড়িটাতে। ছোট বাড়ির ছোট ঘোষাল, অর্থাৎ তারক ঘোষালও ইস্কুলে মাস্টারি করতেন। সাদাসিধে নিরীহ মানুষ ছিলেন, একটু সময় পেলেই বই মুখে নিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু সময় খুব পেতেন না। অনটনের চাপে রোজ ইস্কুলের পর চার মাইল পথ ভেঙে শহরে গিয়ে এক বড়লোকের বাড়ির ছেলে পড়িয়ে আসতে হত। বেনা ঘোষালের কাঠের গোলার খাতাপত্র লিখেও কিছু বাড়তি উপার্জন হত, কিন্তু তা বলে তাঁর ছেলেটিকে দু-লাইন পড়িয়ে হাত পেতে টাকা নিতে পারতেন না।

তখন পর্যন্ত ভদ্রলোকের তিন ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল বলে তাকে কলকাতায় রেখে কলেজে পড়াচ্ছিলেন। ক'টা বছরের মধ্যে ছেলে দাঁড়িয়ে গেলে দুঃখের

অবসানের আশা। পরের দুটি ছেলেও এখানকার ইস্কুলের উঁচু ক্লাসেই পড়ত। মেয়ে অনু ছোট। অনু থেকে তার অনুশ্রীতে পদার্পণ অনেক পরের ব্যাপার।

গেলবারের গরমে মাঝের দুটি ছেলে নিয়ে ভদ্রলোক তাঁর শ্বশুরবাড়ির দেশের কোন একটা গাঁয়ের মেলায় গিয়েছিলেন। নাম-করা রথের মেলা, ছেলেদের বায়না ঠেলতে পারেননি।

বাপ আর এই দুটি ছেলেকে নিয়তি টেনেছিল।

মেলায় মড়ক লেগেছিল। এক রাতে মাত্র কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে তিনজনেই শেষ। এখানে ভদ্রলোকের বুড়ী মা বা স্ত্রী খবরটা পেয়েছেন শুধু, চোখে দেখেননি। স্ত্রীটি অন্তঃসত্ত্বা তখন। সেই অবস্থায় আঘাতটা শুধু শোকতাপেই শেষ হয়নি, মহিলার বোধশক্তি হয়তো চিরকালের মতই আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে। শোকের স্তব্ধতা ঘোচেনি।

বেনা ঘোষাল আর মৃগাঙ্ক গোস্বামী অনেক কবিরাজী চিকিৎসা করিয়েছেন অনুর মাকে। ফল হয়নি। আর ফল হলেও সেটা সুফল হত কিনা বলা শক্ত। শোক সহ্য করারও একটা পরিমিত শক্তি আছে সাধারণ মানুষের। যে আঘাতে চেতনা বিকল হয়েছে, তাকে নিরাময় করার সঙ্গে সঙ্গে আঘাতটাকেই ফিরিয়ে আনা হয় অনেক সময়। সেদিন অন্তত অনেকের মনে হয়েছিল, থাক, এই ভালো।

সকলে ভেবেছিল মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। কিন্তু তা হয়নি। ছেলেটি মাস ছয়েকের এখন—আট বছরের অনু তাকে কোলে-কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আধমরা ঠাকুমা বুড়ী বুক চাপড়ান আর সংসার দেখেন। বড় নাতি দু-পাঁচ দিনের ছুটিতেও এসে ঘুরে যায়। সমস্ত আশা-ভরসা এখন সে। তার পড়া বন্ধ হয়নি, তার এক কাকা হাওড়ায় থাকতেন। একদা পড়াশুনার তাড়না আর ত্রাসেই অগ্রজের সংস্রব ছেড়ে পালিয়েছিলেন তিনি। কাপড়ের ব্যবসায় তাঁর মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা এখন। তবে তাঁর নিজেরই বড় সংসার, ঝামেলাও কম নয়। তবু এই দুঃসময়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। ভাইপোর লেখাপড়া যেমন চলছিল চলছে, এখানকার ব্যয়ভারও যতটা সম্ভব তিনিই বহন করছেন।

মৃগাঙ্ক গোস্বামীর সান্ধ্য ছাত্র আর একটি বেড়েছিল। ছাত্র নয়, ছাত্রী। আগে নিজের ভাইদের সঙ্গে রেষারেষি করে অনু বাবার কাছে পড়তে বসত। এখন গোঁসাইজ্যাঠার কাছে অন্তুদা আর বিভুদা পড়তে বসেছে টের পেলেই সে-ও ঠাকুমার কাছে ভাইকে ছেড়ে বই হাতে এসে হাজির হবেই। কোনদিন বা ভাইকে নিয়েই হাজির হয়। বলা বাহুল্য, গুরুগম্ভীর জ্যাঠামশাইটি মেয়েটাকে ভালবাসলেও বিরক্তই হতেন। এ-সময়ে আসাটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু মেয়েটা কারো পছন্দ-অপছন্দ বিবেচনা করে আসত না, আর সে এলে পড়শুনার গাম্ভীর্যে ছেদ পড়তই। ফলে মৃগাঙ্ক গোস্বামী বেশ কড়া করেই বকেছিলেন একদিন, বলেছিলেন এ-সময় যেন না আসে।

মেয়েটা কাঁদ-কাঁদ হয়ে প্রতিবাদ করেছিল, বা রে, বাবা যে বলেছিল আমাকে পড়াবে—বাবা তো নেই, আমি কার কাছে পড়ব তাহলে?

নিশ্বাস নিতে গিয়ে হঠাৎ বাতাসের অভাব বোধ করেছিলেন রাশভারী মৃগাঙ্ক গোস্বামী। নিঃশব্দে মেয়েটাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলেছিলেন, আচ্ছা পড়, গোলমাল করিস না।

কিন্তু গোলমাল হতই শেষ পর্যন্ত। তবু মেয়েটাকে আর কোনদিন কিছু বলেননি তিনি।

গোঁসাইবাড়ির ওপর অনুর আর একটা কৌতুককর দাবি বা অধিকারও ছিল। এখন তো আট পেরুতে চলল বয়স, দু'বছর আগে থেকেই ঠাকুমার মুখে সে শুনে আসছে অঙ্কুর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। অঙ্কুকে ঠাকুমার অত পছন্দ কেন, অনু ভেবে পেত না। কিন্তু দু'বছর ধরে শুনে ভবিতব্যটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিল। শুধু অনু নয়, অঙ্কুও। কারণ হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবটা ঠাকুমা অঙ্কুর বাবা-মায়ের কাছেও করে রেখেছিলেন। গ্রাম দেশে সেটা তখন অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। অবশ্য অঙ্কুর বাবা-মা পাল্টা কথা কিছু দেননি, শুনে হেসেছেন শুধু। তবু একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ ফুটফুটে চঞ্চল মেয়েটার প্রতি তাঁদের স্নেহদৃষ্টি আরো বেড়েছিল।

সেই থেকে ঠাকুমা অঙ্কুকে নাতজামাই ডাকেন।

নাতজামাই হবার ফলে অনুর ওপর অত্যাচারের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেছিল অঙ্কু। কিল-চড়টা আগে লেগেই ছিল, সেটা দ্বিগুণ হয়েছিল। ইচ্ছেমত সে মারবে ধরবে হুকুম করবে—কিন্তু বিভু অনুকে কিছু বলতে পাবে না। বললেই মারমুখো হয়ে অঙ্কু কৈফিয়ৎ তলব করবে। অনুও যতটা সম্ভব অঙ্কুর অত্যাচার সহ্য করে, অদৃষ্টে আছে কি আর করবে। কিন্তু শাসন আবার অসহ্যও হয় প্রায়ই, পাল্টা আঁচড়ে-কামড়ে দেয়, মুখ ভেংচে অঙ্কা বঙ্কা চঙ্কা বলে ঠাকুমার কাছে পালায়। রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে ঠাকুমাকে শাসায়, ওকে আমি কখ্‌খনো বিয়ে করব না, বিয়ে করতে এলে ওকে আমি দূর করে তাড়িয়ে দেব।

এতবড় শোকের পর ঠাকুমা আর এ-সব রঙ্গরসে মাতেন না বড়। তবু রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে বিয়ের ব্যাপারে নাতনীর সঙ্গে মাঝে-সাজে একটু আধটু আলোচনা করতেই হয়। যেমন, অনু সেদিন প্রস্তাব করেছিল, আমার বিয়েটা তুমি বিভুদার সঙ্গে ঠিক করো না কেন ঠাকুমা, বিভুদা তো খুব ভালো—অঙ্কুদাও আচ্ছা জব্দ হয় তাহলে।

নিজের নিরাপত্তার দিকটা ভেবেই এই প্রস্তাব। ঠাকুমা জবাব দেন, ওরাও যে ঘোষাল, কি করে হবে—

ঘোষাল হলে কি হয়?

এক গোত্রে বিয়ে হয় না।

দুর্বোধ্য হলেও বিয়ে যে হয় না সেটুকুই শুধু বুঝেছে অনু। বিভুকে সখেদে তাই জানিয়েছে।—তোরা ঘোষাল না হয়ে আর কিছু হলে তোর সঙ্গেই বিয়ে হত আমার—বেশ হত।

ঘোষাল পদবীটা কি অপরাধ করেছে বিভুরও জানা নেই। কিন্তু ঘোষাল হয়ে বসার ফলে কটা দিন খেদের অন্ত ছিল না তার।

আর একদিন। মারামারির ফলটা সেদিন বেশ ঘোরালো হয়েছিল। অনু পরিমাণ মত আচার সরবরাহ করতে না পারার দরুন অঙ্কু ঠাস করে তার গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিল একটা।

এটুকু বৃহৎ অত্যাচারের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু তাইতেই কি যে হল, একমুঠো ঝাল আচারসুদ্ধ তার নাকে মুখে চোখে পালটা মেরে বসল অনু। অঙ্কুর নাক চোখ জ্বলে না গেলে তক্ষুনি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। কিন্তু যাতনায় প্রথমেই কুয়োতলায় ছুটতে হল তাকে। তারপর সমস্ত দিন আর ঠাকুমার আঁচল ছাড়েনি অনু। সন্ধ্যার পর জ্যাঠার সাড়া পেয়ে বই হাতে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সাহস করে কাছে আসতে পারেনি। যদিও জানে এখন কোন জারিজুরি টিকবে না অঙ্কুদার।

জ্যাঠা ডাকতে দূরে দাঁড়িয়েই জবাব দিয়েছে, ও আমাকে মারবে।

অঙ্কুর মাথা বইয়ে এসে ঠেকেছে। মৃগাঙ্কবাবু ছেলেকে চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা তুলে দিয়েছেন।—কি হয়েছে?

ছেলে মাথা নেড়েছে। কিছু না।

ওকে মারবি কেন?

ছেলে আবার মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ মারবে না।

কিন্তু অনু বিশ্বাস করে না। ফলটা উলটে আরো খারাপ হল বলেই মনে হয়েছে তার। আসবে না ভেবেছিল, কিন্তু না এসেও পারেনি। অতঃপর জ্যাঠার গা ঘেঁষে পড়তে বসেছে বটে, কিন্তু তিনি ওঠার অনেক আগেই সে উঠে পালিয়েছে। ভয় ছেড়ে ভিতরে ভিতরে একটু অনুশোচনাও হয়েছে তার, কেন আচার দিয়ে মারতে গেল। আর সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভেবে উতলা হয়েছে।

রাতে ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে দুশ্চিন্তাটা প্রকাশ না করে পারেনি অনু। বলেছে, ওর সঙ্গে বিয়ে হলে ও আমাকে মেরে শেষ করে দেবে যে গো ঠাক্‌মা, ওকে আমি বিয়ে করব না।

ঠাকুমা অভয় দিয়েছেন, বড় হলে আর মারবে না। তখন শুধু আদর করবে।

অঙ্কুর আদরটা কেমন হতে পারে ভাবতে গিয়ে দুশ্চিন্তা ভুলে অনু হেসে অস্থির। রাতে সূয্যি ওঠা যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব মনে হয়েছে।

অঙ্কু শোধ নিয়েছে পরদিনই। বাড়ির মধ্যে আর কাঁহাতক নিজেকে আটকে রাখতে পারে অনু। পিঠের ওপর গুম গুম সেই আসুরিক কিল পড়তে দমবন্ধ হবার দাখিল, আর হাত দুটোও মুচড়ে নিয়ে পিঠের দিকে যেন দুমড়ে ভাঙছিল। অনু যতক্ষণ সম্ভব দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে সহ্য করেছে, তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। কিন্তু অঙ্কু এই মুহূর্তটির প্রত্যাশায় মনে মনে বড় বেশি জ্বলছিল। হাত ছেড়ে চুলের মুঠি ধরে ঠাস করে আরো কয়েক ঘা বসিয়ে তবে ছেড়েছে।

কটা দিন তারপর একেবারে সম্পর্ক ছেদ। অনু পড়তেও আসেনি। মনে মনে অঙ্কুর একটু অনুশোচনা হলেও সেটা প্রকাশ করা চলে না। পরদিনই চোখ রাঙিয়ে ডাকতে গেছে, বেরিয়ে আয় বলছি, নইলে আবার মার খাবি। বাবার কাছে নালিশ করে মার খাওয়াবার মতলব আঁটছে কিনা সেই সন্দেহও হয়েছে। আগে থাকতেই সাবধান করেছে, বাবাকে কিছু বলেছিস কি ওই পুকুরে চুবিয়ে একেবারে মেরে ফেলব তোকে।

কিন্তু অনু সাড়াও দেয়নি, নালিশও করেনি। বিভুকে শুধু বলেছে, তার বাবা নেই বলে আজকাল এত বেশি মারা হয় তাকে, বাবা নেই বলেই ওর এত সুবিধে।

কথাটা বিভু আবার অঙ্কুকে জানিয়েছে। শোনা মাত্র পৌরুষে লেগেছিল। তাছাড়া আর

কোথাও লেগে থাকবে। ও-বাড়ির ওই শোকে সে-ও বাগানের উঁচু আমডালে লুকিয়ে বসে কত কেঁদেছিল, সে-খবর আর দ্বিতীয় কেউ রাখে না। কিন্তু আপাতত পৌরুষের দিকটাই বড়। অনুকে আবার একফাঁকে ধরে গর্জন করেছে, বিভুকে ওই কথা বলেছিস?

অনু আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। অমন অত্যাচারীর মুখ দেখতেও আপত্তি।

তারু খুড়ো আমার হাত থেকে তোকে রক্ষা করতে পারত ভাবিস?

অনু নিরুত্তর। সে কি ভাবে না ভাবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। কথা বলার অভিরুচি নেই।

রাগ দেখালেও কি জানি কেন অঙ্কুর গলার জোর কমে আসছিল। বুকের মধ্যে একটা অজানা অনুভূতি মোচড় দিয়ে উঠছিল। একটু বাদে অনেকটা আপসের সুরে দরাজ গলায় বলেছে, আচ্ছা যা, আর তোকে অত মারব না।

এতখানির পর অনু ঘাড় ফিরিয়েছিল। একটুও বিশ্বাস করে না। তবু বিশ্বাসযোগ্য ছিটেফোঁটাও কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখছিল।

চার

সূচনায় যাকে নিয়ে কাহিনীর বিস্তার, সে অঙ্কু বিভু বা অনু কেউ নয়। সে পান্না। মৃগাঙ্ক গোস্বামীর ভাগ্নে পান্নালাল।

চল্লিশ বছর আগের এক সকালের যবনিকা তুললে যে দৃশ্য দেখা যাবে, সেটা নয়নাভিরাম। ব্রাহ্মমুহূর্ত গিয়ে দিনের রঙ সবে সাদা হয়েছে। একতলার একটা ঘরের মাঝখানে কাঠের পার্টিশন তুলে দুটো খুপরির মত করা হয়েছে। পার্টিশনের পিছনে ঘরের একটাই দরজা। সামনের দিকে একটা করে জানালা—ঘরের মেঝের লাগোয়া। অর্থাৎ জানালা খোলা থাকলে ঘরের মেঝে পর্যন্ত বাইরে থেকে দেখা যায়।

অঙ্কুর সামনের জানালাটা আধপাট খোলা। ওদিকের খুপরির জানালা আর পিছনের দরজা বন্ধ থাকার কথা। জানালা বন্ধই ছিল, কিন্তু দরজাটা যদি কেউ চার-ছ আঙুল খুলে দিয়ে থাকে—পাশের খুপরির বাসিন্দা সেটা টের পায়নি।

যে দৃশ্য দেখা গেল, অঙ্কুর সামনের জানালাটা ও-ভাবে খোলা থাকলে সেই দৃশ্যের প্রথম অঙ্ক অবশ্য রোজই দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কটুকুই অভিনব আর অপ্রত্যাশিত।

অঙ্কুর সামনে সংস্কৃত বই খোলা। কিন্তু সে সংস্কৃত পড়ছে না। চোখ-কান বুজে নাক-মুখ সিঁটকে হাত-পা ছুঁড়ে কোমর থেকে ঘাড় মাথা পর্যন্ত দুলিয়ে অজস্র কসরত করে সে সঙ্গীত-চর্চায় মগ্ন। কালোয়াতি গানের যত সব দুর্ভেদ্য জটিলতার মধ্য দিয়ে বিপুল বিক্রমে সগৌরবে স্বতোৎসারিত গতিতে সে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু সঙ্গীতের যে স্বরটা ভেসে আসছে, যে জানে না তার কাছে আদৌ বার-তের বছরের ছেলের কণ্ঠস্বর মনে হবে না সেটা। একটুও কচি গলা নয়, বয়স্কজনের নিটোল পরিপুষ্ট গলা। অঙ্গ সঞ্চালন যতই দর্শনীয় হোক, এই ভারী গলা শুনলে হঠাৎ ধাঁধা লাগবে।

লাগারই কথা। কারণ অঙ্কু সত্যিই গলা দিয়ে গাইছিল না, অন্যথায় স্ব-রবে বা সরবে গাইছিল না। গানটা আসছে পাশের খুপরি থেকে, অর্থাৎ তানপুরায় গলা মিলিয়ে জোরাল কণ্ঠে গলা সাধছে পান্নালাল। আর এ ঘরে দুই হাতে শূন্যের মধ্যে কল্পিত তানপুরায় ঝঙ্কার তুলে নির্বাক কণ্ঠে হুবহু তাকে অনুসরণ করে চলেছে অঙ্কু। তার হাতে তানপুরা বা কণ্ঠে স্বর নেই বলেই পাশের খুপবির মীড় গমক বা মূর্ছনার কোনটাই ছেড়ে দিচ্ছে না সে। বরং শব্দহীন কণ্ঠে সেই সঙ্গীতানুধাবনের অক্লান্ত প্রয়াসে কায়িক ক্লেশটা তার আসল সঙ্গীতকারের চতুর্গুণ হচ্ছিল।

কিন্তু কিছু নিগ্রহ কপালে ছিল তার সেদিন। ছিল, কারণ নিঃশব্দ সঙ্গীতচর্চায় মজে গিয়ে অঙ্কুর নিজেরই মতিভ্রম হয়েছিল।

নইলে তার সামনে জানালার আধপাট আর পিছনের দরজার ছ আঙুল যে উদ্দেশ্যে খোলা, শেষ পর্যন্ত সেটা সে নিজেই ভুলে বসেছিল কি করে ? ও দুটো নিশ্ছিদ্র বন্ধ থাকার কথা। পান্নাদার সঙ্গে তার সেই রকমই প্যাক্ট।

কিন্তু গতকাল থেকে পান্নাদার ওপর সে বিষম চটা মনে মনে। পয়সা জমিয়ে পান্নাদা গতকাল শহর থেকে লোভনীয় বিলিতি মাউথঅর্গ্যান কিনে এনেছে একটা। কিন্তু কাল থেকে একবারের বেশি দুবার বিশ্বাস করে তার হাতে দেয়নি সেটা। তার আবার বদ্ধ ধারণা, হাতে পেলে অঙ্কু ওটা শেষ পর্যন্ত ভেঙে-চুরে টুকরো টুকরো করে দেখবে, ও রকম শব্দ বেরোয় কি করে।

পান্নাদার এ রকম ব্যবহার আদৌ আশা করেনি অঙ্কু। একবার ওটা হাতে পেয়ে সে শুধু আস্তে করে মেঝেতে ঠুকে দেখেছিল ওটার ভিতরে আলগা সরঞ্জাম কিছু আছে কিনা। আর তার ফলেই পান্নাদার এত অবিশ্বাস। বিভুর হাতে দিয়েছে, অনুর হাতে দিয়েছে। কিন্তু অনেকবার চেয়েও সে আর একটিবার ওটা হাতে পায়নি। কেড়ে নেওয়া বা মারামারি করে আদায় করে নেওয়ারও উপায় নেই। পান্নাদা তার থেকে কম করে ছ-সাত বছরের বড়, আঠারো-উনিশ বছর বয়েস। গায়ে শক্তিও রাখে কম না। দুই একবার হাতাহাতি মারামারি করেও দেখেছে অঙ্কু, খুব সুবিধে করে উঠতে পারেনি। অবশ্য ফন্দি-ফিকির করে অনেকদিন অনেক ভাবে শোধ নিয়েছে তার ওপর, কিন্তু ডাইরেক্ট মেথডে তাকে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়।

মুখ বুজে তা বলে এতবড় অপমানটাও বরদাস্ত করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। পান্নালালের গতকালের ব্যবহারে সে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ এবং তাকে মজা বোঝাবার সঙ্কল্পেও বদ্ধপরিকর।

অতএব তার সামনের জানালা আধহাত আর পিছনের দরজাটা ছ আঙুল খোলা। পান্নাদা টের পেলে অঙ্কু সমান তালে ঠোকাঠুকি করে বলত, তার পড়াশুনা আছে, আলো দরকার—অতএব জানালা আর দরজা ওইটুকু খুলে সে রাখবেই। কিন্তু মনে মনে অঙ্কুর দৃঢ় আশা ছিল বেওয়াজে মন বসে গেলে পান্নাদা কিছুই টের পাবে না। আর টের না পেলেই অবধারিত সিদ্ধিলাভ।

বাবা দোতলার ভিতরের দিকটায় থাকলেও, পায়চারি করতে করতে সিঁড়ির এদিকটায় বার দু-চার আসেনই। ভোরে ওঠেন তিনিও, তবে এদের মত এত ভোরে নয়। রেওয়াজের তাগিদে পান্নাদা রাত থাকতে ওঠে, ফলে অঙ্কুরও সকালের ঘুমের দফা শেষ। পাশের খুপরিতে

অমন গাঁ-গাঁ হা-হা-হা চললে এক কুম্ভকর্ণ ছাড়া আর কোন জীব ঘুমোতে পারে বলে তার মনে হয় না। তবে অক্রুর এ অত্যাচার এক রকম সয়ে গিয়েছিল। তারও স্বাভাবটি এমন যে, যতটুকু সময় ঘুমের ফাঁকে চলে যেত, ততটুকুই অপচয় মনে হত। যাই হোক, মামার ঘুম ভাঙা আর আনুষঙ্গিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করে টহল দেওয়া শুরু হবার আগেই বেশির ভাগ দিন ভাগ্নে পান্নলালের গলা সাধার পর্ব শেষ হয়। অবশ্য নিজে থেকে হয় না, সময় হলে অক্রুই পার্টিশনের এধার থেকে ডেকে সচেতন করে দিয়ে থাকে তাকে।

এত উপকারের পর পান্নাদার এমন বেইমানি তার সহ্য হবার কথা নয়। সহ্য হয়ওনি। সে যা আশা করেছিল তাই হয়েছে। অর্থাৎ তার দিকের জানালা বা পিছনের দরজা খোলার ব্যাপারটা পান্নাদা টের পায়নি। ফলে ওপরে তার বাবা কিছু টের পাবেন। বলা বাহুল্য, সময় হলে আজ আর অক্রু কাউকে ডেকে সচেতন করবে না।

পান্নাদার যা কপালে আছে আজ তাই হবে। তাই হওয়া দরকার।

হওয়ার মত সকল ব্যবস্থা পাকা করে অক্রু মুখের সামনে সংস্কৃত বই খুলে বসেছিল।

ঘরের ভিতরটা আবছা এখনো, একবর্ণও দেখা যায় না। দেখার চেষ্টাও নেই। বাবা এলে ওটা সামনে খোলা থাকা দরকার বলে খোলা আছে। অক্রুর হিসেব নির্ভুল, বাবার উঠতে এখনো দেরি আছে একটু।

অতএব বই খুলে প্রথমে পার্টিশনের ওধারে পান্নালালের উদ্দেশে নিঃশব্দে খুব খানিকটা মুখ ভেংচে নিল। তারপর হাত-মুখ নেড়ে সুর নকল করে ভেঙচাতে লাগল। ভেঙচাতে ভেঙচাতে তারও নেশা চাপল কেমন। অ-সুর বিক্রমে নীবরে সে-ও পাশের খুপরির স্বরে অনুকরণ করে চলল। ক্রমশ সরব কণ্ঠের সঙ্গে নীরব কণ্ঠের একটা রেষারেষি চলতে লাগল। রীতিমত জোরালো রেষারেষি। শব্দহীন কণ্ঠস্বর আর কেউ না শুনুক, অক্রুব নিজের কল্পনা করে নিতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। সেই নির্বাক সঙ্গীত-বন্যার গমকে আর গর্জনের তালে আর তাণ্ডবের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে অক্রুর প্ল্যান ভুল হয়ে গেল।

তার ভুল হলেও প্ল্যানে ভুল কিছু ছিল না।

এই সাতসকালে পড়াশুনা ছেড়ে ভাগ্নের কালোযাতি কণ্ঠস্বর কানে যেতেই মৃগাঙ্ক গোস্বামীর দু'কান বিষিয়ে উঠেছিল। রাত থাকতে উঠে ভাগ্নে সঙ্গীত-চর্চা করে সে খবর তিনি রাখেন। কিন্তু তাঁর ধারণা, সঙ্গীত-চর্চাটা চলে বেনা ঘোষালের বার-বাড়ির পিছনের একটা খুপরি ঘরে দরজা বন্ধ করে। সেখান থেকে তারস্বরে চেঁচালেও তেমন শব্দ আসার কথা নয়। ঘোষালমামাকে রাজী করিয়ে গোড়ায় গোড়ায় সেই ব্যবস্থাই করেছিল পান্নালাল। কিন্তু প্রত্যহ এই তানপুরা বয়ে নিয়ে যাওয়া আর নিয়ে আসা যে ভাগ্নের বেশিদিন ভালো লাগেনি, সে খবর মামা রাখতেন না। যাও মাঝে-সাঝে সঙ্গীত-সাধনার রেশ কানে আসত, ভাবতেন বেনা ঘোষালের ওই ঘরের ওখান থেকেই আসছে। কিন্তু আজ আওয়াজটা বড় কাছে মনে হল তাঁর। তাছাড়া চারদিক ফরসা হয়ে গেছে, এখনো পড়তে বসার নাম নেই—তাঁর রাগ চড়ার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।

দোতলার ভিতর মহল থেকে পায়ে পায়ে এদিকের বারান্দার সিঁড়ির কাছে এলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন সঙ্গীত-চর্চার আস্ফালনটা এ বাড়িরই নীচের তলায় চলছে।

নীচে নেমে এলেন। খড়মের চাপা শব্দটা খুব চাপা না হলেও শোনার মত কান অনুপস্থিত তখন।

দরজা ঠেলে যে দৃশ্য দেখা গেল, মৃগাঙ্ক গোস্বামীর চক্ষু স্থির। প্রথম ধাক্কায় অজ্ঞাত ত্রাস—ছেলেটার বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেল। খড়ম খুলে নিঃশব্দে ছেলের পিছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

কিন্তু একটু বাদেই ব্যাপারটা বুঝলেন। ভাগ্নের গলা পঞ্চমে যোঝাযুঝি করছে—এদিকে চোখ-মুখ সিঁটকে আর হাত-পা ছুঁড়ে ছেলের নীরব মহড়ার খণ্ড-যুদ্ধ চলেছে।

এ সময় অঙ্কুদার পড়ার আওয়াজ তিন-বাড়ির লোকের কানে যায়। তার বদলে পান্নাদার গলা সাধা কানে আসতে অনুও দেখতে এসেছিল কি ব্যাপার। আধ-খোলা জানালা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে অনুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত। আতঙ্কিতও। পিছনে জ্যাঠা দাঁড়িয়ে, হুঁশ পর্যন্ত নেই। অনু বোবা, আর তার পা দুটোও যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

অঙ্কুর কানে টান পড়তেই বিদিকিচ্ছিরি ছন্দপতন। সুরলোক থেকে নীরস গদ্যলোকে দড়াম করে আছাড় যেন একটা। এই হাতের স্পর্শটা এমন চেনা যে, এক নিমেষের জন্যেও ফিরে তাকানো দরকার হল না। কানটা ভগবানের নামে সঁপে দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে সামনের খোলা সংস্কৃত বইটা আক্রমণের চেষ্টা করল সে।—অস্তি নর্মদাতীরে বিশলঃ শাল্মলীতরুঃ...

কান ধরে মৃগাঙ্ক গোঁসাই হিড়হিড় করে নর্মদাতীর থেকে টেনে তুললেন তাকে। পিঠের ওপর সশব্দে দুটো ঘা পড়তেই বাইরে অনুর চমক ভাঙল আর ভিতরের পাশের খুপরিতে পান্নালালের। অনু ব্যাপারটা বুঝেছে এতক্ষণে। হাসি চাপতে না পেরে সে ছুটে পালাল। আর পান্নালালের উদাত্ত গলার ওপর হঠাৎ কে বুঝি পাথরচাপা দিল।

ওধারে হুঙ্কার, বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ, উ? সেই কাণ্ডে গিয়ে বসলেই তো পারিস পাজী হারামজাদা—

সপাসপ আবার চার-পাঁচ ঘা। কান ছাড়েননি, কানটা তাঁর অন্য হাতের খাস দখলে। সেই অবস্থাতেই তাকে টেনে নিয়ে পাশের খুপরিতে এলেন তিনি।

থামলি কেন? চলুক—

ইষ্টনাম হাতড়ে বেড়াচ্ছে পান্নালাল।

ছেলের কান ছেড়ে এবারে তার দিকে ঘুরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন মৃগাঙ্ক গোস্বামী। পাজী হতভাগা, বছরের পর বছর ফেল করিস—লজ্জা করে না তোর গান নিয়ে গাধার মত চেঁচাতে! নিজের মাথাটি চিবুনো হয়েছে, এবারে আর যারা আছে তাদের মাথাগুলোও খাবার ইচ্ছে, কেমন? ফের যদি দেখি তো দেব বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে—

রাগে গরগর করতে করতে ওপরে উঠে গেলেন তিনি। অতঃপর অসম-বয়সী দুই মামাতো-পিসতুতো ভাই মুখোমুখি। সাধারণত এই এক ব্যাপারে তারা সমব্যথী। পান্নালাল মামার অত শাসন অত্যাচার মনে করে। অঙ্কুও তাই। আজকের অত্যাচারের আসল ধকলটা অঙ্কুর ওপর দিয়েই গেছে পান্নালাল জানে—কিন্তু কেন এ ভাবে ধরা পড়ল সে-টুকুই জানে

না। জিজ্ঞাসা করল, তুই কি করছিলি? ঘুমুচ্ছিলি বুঝি?

অঙ্কু জবাব না দিয়ে জ্বলন্ত চোখে তার মুখখানা একবার ঝলসে দিয়ে এক ঝটকায় বাইরে চলে এলো। এদিকে ব্যাপার কতদূর গড়াল, জানার আগ্রহে অনু গুটি গুটি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল আবারও। অঙ্কুর রাগটা হঠাৎ তার ওপর গিয়ে পড়ল।

চোখ পাকিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করল, তুই হেসেছিলি কেন তখন?

বারে, আমার হাসি পেয়ে গেল—

হাসি পেয়ে গেল! ছুঁচোমুখী, বাঁদরী—হাসি পাওয়া বার করছি তোর আমি—আমাকে ডাকলি না কেন?

বারে! অনুর নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করায় চেষ্টা, জ্যাঠা পিছনে দাঁড়িয়ে আর তুমি ওই করছ—আমিই যে ভয় পেলাম।

আসল রাগটা আর যাই হোক অনুর ওপরে নয়। দাঁত কড়মড় করে অঙ্কু নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যেন, বলল, টানের চোটে কানের সাড় চলে গেছে, সব ওই পান্নাদার জন্য—তাকে আমি মজা বুঝিয়ে ছাড়ব।

এ যে শূন্য-গর্ভ আস্ফালন নয়, অনু সেটা খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু ওদিকে পান্নাদারও ভয়ানক ভক্ত সে। গানের নয়, গল্পের। পান্নাদার মত অমন জমাট গল্প আর কেউ বলতে পারে না—সব গল্পের মধ্যেই অবশ্য শেষ পর্যন্ত গান ঢুকে পড়ে, তাহলেও শুনতে অদ্ভুত ভাল লাগে। তাই তাকে চুপিচুপি একটু সতর্ক করে দেওয়া দরকার বোধ করল অনু। আর সেটা করতে গিয়ে সকালে যে বিচিত্র দৃশ্যটা দেখেছে, তাও না বলে পারল না।

শোনামাত্র একটা আবিষ্কার করে বসল পান্নালাল। ভাবল, ছেলেটার ভিতরে ভিতরেও নিশ্চয় ভারী একটা সঙ্গীতের তৃষ্ণা লুকিয়ে আছে। মামার হাতে মার খেয়ে সেটাই সে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে। আনন্দে বুকের ভিতরটা ভরে গেল পান্নালালের। চুপিচুপি একসময় কাছে এসে বলল, তুই গান শিখবি? আমাকে বলিসনি কেন এতদিন? আমি শেখাব তোকে, দুজনে একসঙ্গে শিখব—মামা টের পাবে না।

ক্ষতের উপর নুন পড়ল। অঙ্কু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, তোমারও শেখা বার করছি আমি, দাঁড়াও—

সঙ্গোপনে ভাইকে সাহায্য করার প্রস্তাবের বিনিময়ে পান্নলাল এটা আশা করেনি। রাগ করে বলল, তবে তুই গলা দিয়ে আওয়াজ না বার করে ও-রকম করে গাইছিলি কেন?

সরোষে মুখ বিকৃত করে অঙ্কু জবাব দিল, গাইছিলাম না, তোমাকে ভেঙাচ্ছিলাম—

অতএব পান্নালালেরও মেজাজ চড়ল। বলল, বেশ হয়েছে মার খেয়েছিস, খুব ভাল হয়েছে।

সে উঠে চলে গেল।

এর পরেও কিছু একটা করতে না পারলে আত্মসম্মান থাকে? জ্বলতে জ্বলতে সেই মতলবই ভাঁজতে লাগল অঙ্কু।...সব থেকে ভালো হয় ওই মাউথঅর্গ্যানটা হাত করতে পারলে, ওটার জন্যেই যা-কিছু। কিন্তু কি করে হাত করা যাবে? পান্নাদার অগোচরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে

দেখেছে। তার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়—নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গেই থাকে ওটা।

কিন্তু অন্ধু ছাড়বে না, কদিন আর সঙ্গে সঙ্গে রাখবে!

ভগ্নির অজস্র অনুরোধ আর পত্র-বিলাপে অস্থির হয়ে ভাগ্নেকে মানুষ করার জন্যে দেশ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন মৃগাঙ্ক গোঁসাই। আসার সময় ভগ্নি চোখের জলে ভেসে ছেলের সঙ্গে ওই তানপুরাটাও তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পান্নার বাপের তানপুরা। ওই তানপুরাই ছেলের প্রাণ। গান গাইতে না পেলে ছেলে প্রাণে বাঁচবে না, দাদা যেন দয়া করে এইটুকু বরদাস্ত করেন—ওইটুকু স্বাধীনতা পেলেই ছেলেটা মামার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে।

তিন বছর আগের কথা।

মৃগাঙ্গ গোস্বামী সে-দিন মনে মনে হেসেছিলেন, আর ভাগ্নের সঙ্গে তানপুরাটাও সঙ্গে এনেছিলেন। ভগ্নিপতির গানের নেশা জানতেন। ওঁদের বংশে কে এক মস্ত সাধকও ছিলেন নাকি, তাঁর সেই সাধনার গল্প লোকের মুখে আজও শোনা যায়। গল্পটা মৃগাঙ্ক গোস্বামীও জানেন এখন। সেই সাধকটি পান্নালালের ঠাকুরদার কাকা জ্যাঠা কেউ হবেন। গান তাঁর সাধনাই ছিল হয়ত। ভোররাতে তানপুরা নিয়ে বসতেন নাকি। জায়গাটায় সাপের উপদ্রব ছিল খুব, এখনো আছে। কিন্তু লোকের খেদ, সঙ্গীতে সাপেরও হিংসা বশ করার মত মানুষ নেই আর।

জনশ্রুতিটা মুখরোচক। বাড়ির এক ঘুমন্ত শিশুকে লক্ষ্য করে চুপিসাড়ে এক কালান্তর গোখরো সাপ তার শিয়র পর্যন্ত এসেছিল। সাপের কান নিয়ে জীব-তত্ত্ববিদরা গবেষণা করুক। কাহিনীটা এই যে, দংশনোদ্যত সাপের কানে হঠাৎ এসে বাজল প্রভাতী ভৈরবের গুরুগম্ভীর অতি বিশুদ্ধ নাদ। ভৈরব কে? মস্তকে যাঁর কালপ্রবাহিত গঙ্গাদেবী, ললাটে যাঁর তিলকের ন্যায় শশীখণ্ড, তিনটি দিব্য চক্ষু যাঁর, সর্প-ভূষণে ভূষিতাঙ্গ যিনি, পরিধানে শুক্লবর্ণ গজচর্ম, এক হাতে ত্রিশূল অপর হাতে নৃমুণ্ড—তিনিই রাগরাজ ভৈরব।

এই রাগ কানে এলে সাপ ছেড়ে সাপের চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত হিংসা ভুলবে না তো কি! যতক্ষণ ওদিকে রাগ সাধনা চলেছে ততক্ষণ সাপ ফণা তুলে স্থির নিশ্চল হয়ে ছিল। ওদিকে বাড়ির লোকের তার আগেই ঘুম ভেঙেছে, এই দৃশ্য দেখে তারা শিহরিত কণ্টকিত। সাপের তন্ময়তা ভঙ্গ হলেই শিশুর মৃত্যু অনিবার্য। কোনো প্রাজ্ঞজনের ইশারায় কেউ আর্তনাদ ছেড়ে টুঁ শব্দটিও করল না নাকি। ওদিকে সঙ্গীতসাধককে যে সঙ্গীত চালিয়ে যেতে বলবে তাও উপায় নেই। কারণ ওতে তাঁরও ধ্যানভঙ্গ করা হবে, যার ফলে সঙ্গীতে সাময়িক ছেদ পড়তে অন্তত বাধ্য। অতএব এ-সব কিছুই না করে ইষ্টনাম জপ করতে করতে অসম সাহসে একজন শিশুর পায়ের কাছে গিয়ে ওই গোখরো সাপের চোখের ওপর দিয়েই শয্যাটা আস্তে আস্তে টেনে সরিয়ে নিতে লাগল। সাপ তেমনি নিশ্চল সমাহিত, সে হিংসার ধার কাছ দিয়েও গেল না।

অতএব বাড়ির লোকেরাও কেউ ওই শ্রবণ সমাহিত সাপের ওপর হিংসা করল না। যতক্ষণ রাগ সাধনা চলল ততক্ষণ তাকে সেই অবস্থাতেই দেখা গেল। তারপর ফণা নামিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল সে।

শিশুর প্রাণ বাঁচল, কিন্তু এরপর সাধকের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। রটনা এরও পাঁচগুণ

রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। ফলে মুগ্ধ বিস্মিত ভক্তের সংখ্যা ভরা জোয়ারের মত ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। কাতারে কাতারে দর্শনপ্রার্থী আসতে লাগল। কেউ এসে দেখে যায়, প্রণাম করে, আবার কেউ বা রাগসাধনা শোনার আশায় বসে থাকে। শেষে এমন হয়ে দাঁড়াল যে সংগীত নিয়ে বসার নির্জন অবকাশও আর সাধক পান না।

তাই সকলের অলক্ষ্যে একদিন তিনি নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলেন। আর কেউ তাঁকে দেখল না। এই বাড়িতে গল্পটা পান্নালালের মারফতই চালু হয়েছে। কিন্তু পান্নালাল তা বলে মামাকে বলতে যায়নি। মামার বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভর বোঝা এ-ভাবে তার বুকের ওপর চেপে বসেনি। সেই সময়ে মামীর কাছে আর মামাতো ভাই অঙ্কুর কাছে এই বিচিত্র কাহিনীটি ব্যক্ত করেছিল। শুনে অঙ্কু মন্ত্রমুগ্ধ আর মামী বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় কণ্টকিত। মামাকে ভাগ্নের এই অদ্ভুত গল্প মামীই শুনিয়েছেন। শোনাবার কারণ, এই বংশের ছেলে যখন, গানবাজনার দিকে ঝোঁক একটু থাকবেই, অতএব উগ্রস্বভাবের মানুষটি যেন বিরূপ না হন।

ষোল বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটা কেন ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের দিকে পাড়ি দিতে পারেনি, এই গল্প শোনার পর মৃগাঙ্ক গোস্বামী সেটা ভালো করেই বুঝে নিয়েছিলেন।

কিন্তু গান প্রাণ বলতে কতটা প্রাণ, সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল না। নিয়ম-শৃঙ্খলার মানুষ তিনি। সকাল-সন্ধ্যায় হঠাৎ তানপুরা গাঁ-গাঁ করে উঠতে শুনলেই দু'কান চিড়বিড়িয়ে উঠত তাঁর। দিনকতকের মধ্যেই পান্নালাল বুঝে নিল, এখানে যখন তখন তানপুরা পেড়ে বসা বা গলা ছাড়া চলবে না। অতএব বিভুর শরণাপন্ন হল সে—তাদের অনেকগুলো ঘর খালি পড়ে, যদি একধারের একটা ছেড়ে দেয়।

সেই ব্যবস্তাই হল। মৃগাঙ্ক গোস্বামীর জ্ঞাতসারেই হল।

গান গেয়ে না হোক, গানের গল্প করে ইতিমধ্যে অনু বিভু আর অঙ্কু তিনজনকেই মোটামুটি মাত করে ফেলেছে পান্নালাল। গানের গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার তার। শোক বিরহ বিচ্ছেদ মিলন—গানের সেতু ধরে সব কিছুর এক-একটা অলৌকিক গল্প ফেঁদে বসত সে। অঙ্কু কান পেতে শুনত, শেষে মন্তব্য করত, সব ভাঁওতা। সে-রকম দুঃখের কাহিনী কিছু শুনলে বিভুর দু'চোখে ছলছলিয়ে উঠত—আর অনু কেঁদেই ফেলত।

তিন ভক্তকে সম্মোহিত করার লোভে বয়েসের অনুপাতে কিছুটা দুর্বোধ্য প্রেম প্রীতি ভালবাসার গল্পও ফেঁদে বসত পান্নালাল। প্রেমের জটিলতা না বুঝলেও বিস্ময় বা দুঃখ-কষ্টের মোট পরিণতিটা ঠিকই বুঝত তারা। গল্প বলার উদ্দীপনায় এবং সংগীতের মাহাত্ম্য বিস্তারের প্রেরণায় অমন রাধাকৃষ্ণের প্রণয় আখ্যানও নতুন রূপ নিয়েছে। ফলে শ্রীরাধিকা হয়েছে নাম-না-জানা এক জায়গার কোনও মস্ত সংগীতসাধকের সংগীতজ্ঞা মেয়ে, আর শ্রীকৃষ্ণ এক দুর্ধর্ষ স্বভাবের মানুষ—যাকে সহজে বশ করা যায় না। তা সেই মেয়ে ভয়ানক ভালবেসে ফেলেছিল ওই লোকটাকে। ভয়ানক ভালবেসে ফেলা কাকে বলে শ্রোতাদের সঠিক ধারণা নেই, শুধু ভালবেসেছিল শুনেই তাদের ভাল লেগেছিল। তা সেই মেয়ে নাকি গান গেয়ে গানের সুরে সুরে লোকটাকে কাছে টানতে চেষ্টা করত। কিন্তু লোকটাও ছিল তেমনি গোঁয়ার, সব সময় শুনত না। কিন্তু অন্য লোকে তো শুনত।

ফলে মেয়ের মা আর বড় বোনের কাছে ধরা পড়ে গেল সেই মেয়ে। রেগে গিয়ে দুজনেই তারা খুব কষ্ট দিতে লাগল মেয়েটাকে—

কেন?

দু'চোখ বড় বড় করে অনু গল্পে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল।

পান্না বোঝাতে চেষ্টা করেছে, মেয়েটা যে ছেলেটাকে ভালবাসত, বিয়ের আগে মেয়েদের অন্য লোককে ভালবাসতে নেই।

বিয়ের পরে অন্য লোককে ভালবাসতে আছে বুঝি? অনুর অবাক প্রশ্ন।

তা কেন, পান্নালাল বিরক্ত, যার সঙ্গে বিয়ে হয় শুধু তাকেই ভালবাসতে হয়।

জবাব মনঃপূত নয় অনুর, আবার প্রশ্ন, আমার তো বিয়ে হয়নি, আমি যে ঠাকমাকে ভালবাসি, তোমাদের তিনজনকে ভালবাসি—এসব খারাপ? আর ওর সঙ্গে (অন্তুকে দেখিয়ে) বিয়ে হলে তোমাদের ভালবাসতে পাব না?

আঃ, তোর মাথায় কিছু নেই—এই ভালবাসা আর একরকমের ভালবাসা, বিয়ে করার ভালবাসা।

বিয়ে করার ভালবাসাটা কেমন হতে পারে অনুর মাথায় ঢোকে না। অন্তুকে বিয়ে করতে হবে বলে ভালবাসার বদলে তার তো সর্বদাই ত্রাস একটা। কিন্তু গল্পে আর ব্যাঘাত না ঘটিয়ে চুপচাপ শোনে সে।

—সেই মেয়েটা কাঁদে, কিন্তু ভেউ ভেউ করে কাঁদে না, গান গেয়ে গানের মধ্য দিয়ে কাঁদে। সেই গানের কান্না শুনে মেয়ের বন্ধুরা আরও বেশি কাঁদে। তারা তখন শলা পরামর্শ করে কি করে ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার দেখা করানো যায়। সহজ কথা নয়, মেয়েটাকে যে সর্বদাই মা আর দিদি গার্ড দিচ্ছে। ওদিকে আর একটা লোক আবার মেয়েটার সেই গানের কান্না শুনে তাকে ভালবেসে ফেলেছে—সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মেয়েটা তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। ফলে এই লোকটা রেগে আগুন।

মেয়ের বন্ধুরা একদিন সেই ভালবাসার লোককে খুব করে বকে-টকে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করাতে রাজি করেছে। লোকটা বলেছে, রাত্রিতে সকলে ঘুমুলে মেয়েটাকে যেন চুপিচুপি অমুক জায়গায় এক পুকুরধারে আনা হয়।

অনু আবার আঁতকে উঠেছে, কেন, পুকুরধারে কেন, জলে চোবাবে বুঝি?

এবারে অন্তুই ধমকে উঠেছে, তুই কিছু বুঝিস না, ফের মুখ নাড়বি তো দেব এক ঘা। তুমি বল পান্নাদা—

পান্নাদা বলেছে, রাত্রিতে কথামত বন্ধুরা তো চুপি চুপি মেয়েটাকে সেই পুকুরধারে নিয়ে এসেছে। ওদিকে হয়েছে এক কাণ্ড, সেই যে আর একটা লোক যে মেয়েটাকে ভালবেসেছিল, সে কেমন করে টের পেয়ে গেছে সব। টের পেয়ে সরাসরি দিদিকে আর মাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। তখন তারাও সকলে মিলে ছুটেছে পুকুরের দিকে।

আর যে লোকের আসার কথা ছিল পুকুরপাড়ে, সে এ গণ্ডগোল দেখে একটা ঝোপের

আড়ালে লুকিয়েছে। লুকিয়ে দেখছে সব। বেগতিক দেখে মেয়ের বন্ধুরাও ভয় পেয়ে সুটসাট গা-ঢাকা দিল। মেয়েটা এখন করে কি!

কাঁদতে কাঁদতে সে গান ধরল আর পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। গান গেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি যার জন্য এই রাত্রিতে চুপিচুপি এলাম সে আমাকে ফাঁকি দিল, এলো না, বন্ধুরাও সব পালিয়ে গেল, ওদিকে মা আর দিদি এক্ষুনি এসে আমাকে ধরে ফেলবে, তারপর কষ্ট দিয়ে আধমরা করবে—তাই আমি এখন কোথায় যাব, কোথায় পালাব? পুকুর, আমার কষ্ট দেখে যদি তোমার দুঃখ হয়ে থাকে তাহলে তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও, রক্ষা কর।

বলা বাহুল্য পান্নালাল এ জায়গায় এসে বেগতিক দেখে সীতার পাতাল প্রবেশের ভাবটা জুড়েছে। তাই এখানেও ওই মেয়ের গানের কান্নায় পুকুরের জল দু ফাঁক হয়ে গেল, আর মেয়েটি তার মধ্যে প্রবেশ করতে আবার সেই পুকুরজোড়া জল। মা আর দিদি কি আর করতে পারে?

তারপর মেয়েটা উঠল কি করে? অনু সচকিত।

উঠবে কিরে, মেয়েটা তো পুকুরের তলাতেই থেকে গেল। আর ঝোপের আড়াল থেকে এই কাণ্ড দেখে সেই ছেলেটা তখন শোকে দুঃখে পাগল হয়ে গেল। আবার জল ফাঁক করার মত গান সেই ছেলে আর গাইতে পারল না। সেই থেকে ওই পুকুরের নাম হয়ে গেল মেয়ে-ডোবা পুকুর!

অতঃপর আড়ে আড়ে সকলের দিকে চেয়ে গল্পের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে পান্নলাল। বিভুর সেই চিরাচরিত মন খারাপ, অনুর তো মেয়েটার শোকে ফুঁপিয়ে কান্না।

কান পেতে সবটা শোনার পর অঙ্কু চুপচাপ ভাবে একটু, শেষে মন্তব্য জোড়ে, সব ভাঁওতা—গান গেয়ে পুকুর ফাঁক করা যায় না, ছাই!

এই থেকে তর্ক ওঠে আবার। সংগীত মাহাত্ম্যে কত কি অলৌকিক কাণ্ড ঘটে সেই তর্ক। পান্নালাল চোখ পাকিয়ে বলে, গানের ক্ষমতা তুই কতটুকু জানিস? দীপক রাগ গেয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যায় চারিদিকে, জানিস? তেমন মেঘমল্লার গাইতে পারলে মাঘের শীতে তুমুল বর্ষা নামানো যায়, জানিস? বসন্ত গেয়ে মরুভূমিতে বসন্ত আনা যায়, খবর রাখিস?

সংগীত মাহাত্ম্যের এরকম অজস্র অভিনব ঘটনা যেন পান্নালালের প্রায় স্ব-চক্ষে দেখা। মেজাজ ভাল থাকলে এই সবেরই এক-একটা অত্যাশ্চর্য কাহিনী বিস্তার করত সে। যথাঃ

এক বিরাট সাধক একটানা ছত্রিশ বছর ধরে শুধু গান্ধারই সেধে গিয়েছিল, বুঝলি? তাও যেমন তেমন সাধা নয়, হাঁড়ির মুখে মুখ দিয়ে সাধা। তার ফলে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতো কি! যেন জমাট মেঘের ভিতর থেকে গুমগুম শব্দ হত। একটানা ছত্তিরিশ বছর সাধনা করলে মানুষ মাটি ছেড়ে শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে, আর গানের ভিতর দিয়ে তাজ্জব কাণ্ড করতে পারবে না?

তাজ্জব কাণ্ডই করত এক-একজন, বনের পশু-পাখি পর্যন্ত বশ করত। শোন্ মজার কাণ্ড, ভদ্রলোকের অভ্যাস ছিল সমুদ্রের ধারে বসে রেওয়াজ করা। আবার একটাই রাগ আর তার

রাগিনীদের নিয়ে সাধনা করত সে। তা রাগরাগিনীর ব্যাপার জানিস তো, একটা করে রাগের ছটা করে বউ—

এইটুকু শুনেই অনু খুশি, একসঙ্গে ছটা বউ হলে তো বরের থেকে বউদের জোর বেশি।

হ্যাঁ শোন, সেই ভদ্রলোক শুধু বসন্ত রাগ আর তার ছয় বউ দেশী, দেবকিরী, বরাটী, তোড়িকা, ললিতা আর হিন্দোলী—

এ মা-গো, কি-সব নাম! রাগিনীদের নামে অনু বীতরাগিণী।

আঃ, তোর খালি তড়বড়ানি। মনোযোগে ছেদ পড়তে বিভু বিরক্ত।

পান্নালাল গল্পে এগোয়, এই রাগরাগিনীদের নিয়েই সাধনা করত ভদ্রলোক। ব্যস, বার মাস বসন্ত সেই থেকে সেখানে—শেষে এমন হল যে ভদ্রলোকের মাথায় পাখিরা এসে বসত—যতক্ষণ গান চলবে ততক্ষণ মাথায় একটা না একটা পাখি বসে।

অঙ্কুর অবিশ্বাস, হ্যাঁ, পাখিরা আবার গান বোঝে!

পান্নালালের উদ্দীপনায় তক্ষুনি আবার আর এক গল্পের সূত্রপাত।—পাখি কি রে! পাখি ছেড়ে গরুতে পর্যন্ত গান বোঝে। শোন তাহলে! কালাংড়ার নাম শুনেছিস তো?

অঙ্কু বা বিভু অজ্ঞ হতে রাজি নয়, তারা মাথা নাড়ে। অনু গম্ভীর মুখে ফিরে প্রশ্ন করে, কামরাঙার মত?

ধেৎ বোকা, এটা একটা সুরের নাম, কালাংড়াও নয়, কালেংড়া—তা কালেংড়া গাওয়ার নিয়ম হল খুব সকালে। এক ওস্তাদ রোজ আবছা অন্ধকারে কালেংড়া গাইত, আর তখন তার গোয়ালের গরুও ডাকত—ডেকে ভোরের জানান দিত। নিজের কেরামতী পরীক্ষা করার জন্য ওস্তাদ একদিন মাঝরাতে কালেংড়া ধরলে, আর ওমনি ভোর হল ভেবে গরুও ডাকতে লাগল। কত শুদ্ধভাবে গাইতে পারলে ও-রকম হতে পারে ভাব একবার।

এই তিন ক্ষুদ্র শ্রোতাই একসঙ্গে আঁতকে উঠেছিল বেহাগের মর্মান্তিক কাহিনী শুনে।আর অনুর দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

পান্নালাল বলেছিল, গান বলতে বেহাগ—বিরহের, মানে ছাড়াছাড়ির গান তো, যেমন মিষ্টি তেমনি করুণ। গাইতে পারলে সব ভুলিয়ে দেবে। বেহাগ হল দিনের একটু বেলাবেলির গান, কিন্তু এমন এক কাণ্ড ঘটল যে রাজা আইন করে দিনের বেলায় ও গান গাওয়া বন্ধ করে দিল, বলল, মাঝরাত্তিরের আগে কেউ ও গান গাইতে পারবে না।

এরপর রসিয়ে কাণ্ডটা বিস্তার করেছে পান্নালাল। দিনের বেলায় কোন বাড়ির একজন যখন বুকে মোচড় দেওয়া বেহাগ গাইছে, আর এক বাড়িতে একটি বউ তখন বঁটি নিয়ে বসেছে, মস্ত একটা মাছ কুটবে। আর এ-পাশে তার শিশু ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছিল। তা গান শুনতে শুনতে বউটি এমন তন্ময় হয়ে গেল যে কিছুই আর তার খেয়াল নেই। সেই তন্ময় অবস্থায় মাছের বদলে ছেলেটাকেই তুলে কেটে দু-আধখানা করে দিলে।

এই গল্প শোনার পর অনু অনেকদিন গোপনে পান্নাদার কাছে কাঁদ কাঁদ মুখে আবেদন জানিয়েছে, তুমি যেন কক্ষনো বেহাগ গেয়ো না পান্নাদা। তার মতে যত গান আছে বেহাগের থেকে খারাপ আর কিছু হয় না।

এই সব গাল-গল্পের ফলেই পান্নাদাকে গানের যাদুকর ভাবত এরা।

প্রথম ক'টা মাস মৃগাঙ্ক গোস্বামী ভাগ্নের গানের নেশা দেখে অল্প-স্বল্প ভ্রূকুটি করেছেন বা বকা-ঝকা করেছেন। কিন্তু তাঁর মেজাজ চড়ল ভাগ্নের পরীক্ষার ফল দেখে। কোনো বিষয়ে পাশ করতে পারেনি। শুধু ভাগ্নের নয়, ছেলের পরীক্ষার ফলও অন্যান্য বারের থেকে খারাপ। ছেলেকে চড়চাপড় কষালেন কয়েকটা, আর ভাগ্নেকে সোজাসুজি বুঝিয়ে দিলেন, পরীক্ষায় পাস করলে যেন গলা দিয়ে শব্দ বার করে, অন্যথায় তার গলা টিপে দেওয়া হবে।

কিন্তু নেশা জিনিসটা ধমকে ছাড়ানো যায় না, সেটা তাঁর মত মেজাজী লোকও খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন। এটা বরদাস্ত করতেও তেমন আপত্তি ছিল না, যদি পাশাপাশি পড়াশুনার ব্যাপারটা মোটামুটি চলত। কিন্তু একদিকে যত ঝোঁক, আর একদিকে ততো ঘাটতি। যে ভগ্নি মানুষ হবে আশায় ছেলে কোলছাড়া করেছে, তাঁর হেপাজতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে—সেই ছেলের এ-রকম একরোখা নেশা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

কড়াকড়ি বাড়ছিল। ফলে এখান থেকে পালিয়ে বাঁচার মতলব আঁটছিল পান্নালাল। মায়ের আদর পেয়ে পেয়ে সে-ও আবার ও-রকম শাসনে অভ্যস্থ নয়। বিশেষ করে গান নিয়ে শাসন। গান বন্ধ করা মানে তো হৃৎপিণ্ডের একটা দিক বন্ধ করে দেওয়া

পান্নালালের মায়ের সুবিবেচনার এই পরিস্থিতিতে সমস্যাটার একটা সাময়িক সমাধান অন্তত হল বলা যেতে পারে। দিন কয়েকের সান্নিপাতিক জ্বরে তিনি চিরদিনের মত চোখ বুজলেন। পান্নালাল কাঁদল খুব। তারপর একদিন তানপুরা নিয়ে বসল। ক্রমশ অনেকটা প্রকাশ্যেই শোকের তাপের ওপর সঙ্গীতের প্রলেপ পড়তে লাগল। পান্নালাল অবাক হয়ে দেখল, মামা আর তেমন কিছু বলেন না। মনে মনে ভাবল, মা তো গেছেই, তার আশীর্বাদে এখন গানটা বাঁচলেও হয়।

মৃগাঙ্ক গোস্বামী পারতপক্ষে আর কিছু বলতেন না ঠিকই। রাগ যে হত না তাও নয়, এক-একসময় পা থেকে মাথা পর্যন্ত খড়ম দিয়ে পিটতে ইচ্ছে করত। বিশেষ করে ইস্কুলের পড়াশুনার খবর যখন কানে আসত। কিন্তু আবার ভাবতেন, বোনটা তার ছেলের শুধু এই নেশাটাই সহ্য করতে অনুরোধ করেছিল—সে-ই যখন নেই, যা হবার হোক গে। খুব যখন অসহ্য হত, তখন আবার তাঁর স্ত্রী-ই ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করতেন তাঁকে। বলতেন মা-বাপ-মরা ছেলে, পড়াশুনা যখন হবেই না, মিথ্যে আর ও নিয়ে রাগারাগি করে লাভ কি।

লাভ যে নেই সেটা চোখের উপর সকলেই দেখছে। এবারে পরীক্ষার ফল বেরুলে অন্ধু আর বিভু পান্নাদাকে ধরবে—সে সম্বন্ধে তারাও প্রায় নিঃসংশয়।

কিন্তু পান্নালালও নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন নয় একেবারে। মামার শাসন একটু শিথিল হতে সে-ও সঙ্গীত-চর্চার উন্নতির দিকটা ভাবতে বসল। নিজের চেষ্টায় কতটুকু আর উন্নতি সম্ভব? ধারে-কাছে একটা গুণী লোকও নেই যে ধরে পড়ে শিখে নেবে। গুণী লোকের সন্ধানে প্রায়ই চার মাইল দূরের শহরে হানা দিতে লাগল সে। আর ধারে-কাছে বা দূরে দূরেও যেখানে গানের আসর বসে, সেখানেই সে উপস্থিত। শুধু রাতের আহারের সময়টা মামার চোখের সামনে থাকতে পারলেই হল।

কিন্তু এও খুব তুচ্ছ সমস্যা নয়। গানের আসরের বা জলসার আসল সময় তো বেশি রাতে। তাকে যখন উঠতে হয়, আসরের তখন আড় ভাঙে না। উচ্চাঙ্গ গানের মজলিশে যত রাত, ততো জম-জমাট।

যার যেমন ভাবনা তার তেমন সিদ্ধি। উপায় যখন একটা চাই-ই, এরও একটা সহজ উপায়ই আবিষ্কার করে নিল পান্নালাল। যদিও উপায়টা নিরাপদ নয় আদৌ। আর এই থেকেই একদিনের বিষম অঘটন।

বাবার হাতে সেদিনের সেই নিগ্রহ ভোলেনি অঙ্কু। সেজন্যে পান্নাদাকেই দায়ী করেছে সে। তাকে জব্দ করার ফন্দি-ফিকির খুঁজছে সেই থেকে। কিন্তু জব্দ উল্টে পান্নালালই করেছে তাকে। ইস্কুলের টিফিনের সময় দূরের আমতলায় বসে ভক্তদের মাউথ অর্গ্যান বাজিয়ে শুনিয়েছে, আর তাকে দেখে হেসেছে। পান্নালালের সঙ্গীরাও হি হি করে হেসেছে তার দিকে চেয়ে। অর্থাৎ বাবার হাতে ওর সেই হেনস্থার খবরটা ওদের কাছেও ফলাও করে বলা হয়েছে। অঙ্কুর ইচ্ছে হল, সব ক'টার ঘাড় টেনে ছিঁড়ে নিয়ে আসে। পায়রার ঘাড় যেমন করে ছেঁড়ে। পান্নালালেরও সুদ্ধু।

সেই দিনই একটা যোগাযোগ মন্দ হল না। একবার জল খেতে বেরিয়ে বিভু চুপি চুপি অঙ্কুকে খবর দিল, শ্রীবিলাসবাবু পান্নাদাকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছেন—সে স্বচক্ষে দেখে এলো।

মনের এই অবস্থায় খবরটা খুশি হবার মত বইকি! পান্নাদা পড়াশুনোয় যেমনই হোক, শিল্পী হিসেবে ইস্কুলের ছেলেদের কাছে রীতিমত গণ্যমান্য ব্যক্তি। ব্যক্তি, কারণ তার বয়সী ছেলে গোটা ইস্কুলে খুব বেশি নেই। ওদিকে শ্রীবিলাসবাবুও কড়া অঙ্কের মাস্টার। শিল্প বা বয়স কোনটারই ধার ধারেন না তিনি। কেবল অঙ্ক বোঝেন। অতএব স্বচক্ষে দেখার বাসনাগত জলতেষ্টায় অঙ্কুরও তক্ষুনি ছাতি ফাটার দাখিল।

বেরিয়ে এসে দুচোখ ভরে অঙ্কু দৃশ্যটা খানিক দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পান্নাদা মাথা গোঁজ করে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অপমানে মুখ কালো।

চেষ্টা-চরিত্র করে বাইরে থেকে অঙ্কু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারপর হাত নেড়ে ইশারা করল। অর্থাৎ যে-ভাবে পারো একটু বাইরে এসো। ইশারাটা গম্ভীর হুকুমের মতই।

অঙ্কুকে দেখে পান্নালাল আরো কাদার তলায়। গলা ঝাড়তে ঝাড়তে বাইরে এলো সে। অঙ্কু একটি কথাও বলল না, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না। শুধু তার সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।—দাও।

একে ক্লাসে অপমান, তার ওপর এই পরিস্থিতি। যা চাইছে না দিলে কি হবে সেটা অঙ্কুর ও-ভাবে হাত বাড়ানোর মধ্যেই সুস্পষ্ট। পকেট থেকে মাউথ-অর্গ্যানটা বার করে তার হাতে দিতে হল। অঙ্কু বিজয়ী বীরের মতই সেটা নিয়ে চলে গেল। কতক্ষণের বা ক'দিনের কড়ার নিল, সেই ফয়সালাও করার দরকার বোধ করল না। সেটা সে বিবেচনা করে দেখবে। গাঁয়ের ইস্কুল, গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল পাওয়া কঠিন নয়। পছন্দমত এবং নিরাপদমত একটা জায়গা

বেছে নিয়ে চাপা সুরে নানা ভাবে ফুঁ দিয়ে বাজনাটার রহস্যভেদে মগ্ন হল সে। সুর বা স্বর মনের মত না হওয়ায় স্বভাবগত অসহিষ্ণুতায় ক'বার জোরে শব্দ করেছে খেয়াল নেই।

জল খেতে এসে কতক্ষণ কাটল তাও নয়।

ক্লাসে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাই তাকে কাছে ডেকে একহাতে চুলের ঝুঁটি ধরলেন এবং অন্য হাতটা সরাসরি তার পকেটে ঢুকিয়ে মাউথ-অর্গ্যানটা বার করলেন। অবশ্য বামাল হিসেবে ওটাই বেরুবে তিনি ভাবেননি। কাঁচা আম বা সেই রকম কিছুর সন্ধান পাবেন আশা করেছিলেন। এটা পেলেন যখন, তখন খেয়াল হল মাঝে মাঝে একটা বাজনার আওয়াজ কানে আসছিল বটে। বাজনা খুইয়ে অঙ্কুকে বেঞ্চির ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হল।

সমস্ত দিন দাঁড়াতেও আপত্তি নেই, দাঁড়িয়ে অভ্যস্ত সে। কিন্তু বাজনাটা হাতছাড়া হল বলে ঈষৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। যে লোক এরা, হয়তো বাবার হাতেই দিয়ে বসবে। অঙ্কু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কি করা যায়।

হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়তে চক্ষুস্থির তার! বাইরে মাস্টারমশাইকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পান্নাদা গম্ভীর মুখে হাতের ইশারায় বাইরে আসতে হুকুম করছে তাকে। যে ডেকেছিল তাকে, তার থেকেও কড়া মেজাজে।

অঙ্কু অর্গ্যানটা নিয়ে আসার পর থেকেই মেজাজ ভয়ানক বিগড়েছিল পান্নালালের। ঘাবড়ে গিয়ে দিয়ে দিল বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল। কেন দিতে গেল, মামাকে বললে কি আর হত। রাগটা চড়তেই লাগল ক্রমশ। ইস্কুল, পড়াশুনা, মাস্টারমশাই, মামা—সকলের ওপর আর সব কিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ সে। তাছাড়া এ বয়সে ছোট ছোট ছেলেদের সামনে এ অপমানও অসহ্য। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎই পান্নালাল স্থির করে ফেলল, আর সে পড়বেই না, ও পাট এবারে শেষ হওয়া দরকার। এ ধরনের একটা সদিচ্ছা অনেকদিন ধরে সঙ্গোপনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। ভরসা করে প্রকাশ করে উঠতে পারেনি। আজ ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়েছে। আর সে পারছে না, আর সে পারবে না।

বিদ্রোহের সূচনায় বাঘা অঙ্কের মাস্টার শ্রীবিলাসবাবুকেও আর তার পরোয়া করার দরকার আছে বলে মনে হল না। তবে তাঁর অনুমতি নিয়েই ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল সে। তারপর বুক ফুলিয়ে বাজনাটা ফিরে আদায় করে নেবার জন্যে হাজির। এসে দেখে এই অবস্থা।

কম্পিত শ্লেষ্মা অপসারণের তাড়নায় অঙ্কুকেও বেঞ্চি থেকে নেমে বাইরে আসতে হল। ঠিক তার মত করেই হাত বাড়িয়ে দিল পান্নালাল।—দে।

অঙ্কু ঘাড় নাড়ল, নেই।

পান্নালাল তার পকেট হাতড়ে দেখে নিল।—কি করেছিস?

সার নিয়ে নিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে গালের ওপর ঠাস করে বিষম চড় একটা। আচমকা সেই রাম-চড় খেয়ে উলটে পড়ার দাখিল। ওদিকে ক্লাসের ভিতর থেকে ছেলেরা দেখছিল, তারাও হতভম্ব।

পান্নালাল গট গট করে প্রস্থান করল সেখান থেকে।

তার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি রেষারেষি অঙ্কু অনেক করেছে। কিল-চড়ও একটু-আধটু খেয়েছে। সে-ও একভাবে না একভাবে তার শোধ তুলেছে। কিন্তু এ রকম চড় আর ইস্কুলের মধ্যে এইভাবে চড় এই প্রথম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ক্লাসের কতগুলো ছেলে হুমড়ি খেয়ে দেখছে তাকে ঠিক নেই। আয়না না থাকলেও জ্বলুনি থেকেই বুঝতে পারে, গালের ওপর পাঁচটা আঙুলের দাগ টকটকিয়ে উঠেছে।

ফিরে গিয়ে আবার বেঞ্চির ওপর দাঁড়াল সে। মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। সে প্রতিশোধ নেবে। জীবনে না ভোলে এমনি মর্মান্তিক প্রতিশোধ কিছু। আর ওই বাজনাটা হাতে আসা মাত্র গুঁড়িয়ে ভাঙবে তো বটেই।

কিন্তু তাও হাতে এলো না। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পান্নালাল ক্লাসে ঢুকে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেল ওটা।

যাক। অঙ্কু দেখে নেবে। শিগগীর। খুব শিগগীর। মাস্টারমশাই বেরিয়ে যেতে অন্তরঙ্গ কয়েকজন সহপাঠী ছেঁকে ধরেছিল অঙ্কুকে। ব্যাপারটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না তারা। কিন্তু দুর্দান্ত বন্ধুটির দুই চোখের জ্বলন্ত আঁচ গায়ে লাগতে সভয়ে যে যার নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে আবার।

পান্নালাল সঙ্কল্পচ্যুত হয়নি। মামার কড়াকড়ি আর ইস্কুলের হেনস্থা থেকে মুক্তিলাভের একটা সহজ উপায়ও তার মাথায় এসেছিল। কিন্তু উপায়টা কাজে লাগাতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার।

পরের দিনই এক ফাঁকে বৃন্দাবন ঘোষালের শরণাপন্ন হয়েছিল। আর্জি, তাকে তাঁর কাঠের গোলায় যা হোক একটা কাজে লাগিয়ে দিতে হবে—লেখাপড়া আর তার দ্বারা হবে না।

বৃন্দাবন ঘোষাল খানিক চুপ করে থেকে শুধু বলেছিলেন, ভেবে দেখি।

এই ভেবে দেখার ফল কোথায় এসে ঠেকতে পারে পান্নালাল একবারও চিন্তা করেনি। পরদিনটা ছিল রবিবার। বেনা ঘোষাল পরামর্শ করতে এলেন দাদার সঙ্গে, অর্থাৎ মৃগাঙ্ক গোস্বামীর সঙ্গে। পান্নালালের আবেদন জানালেন, কারণ তাঁর মতামত না জেনে কিছু করা সম্ভব নয়।

যুক্তি দিয়ে ভাবতে গেলে পান্নালালের চেষ্টাটা এমন কিছু গর্হিত নয়। পড়াশুনা যে হবে না সেটা মামাও জানেন। কিন্তু তাঁকে ডিঙিয়ে এভাবে বেনা ঘোষালকে গিয়ে ধরাটা অপমানকর লাগল। তাছাড়া পরীক্ষার আর কটা মাস মাত্র বাকি। পান্নালাল বাড়িতেই ছিল, বাইরের দাওয়ায় ডাক পড়ল। এমন উগ্রমূর্তি দেখবেন জানলে বেনা ঘোষালও পরামর্শ করতে আসতেন কিনা সন্দেহ।

আর পান্নালালের গত দু দিনের বিদ্রোহের তাপ এক নিমেষে জুড়িয়ে জল।

মামা পায়ের থেকে শুধু খড়মটা খুলে পিটিয়ে বাকি রাখলেন তাকে। বিভু অনু ছেড়ে তিন বাড়ির দাসী-চাকর পর্যন্ত আড়াল থেকে আধঘণ্টা ধরে শিল্পীর নির্যাতন দেখল। মামার তাড়না থেকেও এই অপমানের ধকল বেশি।

এরই থেকে আর এক নাট্যের শেষ অধ্যায়ের সূচনা।

মামার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে পান্নালাল বাড়িতে ঢোকেনি। গোটা পরিবেশটাই বিষাক্ত লাগছিল। অনির্দিষ্টের মত বড়তলার ফাঁকা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। সব কটা স্নায়ু একসঙ্গে নাড়াচাড়া খেয়েছে। কিছু ভাবতেও পারছে না।

থমকে দাঁড়াল। কানাই। কাঁদতে কাঁদতে এদিকেই আসছে।

বয়সে ছোট হলেও এক ক্লাসেই পড়ে। পান্নালালের একমাত্র ভক্ত অনুগত সাগরেদ কানাই। রোগা দুর্বল গোছের ছেলেটার গানের প্রতি ঝোঁক খুব। উচ্চাঙ্গের গান—যে গান পান্নাদা গায়। অতএব পান্নালাল তার গুরুস্থানীয় সহপাঠী।

সেই কানাই কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

দূরের গাছতলায় দুটো দামাল ছেলের সঙ্গে অন্ধু দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছে। একটু আগে বাড়িতে যে প্রহসন ঘটে গেছে, সেটা তার অজ্ঞাত। ছুটির দিনে ও-সময় বাড়িতে থাকাটা তার হিসেবের বাইরে।

এদিকেও ছোটখাট একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। গাছতলায় বসে সঙ্গীদের সঙ্গে অন্ধু তেমন কথাবার্তা কইছিল না। সেদিনের ইস্কুলের ব্যাপারটাই মগজে ধিকিধিকি জ্বলছে, সারাক্ষণ শোধ নেবার ফন্দি আঁটছে। চোখে পড়ল, বামুনপাড়া থেকে কানাই আসছে। পান্নাদার কাছেই যাচ্ছে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। গানের মহড়া নেবে আর গদগদ ভাবে পান্নাদার তারিফ করবে।

হঠাৎই অন্ধুর মনে হল পরশু দিন ইস্কুলের বটতলায় বসে পান্নাদার সঙ্গে কানাইও হেসেছিল তার দিকে চেয়ে। অপরাধ আবিষ্কার করা মাত্র টপ করে উঠে পথ রোধ করে দাঁড়াল।

সেদিন হেসেছিলি কেন?

কানাই অবাক। মুখ শুকনো।—কবে?

পরশু ইস্কুলের বটতলায়।

কানাই অস্বীকার করল। রোগা আর দুর্বল হলেও, আর ভিতরে ভিতরে ভয় পেলেও এক ক্লাস ওপরে পড়ে এই ভরসায় কানাই সমান ওজনেই জবাব দিতে চেষ্টা করছিল। ফলে এই, মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে।

শোনামাত্র শরীরের সব রক্ত মাথার দিকে ধাওয়া করল পান্নালালের। একটু আগের লাঞ্ছনার সঙ্গে এই যোগটা চূড়ান্ত ব্যাপার। কানাইয়ের মারের সবটাই তার গায়ে এসে পড়ল। তার একটা হাত ধরে টেনে আবার গাছতলায় নিয়ে এলো।

অন্ধু বুক ফুলিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিতণ্ডার আশাতেই কানাইকে মারা।

ওকে মারলি যে?

বেশ করেছি।

তারপর বেশ বড়গোছের খণ্ড-যুদ্ধ একটা। কানাই আর অন্ধুর বন্ধুরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে।

বাড়ির ঘটনা জানা নেই অন্ধুর। এমন জিঘাংসু আক্রমণ আশা করেনি।

তা বলে পাল্টা আক্রমণের কসুর করেনি সে। হাত আর পায়ে যতটা সম্ভব করেছে। করছে। মাটিতে গড়াগড়ি দুজনে। কিন্তু অন্ধু নিস্তেজ হয়ে পড়ছে ক্রমশ। প্রহারে প্রহারে সর্বাঙ্গ

জর্জরিত। তার হাতদুটো নিজেরই পিঠের তলায় চাপা পড়ে গেছে, অতবড় শরীরটা নিয়ে পান্নালাল তার বুকের ওপর চেপে বসেছে। মার পান্নালালও কম খায়নি, তবে যা দিয়েছে তার তুলনায় কিছু না। তখনও রাগে অন্ধ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য সে। বুকের ওপর বসে এক হাতে আর দুই হাঁটুতে তাকে চেপে ধরে অন্য হাতে তার মাথাটা মাটির সঙ্গে ঠুকে থেঁতলে দিতে লাগল। পিঠের তলায় অঙ্কুর হাতদুটো দুমড়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, বুকের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখে অন্ধকার দেখছে অঙ্কু।

এক বাড়িতে দুজন অপরিচিতের বাস যেন। কেউ কারো দিকে তাকায় না, কেউ চেনেও না। মাথা ঠাণ্ডা হতে দিন দুই পান্নালাল একটু ভয়ে ভয়ে ছিল। যে মার মেরেছে, মামা-মামীর চোখে পড়ারই কথা। এই দুতিনটে দিন অঙ্কুকে যতটা সম্ভব তাঁদের চোখের আড়ালে থাকতে দেখে শঙ্কা গেছে। ভিতরে ভিতরে হয়তো অনুশোচনা হয়েছে একটু, কিন্তু আপাতত সেটা ভিতরেরই ব্যাপার, বাইরে প্রকাশের নয়।

তলায় তলায় অঙ্কুর দুচোখ সর্বদা প্রহরারত। তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখছে, সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে। সুযোগ আসবেই জানে। একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবার মতই সুযোগ। মনের এই অবস্থায় দুজনার মধ্যে একজনের অস্তিত্ব মুছে গেলেও তার আপত্তি নাই।

সুযোগ এলো। যে-রকমটি প্রত্যাশা করেছিল সেই রকমই।

বাইরের চোখ দুটো অঙ্কুর আরো নিরাসক্ত, কান দুটো আরো নিস্পৃহ। কিন্তু ভিতরে আরো তীক্ষ্ণ, আরো উৎকর্ণ...কানাইয়ের সঙ্গে পান্নাদার ফিসফিস মন্ত্রণা চলেছে, একটা সংগোপন পরামর্শ চলেছে। কিছু একটা বিশেষ প্রত্যাশায় বিভোর দুজনে।

কি মন্ত্রণা, কি পরামর্শ, আর কিসের প্রত্যাশা অঙ্কু জানে। সে-ও নিষ্ক্রিয় বসে নেই। ওদের চাল-চলনে সন্দেহ হতে সে-ও শহরের দূর প্রান্তের আসন্ন সমাচারটি সংগ্রহ করেছে।

সেই দিন।

পান্নালালের হাবভাব আরো নরম, আপসের চেষ্টাটা আরো স্পষ্ট। এমন কি এত সাধের মাউথ-অর্গ্যানটাও মালিকের অনবধানতায় অঙ্কুর নাগালের মধ্যে পড়ে আছে সেই থেকে। অকারণে দু-চারবার তার সামনে দিয়ে ঘুরঘুরও করে গেছে পান্নালাল। কিন্তু পড়শুনায় অঙ্কুর একটা গোঁ-ই চেপেছে যেন, কোনদিকে তাকানোর অবকাশ নেই।

রাত্রি।

সময় বুঝে অঙ্কু বিছানা ছেড়ে উঠল। লণ্ঠনটা জ্বালল। একটু আগে কেউ তাকে দেখলে ভাবতেও পারত না যে সে অকাতরে ঘুমুচ্ছিল না। কিন্তু অতি সন্তর্পণে সদর দরজা খোলার আর বন্ধ করার মৃদু শব্দটা পর্যন্ত তার কানে এসেছে। তার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মড়ার মত পড়েছিল। তারপর উঠেছে।

কোনদিকে না চেয়ে সোজা দোতলায় উঠে গেল। সামনের বারান্দা পেরিয়ে লণ্ঠন হাতে একেবারে বাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

সবে তন্দ্রা এসেছিল মৃগাঙ্ক গোস্বামীর, ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে এলেন।

কি রে?

নীচে পান্নাদার ঘরে একবারটি দেখবে এসো।

মৃগাঙ্ক গোস্বামী ঘাবড়েইগেলেন প্রথমটা।—কি, কি হয়েছে?

তুমি দেখবে এসো না।

লণ্ঠন হাতে তাড়াতাড়ি ফিরে চলল সে। কি হয়েছে এখানে সেটা বলার ইচ্ছে এখানে একটুও নেই। মৃগাঙ্ক গোস্বামীর বিমূঢ় ভাব কাটে নি তখনো, ছেলে কোনদিন লণ্ঠন হাতে এভাবে উঠে আসে না, এভাবে ডাকে না। বারান্দার কোণের স্তিমিত হারিকেনটা তুলে নিয়ে খালি পায়েই তিনি ছেলের পিছনে পিছনে নীচে নেমে এলেন।

ভাগ্নের ঘরে ঢুকেও হঠাৎ বুঝতে পারেনি কি ব্যাপার। পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ যেন নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। কি হল ভেবে আঁতকে উঠলেন তিনি, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে চাদর সরালেন।

শূন্য শয্যা। চাদর বালিশ আর কাপড়ের পুঁটলির বিন্যাসে গোপনের পরিপাটি চেষ্টা।

মৃগাঙ্ক গোস্বামী স্তম্ভিত খানিকক্ষণ।—কোথায় গেছে?

গান শুনতে।...শহরেরও একেবারে সেই শেষের মাথায়, বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়ে এসেছে বাইরে থেকে। থামল একটু, বাবার চোখ-মুখের অবস্থা দেখেই পরের প্রশ্নটা অনুমান করেছে। আগেই বলল, প্রায়ই যায়...আমি মারের ভয়ে কিছু বলতে পারি না।

প্রাই যায় সেটা মিথ্যে নয়। আর মারের ভয়ে কিছু বলতে পারে না সেটা সত্যি নয়। এ-রকম নালিশ আর এ-রকম সত্যের অপলাপ এই প্রথম। আগে না জানানোর কৈফিয়ৎ বাবা তলব করবেন জেনেই এইটুকু নিরাপত্তার আশ্রয়।

সকালে পাখী জাগার আগেই পান্নালাল ফিরেছে। কানাই সাইকেল যোগাড় করেছিল একটা, এক সাইকেলে দুজন হলেও যেতে বা আসতে সময় লাগেনি খুব। বড়তলার মুখে সাইকেলটা কানাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে এটুকু পথ হেঁটে এলো সে। তারপর সন্তর্পণে দরজা ঠেলতে গিয়ে অবাক।

ভিতর থেকে বন্ধ।

নিশ্চয় অঙ্কুর শয়তানী। নয়তো এত সকালে কে আর দরজা বন্ধ করতে যাবে। পাশের জানলায় সরে এসে মৃদু টোকা দিল কয়েকটা। প্রায় আত্মসমর্পণের সুরে চাপা গলায় ডাকল, এই অঙ্কু, দরজাটা খোল্—

একটু বাদেই দরজা খোলার শব্দ। পরক্ষণে সামনে যম দেখল পান্নালাল। মামা দাঁড়িয়ে। তিনিই দরজা খুলেছেন। পান্নালাল নিস্পন্দ, বিবর্ণ, পাংশু।

অপলক কঠিন নেত্রে খানিক চেয়ে থেকে মৃগাঙ্ক গোস্বামী পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন একটু। কলের পুতুলের মত পান্নালাল ভিতরে ঢুকল।

মৃগাঙ্ক গোস্বামী ঘরে এসে দাঁড়ালেন। আবারও তার আপাদমস্তক চেয়ে চেয়ে দেখলেন খানিক।

পার্টিশনের এধার থেকে অঙ্কু গলা বাড়িয়েছে। অজ্ঞাত ত্রাসে তারও মুখ শুকনো।

কোথায় গিয়েছিলি?

পান্নালাল নিরুত্তর।

বজ্রকণ্ঠে কাঠের পার্টিশনটাও কেঁপে উঠল বুঝি।—কোথায় ছিলি সমস্ত রাত?

পান্নালাল বোবা।

নীরবতার ফলেই মৃগাঙ্ক গোস্বামী যেন দ্বিগুণ ক্ষেপে গেলেন। এইভাবে রাতে পালানো ধরা পড়তে ভাগ্নের স্বভাব-চরিত্রের প্রতিও সন্দিগ্ধ তিনি। পান্নালাল দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কাঁধের কাছে তানপুরাটা ঝুলছে। মৃগাঙ্ক গোস্বামীর সেটার ওপর চোখ পড়ল। নিদারুণ আক্রোশে হ্যাঁচকা টানে দেয়াল থেকে টেনে নামালেন সেটা। পরমুহূর্তে তানপুরার মস্ত গোল মাথাটা ভেঙে চুরমার। তারগুলো সব টেনে ছিঁড়লেন, বাদ্যযন্ত্রটা দেখতে দেখতে ভেঙে দুমড়ে একাকার হয়ে গেল।

কর্, এবারে কত গান করবি—

অঙ্কুর হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে থেমে গেছে। সর্বাঙ্গে আর্ত আলোড়ন, বোবা ত্রাসে চেয়ে চেয়ে দেখছে, পান্নাদার মাথাটাই মেঝেতে আছড়ে ভাঙা হল যেন, তার বুকের তারগুলোই যেন সব টেনে টেনে ছিঁড়ল বাবা।

ভাগ্নের দিকে চেয়ে হঠাৎ মৃগাঙ্ক গোস্বামীও কি দেখলেন তিনিই জানেন। আত্মস্থ হলেন। আর কিছু না বলে সোজা উপরে উঠে গেলেন তিনি।

বেলা বাড়ছে। ভিতরে ভিতরে বিষম একটা জ্বালা-পোড়া শুরু হয়েছে অঙ্কুর। এক মুহূর্ত বসতে পারছে না কোথাও। কে যেন চাবকে তুলে দিচ্ছে তাকে। আড়াল থেকে কতবার উঁকিঝুঁকি দিয়েছে ঠিক নেই। পান্নাদা সেই একভাবে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে। দেহে যেন প্রাণের লেশমাত্র নেই। সামনে ভাঙা তানপুরাটা তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে।

ইস্কুলের সময় হতে বলে-কয়ে মাকে ডাকতে পাঠালো। আড়ালে দাঁড়িয়ে অঙ্কু দেখল, মা যেন কোনো মৃতের গায়ে-পিঠে হাত বুলোচ্ছে, মৃতকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শেষে হাল ছেড়ে উঠে আসতে হল মাকে।

ইস্কুল ভালো লাগছে না অঙ্কুর। এক মুহূর্তও না। সময় জাঁতার মত বুকে চেপে বসে আছে। এই ছটা ঘণ্টার এত ক্লেশ আর বোধ হয় জীবনে ভোগ করে নি। অন্য ছেলেরা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। শুধু বিভু গম্ভীর, একটা কথাও বলেনি তার সঙ্গে। আর অনুও তার ধারে কাছে ঘেঁষেনি।

ইস্কুল থেকে ফিরে পান্নাদার ঘরে উঁকি দিয়েই বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল অঙ্কুর। ঘরে নেই কেউ। দুমড়নো তানপুরাটা তেমনি মেঝেতে পড়ে। বিছানায় মাউথ-অর্গ্যানটাও।

কুয়োতলা, পুকুরঘাট, বাগান—সর্বত্র টহল দিয়ে এলো একবার। এমনিই ঘুরছে যেন। কারণ যেখানে যায় ভাবে এইবার মুখোমুখি দেখা হবে। পান্নাদা যদি তাকে ধরে মারে সেদিনের মত, মেরে মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলে—অঙ্কু বেঁচে যায় যেন।

বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞাসা করল, মা, পান্নাদা কই?

শুনে মাও অবাক একটু, কেন, ঘরে নেই? ঘরেই তো ছিল...সমস্ত দিন উঠল না, নাইল না, খেল না, গেল কোথায়!

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। রাত বাড়ছে।

নদীর ধারে, জঙ্গলের দিকটা, কৈবর্তপাড়া কুমোরপাড়া সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলো অঙ্কু। এদিকে মৃগাঙ্ক গোস্বামীও খুঁজেতে বেরিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পাড়ার আরও অনেকে। রাত বাড়ছেই।

বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে অঙ্কুর। মন যা বলছে তা সে কিছুতে বিশ্বাস করতে চাইছে না, শুনতে চাইছে না। মন বলছে, পান্নাদা আর ফিরবে না।

মেঝেতে ভাঙা দুমড়নো তানপুরাটা তেমনি পড়ে আছে তখনো। বিছানায় মাউথ-অর্গ্যানটাও। অঙ্কু ওটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল খানিক, শেষে এক জায়গায় সরিয়ে রেখে দিল। তানপুরাটা দেখছে। হঠাৎ সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল, পান্নাদার গোটা শরীরটাই ভেঙে চৌচির হয়ে পড়ে আছে। আর এক অব্যক্ত অনুযোগে পান্নাদা তার দিকেই চেয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এলো সে। কি মনে পড়তে ত্রাসে সর্বাঙ্গ কাঁপছে।... দুর্নাম রটেছিল বলে শাঁখারীপাড়ার একটা বউ জলে ডুবে মরেছিল। সাঁতার জানত, তাই মাঝপুকুরে গিয়ে হাতে-পায়ে শাড়ি জড়িয়ে নিয়েছিল বউটা। সকালে খবর পেয়ে অঙ্কুরা দেখতে ছুটেছিল।...দেখেছিল।

রাত অনেক। লণ্ঠন হাতে চুপি চুপি অঙ্কু খিড়খির পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল। লণ্ঠন তুলে দুচোখ টান করে অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। পুকুরটার চারধারে ঘুরল একবার, কালো জলে সাদা কিছু দেখা যায় কিনা।

পরদিনও খোঁজাখুঁজি চলল। তার পরদিনও।

ছোট্ট একটা বুক অবিশ্রান্ত পুড়ছে। ভাঙা তানপুরাটা দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে অঙ্কু। একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ওটার দিকে তাকানো যায় না। মাউথ-অর্গ্যানটা যত্ন করেরেখে দিয়েছে। বুকের বাতাস যখন কমে আসতে চায় বাগানে ছুটে পালায়। পান্নাদার যা-কিছু ভালো, তাই শুধু সারাক্ষণ ছেঁকে ধরছে তাকে। তার ভোরের আলাপ প্রায়ই সে-ও কান পেতে শুনতো বইকি, পরে মুখ ভেঙচাক আর যাই করুক তখন ভালো লাগত। কত রকমের গানের গল্প করত পান্নাদা। ওকে বা বিভুকে আর অনুকে না দিয়ে কখনো কিছু খেত না।...পান্নাদা ভালবাসত তাকে।

সে-ও পান্নাদাকে ভালবাসে মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল আর বাধা মানে নি। একা একা ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। অব্যক্ত আকুতি—পান্নাদা তুমি ফিরে এসো, আর কোনদিন আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না, কক্ষনো আর বাবার কাছে নালিশ করব না।

তৃতীয় দিন। বিভুকে হাতের কাছে পেয়ে নতুন করে একটা খোঁজার পরামর্শ করার জন্য

ডাকল তাকে। কিন্তু গোমড়া মুখে বিভু পাশ কাটালো তাকে। তার সঙ্গে বাক্যালাপেও আপত্তি। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুর মাথায় আগুন জ্বলল, পথ আগলে দাঁড়াল। তোকে ডাকলাম, শুনলি না যে?

বিভু জবাব দিল, তোর সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করে।

ব্যস্, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুঁসি। বাবার ভয়ে বিভুর গায়ে হাত বড় তুলত না সে। সকলের চোখেই বিভু রত্নবিশেষ। কিন্তু কাউকে আর পরোয়া করে না অঙ্কু, বাবাকে না—কাউকে না।

এরপর অঙ্কুর মনে হল, সামনে পড়লে অনুও মুখ বাঁকিয়ে চলে যায়। পান্নাদার জন্যে কেঁদে কেঁদে অনুকে চোখ ফোলাতে দেখেছিল। সে-ও নিশ্চয় বিভুর সঙ্গে একজোট হয়েছে। আবারও আক্রোশে দপদপিয়ে উঠল ভিতরটা। ওদের বাইরের ঘরে এসে ডাকল তাকে।

অনু কাছে এলো না। দুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন? বিরস মুখ।

কথা আছে।

তোমার সঙ্গে কথা বলব না, নালিশ করে পান্নাদাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ তুমি।

অঙ্কু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। ধরতে পারলে জ্বালা মেটে, কিন্তু ধরতে গেলে ছুটে পালাবে জানা কথা। ভিতরের দুঃসহ ক্ষতটার ওপরেই যেন ধারালো ছুরি দিয়ে কাটাকুটি করছে ওরা। বলল, তুই বাড়ি থেকে বেরুবি না কোনদিন?

অনু মুখ মুচকে জবাব দিল, কদিন আর মারবে, আমরা তো চলেই যাচ্ছি এখান থেকে।

এই চলে যাওয়ার কথাটা অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। অনুর বড়দা ভালো পাশ করেছে, এখন ভালো একটা চাকরি-বাকরি পেলেই সকলকে নিয়ে যাবে। শোনা কথাটায় নতুন করে গুরুত্ব দিল না অঙ্কু, দেবার মত মনও নয়। রাগে জ্বলতে জ্বলতে বলল, যা দূর হ এখান থেকে, চিরকালের মত যা—স্টেশনে গিয়ে হলেও যাবার আগে তোকে আধমরা করে আসব আমি।

পনের-বিশ দিন কেটে গেল।

মৃগাঙ্ক গোস্বামী দেশে চিঠি লিখেছেন। নিজেও দু-তিন দিনের জন্য গেছেন। ফেরার পথে কলকাতা হয়ে এসেছেন। ভাগ্নের সঙ্গে শাখায় প্রশাখায় যোগাযোগ আছে এমন সর্বত্র খোঁজ-খবর করে এসেছেন। তারপর ফিরে এসেছেন। সেই থেকে একেবারে স্তব্ধ তিনি।

বিভু বা অনুর সঙ্গে অঙ্কুর কথা বন্ধ। ইস্কুলেও কারো জানতে বাকি নেই। দিনে দিনে আরো দুর্দান্ত আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে সে। কারো মুখে একটু ঘোরালো আভাস পেলেই রক্ষা নেই, মারামারি লেগেই আছে। তার ধারণা সকলেই তলায় তলায় ঘৃণা করছে তাকে, কানাকানি করছে, ভালো কথা বলতে এলেও বিপরীত হয়। ফলে হেডমাস্টারের হাতে মার খাচ্ছে অঙ্কু, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে হচ্ছে—আর বাবার মারের তো কথাই নেই। ভাগ্নের এই ব্যাপারটার জন্যে নিজের অগোচরে হয়তো ছেলেকে দায়ী করছিলেন তিনিও। তুচ্ছ অপরাধেও বিষম প্রহার করেছেন এক একদিন।

কিন্তু বাবার ওপরেই যেন সব থেকে বেশি রাগ আর বিদ্বেষ অঙ্কুর। এই মারের মুখেই একদিন হাত থেমে গিয়েছিল মৃগাঙ্ক গোস্বামীর। অপরিণত বয়সের ছেলের জ্বলন্ত চোখের আঁচ

বুঝি অন্তস্তলে গিয়ে লেগেছিল। হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই থেকে আর মারেন নি, ডেকে পড়াতেও বসেননি।

অনুদের বাড়িতে দু দিন ধরে বাঁধা-ছাঁদার তোড়জোড় চলছিল অঙ্কু লক্ষ্য করেও করেনি। বাড়িতে কমই থাকে। বই ছোঁয়ও না। কোথায় কোথায় ঘোরে কেউ খবর রাখে না। যেদিন যাবে ওরা, সেই দিন খেয়াল করল। অনুর বড়দাকে দেখে খেয়াল হল।

সকালেই অঙ্কু বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। অনু আসবে ভাব করতে, ও ভাব করবে না। যাচ্ছে যাক, কাউকে দরকার নেই ওর। অঙ্কুর সঙ্গে রেষারেষি করেই এই যাওয়ার ব্যবস্থাটা যেন।

ইস্কুলের সময় হতে এক ফাঁকে খেয়ে-দেয়ে চুপি চুপি ইস্কুলে চলে গেল। কিন্তু ইস্কুল অসহ্য। ক্লাস অসহ্য। মাস্টারমশাই, ক্লাসের ছেলেরা সব অসহ্য। তবু বেঞ্চি আঁকড়ে টিফিন পর্যন্ত কাটাল কোন রকমে। বিভু আজ আসেইনি লক্ষ্য করেছে।

টিফিন হতে আর ইস্কুলে টেঁকা গেল না। কাউকে কিছু না বলে বই-খাতা নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলো। শাস্তির পরোয়া করে না।

কিন্তু দেরিতে এলো। আধঘণ্টা আগে অনুরা চলে গেছে। বই খাতা ফেলে অঙ্কু ছুটল। ওরা গরুর গাড়ি চেপে প্রথমে শহরে যাবে। শহর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে স্টেশনে।

অনু সকাল থেকেই কাঁদছিল। গরুর গাড়িতে বসেও কাঁদছিল। তার চোখেই পড়ল প্রথম। দেখা মাত্র মনে হল, স্টেশনে এসেও যাবার আগে অঙ্কুদা মারবে বলেছিল, মারতেই আসছে। তবু চেঁচিয়ে উঠল, ঠা-মা, গাড়িটা থামাতে বল, ওই যে অঙ্কুদা ছুটে আসছে।

গাড়িটা ধরে অঙ্কু নিঃশব্দে হাঁপালো খানিকক্ষণ। ঠাকুমা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কোথায় ছিলি দাদা সকাল থেকে, কত খুঁজেছি।

অঙ্কু ঠাকুমার পায়ের ধুলো নিল। তারপর অনুর দিকে তাকালো। সেই চাউনি দেখে অনু তখনো বুঝে উঠছে না, অঙ্কুদা তাকে মারবার জন্যেই এত পথ ছুটে এসেছে কিনা।

অনুর বড়দা তাড়া দিতে ঠাকুমা বললেন, যাই দাদা—বড় হয়ে কলকাতা গিয়ে বউ নিয়ে এসো।

সংযমের বাঁধটা ভাঙল যেন। সবেগে মাথা নেড়ে অঙ্কু বলে উঠল, না না, কোথাও যাব না আমি—সব চলে যাক এখান থেকে—কাউকে দরকার নেই—কাউকে চাইনে আমি।

যেমন ছুটতে ছুটতে এসেছিল, তেমনি উর্ধ্বশ্বাসে ফির চলল আবার। কান্না ভুলে, যাত্রার শোক ভুলে অনু অবাক। প্রায় হতভম্ব। অঙ্কুদার লাল চোখে জীবনে এই প্রথম জল দেখল ও।

পাঁচ

বেনা ঘোষাল বিভু আর অঙ্কু দুজনকে দুটো সাইকেল কিনে দিয়েছেন। শহরের কলেজ প্রায় ছ-মাইল দূরে, সাইকেলে বাড়ি থেকে কলেজ করা সম্ভব।

বিভু ভালো পাস করেছে। মফঃস্বল কলেজে না দিয়ে তাকে কলকাতার কলেজে

পড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন অনেকে। এমন কি মৃগাঙ্ক গোস্বামীও তাই বলেছিলেন। কিন্তু বিভুর বাবা রাজি হন নি। পড়াশুনা যতটা হয় হল, ছেলে তারপর ব্যবসার কাজে এলে বরং তিনি খুশি হন। তাঁর ব্যবসা বাড়ছে, একা সবদিক সামলে উঠতে পারেন না।

কিন্তু কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করার ইচ্ছে ছিল অঙ্কুর। সে প্রস্তাব কেউ উত্থাপনও করেনি। মোটামুটি পাস করেছে সে। তাও করবে ভাবেনি কেউ।

অঙ্কুর কলকাতা যাবার ইচ্ছেটা পড়াশুনার তাগিদে নয়। পান্নাদাকে খোঁজা তার এখনও শেষ হয় নি। শেষ কখনো হবেও না বোধহয়। তার ধারণা, কলকাতায় গেলে একদিন না একদিন কোথাও না কোথাও তার দেখা মিলবে। কিন্তু নিজের অগোচরে এই খোঁজার তাগিদটাও হয়তো গৌণ। এই অন্বেষণ-পর্বের ভিতর দিয়েই একটা পরিবর্তন আসছিল তার মধ্যে, সেটা কেউ জানে না। অমোঘ পদার্পণ ঘটছিল কোনো কিছুর, সে-সম্বন্ধে ও নিজেও সচেতন নয় খুব।

যে অপরাধের শাস্তির ফলে পান্নালাল হারিয়ে গেল, সেই অপরাধ কিছুদিন না যেতে অঙ্কু নিজেই করা শুরু করেছিল। অবশ্য এ-অপরাধের উদ্দেশ্য ভিন্ন। উদ্দেশ্য গান শোনা নয়, আর কেউ যদি শোনার আকর্ষণে এসে থাকে, তাকে খুঁজে বার করা।

যেখানে যে গানের জলসা বা উৎসব হোক, হাফ-প্যান্ট পরা একটা ছেলেকে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছে অনেকে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে অপরিণত বয়সের ভিড় খুব একটা হয় না। অন্তত তখন হত না। অনেকে জিজ্ঞাসা করত, কাকে খুঁজছ খোকা? কেউ বলত, সঙ্গের লোককে পাচ্ছ না বুঝি? কেউ বা বিঘ্নের কারণে বিরক্ত হয়ে নির্দেশ দিত, বোসো চুপচাপ— এখানেই আছে কোথাও গান শেষ হলে পাবে।

পাওয়ার আশায় অঙ্কু নিরাশ হয়েছিল। তবু খোঁজার বিরাম ছিল না। কোথাও আসর হচ্ছে কানে এলেই শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারত না। আসরের সংবাদ বেশির ভাগ কানাইয়ের মারফৎ কানে আসত। তার সঙ্গে অঙ্কুর আর কোনো বিরোধ নেই। আর এ-ব্যাপারে বিভু প্রধান সহায় ছিল তার। পান্নাদাকে ফিরে পাওয়ার আগ্রহ তারও কম ছিল না। তাই পরীক্ষার বছর দু বন্ধু যদি এক-একদিন বেশি রাত পর্যন্ত ঘোষালবাড়ির নীচের কোনো একটা নিরিবিলি ঘরে এক সঙ্গে পড়াশুনা করে আর তারপর একসঙ্গেই ঘুমোয় সেখানে—সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া স্বাভাবিক হোক বা অস্বাভাবিক হোক, বাবাকে আর সেরকম ভয় করত না অঙ্কু। ভিতরে ভিতরে তার এখনো সব থেকে বেশি বিদ্বেষ বোধহয় বাবার ওপরেই। মৃগাঙ্ক গোস্বামীও বোধহয় উপলব্ধি করতেন সেটা, ছেলেকে পড়ানোও ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

বাইরে বাইরে অঙ্কু তেমনি দুর্দান্ত, তেমনি বেপরোয়া। সেদিক থেকে বিচার করলে সর্ব ব্যাপারে তার সহিষ্ণুতা কমে আসছিল দিনকে দিন। নিজের ওপরেই এক ধরনের অফুরন্ত আক্রোশ তার। কারণে অকারণে সেটাই উগ্র হয়ে বাইরে প্রকাশ পেত।

কিন্তু একই কারণে, সঙ্গোপন নিভৃতে বিষম একটা ভাঙা-গড়া চলছিল নিঃশব্দে। এত নিভৃতে যে নিজেও সব-সময় তার হদিস পেত না। অন্যমনস্কের মত গুনগুনিয়ে হঠাৎই সুর টানত এক-একসময়। বিশেষ কোন রাগরাগিণীর নয়, মনের তলায় যে সুরগুলোর নিজের অজ্ঞাতে ছাপ পড়ে গেছে একটু আধটু, তারই অসংলগ্ন দুই-একটা হঠাৎ বেরিয়ে আসত মুখ

দিয়ে। খেয়াল হলে নিজেই হেসে উঠত আবার—কি কাণ্ড!

এই কাণ্ডটা প্রায়ই হত। কখনো আবার সজ্ঞানেই হত। পান্নাদার কোনো বহুবারের শোনা সুর বা কোনো প্রিয় গানের একটু-আধটু মনে পড়ে গেলে সকৌতুকে এক-একসময় অনুকরণের চেষ্টা করত, তার মত হয় কিনা। সেই নীরব অনুকরণ নয়। হাত-পা-মুখ বিকৃত করেও নয়। স্বর আর সুরের প্রয়াসে।

হাসত আবারও।

কখনো মনে হত স্বর আর সুর দুটো দুই রাস্তায় চলেছে, একটুও যোগ হচ্ছে না। কখনো বা মনে হত, একেবারে হচ্ছে না তা নয়। কান খাড়া রেখেই নিজের সুরটা শুনতে চেষ্টা করত। কখনো ভাবত, কি বিচ্ছিরি। কখনো মনে হত, খুব বিচ্ছিরি নয় যেন। সঙ্গীতের আসরে একজনকে খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে কান দুটোও সজাগ হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। কানে লাগলে খোঁজা ভুলে চুপচাপ শুনত কিছুক্ষণ, বুঝত না অবশ্য। কত রকমের কত কি ব্যাপার। জয়জয়ন্তী, বেহাগ, কালেংড়া, পুরবী, বাগেশ্রী, নটবাহার, শঙ্করা, কানাড়া, মালকোশ—। সবই দুর্বোধ্য, কোনটার সঙ্গে কোনটার তফাৎ ঠাহর হত না। কিন্তু সব কিছু বিশ্লেষণ করা ছেলেবেলার স্বভাব। কোনটা কি? বেহাগ কি? বাগেশ্রী কি? শঙ্করা কি কানাড়া কি?

শহরের কলেজে ভর্তি হওয়ার ফলে আর নিজস্ব সাইকেল হওয়ার ফলে খোঁজার পরিধি বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে কোনটা কি আর কোনটা কেন এই প্রশ্নের তাগিদও। শহরের প্রায় সব কটা লাইব্রেরী ঘাঁটল একে একে। তার সঙ্গীত-গবেষণার খেয়াল দেখে বিভু হাসত। গোগ্রাসে কিছু একটা বই পড়তে দেখলেই বুঝত, সে বই গান প্রসঙ্গে। কিন্তু পড়া শেষ হবার সঙ্গেসঙ্গে বিরক্তির একশেষ অঙ্কুর। কিছুই বোধগম্য হবার নয়, সব দুর্বোধ্য।

কলেজের প্রথম বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় বছর চলছে। এর মধ্যে কটা দিন সে পড়ার বই খুলেছে হাতে গোনা যায়। বিভুর তাগিতে পড়তে বসে যে-দিন, দুজনেরই পড়া পণ্ড। এমনি সময় একদিন খবর পেল, সিরামপুরের কোন এক মস্ত বড়লোকের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিরাট আয়োজন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে নামজাদা সব শিল্পীরা আসছেন সেখানে। মফঃস্বল শহরে এতবড় আয়োজন আর বড় হয় নি।

অঙ্কুর ভিতরে ভিতরে নতুন করে নাড়াচাড়া পড়ল একটা। নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা। কিন্তু সিরামপুর তো সাইকেলে মেরে দেবার মত ঘরের কোণে নয়, আর আসরও একদিনের নয়। সে যাবে। তার না গেলেই নয়। এতবড় আসর শুনেও পান্নাদা আসবে না?

কিন্তু সবদিক বজায় রেখে যায় কেমন করে সে। সন্ধ্যার ট্রেনে গিয়ে সকালের ট্রেনে ফিরতে হয়। সাইকেল অবশ্য ব্যবস্থা করে স্টেশনেই রাখা যেতে পারে। তাও একদিনের ব্যাপার হলে কথা ছিল। দেখা না মিললে তো সব কদিনই যেতে হবে। গোপন থাকবে কেমন করে...। বাবাকে এখন আর সে ভয় করে না আদৌ, কিন্তু এ নিয়ে শোরগোল হোক, তাও চায় না। যত দিন এগিয়ে আসছে, বিভুও চিন্তিত। অঙ্কুর যাওয়া দরকার, কিন্তু মৃগাঙ্ক জ্যাঠার চোখে ধুলো দিয়ে যাবে কেমন করে সেটাই সমস্যা।

সেই বিশেষ দিনটিতে প্রায় লাফাতে লাফাতে অঙ্কু এসে বিভুর পড়ার বই-পত্র সব ঠেলে

সরিয়ে দিল। এমন আশ্চর্য যোগাযোগ আর হয় না, খোদ ভগবানের কারসাজি যেন। মায়ের মুখে অঙ্কু এইমাত্র শুনে এলো, তার বাবার অনেকদিনের পুরনো এক যজমান বন্ধু কি এক জরুরী ব্যাপারে বাবার শরণাপন্ন। আজই বাইরে যাচ্ছেন তিনি, ফিরতে দিন কয়েক দেরি হওয়াই সম্ভব।

শুনে বিভূরও মনে হল, এবারের অন্বেষণ সার্থক হলেও হতে পারে, নইলে অদৃষ্ট এত প্রসন্ন কেন? অঙ্কুর সঙ্গে তারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এদিকে বাবাও বাইরে—ব্যবসায়ের চাপে সপ্তাহের বেসির ভাগ দিনই বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। ওদিকে মৃগাঙ্ক জ্যাঠাও থাকবেন না, এ-ভাবে ঘরবাড়ি ফেলে যাওয়া উচিত নয়।

অঙ্কু যে গাড়িটায় যাবে ভেবেছিল, সেটা ধরা গেল না। পরের গাড়ি ধরতে হল। ফলে আসরে যখন পৌঁছল, তখন গান আরম্ভ হয়ে গেছে। মস্ত সমারোহের ব্যাপার। বাইরের প্রশস্ত আঙিনা ঘেরাও করে তাঁবু খাটানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কতজন থাকবেন ঠিক নেই অবশ্য, কিন্তু আপাতত শ্রোতার সমাগম কম হয়নি। ঠাসাঠাসি ভিড়।

কোন্ দেশের কোন্ গুণী গাইছেন ঠাওর করতে না পারলেও ভিড়ের মধ্যে মিশে অঙ্কু কান পেতে শুনল খানিকক্ষণ। কোন্‌টা কোন্ রাগ বা রাগিণী এখন শুনলে বুঝতে পারে। শঙ্করার গমক চলছে। বীর-রসের গান, জোরদার ব্যাপারই হওয়ার কথা একটু। কিন্তু অঙ্কুর ভালো লাগছে না. শুদ্ধ ব্যাকরণ কসরৎ কেমন যেন ঠাস ঠাস করে কানে লাগছে তার, প্রায় রূঢ় লাগছে। যে যতবড় ওস্তাদই হোন, সুর কানের ভিতর দিয়ে বুকের দিকে না এগোলে অঙ্কুর ভালো লাগে না।

ভিড় ঠেলে অঙ্কু এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। সন্ধানী দৃষ্টিটা সজাগ হয়ে উঠল তার। একটু করে সামনে এগোয় আর চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

ওই পান্নাদা না?

না...।

ওই যে, ও কে চাদরে মুখ ঢেকে বসে?

নাঃ...।

হঠাৎ একজনের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে অঙ্কু নিস্পন্দ কাঠ একেবারে।

একাগ্র অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনিও ঘুরে খুঁজছিলেন কাউকে। সামনা-সামনি দেখা।

অঙ্কুর বাবা। মৃগাঙ্ক গোস্বামী।

দুজনে দুজনকে দেখে হতভম্ব খানিকক্ষণ। পিছনের থেকে সরে যাবার তাগিদ আসতে হুঁশ ফিরল। মৃগাঙ্ক গোস্বামী একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না। একটা কথাও বললেন না। ছেলেও কোন্ তাগিদে এসেছে এক-নজর দেখেই বুঝেছেন। ওর সামনে নিজের এতদিনের চাপা দুর্বলতা সত্ত্বেও স্থির শান্ত তিনি। নিঃশব্দে সরে এলেন সেখান থেকে।

আসরের এক কোণে অঙ্কু চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তার বুকের মধ্যে অনেক দিনের পুঞ্জীভূত

একটা বিদ্বেষের পাথর দ্রবীভূত হতে শুরু করেছে।

সেটা সম্পূর্ণ তরল হয়ে গেল সাত-আট মাস বাদে আর একদিন।

অন্ধু তেমনি গড়িয়ে গড়িয়ে আই-এ পাস করেছে। বি-এ পড়ছে। বিভুও। তার ধারণা, পড়াশুনা করলে অন্ধু তার থেকে অনেক ভালো পাস করত। কিন্তু কি করলে কি হত অন্ধু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

রাতের অন্ধকারে সবে দিনের আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল। কেন জানি সেদিন আগেই ঘুম ভেঙেছে মৃগাঙ্গ গোস্বামীর। কদিন ধরে ঘুমের ঘোরে তিনি যেন একটা পরিচিত বাজনা শোনেন, কোথা থেকে একটা সুর যেন কানে ভেসে আসে। পরে ভাবেন, ভুল। কানের ভুল, মনের ভুল।

কিন্তু সে-দিন তো জেগেই আছেন তিনি। আজকের বাজনার রেশ আর সুরের রেশ তো ভুল নয়, স্বপ্ন নয়। ধড়মড়িয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে এলেন। বাজনা আর সুর আরো স্পষ্ট। নীচে, ওই পান্নার ঘরেই মনে হল।

নীচে নেমে এলেন। না, ভুল নয়। ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতরে তানপুরার গুরুগম্ভীর গঙ্ গঙ্ শব্দ। এ-কবছরে পান্নার গলাটাও বদলে গেছে নাকি?

হঠাৎ সজোরে দরজায় ঘা দিলেন তিনি।—পান্না এলি? দরজাটা খোল্—

বাজনা বন্ধ হল। গান থেমে গেল। দরজা খুলল।

পান্না নয়, ছেলে। অন্ধু। মেঝের মাদুরের উপর মস্ত তানপুরা একটা।

তিনি জানতেন না, কেই জানত না, এ ক'বছর কেমন করে কেটেছে। কোন্ সাধনায় কেটেছে। শুধু বিভু জানত। বিভু জানে, কলেজের পর শহরের কোনো বাড়ির ছোট ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে পড়ানোর বিনিময়ে গানের ওস্তাদ সংগ্রহ করেছিল অন্ধু। শুধু বিভু জানে, কোন্ তাগিদে কত জায়গায় কত করে ধরণা দেয় সে।

আর জানে কুমোরপাড়া আর মাহিষ্যপাড়ার মেয়ে- পুরুষেরা। জঙ্গলের ওধারের নিম-বেল-কাঁঠালে ঘেরা এক পড়ো কুটির থেকে ছুটির দিনের সকাল সন্ধ্যায় সুরের আলাপ কানে আসত তাদের। শুধু ছুটির দিনে নয়, এমনি দিনেরও অনেক দুপুরে, অনেক সন্ধ্যায়, অনেক রাতে গানের মহড়া শোনে তারা । প্রথম প্রথম ভিড় করে দেখতে আসত সকলে। ভাবত বামুনের ছেলেটা পাগল হয়ে গেল। কিন্তু এখন আর সে-রকম ভাবে না তারা। বিস্মিত হয়, কিন্তু এটা যে সাধনা তা উপলব্ধি করতে পারে।

সেখানে তানপুরা আছে, তবলা আছে। মাঝে মাঝে তবলা বাজানোর জন্যে কাউকে ধরে নিয়ে আসে অন্ধু। তাছাড়া গানের জন্যে তবলাও শেখে নিজে। কিন্তু তার সকাল-ছোঁয়া রাতের সাধনার তাগিদ বাড়ছিল ক্রমশ। রাত থাকতে উঠে কতদিন ছটফট করেছে ঠিক নেই। তাছাড়া বর্ষা আসতে সেই নির্জন কুটিরে যাতায়াতে ছেদ পড়ছিল প্রায়ই।

দিন কয়েক আগে সকল দ্বন্দ্বের অবসান করে দিয়েছে। বাড়িতে নতুন তানপুরা এনেছে আর একটা।...বাবা জানবে, সকলেই জানবে। জানুক।

মৃগাঙ্ক গোস্বামী বোবার মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক নেই। চুপচাপ দোতলায় উঠে গেছেন এক সময়।

একে একে আরো দুটো বছর গড়িয়েছে। বিভু কলকাতায় এম. এ. পড়তে এসেছে। অঙ্কুও এসেছে। কিন্তু সে কেন এসেছে সে-ই জানে। অঙ্কু এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয় নি। বিভুর সঙ্গে এক মেসে এক ঘরেই থাকে। কিন্তু কি করে সমস্ত দিন, ছন্নছাড়ার মত কোথায় কোথায় ঘোরে—বিভুও সঠিক হদিস পায় না।

কলকাতায় এসে প্রথমেই অনুর খোঁজ করেছিল বিভু। সেই কবে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে প্রথম প্রথম দুই-একটা চিঠি লিখেছিল অনু। বিভুও লিখেছিল। তারপর দেশে থাকতেই শুনেছিল, অনুরা কলকাতা ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে—তার দাদা বাইরে ভালো চাকরি পেয়েছিল। যদি আবার ফিরে থাকে সেই আশায় খোঁজ করা। খোঁজ নিয়ে জেনেছে তারা বাইরেই আছে—কলকাতায় ফেরে নি।

ছয়

একটানা দু বছর ছোট-বড় অনেক ওস্তাদের দোরে ঘুরে বেড়াল অঙ্কু। ছোট ওস্তাদেরা নিজেদের ছোট ভাবে না, আর বড় ওস্তাদেরা বেশির ভাগই নাগালের বাইরে। তবু অঙ্কু এদের অনেকের নাগাল পেয়েছে। মন কারো পায়নি। সে গান চেয়েছে। গানের ভিতর দিয়ে গুরুর মনের ছোঁয়া পেতে চেয়েছে। পেলে তার ধৈর্য পুষ্ট হতে পারত, নিষ্ঠা আরো অবিচলিত হতে পারত। মন মেলে না। যে গান চায় সেই গানও মেলে না। হৃদয়ের দিকটা বড় নিঃস্ব মনে হয়েছে সকলেরই। যে-সব ওস্তাদদের সে সসম্ভ্রমে ঈর্ষা করত, সুরলক্ষ্মীর অপার করুণার পাত্র ভাবত যাদের—কিছুদিন বাদেই মনে হত, বস্তুতন্ত্রীয় ঘাত প্রতিঘাতে ভিতরে ভিতরে তারাও হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। সদা সংশয়, সদা ভয়—যশ আর খ্যাতির ভিতটা কবে জানি নড়েচড়ে ওঠে। তাই সাধনার থেকে তাদের আড়ম্বর বেশি, দানের থেকে চাহিদা বেশি।

শিষ্যরা আর ভক্তরা যেন প্রচার-সচিব তাদের। গুরু গুণপ্রচারের যন্ত্র কিন্তু অঙ্কুর বেলায় এই যন্ত্র তালে বাজে না সর্বদা। তাই বিচ্ছেদ ঘটে। আর্থিক সংগতি থাকলেও কথা ছিল। সকাল বিকেল ছেলে পড়িয়ে মেসখরচ চালাতে হয় যা·', তার মাথা উঁচিয়ে চলাটাই তো অবিনয়। তার ওপর বেশি প্রত্যাশা স্পর্ধা ছাড়া আর কি! এই স্পর্ধাটাই মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে ওঠে অঙ্কুর ব্যবহারে। মাত্র বাইশ তেইশ বছর বয়েস। একরোখা স্বভাবের আগুনে জল ঢেলে গাঁ ছেড়ে শহরে বাস করতে আসেনি। শহরের হৃদয়শূন্য উদাসীনতায় সেই আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছে আরো।

তাড়না বেশি। ফলে চাহিদাও বেশি। স্বভাব-ই তখন নিজের যোগ্যতার প্রশ্ন মনে আসে না। আসবে কি করে, পয়সাওলা আরো বেশি অযোগ্য লোকের প্রতি শিক্ষাগুরুর কৃপাদৃষ্টি লক্ষ্য করে। তাদের সামান্য কেরামতিতে গুরুর প্রশংসার দাক্ষিণ্য দেখে। শেষের দিকে একটানা প্রায় বছর খানেক সে লেগে ছিল একজনের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। এক নামজাদা

ওস্তাদের ঘরোয়ানার খ্যাতি গলায় ঝুলিয়ে বেড়ান। ভক্তের সংখ্যা যত না, স্তাবকের সংখ্যা তার চতুর্গুণ। কয়েকটি পয়সাওলা শিষ্য সংগ্রহ করেছেন। নিজে করেননি, অনুগতরা করে দিয়েছে। অঙ্কু অনিয়মিত পয়সা-কড়ি যা দেয় তা নামমাত্র। কিন্তু কাজ যা করে দেয় তার হিসেব ওস্তাদ না রাখলেও সে রাখে। ঘরের কাজ করে দিতে হয়, যোগাযোগের ব্যবস্থায় ছুটাছুটির ফলে ছেলে পড়ানো কামাই করতে হয়, গানের আসরে কুলীর মত তাকে ওস্তাদের বাজনা বইতে হয়, নিয়ে আসতে হয়।

ফলে অঙ্কুরও বায়না বেড়েই চলে। এটা দিন ওটা দিন করে। বলে, সেই কবে মুখ দিয়েছেন আজও বিস্তার দিলেন না, আস্থাই দিলেন তো অন্তরা দিলেন না।

স্বল্প পুঁজির ওস্তাদ নয় শুধু, বড় পুঁজির গুরুরা পর্যন্ত দাবি জানালে বিরক্ত হন। এই ওস্তাদটি একদিন অপমান করে বসলেন তাকে। তাঁর দিন কয়েক আগের এক ব্যবহারে অঙ্কুর ভিতরটা তিক্ত হয়েই ছিল। পয়সাওলা ছাত্রকে যখন শেখাচ্ছিলেন, অঙ্কু কাছে বসে মন দিয়ে শুনছিল। খানিক বাদে সেই ছাত্রের সামনেই তাকে উঠে যেতে বলা হয়েছিল। সেই রাগ অঙ্কু ভোলেনি।

সেদিন মুখ আর বিস্তার, আস্থাই আর অন্তরার অনুযোগ করতে হাসিমুখে ওস্তাদটি স্তাবক ভক্তদের এক গল্প শোনালেন। কোনো নামজাদা গুরুর শিষ্য ঠিক এমনি করেই 'চীজ'-এর জন্য গুরুকে উত্ত্যক্ত করত। সেই গুরুটি ছিলেন রাশভারী মানুষ, তাঁর হুকুম অমান্য করার জো নেই। বিরক্ত হয়ে তিনি শিষ্যকে বিলম্বিত লয়ে আস্থাই দিলেন—তাঁর বাণী, 'হাম শালা বঢ়ে গাধ্যা'—বললেন, আগে এই আস্থাই ঠিক করে নে, পরে অন্তরা দেব। শিষ্য কি আর করে, গুরুর হুকুম, নিষ্ঠাসহকারে দরদ ঢেলে মাথা ঝাঁকিয়ে ও-ই গায়, 'হাম শালা বঢ়ে গাধ্যা'। তা তিনিও অঙ্কুকে এই রকমই কিছু একটা দেবেন ভাবছেন এইবার।

ভক্তরা সব হেসে সারা। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। অর্থাৎ বেশি চাহিদার উচিত জবাবই হয়েছে বটে।

অঙ্কুর ধৈর্য গেল। বলে বসল, ওস্তাদজী, সুরে শালা বলতে পারলেও খারাপ লাগবে না, কিন্তু বেসুরে যদি আপনাকে মহারাজা বলি তাহলে আপনি ওই শালার থেকে খুব ভালো কিছু শুনবেন না হয়ত। বেসুরে মহারাজা বলার থেকে সুরে শালা বলাটা অন্তত শেখান।

বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু গর্হিত উক্তি নয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করার মেজাজ কারও থাকল না। ওস্তাদ তখনি ঘরের দরজা দেখালেন তাকে। দেখানো হবে অঙ্কু যেন তা জানত। তখনি উঠে দাঁড়াল। খুব ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনার এই বাজনা-টাজনাগুলো যদি এখানে আছড়ে ভেঙে আপনার এই ভক্তদের আর একটু আনন্দ দিই, আপনার নতুন করে আবার সব করাতে অসুবিধে হবে?

ওস্তাদ স্তম্ভিত। ভীতও। অবাক হয়ে দেখলেন, ভক্ত শিষ্যরাও সব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে আছে। সাহস করে কেউ একটা পাল্টা হুমকি পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারছে না।

অঙ্কুর ভিতরটা ক্রমে শুকিয়ে আসছে, খরখরে হয়ে উঠছে। চিরাচরিত অসহিষ্ণুতায় জ্বলে

জ্বলে নিজেকেই দহন করছে। প্রকৃতি যেমন করে একসময় আপন আগুনে নিজেকে জ্বালায়। শুকনো, বিশীর্ণ করে তোলে। জঞ্জাল পোড়ায়। নদী শুকোয়, মাঠ শুকোয়, দিগন্তে তপ্ত হল্কা ছোটে, তেমনি। নিজের অগোচরে অনেক জঞ্জাল সে-ও পোড়াচ্ছে হয়তো। কিন্তু সেটা সে টের পাচ্ছে না। দহনের জ্বালাই অনুভব করে শুধু। জ্বালাময় শুষ্কতার টানে নদী বন মাটি, সমস্ত প্রকৃতি যেমন তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, তেমনি আকণ্ঠ তৃষ্ণার জ্বালা তার। কিন্তু প্রকৃতির এই রীতির পরে তৃষ্ণা মেটানোর অবধারিত অধ্যায়ও আছে একটা। বর্ষণ নামে। তৃষ্ণা দূর হয়। প্রকৃতি ভরে ওঠে, তার জঠরে সৃষ্টির কাঁপন লাগে, পূর্ণতার মায়ামন্ত্রে সে স্থির হয়, শান্ত হয়।

কিন্তু অন্তু কি পেল। দাহনান্তে তার নিভৃতে কোনো সুরের বর্ষণ নেই, বর্ষণের আশাও নেই। এই তৃষ্ণার অধ্যায়টাই বুঝি জীবনের শেষ অধ্যায়।

তার চাল-চলন, রকম-সকম ভালো লাগে না বিভুর। অনেক দিন সে রাতে ফেরে না, বিভু রাত জেগে বসে থাকে। সে বিরক্ত হয়। এক একসময় বলেও বসে কিছু। অন্তু তাও বরদাস্ত করতে পারে না। টাকা পয়সার ব্যাপারে অনেক সময় বিভুর সাহায্য নিতে হয় বলে তার কথা আরো তিক্ত মনে হয়। দু জনের মাঝে প্রচ্ছন্ন একটা ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে।

বিভু বলতে গেলে এখন কিছুটা সন্দেহের চোখেই দেখে ওকে।

তার কারণও আছে। ঘটনাটা গোড়ায় সে অন্তুর মুখেই শুনেছিল। সংশয়ের সেটাই প্রাথমিক উৎস বিভুর।

এক বনেদী বড়লোকের বাড়িতে ছেলে পড়াত অন্তু। মাইনে সেই দিনে মোটামুটি ভালো ছিল বলেই যে একটানা কিছুকাল সেখানে লেগেছিল তা নয়। তার অনিয়মে এখানকার চাকরিটা যায়নি বলেই লেগে ছিল। ছেলের মাস্টার একজন দরকার বলে মাস্টার আছে— পরীক্ষায় ভালো ফল দেখাতে হবে বলে নয়। ও-বাড়িতে পাস-ফেল কখনো বড় হয়ে ওঠেনি, বাড়ির কর্তারও না, ছেলেরও না। তাই টিকে থাকতে পেরেছিল সে।

ছাত্রটি একদিন কোনো একটা ছোট অনুষ্ঠানে অন্তুর গান শোনার সুযোগ পেল। এর আগে সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি নীরস গম্ভীর এই মানুষটার মধ্যে গান আছে, সুর আছে। সকলে এক বাক্যে মাস্টারের প্রশংসা করেছে আর সে শুধু অবাক হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক সেই দিনই ঘুচেছে বলা যেতে পারে। সে এলেই প্রথমে এক দফা গানের গল্প ওঠে। অন্তু গোড়াতে ছাত্রের সঙ্গে এই আলাপে আদৌ উৎসাহ বোধ করেনি. কিন্তু যখন শুনল অমুক গানের বাড়ির কর্তাটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার বাবার, এবং সপ্তাহে কম করে চার পাঁচ দিন সেই বাড়িতে আড্ডা দিতে যান তিনি— তখনই তার আগ্রহ দেখা গেল।

গানের বাড়ি বলতে বনেদী সংগীত রসিকের বাড়ি। পুরনো কলকাতার নামজাদা ঘর, বাইরের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে কলকাতায় এলে ওই বাড়ির অতিথি হন। গানের আসর বসে। সংগীতানুরাগী মাত্রেরই ওই গানের বাড়ি জানা আছে। কিন্তু সেখানে প্রবেশের দরজা সকলের জন্য অবারিত নয়. কোনো বড় গুণীর শুভাগমন ঘটছে জানলে চেনা জানা লোকের ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয়।

ছাত্রটি সোৎসাহে তার বাপের কাছে মাস্টারের গানের গল্প করেছে। বলা বাহুল্য তার

প্রশংসা বিস্তারে অতিশয়োক্তি ছিল। ছিল কারণ, সাদামাটা গাইয়ে শুনলে বাবা উৎসাহ বোধ করতেন না। মাস্টারের এই গুণ আবিষ্কারের গৌরব যেন তারই। ছাত্রের বাবা ভদ্রলোকটি সদালাপী, মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি হাবভাব। কথা বলার থেকেও কথা শুনতে ভালবাসেন। কি কারণে ছাত্রের এই আবিষ্কারের কিছুদিন আগেই ভদ্রলোকের তার সঙ্গে আলাপ করার বাসনা হয়েছিল, অঙ্কু জানে না। তার সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছেন। কোথায় থাকে, বাড়ি কোথায়, আর কি করে ইত্যাদি। তার পরেও তাকে যে মাঝে সাঝে লক্ষ্য করতেন ভদ্রলোক তাও অঙ্কুর অগোচর নয়। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে ভদ্রলোকের বুঝি আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ফলে ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তিও বোধ করেছিল অঙ্কু। কারণ মাস্টারের দায়িত্ব সেও কখনো যথাযথ পালন করেনি।

গানের খবর শুনে ভদ্রলোক ঘরে এসে চেয়ার টেনে বসলেন একদিন। ছেলের সামনেই গানের আলোচনা শুরু করে দিলেন। কতদিন গাইছে, কি গাইছে, গানের ওস্তাদ কে, ইত্যাদি। অঙ্কু তেমন করে বলেনি, তবু তার মর্মবেদনার আঁচ ভদ্রলোক একটু পেলেন বোধ হয়। এরপর তবলচি ডাকিয়ে এনে বাড়িতেই একদিন তার গান শোনার ব্যবস্থা করলেন।

সঙ্কট দশায় লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, এই মুরুব্বি তো তখন তার কাছে এক প্রকাণ্ড আশার কাণ্ড বিশেষ। গান শুনিয়ে অঙ্কু তাঁকেই মুগ্ধ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু মুগ্ধ হলেন কি না ঠিক বোঝা গেল না। তিনি তেমন কিছু মন্তব্য করলেন না। এর কারণও পরে অনুমান করা গেছে। গানের বাড়িতে ভদ্রলোকের শ্রোতার ভূমিকা। বেশি প্রশংসা করে ফেলে পরে ঠকতে হতে পারে ভেবেই মন্তব্য স্থগিত রাখলেন। শুধু বললেন, শিগগীরই একদিন তিনি তাকে গানের একজন বড় সমঝদারের কাছে নিয়ে যাবেন।

গানের বাড়িতে ঢোকার সেই প্রথম ছাড়পত্র পেল অঙ্কু। ভদ্রলোকের প্রতি অর্থাৎ ছাত্রের বাবার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ইতিমধ্যে অনেক আশাহত দুঃখের কথাই অঙ্কু তাঁকে বলে ফেলেছিল। গানের বাড়ির মালিক তাকে গানের ফরমাস করলেন। একটা একটা করে গোটাকয়েক গান শুনলেন। তারপর বললেন, লেগে থাকলে হবে, গলা ভালো। তিনি মাঝে মাঝে আসতে বললেন তাকে।

অঙ্কুর খুশি ধরে না। এই যোগাযোগ যেন সুরললনার সদয় ইশারার মত। কিন্তু কদিন না যেতে ছাত্রের বাবার এক প্রস্তাব শুনে সে হতভম্ব। ছাত্রটি সেদিন পড়তে এলো না। তার বদলে তার বাবা এলেন। বললেন, ছেলে কোন আত্মীয়ের বাড়ি গেছে। পরে অঙ্কুর মনে হয়েছে, আত্মীয়ের বাড়ি যদি গিয়েও থাকে, তাকে ছল করে পাঠানো হয়েছে।

গানের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, তাঁর সঙ্গীত-সমঝদার বন্ধু অঙ্কুর গানের খুব প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু কোনো বড় ওস্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া দরকার, নইলে কিছুই হবে না। বন্ধুর মারফৎ এই যোগাযোগের ব্যবস্থা অবশ্য তিনি অনায়াসেই করে দিতে পারেন। কোন্ বড় গাইয়ে বাজিয়ে তাঁর বন্ধুর বাড়ির নুন খায়নি?

অঙ্কু আশায় আনন্দে নির্বাক। ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ হলে তখুনি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলত বোধহয়। বলল, আপনার অনুগ্রহ পাব এই ভরসাতেই আছি, নইলে আর কিছু হবে না।

তিনি বললেন, ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে আর একটি কাজে রাজি হতে হবে।

একটা ছেড়ে দশটা কাজে রাজি সে। অধীর, জিজ্ঞাসু।

ভদ্রলোক গলা খাটো করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কত মাইনে পাচ্ছ?

তিরিশ...।

তার থেকে আরো বেশি পাবে, ধর পঞ্চাশ পাবে। আর এক জায়গায় তোমাকে পড়াতে হবে। বেশিদিন নয়, এই মাস ছয়েক, ম্যাটিক পরীক্ষা পর্যন্ত।

অঙ্কু আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সেই দিনে পঞ্চাশ টাকা মাইনে একটা বড় চাকরি বলা যেতে পারে। তখুনি ঘাড় নাড়ল, সে পড়াবে।

ভদ্রলোক প্রীত মুখে হাসলেন।— তোমার সেখানকার ছাত্রীটি কিন্তু এখানকার ছাত্রের মত নয়। খেটেখুটে পড়িয়ে পাস করিয়ে দিতে হবে। পাস করবেও, খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।

আনন্দের পরে বিস্ময়ের পর্ব! অঙ্কু ধাক্কা খেল একটু। ছাত্র নয়, ছাত্রী—এবং তার পাস ফেলেব ব্যাপারে ভদ্রলোক উদাসীন নন আদৌ। এই প্রথম মনে হল, প্রস্তাবটা ভদ্রলোক যেন কিছুটা সংগোপনে পেশ করছেন তার কাছে। সশঙ্কে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি আপনার কোন আত্মীয়া নাকি?

হ্যাঁ, মেয়েই বলতে পার।...কিন্তু এখানে তো তাহলে তোমার পড়ানো চলবে না, ওই মেয়েটিও রাত্রিতেই পড়বে। এখানে আমিই যা-হোক কিছু বলে দেব, তুমি কিছু বোলো না। ছমাস বাদেও তোমার চাকরি যাবে না, এখানেও পড়াতে পার, পাস করার পরেও ওই মেয়েটির আরো পড়াশুনা করার ইচ্ছে আছে।

সেই দিনই অঙ্কুকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরুলেন তিনি। কিছু দূরে উত্তর কলকাতারই একটা ছোট বাড়ির দরজায় নামলেন। তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে নিজে ভিতরে চলে গেলেন। মিনিট পনের বাদে একটি মহিলাকে সঙ্গে করে ফিরলেন। মহিলা রূপসী তেমন নয়, তবে শ্রীশূন্যও নয়। বছর চল্লিশ হবে বয়স। ঈষৎ গম্ভীর, দৃষ্টি গভীর। একেই পড়াতে হবে ভেবে অঙ্কু মনে মনে ঘাবড়েই গেল।

ভদ্রলোক বললেন, এঁর মেয়ে পড়বে। আসছে।

মহিলা দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করল মাত্র। বেশির ভাগ সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তাকে। কথা ভদ্রলোকই বলে গেলেন। বেশির ভাগই অঙ্কুর প্রশংসা। এত ভালো মাস্টার হয় না, কত সাধারণ ছেলে মেয়ে তার হাতে পড়ে উৎরে গেছে, আর ভবিষ্যতে কত বড় গায়ক হবে, ইত্যাদি।

ছাত্রী এলো। নমস্কার করল। মায়ের আদলের চেহারা। বয়স কম বলে আর একটু ভালো দেখায়। বছর আঠারো উনিশ হবে বয়স। মায়ের মতই একটু গম্ভীর এবং ধীর স্থির মনে হলো তাকে। পড়শুনার কথাই উঠল। কোনো ইস্কুলে পড়ছে না। বাড়িতে পড়ছে। প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। ছেলেবেলা থেকে স্কুলের এক বৃদ্ধ শিক্ষক তাকে পড়াতেন, সম্প্রতি তিনি মারা যেতে অসুবিধে হয়েছে।

তিনি মারা যেতে অঙ্কুর সুবিধে হল কি অসুবিধে হল সঠিক বুঝে উঠছে না। সারাক্ষণ বসে বসে সে কেবল এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করল। শেষে পড়ানোর সময় ঠিক করে উঠল একসময়। ভদ্রলোক থেকে গেলেন।

ব্যাপারটা সহজও আবার জটিলও। সব শুনে বিভু তাকে পরামর্শ দিল সরে আসতে। অঙ্কুর দ্বিধা দেখে রাগ করল, ব্যাপারটা বুঝছিস না তুই! ভালো চাস তো ও রাস্তাই আর মাড়াবি না বলে রাখলাম।

কিন্তু অঙ্কুর সামনে তখন আর এক প্রলোভন। গানের বাড়ির সংস্রবে এসে হতাশার মরুভূমিতে সে আশার আলো দেখেছে। সেই আলো মরীচিকার মতই মিলিয়ে যাবে? কি হবে ওই মেয়েকে পড়ালে, কি ক্ষতি হতে পারে তার? বিভুটাকে বলাই ভুল হয়েছে, না বলাই ভালো ছিল তার। যত ভাবল, ততো এই সুয়োগ বাতিল করাটাই বাতুলতা মনে হল তার। বিভুকে আর কিছু বলল না। কিন্তু সে বুঝে নিল। আর মনে মনে বিরূপও হল।

মেয়েটির নাম লক্ষ্মী। কিন্তু নামের সঙ্গে স্বভাবের সত্যিই মিল নেই। চঞ্চলা বা চপলা নয়। এই বয়সেই বরং একটু বেশি গম্ভীর। তার থেকেও বেশি গম্ভীর অঙ্কু। পড়ানোর সময় গোড়ায় গোড়ায় কিছুদিন তার মা এসে বসত। বসে হাতের কাজ করত, আর পড়ানো শুনত। কিন্তু শোনার ভাবটা গোপন করতে চেষ্টা করত। মেয়েটির পড়শুনায় আগ্রহ আছে। বুদ্ধিমতীও। কোনো প্রসঙ্গ না বুঝলে মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকে। তাই থেকেই অঙ্কু বুঝে নেয়, পাঠ স্পষ্ট হয়নি। আবার বোঝাতে বসে।

সেই ভদ্রলোক, অর্থাৎ অঙ্কুর মরুব্বিটি প্রায় রোজই আসেন। তার খানিক আগেই লক্ষ্মীর মা উঠে যায়। ভদ্রলোকের গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ কানে এলেই অঙ্কু অস্বস্তি বোধ করে কেমন। এই অস্বস্তি লক্ষ্মীও আঁচ করে থাকবে। কারণ তাব মুখখানা তখন আরো একটু গম্ভীর দেখায। অঙ্কুর দুঃখ হয় এক একসময়। সামাজিক মর্যাদার কোন্ স্তরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি ভালই অনুভব করে বোধ হয়। ওদিকে ভদ্রলোকের কথা ভেবেও মনে মনে অবাকই হয় অঙ্কু। তাঁর নাম রাজেশ্বর মল্লিক, বিত্তের সঙ্গে এখনো এই নামের কতটা মিল আছে অঙ্কু জানে না, কিন্তু চেহারার সঙ্গে মিল আছে। এই বয়সেও রূপবান, ঘরে রূপসী স্ত্রী। অথচ যাব আকর্ষণে তিনি আসেন এখানে, তাকে বড় জোর সুশ্রী বলা যেতে পারে। শুধু তাই নয়। নিজের ঘরসংসারের প্রতি ভদ্রলোকের কোনোরকম টান লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এখানকার ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা করেন। ভাবেন। অঙ্কুর সঙ্গে তিনি কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা করেন এখন। দেখা এবং কথা হয় গানের বাড়িতে। অঙ্কু প্রায়ই যায় সেখানে, তিনিও যেতে বলেন। লক্ষ্মীর পড়াশুনা কেমন হচ্ছে খবর নেন। যত্ন নিয়ে পড়াতে অনুরোধ করেন। এই উপকারের বিনিময়ে সে কিছু পাবে ঘুরিয়ে এই আশ্বাসও দেন।

অঙ্কু বিব্রত বোধ করে। আর মনে মনে কিছুটা সচকিত হয় রাজেশ্বরবাবু যখন লক্ষ্মীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। এমন মেয়ে হয় না, এই বয়সে যেমন ধীর স্থির, তেমনি বুদ্ধিমতী। দিনরাত কেবল পড়া আর পড়া। ভিতরের ঘরে বই বোঝাই, মাসে কত টাকার বই কেনে ঠিক নেই। বাজে গল্প উপন্যাস নয়, ভালো ভালো বই। অঙ্কু মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে,

প্রশংসার পিছনে উদ্দেশ্যের ছায়া পড়ছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করে।

এই এক ব্যাপার নিয়েই বিভুর সঙ্গে মনোমালিন্যের সূত্রপাত। মেসে ফিরতে অঙ্কুর রাত হয় প্রায়ই, কোনো কোনো দিন ফেরেই না। গানের বাড়িতে হাজিরা দেওয়াটা প্রায়ই নেশায় দাঁড়াচ্ছে। লক্ষ্মীকে পড়িয়ে সোজা সেখানে চলে যায়। যদি কোনো গুণীর পদার্পণ ঘটে থাকে, যদি কোনো আসর বসে। তাছাড়া ঘরোয়া গান সেখানে প্রায় রাত্রিতেই হয়। একটু বড় আসর বসলে রাতে আর ফেরাই হয় না। সংগীত ভক্ত গৃহস্বামীটিরও কিছুটা স্নেহভাজন হয়ে উঠেছে সে। তিনিও আশা পোষণ করেন, কালে দিনে অঙ্কু বড় গাইয়ে হয়ে উঠতে পারে।

মেসে ফেরা বা না ফেরার ব্যাপারে আগেও এ-রকম অনিয়ম হত। বিভু তখনো খুশি হত না বটে, কিন্তু সন্দেহও করত না। অঙ্কু বুঝতে পারে এখন সে সন্দেহের চোখে দেখে তাকে। দেরি হলে বা না ফিরলে তার মুখ গম্ভীর হয়। তার চাল-চলনের প্রতি যেন ওর লক্ষ্য বেড়েছে। গানের আসর থেকে ফিরছে বললেও ঠিক বিশ্বাস করে না। সেদিন জিজ্ঞাসা করল, যেখানে মেয়ে পড়ায় সেখানেও গানের আসর বসে কিনা।

গানের ব্যাপারে অঙ্কুর সহিষ্ণুতা বেড়েছে বটে, কিন্তু অন্যদিকে ধাত বদলায়নি। আর সব ব্যাপারে সহিষ্ণুতা বরং কমেছে। বনেদী ব্যবসায়ীর ছেলে বিভু। সব দিকে চোখ রেখে চলাটা স্বভাবের অন্তর্গত। ছেলেবেলার অনুগত ভাব নিয়ে এখনও বসে থাকার কারণ নেই। ফলে তার কথাবার্তা প্রায়ই বরদাস্ত হয় না অঙ্কুর। টাকার দেমাক ভাবে।

ছোটখাট বিচ্ছেদের সূত্রপাত ঘটে গেল একটা।

সেদিন মেসে ফিরল যখন, বেলা প্রায় ন'টা। গানের আসরে রাত জাগার ফলে চোখ লাল। ভোরের দিকে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়েছে। ঘরে পা দিতে না দিতে গম্ভীর মুখে বিভু জানাল, কাল রাত্রিতে মৃগাঙ্ক জ্যাঠা এসেছিলেন, আজ সকালে চলে গেলেন। রাতে এখানেই ছিলেন।

অঙ্কুর বিব্রত বোধ করার কথা। করতও হয়ত। কিন্তু বিভুর এই মুখের দিকে চেয়ে তার রাগ হয়ে গেল। কিন্তু আরও কি বলে শোনার জন্য চুপ করেই রইল।

বিভু আবার বলল, তোর কথা জিজ্ঞাস করছিলেন, কোথায় পড়াস, গানের আসর কোথায় বসে, এই সব— তোর মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না শুনলাম। সম্ভব হলে তোকে একবার দেশে যেতে বলেছেন।

অঙ্কু নীরবে অপেক্ষা করছে।

— তোর যাওয়া দরকার। তাছাড়া আমার মনে হয় এখন দেশেই থাকা উচিত তোর। বাবারও বয়স হয়েছে, এখন আর একা সবদিক দেখে উঠতে পারেন না। তোকে পেলে খুশি হবেন। এখানে এ-ভাবে সময় নষ্ট করে কি হবে।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে অঙ্কু জিজ্ঞাসা করল, আর কি মনে হয় তোর?

আর কিছু মনে হয় না। তোর এখন দেশেই থাকা উচিত সেকথা জ্যাঠাকে আমি বলেছি। এ-ভাবে দিন কাটানো আমার ভালো লাগছে না।

অঙ্কু এবারে কাছে এসে দাঁড়াল। বাবাকেও সন্দেহের আভাস দিয়েছে শুনে জ্বলছে ভিতরে ভিতরে। ধরে ছেলেবেলার মতই দুই একটা ঝাঁকানি দিতে ইচ্ছে করল। তপ্ত ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা

করল, একজনের এক রক্ষিতার মেয়েকে পড়াই সেকথা বলিস নি?

বলার ইচ্ছে ছিল, বলতে পারিনি। তবে তিনিও তোর সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা নিয়ে যান নি। আজ আর বিভু তার রাগের পরোয়া করে না একটুও।

রাত্রি জাগরণের পরে ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজের তাল কেটেছিল। দুর্বার রাগ সংযত করতে সময় লাগল এবারে। তবু চেষ্টা করলো নিজেকে সংযত করতে।—তাহলে তুই বলতে চাস তোর ভালো লাগা না লাগা বুঝে আমাকে চলতে হবে।

চললে তোর ভালো ছেড়ে মন্দ হবে না বোধ হয়।

কিন্তু তোর এত আস্পর্ধা হল কি করে? টাকার জোরে?

বিভু সমান তালে জবাব দিল, কোন্ জোরে সেটা নিজেই ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ গে যা।

দেখবো। কিন্তু এ-রকম কথা আমি আর তোর মুখ থেকে শুনতে চাই না। শুনলে আমার যাই হোক, তোর খুব ভালো হবে না। ফের যদি আমার ব্যাপারে নাক গলাতে আসিস তোর এই মুখ আমি থেতলে দেবো।

হন হন করে ঘর থেকে আবার বেরিয়ে গেল সে। বিভুর সমস্ত মুখ ধারালো হয়ে উঠল। আজও এ-ভাবে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পারে ভাবেনি।

অঙ্কু ফিরল সেই বিকেলে। বিভু ঘরে নেই। দুজনের কাছে দুটো চাবি, ঘরে ঢুকতে অসুবিধে নেই। অঙ্কু কি ভাবল একটু। তারপর পকেট থেকে একশোটা টাকা বের করে একটা খামে পুরল। দুলাইনের একটা চিঠি লিখল। —বনেদী ব্যবসায়ী তারা, ধার-ধোর কি দিয়েছে না দিয়েছে হিসেব থাকাই স্বাভাবিক। আরও যদি কিছু পাওনা থাকে জানালেই দিয়ে দেবে। খাম আর চিঠি বিভুর টেবিলে রেখে আবার বেরিয়ে পড়ল সে।

সাত দিনের মধ্যে আর এ-মুখো হল না।

বিভু চিঠি আর টাকা পেয়েছে। অপমানের ওপর এই অপমান আরও বিঁধেছে। বিত্তবানের মর্যাদায় ঘা পড়লে যেমন হয়, তারও মনের অবস্থা সেই রকম। ভিতরে ভিতরে কেবল ফুঁসেছে সে।

এরপর এক ঘরে প্রায় অপরিচিতের মতই বাস করেছে দুজনে। বাস করেছে বললেও অত্যুক্তি হবে। অঙ্কুকে পর পর কয়েকদিন ঘরে থাকতে দেখলে সে নিজেই দেশে চলে গেছে। আর মনে মনে ভাবছে, মেসটা বদলানো দরকার।

মাস চারেকের মধ্যে শুকনো মরুভূমিতে আরো একটা জোরালো আশার আলো দেখল অঙ্কু। গানের বাড়িতে অতিথি হয়ে আসছেন লাহোরের সেরা ওস্তাদ নূরনওয়াজ খাঁ। এই বাড়ির মালিকের অন্তরঙ্গ সুহৃদ নাকি তিনি। অঙ্কু তাঁর নামডাক শুনেছে, সামনে বসে তাঁর গান শোনার সুযোগ কখনো হয়নি। তাঁর সঙ্গে আসছে তারাবাঈ। খাঁ সাহেব তারও গুরু। ঠুংরি গানে তারাবাঈয়েরও নাম হয়েছে। রেকর্ডে তার গান অঙ্কুর কিছু শোনা আছে।

নওয়াজ খাঁ এলেন। তারাবাঈ এলো। প্রাথমিক অভ্যর্থনার বন্যায় অঙ্কু গোড়ার দিকে ধারে

কাছে ঘেঁষতে পারল না। পর পর ক'রাত গানের আসর বসল। অঙ্কু কান পেতে শুনল, বুক ভরে শুনল। খাঁ সাহেবের বয়স হয়েছে, কিন্তু এই বয়সেও গায় বটে। তেমনি সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে রসের বুনট রচনা করে চলে তারাবাঈ। খাঁ সাহেবের গানের পরে সভার আবহাওয়া স্থির শ্রদ্ধাবনত। সেই পরিবেশ ঠুংরি আর গজলের নিটোল রস-মাধুর্যের প্রলেপ দিয়ে দিয়ে ক্রমে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে তারাবাঈ। তারপর একসময় অস্থির চঞ্চল মুখর করে তোলে সেই পরিবেশ। তারাবাঈ সুন্দরী নয়। শ্যামবর্ণা, লম্বা বলে একটু রোগার দিক ঘেঁষা মনে হয়। কিন্তু গান করে যখন, তখন ক্রমশ যেন অন্যরকম লাগে দেখতে। ভালো লাগে। শুধু অঙ্কুর নয়, সভার সকলেরই। মৃদু হাসে আর রসের ভিয়েনে পাক দিয়ে চলে যেন। সেই রসের ছোঁয়া ক্রমশ তার ঠোঁটের ফাঁকে, চোখের কোণে জমাট বাঁধতে থাকে, রমণীয় যৌবনে যেন অল্প অল্প দোলা দিতে থাকে। শ্রোতাদের নীরব আনন্দ ক্রমে মুখর হয়ে উঠতে থাকে, বাহবার গুঞ্জন ওঠে আর তারাবাঈ এক-একবার হেসে ফেলে তাদের দিকে চেয়ে। ঝকঝকে দাঁত দেখা যায়। তখন কোন্ বিচারে যে রীতিমত সুন্দরী মনে হয় তাকে অঙ্কু জানে না।

তিনটে রাত এক ধরনের বিহ্বলতার মধ্যে কেটেছে অঙ্কুর। সেদিন একটু বেশি রাতে গান ধরেছেন খাঁ সাহেব। দরবারী কানাড়া গাইছেন। সভার স্তব্ধতা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। অঙ্কুর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। তন্ময় হয়ে শুনছে। কিন্তু এই তন্ময়তার মাঝে মাঝে ছেদ পড়তে লাগল। শুধু তার নয়, সকলেরই। এমন কি গায়কেরও। বাড়ির পোষা কুকুরটা থেকে থেকে কেঁউ কেঁউ করে উঠছে। কুকুরটা কাছে নয়, দূরে আর একদিকে কোথাও বাঁধা। সেখান থেকেই শব্দটা কান্নার শব্দের মত কানে এসে লাগছে।

অঙ্কুর হঠাৎ খেয়াল হল, ঘুরে ফিরে বার বার খাঁ সাহেবের সুর কোমল গান্ধারে ফিরে ফিরে আসছে।

ওদিকে কুকুরটার কান্না বাড়ছে ।

গৃহস্বামী ভাবছেন, উঠে কুকুরটাকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে বলবেন কিনা।

হঠাৎ গান থামিয়ে দিলেন খাঁ সাহেব। জিজ্ঞাসা করলেন, কুকুরটার কি শিগগীর কোনো শোকের কারণ ঘটেছে?

এ প্রশ্ন শুনে অবাক সকলে। গৃহস্বামী জানালেন, শিগগীর নয়, প্রায় ন' মাস আগে ওই কুকুরটার একটা বাচ্চা গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে।

খাঁ সাহেব হাসতে লাগলেন। বললেন, দেখো, যখনই আমি গান্ধারে আসছি তখনই ওটা ডাকছে, ওর শোকের জায়গায় নাড়া পড়ছে।

ছেলেবেলা থেকে গানের বহু বিস্ময়কর গল্প শুনেছে অঙ্কু, কিন্তু এই বয়সে এমন রোমাঞ্চ আর বোধ করি কখনো অনুভব করেনি। সে তখুনি স্থির করে ফেলল, এই ওস্তাদের কাছে, এই খাঁ সাহেবের কাছেই গান শিখবে। সেই রাতেই গৃহস্বামীকে ধরে পড়ল সে। তিনি খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলেন একটু। একটা বাঙালী ছেলের যদি হয় কিছু তাহলে তিনিও খুশি হন। তাছাড়া এতদিনে তার সত্যিকারের নিষ্ঠার পরিচয়ও পেয়েছেন তিনি।

সেই প্রথম ওস্তাদ নূরনওয়াজ খাঁ লক্ষ্য করলেন তাকে। গৃহস্বামীই দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইশারায় তাকে ডাকা হল। অক্ষুর বুকের ভিতরটা ঢিব ঢিব করছে। সভার শ্রোতারা তখন তারাবাঈয়ের গানের অপেক্ষায় বসে। কিন্তু ওস্তাদের নির্দেশে গাইতে বসল অক্ষু।

অক্ষুর ধারণা গান ভাল হয়নি। হবে কেমন করে। সে গান গাইছে না, পরীক্ষা দিচ্ছে। এই আসরে আর এতবড় ওস্তাদের সামনে তাকে গাইতে বলা হবে ভাবেনি। অদৃষ্ট বুঝে নেবার জন্য মরিয়া হয়েই গাইতে বসে গেছে সে।

গানের পরের পরিস্থিতি আরো বিড়ম্বনাজনক। খাঁ সাহেব তবু দুই একবার মাথা নেড়েছেন। শ্রোতাদের তরফ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না। ঘরের সুরের আবহাওয়াটা সে যেন নষ্ট করে বসেছে। তারাবাঈয়ের চোখেও প্রশংসার ছিটেফোঁটা দেখা গেল না। সে শুধু বার দুই তার দিকে তাকিয়েই সান্ত্বনা দিল যেন। তারপর সভার অনুরোধে তানপুরা নিয়ে বসল।

অক্ষুর গানের ফলে যে ঝিমনো ভাবটা এসেছিল, সেটাই যেন সজীব করে তুলতে চেষ্টা করল তারাবাঈ। খানিকক্ষণের মধ্যে তাজা করে তুললও। কিন্তু তখন এতগুলো শ্রোতার মধ্যে একমাত্র বিমর্ষ মুখ বুঝি অক্ষুরই। তার সামনে বসেই গাইছে তারাবাঈ। সে যেন তার এই মুখ লক্ষ্য করেছে। আর গানের রসে তরঙ্গে মাঝে মাঝে উৎসাহিত করে তুলতে চেষ্টা করছে তাকে।

কিন্তু তেমন উৎসাহ বোধ করছে না অক্ষু।

পরদিন ওস্তাদের ঘরে তার ডাক পড়ল কদিন ধরে অক্ষু ও বাড়িতেই আছে। বিকেলে এক ফাঁকে গিয়ে লক্ষ্মীকে পড়িয়ে আসে। সে-ও না যেতে হলেই যেন ভালো হত। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজেশ্বর মল্লিকের কড়া চোখ। প্রথম দিনেই বলে রেখেছিলেন, গানের তালে পড়ে মেয়েটাকে পড়ানো কামাই কোরো না যেন।

ঘরে ঢুকে দেখে, ওস্তাদ আরাম কেদারায় হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন। সামনে গৃহস্বামী বসে। আর অদূরে তারাবাঈ।

নূরনওয়াজ খাঁ সদয় মুখেই তার অভিবাদন গ্রহণ করলেন। বসতে বললেন। তারপর হিন্দীতে যে মন্তব্য করলেন, অক্ষুর নিভু নিভু আশার প্রদীপটা যেন আবার জ্বলে উঠবে মনে হল। তিনি বললেন, তোমার গলা খুব ভালো, জোয়ারি গলা, কিন্তু অনেক বুনো জঞ্জাল আছে তার মধ্যে, সে-সব সাফসুফ করতে পারলে ভালো ফুল ফোটার আশা আছে।

অক্ষু কি বলবে ভেবে পেল না। তার মনের কথা গৃহস্বামীই বলেছিলেন। মেহেরবাণী করে তাঁকেই তিনি তালিমের ভার নিতে বললেন। মুরুব্বীর জোর থাকলে কত কঠিন ব্যাপার কত সহজে ফয়সালা হয়ে যায়, অক্ষু যেন এই প্রথম তার নজির দেখল। ওস্তাদ সবিনয়ে বললেন, তাঁর গরীবখানায় গেলে তালিমের ভার নিতে তাঁর আপত্তি নেই।

তৃষিত শুকনো মরুভূমিতে এইবার বুঝি বর্ষণের সূচনা দেখা গেল। তৃষ্ণার অধ্যায়টাই তার জীবনের শেষ অধ্যায় নয় তাহলে। নূরনওয়াজ খাঁর কুৎসিত মুখের দিকে চেয়ে বর্ষার অপরূপ মেঘ দেখছে সে—সমস্ত আকুলতার অবসান এবারে আসন্ন বুঝি। অক্ষু বেরিয়ে এলো। সে যাবে। লাহোরেই যাবে। লাহোর তখন বিদেশ নয়। অক্ষুর মনে হল, লাহোর তো ঘরের কোণে, তার তৃষিত অন্তরে সংগীতের ধারাবর্ষণের আশা যদি মেলে, আশ্বাস যদি মেলে—সে

পাতাল পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে।

এতদিনের সব দাহ বুঝি পলকে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর আশ্চর্য, আকাশে সত্যিই মেঘ করেছে আজ। বর্ষণ শুরু হয়নি, কিন্তু অঙ্কুর মনের আনাচ-কানাচ পর্যন্ত ভরে উঠেছে, ভরে উঠতে চাইছে। মহাকবি বাল্মীকির মেঘমন্দ্র কানের ভিতর দিয়ে যেন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ প্রিয়াবিহীনা শিখিনঃ প্লবঙ্গঃ।।

তারও হৃদয়ের শুকনো নদী ধারা পেয়েছে, চিত্তাকাশের মেঘ বর্ষণ শুরু করেছে, সুরের মত্ত গজ রব তুলেছে, মনোবনে লাবণ্য ধরেছে, বিরহী অন্তর সুরপ্রিয়ার ধ্যানে বসেছে, আশার ময়ূরেরা পেখম মেলেছে, অশান্তস্নায়ু কপিরা এই বর্ষণে আশ্বস্ত, তৃপ্ত।

অনেকবার ঘোরা-ফেরা করে তারাবাঈকে একলা পেল একসময়। বয়সে বছর দুই বড়ই হবে হয়ত তার থেকে তারাবাঈ। মেঘ দেখেই বারান্দায় এসে বসেছিল কিনা কে জানে। অঙ্কু সবিনয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু বাক্যালাপে অনভ্যস্ত বিনয়ের দিকটা ছেঁটে ফেলে সাদা-সাপটা দাবি পেশ করল, আমাকে কিন্তু সাহায্য করতে হবে, আমি লাহোরে যাব ওস্তাদের কাছে।...আমি কিচ্ছু গাইতে পারি না, কিছুই শেখার সুযোগ পাইনি, তবু কাল রাতে যত খারাপ গেয়েছি অত খারাপও গাইনে। আমার নিজেরই ভারী লজ্জা করছে।

তারাবাঈ সকৌতুকে কয়েক নিমেষ দেখল তাকে। ছোট ছেলের স্বীকারোক্তি শুনে বয়স্করা অনেক সময় যেমন কৌতুক বোধ করে, অনেকটা তেমনি। তারপর হাসিমুখেই আশ্বাস দিল, বলল, কেন, খারাপ তো লাগেনি। তাছাড়া ওস্তাদ যে বলেছেন জোরদার গলা, সেটা মিথ্যে নয়।

অঙ্কু প্রশংসার দিকটা একেবারে বাতিল করে দিয়ে বলল, জোরদার গলা তো গাধারও, আমি গাধাই বনে গেছি কাল, আসর মাটি করেছি—কিন্তু কি করব, ওস্তাদ আমাকে নেবেন কি নেবেন না ভেবে ঘাবড়ে গেলাম যে। নইলে আর একটু ভালো অন্তত গাইতে পারতুম—ভালো মানে আমাদের ভালো, আপনাদের মত গুণীদের নয়।

তারাবাঈয়ের এবারের হাসি সদয় মনে হল অঙ্কুর। তাই মিষ্টিও লাগল।

বিকেলের মধ্য রাজেশ্বরবাবু জানলেন, অঙ্কু রাস্তা পেয়েছে একটা, লাহোরে যাবে খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখতে। তিনি গম্ভীর ঈষৎ 'তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর মাস দেড় দুই বাদে পরীক্ষা, তোমার ছাত্রীর কি হবে?

অঙ্কু ফাঁপরে পড়ল। এই ভদ্রলোক বিরূপ হলে সবই ভেস্তে যেতে পারে মনে হল। রাজেশ্বরবাবু প্রকারান্তরে সেই কথাই শোনালেন, আমাকে না বলে সাত-তাড়াতাড়ি এগোতে যেও না, ভালো লোকের কাছে যাতে শেখার সুযোগ পাও সে চেষ্টা আমিই করেছিলাম। মেয়েটার পরীক্ষা হয়ে যাক, তারপর যাবে।

অঙ্কু যেন হতাশার মধ্যে ডুবতে চলেছে আবার। দ্বিধা কাটিয়ে বলল, অতদিনে খাঁ সাহেবের কি আর মনে থাকবে?

থাকবে। খাঁ সাহেব তোমার খাতিরে তোমাকে শেখাতে রাজি হননি। ওঁদের জান না। যার

জন্যে খাঁ সাহেবের বাংলা দেশে এত কদর আর এত পয়সা, তিনি তোমার পিছনে থাকলে যখন যাবে তখনই তোমাকে জামাই আদরে শেখাবেন।

অর্থাৎ গানের বাড়ির মালিকটি সহায় থাকলে তার ভাবনার কোন কারণ নেই।

অগত্যা অন্ধু এই প্রস্তাবেই রাজি। রাজেশ্বরবাবু তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে এই ব্যবস্থাই পাকা করে নিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় পড়াতে এসে অন্ধু মনে মনে সব থেকে বেশি বিমুখ এই মেয়েটার প্রতি। ম্যাট্রিক পাশ করে তো দিগ্‌গজ হয়ে যাবে একেবারে। নিরীহ মেয়েটাও প্রায় অকারণে তার মেজাজের আঁচ পেয়ে দুই একবার বিব্রত বিস্ময়ে তাকালো তার দিকে। টাস্‌ক্‌ ঠিকমত করেছে শুনেও খুশি নয়। আর ভুল তেমন পেল না বলেও যেন রাগ রাগ ভাব।

সেই রাতে খাঁ সাহেব আসরে বসলেন না, তাঁর শরীর খুব ভালো নয়। অতএব শুধু তারাবাঈয়ের আসর সেদিন। কিন্তু সকালে তার সঙ্গে বাক্যালাপের খেসারত এইভাবে দিতে হবে, অন্ধু ভাবে নি। আসরে বসে তারাবাঈ প্রথমে তাকেই আহ্বান জানালো, পহ্‌লে আপ কুছ শুনাইয়ে।

ফলে গৃহস্বামীও তাকে ইশারা করলেন। অন্ধু নিরুপায়। নিজেই এই বিপদের রাস্তা খুঁড়েছে—আগের দিন যত খারাপ গেয়েছে, ততো খারাপ গায় না বলেছে। মনে হল, কথাটা তারাবাঈ মনে রেখেছে বলেই ভালো মুখ করে আহ্বান জানালো তাকে।

অতএব অন্ধু একটু বুদ্ধিমানের কাজ করল আজ। গুরুগম্ভীর কোনো শুদ্ধ রাগ ফেঁদে বসল না। গতকাল গোড়ায় কাফি রাগে ঠুংরি ধরেছিল তারাবাঈ। আজ অন্ধুও তাই করল। গত রাতের গানের যেন একটা রসভরা জবাব দিল। গানের সুরের মধ্য দিয়ে তারাবাঈ নানাভাবে এক তরফা দোষারোপ করছিল গত রাত্রিতে। বলছিল, আমার নরম হাত তুমি এভাবে এত শক্ত করে ধরে আছে কেন, বড্ড লাগছে বলছি না? আর কি রকম বে-আক্কেলে তুমি যে আমাকে এভাবে আগলে বসে আছ? আমি যে অবলা নারী, এই কাণ্ডজ্ঞানও কি তোমার নেই?

আজ অন্ধু গাইল, নিজেকে তুমি অবলা বল, কিন্তু বেশ জান সেখানেই তোমার আসল জোর। দীঘির জল বড় নিরীহ দেখতে, কিন্তু বে-আক্কেলের মত ওতে আঘাত না দিলে সে তো ডুবিয়ে মারবে। তোমার হাত দুখানি নরম বটে, কিন্তু ওই দুহাতের বেষ্টন দেখলে ভুজঙ্গ তোমাকে বিনীত সেলাম জানাবে। অতএব, প্রিয়, আমি শুধু আত্মরক্ষা করছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা যে হবে না তাও জানা কথাই।

অপ্রত্যাশিত জমজমাট হয়ে উঠল আসর। গানের মাঝে থেকে থেকে বাহবা দিয়ে উঠতে লাগল সকলে। তারাবাঈ হাসছে মিটি মিটি, মুখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে এক-একবার, আবার ছদ্ম কোপের আভাসও দেখা যাচ্ছে। গানের সঙ্গে এই মিষ্টি ব্যঞ্জনাটুকুও উপভোগ্য বটে।

সমবেত বাহবার মধ্যে গান শেষ হল। এই জমাট আসর এবারে তারাবাঈ কোথায় তোলে সেই প্রত্যাশায় উন্মুখ সকলে। তারাবাঈ তানপুরা টেনে নিল। গম্ভীর। সেই গাম্ভীর্যের তলায় তলায় নির্লিপ্ত আত্মপ্রত্যয়। শ্রোতারা তন্ময় একটু বাদে। তারপর ক্রমশ সেই তন্ময়তা বুঝি

পাহাড়ী ঝরণার মত শতধা হয়ে চিত্তের প্রতি রন্ধ্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেমে আসতে লাগল। আসর দ্বিগুণ সরগরম।

—জাবো মোহন মোরে ফন্দ পড়না
কপট কুটিল হম আপ ভলে হো
গুণনিধান অরূ শ্যাম সলোনা।।
মন্দমতি হম কান চতুর তুম
বিঢ়হ বিথা ভলে হমকো সতাবত
মন্দিরমে অব দের পড়েগী
ক্যুঁ পুছো তুম হমরো রো না।।

যাও, মোহন যাও, তুমি আমার ফাঁদে পোড়ো না। আমি কপটি কুটিল, আর তুমি তো ভালো মানুষ গুণনিধান—সুন্দর শ্যাম রূপ তোমার। আমি মন্দমতী আর তুমি বুদ্ধিমান—অথচ বিরহ দিয়ে তুমি আমাকে বেশ জ্বালাচ্ছ। শিগগীর তুমি তোমার মন্দিরে যাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি কেন কাঁদি সে আর জিজ্ঞাসা করা কেন।

শ্রোতাদের উৎফুল্ল উচ্ছ্বাসের আবেগ পরের প্রতীক্ষায় স্তিমিত হবার আগেই পিছন থেকে অঙ্কুর কাঁধে হাত দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল কে। অঙ্কু ফিরতে পিছনের এক ভদ্রলোক দরজার দিকটা দেখিয়ে দিল। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে অঙ্কু অবাক। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিভু। শুকনো মুখ, গম্ভীর। নীরব ইশারায় সে-ই বাইরে ডাকছে তাকে।

অঙ্কু উঠে এলো। তেমন কিছু না ঘটে থাকলে বিভুর এখানে আসার কথা নয়।

বিনা ভণিতায় বিভু বলল, আজ পাঁচদিন হল জেঠিমা মারা গেছেন। চারদিন আগে তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। সেই টেলিগ্রাম নিয়ে দুদিন ধরে আমি আঁতিপাঁতি করে তোমাকে খুঁজেছি। কোথায় কোন্ বাড়িতে আসর বসে জানতুম না। দুদিন আগে আবার আমার নামে টেলিগ্রাম পেয়ে আমিই দেশে চলে গিয়েছিলাম। আজ ফিরে একজনের কাছে শুনলাম উত্তর কলকাতায় এই বাড়িতে বড় গানের আসর বসে। তাই এসেছিলাম একবার খোঁজ নিতে—

অঙ্কু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। সুরে সুরে মগজের প্রতি কোষ ভরাট হয়ে ছিল তার, তাই বোধহয় এই বিপরীত "ধাক্কায় হকচকিয়ে গেল একেবারে। বিভু চলে যাচ্ছে। কেমন নির্মম নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে তাকে। নিজের অগোচরে অঙ্কুও নেমে এলো বাড়ি থেকে। বিভু দেখল। রাত হয়েছে। একটা ট্যাক্সি ধরবে। ট্যাক্সি থামালো একটা। দরজা খুলে ফিরে তাকালো একবার। খানিক দূরে সে চুপচাপ দাঁড়িয়েই আছে দেখে নিজে উঠে পড়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ট্যাক্সি চোখের আড়াল হয়ে গেল। অঙ্কু দাঁড়িয়ে তেমনি।

আরো দিন দুই কি ভাবে কেটে গেছে, নিজেও ভালো জানে না। এ দুদিন গানের আসরেও বসেনি পড়াতেও যায় নি। মেসে এসেছিল। বিভুর সঙ্গে একটি কথাও হয়নি। সামনাসামনি দেখাও কম হয়েছে। রাতে বিভু যখন শয্যা নিয়েছে, অঙ্কু তখন ছাদে বসে। দুদিন বাদে সে দেশে

চলে এলো। এখানে বাবা বা আর কেউও তার সঙ্গে বিশেষ কথা বললেন না। সে যেন খুব পরিচিত নয় কারো এখানে। বিভুর মা শুধু এগিয়ে এলেন। হবিষ্যির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তিনিও তার কাছে কোনরকম খেদ প্রকাশ করলেন না, একটা মন্দ কথাও বললেন না। নীরবে কর্তব্য পালন করলেন শুধু। ছেলের মুখে ইনি বা বেনা ঘোষাল তার সম্বন্ধে অনেক খবরই শুনেছেন বোঝা গেল।

মায়ের কাজের দুদিন আগে বিভু এলো। কিন্তু সে-ও আর তাকে চেনে মনে হল না। তবে সেইদিনই বাবার সঙ্গে প্রথম কথা হল অঙ্কুর। নিচের থেকে ওপরে ডেকে পাঠালেন তাকে। প্রশ্ন করলেন, তুমি মায়ের কাজ করবে?

অঙ্কু মাথা নাড়ল। করবে।

আচ্ছা।

কাজ শেষ হয়ে গেল। অঙ্কু আবার অপরিচিতের মতই দেশ থেকে কলকাতায় রওনা হল।

রাজেশ্বরবাবু মনে মনে রাগে ফুঁসছিলেন বোধ করি। কিন্তু মাথা কামানো দেখে বুঝলেন বাপ মায়ের একজন গত হয়েছে। সৌজন্যের খাতিরে খোঁজ নিলেন প্রথমে। তারপর মন্তব্য করলেন, আমাদের একটু জানিয়ে যেতে পারতে, ওদিকে ভেবে সারা।

অঙ্কু আগে থাকতে কিছু চিন্তা করেনি, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আমাকে এই দেড়মাস দুমাস কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? এদিকের পরীক্ষা হয়ে গেলে লাহোর চলে যাব...

রাজেশ্বরবাবু সানন্দে রাজি। বললেন, যেখানে পড়াও সেখানেই থাকো না। কোনো অসুবিধে হবে না, ওরা তোমাকে খুব সমীহ করে।

অঙ্কু ঠাণ্ডা মুখে তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি ইচ্ছে ঠিক করে বলুন তো?

রাজেশ্বরবাবু থতমত খেলেন। তারপর তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি আর কোথাও ব্যবস্থা করা যায় কি না, কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়, ওরা সত্যি লোক ভালো—

কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হল সে। লক্ষ্মী পড়তে আসার আগে তার মা এলো। সামনে বসল। শান্ত, গম্ভীর। বলল, শুনলাম তুমি থাকার জায়গা খুঁজছ, আর এখানে তোমার থাকতে আপত্তি। কিন্তু এই কমাস তোমাকে দেখে যা মনে হয়েছে ঠিক সে-রকম মনে না হলে আমারও রাখতে আপত্তি হত। একটু থেমে আবার বলল, আমি ভদ্রঘরেরই মেয়ে, মেয়েটা ভদ্রভাবে বড় হয়ে উঠে নিজের পায়ে দাঁড়াক এ ছাড়া আর কিছু আকাঙ্ক্ষা রাখি না। প্রথমবারের পরীক্ষা, তুমি থাকলে ওর থেকেও আমি বেশি বল পাই মনে—নিজের দিদির বাড়িতে আছ এ-রকম ভাবতে খুব বেশি অসুবিধা হবে তোমার? আর অসুবিধে হয়ই যদি, তোমার চলে যেতে কতক্ষণ?

অঙ্কু কথা বিশেষ বলেনি। শুধু রাজি হয়েছে। খুব যে ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়েছে তাও না। বিভুর সঙ্গে ওই মেসে এক ঘরে আর থাকবে না এই শুধু স্থির করেছিল। লক্ষ্মীর মায়ের একথা শোনার পরে হঠাৎ মনে হয়েছে, কেনই বা রাজি হবে না? ভালো চোখে এখন কে আর দেখে তাকে? দেখুক না দেখুক, পরোয়াই বা কার করে সে? তাছাড়া এই মহিলার কথাগুলোও

কানে লেগে থাকার মতই। কে তাকে আদর করে ডেকেছে কবে—কেই বা তাকে সাদরে রাখতে চেয়েছে? সত্যিকারের ভদ্র পরিবেশই তো বটে, উলটে রাজেশ্বরবাবুকে বরং বেমানান লাগে এখানে। অঙ্কুর অত চিন্তা করার দরকার কি?

একে একে দিন গেছে। অঙ্কু তার বাক্স বিছানা আনতেও মেসে যায়নি একদিনের জন্য। লক্ষ্মীর মা-ই একে একে সব ব্যবস্থা করেছে। কাপড় কিনে দিয়েছে, সুটকেস কিনে দিয়েছে, দরজী ডেকে তার জামা করিয়ে দিয়েছে। অঙ্কু কিছু বলতে গেলেই খুব সাদাসিধে গম্ভীর মুখে বাধা দিয়েছে, দিদি দিচ্ছে আপত্তি করো না।

অঙ্কু আপত্তি করেনি। আর লক্ষ্মীকে আগের থেকে দ্বিগুণ যত্ন করে পড়িয়েছে।

পরীক্ষা হয়ে গেল। এবারে অঙ্কু যাবার জন্যে উদগ্রীব। গানের বাড়ির মালিককে ধরে অঙ্কু লাহোরে খাঁ সাহেবের কাছে চিঠি লিখিয়েছে। জবাবের প্রত্যাশায় আছে। সেখান থেকে চিঠি এলেই রওনা হবে।

অবকাশ অনেক বলেই মন ঈষৎ চঞ্চল এখন। খাঁ সাহেব পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত তাকে ডাকবে কি ডাকবে না কে জানে। তবু এরই মধ্যে লক্ষ্মীর কথা আর লক্ষ্মীর মায়ের কথা ভাবে এখন। তাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না বলতে গেলে। রাজেশ্বরবাবুর প্রতি একটুও শ্রদ্ধা নেই তার। অথচ দুটো মাস ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে এই মা-মেয়ের হৃদয়ের যে দিকটার সন্ধান সে পেয়েছে, তাতে তার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এই দিকটা যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি বিষণ্ণ গম্ভীর। রাজেশ্বরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে অঙ্কু হয়ত এদের জীবনের কথা জানতে পারত, কিন্তু কৌতূহল সত্ত্বেও কেন জিজ্ঞাসা করেনি নিজেও ভালো জানে না। এই জীবনের সঙ্গে রাজেশ্বরবাবুর মত একটা লোক জড়িত বলেই হয়ত করেনি।

রাজেশ্বরবাবুর কাছ থেকে একটা খবরের আশাতেই বসেছিল অঙ্কু। সেটা খাঁ সাহেবের সম্মতির খবর। কিন্তু তার বদলে সেদিন যে খবর দিলেন তিনি, অঙ্কু বিমূঢ় হঠাৎ। অঙ্কুর খোঁজে আজই বিকেলে কে একজন লোক এসেছিল গানের বাড়িতে। সে জানিয়েছে তার বন্ধু বিভুতির খুব অসুখ, একবার যদি দেখা করতে যায়। কি অসুখ, কি বৃত্তান্ত, আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি।

শুধু বিভূতি নয়, আবাল্য পরিচিত সব মুখগুলোকেই মন থেকে প্রায় ছেঁটে দিয়েছিল অঙ্কু। বিশেষ করে গত দুটো মাস পিছনের দিকে সে ফিরে তাকায়নি। মানসিক যোগাযোগটা সব থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বিভুর সঙ্গেই। বেশি কিছু না হয়ে থাকলে বিভুরও তার কাছে লোক পাঠাবার কথা নয়। তার আত্মাভিমান জানে। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ এক যুগ আগের সেই ছেলেবেলার নাড়ির টানটাই যেন অনুভব করল সে।

রাজেশ্বরবাবুকে মেসের ঠিকানা দিয়ে এবং খাঁ সাহেবের কোন খবর এলে জানাতে অনুরোধ করে অঙ্কু তক্ষুনি ছুটল।

ঘরে ঢুকে স্তব্ধ। আশ-পাশ ঘরের তালা বন্ধ। ধারে কাছে কাউকে দেখলও না। বিছানায় শুয়ে বিভু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এক নজর তার দিকে তাকিয়েই অঙ্কু কাঠ একেবারে। অন্তরাত্মা

কেঁপে উঠল। এ কি দৃশ্য দেখার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছে সে! বিভু তাকে দেখেনি। যন্ত্রণায় চোখ মেলে তাকাতেও পারছে না। বসন্ত। আসল যে তাতেও ভুল নেই।

বিভু—!

চমকে চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করল। ঠিক মত পারল না। কিন্তু বুঝল কে এসেছে। যন্ত্রণার কাতরানি থেমে গেল। দুই চোখে ধারা নামল।

অন্ধু এগিয়ে এলো।—এ কি কাণ্ড বিভু, আমাকে আগে খবর দিসনি কেন? দেশে খবর পাঠানো হয়েছে?

বিভু মাথা নাড়ল শুধু। একটু বাদে বিড়বিড় করে বলল, সময় পাওয়া গেল না। পরশু বেদম জ্বর হল, তার আগে দু তিন দিন ধরেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। গতকাল রাত্রিতে টের পেয়েছে কি হয়েছে—আজ একদিনের মধ্যেই এই। তাছাড়া কি হবে খবর দিয়ে...যা জানার একেবারেই জানবে। অন্ধু একেবারে তার শয্যার কাছে এসেছে টের পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, কাছে আসিস না, সরে দাঁড়া—টিকে নেওয়া আছে তোর?

আছে। অন্ধু মিথ্যে কথাই বলল। ইচ্ছে করে বলেনি, কি একটা অনুভূতি তাকে বলালো।

একটু দম নিয়ে বিভু বলল, মেসের এরা হাসপাতালে পাঠাবার পরামর্শ করছিল, দ্যাখ্ ওরা কিছু ব্যবস্থা করতে পারল কিনা। তারপর না হয় দেশে একটা খবর দিস।

এই রোগের হাসপাতাল বলতে কলকাতায় তখন একটাই। এ-সময় সেখানে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। খবর পেলে তারা নিয়ে যাবে, কিন্তু এই রোগ ছড়িয়ে পড়লে কি ভাবে সেখানে রোগী রাখা হয়, অন্ধুর শোনা ছিল। নিচে নেমে এসে যে ক'টি বাসিন্দার সঙ্গে দেখা হল, তাদের মুখ শুকনো। তারা হাসপাতালে খবর নিয়ে এসেছে, রোগী গাদা করে রাখা হচ্ছে সেখানে। অসুখটা বেশ ভালো মতই ছড়িয়েছে। বিভু বড়লোকের ছেলে জানে সকলে, দোতলার সব থেকে ভালো ঘরে থাকে, তার চাল-চলন অন্যরকম। তাকে ওইভাবে ওখানে সরানো সমীচীন কিনা ভাবছিল সকলে। আবার ভরসা করে রাখতেও পারছে না।

একটু সুবিধে এই যে, দোতলার ছাদের দিকে তার ঘরটা বিচ্ছিন্ন। অন্ধু প্রস্তাব করল, মেসের বাসিন্দারা যদি না ঘাবড়ায় তাহলে বিভূতি যেখানে আছে সেখানেই থাকুক। সবরকম প্রতিষেধকের ব্যবস্থা সে করবে। তার যাবতীয় দেখাশুনার ভারও সে নেবে।

কেউ আপত্তি করল না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তা ছাড়া এই রোগ হলেই তাড়াহুড়ো করে হাসপাতালে পাঠানোর দিনকালও নয় সেটা। ঘরে রোগী থাকে, ভবিতব্যের ওপর নির্ভর করে।

কি চিকিৎসা হচ্ছে খবর নিয়ে অন্ধু বেরিয়ে পড়ল তখুনি। অনেক খোঁজখবর করে এই রোগের নামজাদা চিকিৎসক এক কবিরাজকে ধরে নিয়ে এলো সে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ছিলও না তখন। কবিরাজ রোগী দেখে যাবতীয় ব্যবস্থার এক বিস্তৃত ফর্দ দিয়ে গেলেন। বিভু যন্ত্রণায় বেহুঁস প্রায়। তারই মধ্যে একসময় জিজ্ঞাসা করল, আমাকে এখানে রাখার ব্যবস্থা করলি?

অন্ধু আশ্বাস দিল, এ আজকাল ঘরে ঘরে হচ্ছে, তুই কিছু ভাবিসনে, কদিনের মধ্যেই সারিয়ে তুলছি তোকে, দ্যাখ্ না।

শুধু যন্ত্রণা নয়, কি একটা উদ্‌গত অনুভূতিও চাপতে চেষ্টা করল বিভু। পারল না। বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল, আমাকে হাসপাতালেই পাঠিয়ে দে তার থেকে, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তুই কেন নিজের বিপদ ডেকে আনছিস?

খুব স্বাভাবিক লাগল না কথাগুলো। কিন্তু এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নয় এটা। বলল, তুই যদি সাহায্য না করিস বিভু তাহলে সত্যি মুশকিলে পড়ব। আমি বলছি তুই ভালো হয়ে যাবি।

বিভু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অঙ্কুর মাথায় রাজ্যের চিন্তা। বিভুর বাবা মাকে খবর দেবে কিনা। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল সে। তাঁরা এসে কি করবেন? রোগীকে সরানো সম্ভব নয় এখন। মাঝখান থেকে তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। তাঁরা এই মেসেই ছুটে আসবেন। ফলে তাঁদের সামলানোই দায় হবে। তার থেকে দুটো একটা দিন দেখা যাক।

অঙ্কু রোগীর শিয়রে আসন নিল। কে যে তাকে এতবড় শক্তি জোগালো নিজেও জানে না। নিজের হাতে কবিরাজের যাবতীয় নির্দেশ পালন করল। মেসের মত জায়গায় এ রোগ হলে অন্যের সাহায্য দুর্লভ। অঙ্কু আশাও করল না। কিন্তু বারবার গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে লাগল বিভুই। নিজের জীবনের শঙ্কা তুচ্ছ করে দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা একজন যে ভাবে বুক পেতে দিয়েছে, সেটা যেন রোগযন্ত্রণার থেকেও যন্ত্রণাদায়ক। ছোট ছেলের মতই সে কেঁদে ফেলছে এক-একবার।

পাঁচ দিনের দিন অঙ্কু চিঠি পেল একটা। লিখেছেন রাজেশ্বরবাবু। খাঁ সাহেবের চিঠি এসেছে। তিনি সম্মতি দিয়েছেন। পত্রপাঠ যেন অঙ্কু রাজেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করে।

এবারে সত্যিকারের সঙ্কট। অঙ্কু কি করবে? এই আশাতেই তো দিন গুনছিল। সেটা বুঝি শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই ব্যঙ্গ করে যাবে তাকে। বিভু একটু ভালো বোধ করছিল সকালের দিকে। চিঠি পড়ার সময় অঙ্কুর মুখে গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেছে। জিজ্ঞাসা করল, কার চিঠি?

অঙ্কু হাসল একটু অন্যমনস্কের মত। চিঠিটা তার দিকে এগিয়ে দিল। পরে খেয়াল হল, ও পড়তে পারবে না। বলল, একজনের মারফৎ লাহোরের একজন মস্ত ওস্তাদকে ধরেছিলাম, যদি শেখায়, রাজি হয়ে যেতে লিখেছেন।

বিভু ব্যাকুল মুখে চেয়ে আছে তার দিকে। বহুবার যে তাকে সরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে, তারই এই অসহায় দৃষ্টি কোথায় যেন বিঁধল। তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিল, আমি কোথাও যাব না রে এখন, তুই আগে সেরে ওঠ।

দুপুরে রাজেশ্বরবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দিল সে। এখন যাওয়া সম্ভব নয় তার, বন্ধুর অসুখ সারলেই রওনা হবে।

কিন্তু বিভুর সেরে উঠতে প্রায় মাস খানেকের ধাক্কা। সঙ্কট কেটে যেতে অঙ্কু তার বাবা মাকে খবর দিয়েছে। তাঁরা এসেছেন। অঙ্কুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করেছেন। পাশেই তাঁদের থাকার একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে অঙ্কু। রোগীর ঘরে নিজে থেকেছে, তাঁদের থাকতে দেয় নি।

যত সুস্থ হয়ে উঠছিল ততো বিমর্ষ দেখাচ্ছিল বিভুকে। চুপচাপ শুয়ে থাকে, ভাবে কি।

সেদিন রাত্রিতে বাবা মা ওদিকের ঘরে চলে যেতে অঙ্কুকে বলল, আমার কাছে এসে বোস একটু, তোর তো আর ভয়ডর বলতে কিছু নেই, ভগবান এখন সব দিক রক্ষা করলে হয়।

গত দু'দিন ধরেই বিভু যেন কিছু বলি-বলি করছে। অঙ্কু তার শয্যার সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

বিভু বলল, আমি দেশে রওনা হলেই ঘরটা ডিসইনফেক্ট করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করিস। আর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে একটা টিকে নেওয়ার ব্যবস্থা করিস, তোর টিকে নেওয়া হয়নি আমি জানি।

বিভুর চোখ দুটো ছলছল করে আসছে। অঙ্কু মুখের দিকে চেয়ে আছে। হেসে বলল, তোর কান্না দেখার জন্যে আমি জেগে থাকতে পারব না, কিছু বলার থাকে তো বল।

বিভু চুপচাপ খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুই এত করলি, কিন্তু আমি তোর কত শত্রুতা করেছি জানিস না।

জানি। বাবা আমার ওপর আরো একটু বেশি বিগড়েছে, এই তো?

বিভু মাথা নাড়ল। শুধু এই নয়। তারপর বিবেকের দংশনের ফলেই যেন বলে ফেলল, তোর সঙ্গে দু মাস দেখা হয় নি—এর মধ্যে অনু এসেছিল। পশ্চিমে থাকে, পনের বিশ দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিল, সেখানে কলেজে পড়ছে এখন।...দেশে চিঠিপত্র লিখে ঠিকানা সংগ্রহ করে এই মেসেই এসে হাজির হয়েছিল।

এই খবরটা আশা করে নি অঙ্কু। চোখেমুখে আগ্রহ দেখা দিল।...দেশের সেই ফ্রকপরা অনু, যার ওপর কত অত্যাচার করেছে ঠিক নেই। সে কলেজে পড়ছে এখন। নতুন বয়সের ওই অধ্যায়টার স্মৃতি মন থেকেই মুছে গিয়েছিল বলতে গেলে। কিন্তু অনু ভোলেনি তাদের এখনো।...

বিভু বলল, অনু বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে এখন, আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। মুখে কথা আর হাসি লেগেই আছে।...তোর কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছিল, আর তোর সঙ্গে দেখা করতেও খুব চেষ্টা করেছিল। তোর খোঁজে আমি আর একদিন সেই গানের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ও-ই বলে বলে আমাকে পাঠিয়েছিল...।

অঙ্কু শুনতে শুনতে একটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। আজকের কলেজে-পড়া অনুর মুখখানা দেখতে কেমন হতে পারে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু কল্পনায় সেই ফ্রকপরা অনুর মুখখানাই চোখে ভাসছে। খেয়াল হল, বিভু চুপ করে আছে। আর চুপচাপ তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখেমুখে কি একটা চাপা যাতনা। অঙ্কু তখুনি বুঝে নিল কি হতে পারে। হেসে তার বক্তব্যটাই সহজ করে দিল, ওর কাছেও আমার বদনাম করেছিস, এই তো?

যাতনার আবেগ দমন করে বিভু মাথা নাড়ল। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, ভালো কিছু বলিনি।

বেশ করেছিস, ভালো কিছু থাকলে তো বলবি। তা অঙ্কু জাহান্নমে গেছে শুনে অনু কি বলল?

বিশ্বাস করল না ঠিক। তবে অবাক হয়েছিল। আর তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য আরো

বেশি ঝোঁক চেপেছিল। আবার একটু থেমে গ্লানির শেষটুকুও প্রকাশ করেই ফেলল। বলল, তোর সম্বন্ধে ওর এখনো এত আগ্রহ দেখে আমার হিংসে হয়েছিল, রাগও হয়েছিল।

অঙ্কু হাসছে।—সে কি রে! বিয়ের প্রস্তাবও করে বসেছিস নাকি?

...ওর কাছে করিনি, ওর দাদাকে বলেছিলাম। ওই পনের বিশ দিনে আমার যেন কি হয়েছিল। গোত্র বদল করে শাস্ত্রমতেই বিয়ে হতে পারে এই কথা পর্যন্ত বলেছিলাম।...পরদিন ওর দাদা জানালে, বিয়ের কথা এখন তারা কিছু ভাবছে না। আমার বিশ্বাস অনুই আপত্তি করেছে। এর পরেও কোনরকম সঙ্কোচের ধার ধারেনি, আগের মতই হেসে অস্থির হয়ে আমাকে বলেছে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে বিভুদা, ঠাকুমাবুড়ি সেই আট বছর বয়স থেকেই ধরে-বেঁধে আমাকে জলে ফেলেছে। তাছাড়া ওই একজনের ওপর আমার অনেক শোধ নিতে বাকি, দিন এলে হয়। তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলে দিও, খবরদার যেন আর কোথাও বিয়ে করে বসে না থাকে।

অঙ্কু কান পেতে শুনছে। অদ্ভুত লাগছে শুনতে। যে জীবন আর যে সম্বল তার, কেউ কোনদিন তার ঘরে আসবে একবারও ভাবে না। তবু এ-রকম শুনলে বুকের কোথায় যেন একটু দোলা লাগে। আর আশ্চর্য, এই অনুকে সে তো ভুলেই গিয়েছিল একরকম।

বিভু বলল, অনুর ওই কথা শোনার পরেই আমি হিংসায় জ্বলে উঠেছিলাম, আর যাচ্ছেতাই বলেছিলাম তোর সম্পর্কে।

এবারে অঙ্কুর ভালো লাগল না শুনতে। তবু বিভুর এই রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে বিরূপও হতে পারল না। দুই এক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর মন থেকেই ও প্রসঙ্গ ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল সে। লঘু পরিহাসের সুরে বলল, এমন একটা সাংঘাতিক অপরাধও স্বীকার করে ফেলতে পেরেছিস যখন, একেবারে নিষ্কলঙ্ক হয়ে গেছিস, নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়ে ঘুমো এখন। হেসে ফেলল নিজেই, তুই এখনো একেবারে ছেলেমানুষ আছিস বিভু— কতবড় রাজ-রাজেশ্বর আমি, আর বিয়ে করে কোনোদিন কোনো মহারাণী ঘরে আনব কিনা তুই জানিস না? বলে ভালই করেছিলি, কলেজে পড়লেও অনুটাকে এখনো নেহাত বোকাই বলব।

রাত বাড়ছে।

অঙ্কুর চোখে ঘুম নেই। অনেকদিন পরে বিভু সত্যিই যেন বড় আরামে ঘুমুচ্ছে। অঙ্কুর হাসি পেল। বিবেকের দংশনে ভুগছিল। রোগেব দাগে ভরা বিভুর এই মুখটাও সত্যি সুন্দর লাগছে এখন। তার বেপরোয়া মন ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন সুন্দর খুঁজে বেড়ায় সর্বদা। সেই সুন্দরেরই একটু বুঝি ছোঁয়া পেল।

ঘুম আসছে না। ঘুরে ফিরে সেই ছোট্ট অনুর কথাই ভাবছিল। ছেলেবেলার কথা ভেবে এক একসময় নিজের মনেই হাসছিল। কত যে কাঁদিয়েছে মেয়েটাকে ঠিক নেই। অনুটা ভুল করল। ভুল বিভুও করেছে। চেষ্টা করে অঙ্কুর সঙ্গে দেখা করে মনের কথা বললে সে-ই একবার চেষ্টা করে দেখতে পারত। পা টিপে উঠে বাইরের ছাদে এসে দাঁড়াল সে। ঘরের মধ্যে বড় গরম।

নিঝুম রাত্রি। অঙ্কুর থেকে থেকে মনে হচ্ছিল, বড় নিঃসম্বল রাত্রিও।

রাজেশ্বরবাবুকেও এ-সময়ে বাড়িতে পাবে আশা করেনি। কিন্তু তিনি বাড়িতেই আছেন শুনল।

লক্ষ্মীদের বাড়ি থেকে বিমূঢ় মুখেই এখানে চলে এসেছে অন্থু। লক্ষ্মীদের বাড়ি তালা-বন্ধ। সমস্ত জানলা দরজাও বন্ধ। কাছের একটা পানওলার দোকানে খোঁজ করে জানল, দু সপ্তাহ হল বাড়ির বাসিন্দারা চলে গেছে কোথায়।

অন্থু অবাক প্রথমে। শেষের দু মাসে সম্পর্কটা যা দাঁড়িয়েছিল, এভাবে একেবারে না জানিয়ে চলে যাবার কথা নয়। লক্ষ্মীর মা রাজেশ্বরবাবুর মারফৎও একটা খবর দিতে পারত। অন্থুর দরকারী জিনিসপত্র সব এইখানে। বিভুরা আজই দেশে চলে গেল। স্টেশনে তাদের তুলে দিয়ে সে সোজা এইখানেই এসেছে। সম্ভব হলে কালই লাহোর যাত্রার সংকল্প তার। আবার লাহোরে চিঠি লেখালিখি কোনো কাজের কথা নয়। গানের বাড়ির মালিকের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে রওনা হয়ে পড়বে, তারপর যা থাকে বরাতে। কিন্তু বাড়ির দরজায় তালা দেখে ভাবনাটা ঘুলিয়ে গেল। রাজেশ্বরবাবুর সঙ্গেই যদি কোথাও হাওয়া-বদলে বেরিয়ে থাকে তাহলে তো সব সঙ্কল্পই পণ্ড। হাতে টাকা-কড়ি পর্যন্ত নেই। লক্ষ্মীর মায়ের কাছে তার কিছু টাকাও জমা ছিল।

রাজেশ্বরবাবু আছেন শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল কিছুটা। একজন চাকর এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। ভূতপূর্ব ছাত্রের টিকি দেখল না।

দোতলার কোণের দিকের বিচ্ছিন্ন একটা ঘরে রাজেশ্বরবাবু আরামকেদারায় অর্ধশয়ান। অন্থু তার সামনেই একটা মোড়া টেনে বসল। রাজেশ্বরবাবু নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর?

সঙ্গে সঙ্গে অন্থুর দুই চোখ তাঁর মুখের ওপর যেন ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। নাকে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ এসে লাগল। ভদ্রলোকের চোখ মুখও ঈষৎ লাল। এই ভর-সন্ধ্যায় মদ গিলে বসে আছেন। কটা কথা মাথায় ঢুকবে এখন কে জানে।

...ও বাড়ি তালাবন্ধ দেখলাম, কি ব্যাপার?

চলে গেছে। তোমার জিনিসপত্র সব আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, নিয়ে যাও।...আর একটা চিঠি আছে।

উঠে স্যুটকেস খুলে একটা মুখবন্ধ খাম তার হাতে দিয়ে ধুপ করে বসে পড়লেন আবার। চাকরকে ডেকে আদেশ দিলেন, তার জিম্মায় বাক্স বিছানা যা-কিছু ছিল সেগুলি বার করে দিতে। অন্থুকে বললেন, যাও এর সঙ্গে।

ব্যস, আর যেন কোনো কথা থাকতে পারে না। ভদ্রলোকের এ-ধরণের নির্লিপ্ত খুব প্রত্যাশিত নয়। তার সঙ্গে বন্ধু ব্যবহারই করতেন। উদ্দেশ্যটা এখনি ব্যক্ত করবে, না কাল নেশার ঝোঁক কাটলে এসে বলবে, ভাবল একটু। কিন্তু ভিতরের তাগিদ তারও কম নয়। বলেই ফেলল, কাল আমি লাহোর রওনা হব ভাবছিলাম।

যেখানে খুশি যাও, আমি আর কোনো কথার মধ্যে নেই।

অন্থু অবাক। কথাগুলো নেশাগ্রস্তের মত নয়। স্পষ্ট বিরক্তি। ফলে অন্থু একটু দাবির

সুরেই বলল, কিন্তু আপনার বন্ধুর কাছ থেকে তো খাঁ সাহেবের নামে একটা চিঠি নেওয়া দরকার।

কেন দরকার? তিনি রুখে উঠলেন, তোমার গান হল কি না হল তাতে আমার কি? কেন উপকার করব, উপকার করলে কে কবে মনে রাখে?

অন্থু চুপচাপ চেয়ে রইল। এই মেজাজের ওপর কথা বলা নিরর্থক। কাল বরং একবার এসে দেখা যেতে পারে। উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখেই জবাব দিল, মনে রাখার কথা ভাবলে উপকার করা একটু কঠিনই বটে। কিন্তু ওই মেয়েটিকে যত্ন করে পড়িয়েছিলাম বলে আমিও উপকার আশা করে বসে আছি। আচ্ছা...

রাজেশ্বরবাবুর মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হল বোধহয়। বললেন, বোসো। হঠাৎ কি মনে পড়তে একটু উৎসুকও হলেন।— আচ্ছা লক্ষ্মীর মা তোমাকে কি লিখেছে দেখো তো, ফেরা-টেরার কথা কিছু আছে কি না।

অন্থু বসল আবার। যত্ন করে আঁটা বড় খামটা খুলল। খাম থেকে বেরুলো ছ'খানা একশ টাকার নোট। আর কিছুই না।

অন্থু বিমূঢ় আবার। লক্ষীর মায়ের কাছে তার একশ টাকা ছিল। বাকি পাঁচশ টাকা কৃতজ্ঞতার দান ভেবে মুখ লাল হয়ে উঠল। রাজেশ্বরবাবু হালকা সুরে বললেন, বেশ ভালই তো লিখেছে দেখছি, সামান্য টাকা হাতে ছিল, তার থেকেও ছ'শ টাকা কমিয়ে রেখে গেছে।

অন্থু গম্ভীর মুখে বলল, ছ'শ টাকা নয়, পাঁচশ টাকা—একশ টাকা আমার ছিল। পাঁচখানা নোট তাঁর দিকে এগিয়ে দিল, এটা ফিরিয়ে দেবেন।

রাজেশ্বরবাবু এবারে বিস্মিত একটু। বিরক্তও। বললেন, আমি কাকে ফেরত দেব! আমি কি জানি কোথায় গেছে? উত্তেজনা চাপতে চেষ্টা করলেন। তারপর ঠাণ্ডা মুখেই বললেন, ফেরত দেবে কেন, রেখে দাও। দান করার অবস্থা তার নয়, দান করেনি। তোমাকে ভালোবাসত আর শ্রদ্ধা করত বলেই রেখে গেছে। আমাকে অনেকবার বলেছে, ছন্নছাড়া ছেলেটা বেঘোরে না পড়ে, একটু খোঁজ-খবর রেখো। টাকা ফেরত দিয়ে তাকে অশ্রদ্ধা কোরো না।

অন্থুর জীবনে এই স্নেহটুকুরই বড় অভাব, আর বুকের তলায় এইটুকুরই চাহিদা। রাজেশ্বরবাবুর এই অসহায় কণ্ঠস্বরও বিস্ময়ের কারণ। নোট ক'খানা হাতে রেখেই জিজ্ঞাসা করল, তাঁরা এভাবে চলে গেলেন কেন?

আবার ঈষৎ উত্তেজিত দেখালো রাজেশ্বরবাবুকে।—গেল, বাইরের কথাটাকেই তারা বড় ভাবে বলে। আর এদিকেও বনেদী ঘরের মেয়েরা রক্ষিতাকে বরদাস্ত করতে পারে কিন্তু সতীন বরদাস্ত করতে পারে না বলে, গেল লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের মর্যাদাজ্ঞান একেবারে টনটনিয়ে ওঠে বলে।

দুর্বোধ্য। অন্থু হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে।

রাজেশ্বরবাবুর ওখান থেকে বেরুলো আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। অপ্রত্যাশিত কিছুই শুনেছে।

জিনিসপত্র নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে মেসের দিকে চলেছে। একটা ব্যথার

অনুভূতিতে মন ছেয়ে আছে। কিন্তু যে ব্যথা ভিতরটা কুরে খায় সেই ব্যথা নয়। যে ব্যথা দীপ্তি ছড়ায় সেই ব্যথা।

...লক্ষ্মীর মা তাহলে রাজেশ্বরবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী। আর লক্ষ্মী রাজেশ্বরবাবুরই মেয়ে। আশ্চর্য, এই রাজেশ্বরবাবুর প্রতি মনে মনে সে অনেক অবিচার করেছে। অবিচার লক্ষ্মীর মায়ের প্রতিও করেছে। মা মেয়ের প্রতি ভদ্রলোকের এই টান কোনদিন সুচক্ষে দেখেনি।

রাজেশ্বরবাবুর অবস্থা আগে ভালো ছিল না। বনেদী ঘরের পড়ন্ত অবস্থার ছেলে তিনি। থাকার মধ্যে শুধু চেহারাখানা ছিল। বড় ঘরের রাজপুত্তুর মার্কা চেহারা। ছেলের এই চেহারার গুণে রাজেশ্বরবাবুর বাবা যখন বড় ঘরের মেয়ে আনার সঙ্কল্প ফেঁদে বসেছেন, তখনই ছেলের সঙ্গে গণ্ডগোল বাঁধল। তাঁদেরই প্রায় অনুকম্পাভাজন একজনের একটা সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায় ছেলে! বাপ আমল দিলেন না, উল্টে ছেলেকে ডেকে শাসিয়ে দিলেন। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ছেলে বিয়ে করতে চায় খবরটা ভুল, বিয়ে গোপনে করেই বসে আছে, এখন ঘরে আনতে চায়।

রাজেশ্বরবাবুর বাবার বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদাদাও বেঁচে তখন। তাঁরই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হল। নিরুপায় ক্ষোভে বাপ শেষ পর্যন্ত ওই বউ ঘরে আনতে রাজি হলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে অন্য রকম। যেদিন বউ আনার কথা সেদিনই বিষম অঘটন ঘটে গেল একটা। সন্দেশ খেতে গিয়ে শ্বাস-নালিতে সন্দেশ আটকে বুড়ো ঠাকুরদা মারা গেলেন। আর এই অঘটনের সব দায় গিয়ে পড়ল যে বউ ঘরে পা দিতে আসছে তার ওপর।

রাজেশ্বরবাবুর বাবা মা সকলে একবাক্যে ঘোষণা করলেন, ওই অলুক্ষণে বউ ঘরে তুললে ছেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ওই বউ নিয়ে সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে।

কিন্তু সেই অবস্থা নয় রাজেশ্বরবাবুর তখন। আর ভিতরে ভিতরে তাঁরও একটা খটকা লেগেছে। এ-রকম হল কেন? এত বিরূপতা ঠেলে দুই পায়ে দাঁড়ানোর মত শক্তিই বা কোথায় তাঁর?

দিন গড়িয়ে চলল। ব্যাপারটা চাপা পড়তে লাগল। অশান্তির দরুন রাজেশ্বরবাবুর শ্বশুর মেয়েকে নিয়ে দূরে অন্য পাড়ায় চলে গেলেন। ব্যবস্থাটা জামাইয়েরই। তখনো ছলে বলে রাজেশ্বরবাবু টাকা সংগ্রহ করে এনে দিলে তবে এই সংসার চলে।

বছর দুই বাদে বিরাট ধনীর ঘরেই আবার ছেলের বিয়ে দিলেন রাজেশ্বরবাবুর বাবা। ঘর বটে। কালে দিনে সম্পত্তির মালিক হবে ওই মেয়ে। দেখতে চমৎকার সুন্দরী। কেবল একটু খুঁত, খুঁড়িয়ে চলে। ছেলেবেলায় অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পা ছোট। তা যে বাড়ির মেয়ে, এটুকু খুঁত ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। নিখুঁত হলেই বরং এ বাড়িতে ওই মেয়ে আনার চেষ্টা চাঁদের লোভে হাত বাড়ানোর চেষ্টার মত নিষ্ফল হত।

এদিকে লক্ষ্মীর মা তখন অন্তঃসত্ত্বা।

বছর দুই না যেতে রাজেশ্বরবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী টের পেল এত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও স্বামীর আসল টান কোন্ দিকে। রাজেশ্বরবাবুর বাবাও আর নেই তখন। তিনি বেঁচে থাকতেই ছেলের

শ্বশুরবাড়ির কর্তৃত্ব এদিকে বাহু বিস্তার করছিল। শ্বশুরের তিন চারটে মেয়ে, ছেলে নেই। টান থাকাই স্বাভাবিক। তার ওপর প্যায়ের ওই খুঁতের দরুন যে মেয়ে অযোগ্য ঘরে পড়েছে, তার প্রতি টান আরো বেশিই হবে জানা কথা। তিনিই গার্জেন। রাজেশ্বরবাবুর বাবা মারা যাবার পর মেয়ের বাড়ির ভোলই বদলে দিয়েছেন তিনি। সংসার চালাচ্ছেন।

কিন্তু লোকটা যদি এমন অকৃতজ্ঞ হয় তাহলে কোন্ স্ত্রী বরদাস্ত করতে পারে? রাজেশ্বরবাবুর এই স্ত্রী অন্তত পারল না। অশান্তির সূত্রপাত হতে লাগল নতুন করে। এদিক থেকে টাকা সরিয়ে ওদিকের সংসার চালানো হচ্ছে এই সন্দেহ আগেই হয়েছিল। সন্দেহটা খুব মিথ্যেও নয়। অতএব টাকা-কড়ির দখল সম্পূর্ণই এই স্ত্রীটি নিজের হাতে নিয়ে নিল। অঢেল অপচয় হোক আপত্তি নেই, কিন্তু এক কপর্দকও যাতে আর কোনো সংসারে না যায় সেদিকে কড়া চোখ রাখার কর্তব্য পালনে ত্রুটি হল না।

রাজেশ্বরবাবুর মেজাজ বিগড়তে লাগল। এই মেজাজের আঁচ লক্ষ্মীর মাকেই সামলে চলতে হল। কারণ নিজের বাড়িতে তো লোকটা করুণার পাত্র। অভাবের ঘরে স্বভাব দ্রুত বদলায়। মেজাজ লক্ষ্মীর মায়েরও দ্রুত বদলাতে লাগল। মেয়ে কোলে আসার পর থেকে দুশ্চিন্তায় তার সহিষ্ণুতাও কমেছে। ঝগড়াঝাঁটি খিটির মিটির লেগেই আছে।

তিন বছরের মেয়ে নিয়ে লক্ষ্মীর মা একদিন কোথায় চলে গেল জানেন না। পরে জেনেছেন। অনেক বছর পরে। রাজেশ্বরবাবু একটু আধটু খোঁজ করেছিলেন। মেয়েটার জন্য মনও খারাপ হয়েছিল। কিন্তু অক্কুর কাছে তিনি স্বীকারই করেছেন, যতটা তৎপর হয়ে খোঁজ করা উচিত ছিল, তা তিনি করেননি। সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তিনি, হাল ছাড়ারই অবস্থা হয়েছিল তাঁর। এই সময়ে লক্ষ্মীর মায়ের চলে যাওয়াটা প্রায় মুক্তির মতই মনে হয়েছিল তাঁর।

...পশ্চিমে অবস্থাপন্ন এক বৃদ্ধের আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল লক্ষ্মীর মা। যোগাযোগটা হয়েছিল কলকাতায় তার বাবার মারফত। বৃদ্ধ খুশি হয়ে তাকে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে মেয়ের মত থাকবে, নিজের ছেলের মতই বুড়োকে দেখাশুনা করবে এই শর্ত। তাঁর ছেলে আছে তিনটি, ছেলের বউয়েরা আছে, কিন্তু তাঁকে দেখাশুনা করার লোক নেই।

ভালই ছিল লক্ষ্মীর মা। বুড়ো যতদিন ছিলেন, মেয়ের মতই দেখেছেন তাকে। তার এবং তার মেয়ের একটু কিছু ব্যবস্থাও করে যাবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু এগিয়ে এসেছে এ কেউ ভাবতে চায় না। ভেবেছিলেন সময় আছে। কিন্তু একদিন দেখা গেল কিছু না করেই তিনি চোখ বুজেছেন।

এই অঘটনের অনেক আগেই বুড়োর বড় ছেলেটির চোখ পড়েছিল লক্ষ্মীর মায়ের দিকে। রাজেশ্বরবাবুরই বয়সী সেই ছেলে। এমনিতে ধীর স্থির। কিন্তু তাঁর বাসনার আঁচ গায়ে লাগত। বাপ বেঁচে থাকতে যে সুয়োগ পায়নি, চোখ বোজার পর সেই সুয়োগ পেয়েছে। যতদিন সম্ভব লক্ষ্মীর মা চেষ্টা করেছে যুঝতে, শেষে হাল ছেড়েছে। আর ক'টা দিন সময় পেলে, হাতে কিছু টাকা এলে সে পালাবে স্থির করেছিল। কিন্তু সে অবকাশ পায়নি।

ওই বাড়ি থেকে অবশ্য বেরুতে হয়েছে। বুড়োর সেই ছেলে আলাদা বাড়িভাড়া করে বছর কয়েক সাদরে রেখেছে তাকে। কিন্তু মেয়ে ওদিকে বড় হয়ে উঠছে। তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই

কাউকে কিছু না জানিয়ে লক্ষ্মীর মা মেয়ে নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছে আবার। একমাত্র আশা, কোনো প্রতিষ্ঠানে মেয়েকে রেখে যদি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারে। ওই বয়সেই মেয়ের লেখাপড়ার প্রতি খুব ঝোঁক।

কিন্তু এখানে এসেও শেষ পর্যন্ত হতাশা সম্বল। নিরুপায় হয়ে শেষে রাজেশ্বরবাবুকে খবর দিল। তিনি ছুটে এলেন। তাঁর তখন দিন ফিরেছে। শ্বশুর বিগত। মেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। ঘরের স্ত্রীটিও ততদিনে নিজেকে নিষ্কণ্টক ভেবে দেখাশুনার সব ভার তাঁর হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। তা ছাড়া বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আয়েসী হয়ে পড়েছে। খোঁড়া পা নিয়ে বেশি তৎপরতা ভালো লাগে না। টাকায় টাকা আনে। মাথা খাটিয়ে আর টাকা খাটিয়ে রাজেশ্বরবাবুও মন্দ রোজগার করছেন না। কিন্তু বুকের তলায় একটা ব্যথা তাঁর পুঞ্জীভূত হয়েই ছিল। অবস্থা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আরো বেড়েছে। সেই ব্যথা লক্ষ্মীর জন্য আর তার মায়ের জন্য। এই ব্যথা ভুলে থাকার তাড়নায় চাল-চলনও বদলেছে তাঁর। রাত্রিতে অনেকদিনই বাড়িতে থাকেন না। স্ত্রীর তাতে খুব আপত্তি নেই। সেদিনের বড়লোকের মেয়েরা পুরুষের এই-ধরনের একটু-আধটু দোষ দেখে অভ্যস্ত, বরদাস্ত করেও অভ্যস্ত।

লক্ষ্মীর মা বলল, মেয়েকে মানুষ করতে হবে, এ ছাড়া আমি আর কিছু চাই না। মেয়ে তোমার, দায়িত্বও তোমার। যতদিন পেরেছি করেছি, আর পারছি না।

রাজেশ্বরবাবু আর কোনো ওজর-আপত্তি শোনেন নি। মাঝের এই এতগুলো বছরের কথা শোনার পরেও না। মেয়ের ভার নিয়েছেন, সেই সঙ্গে মেয়ের মায়েরও। গোড়ায় গোড়ায় আপত্তি দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে শাসিয়েছেন, তাহলে মেয়ের ভারও নিতে পারবেন না। হস্টেলে বোর্ডিংয়ে রেখে মেয়ে মানুষ করাটা সহজ হয়ে ওঠেনি তখনো। আর বলেছেন, অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমার দখলেই থাকলে না হয়, সেটা এমন আর বেশি কি অসম্মানের হবে।

লক্ষ্মীর মা রাজি হয়েছে। রাজেশ্বরবাবুকে বিমুখ কখনো করেনি, দূরে সরিয়ে রাখেনি নিজেকে। কিন্তু একটা দিনের জন্যেও স্ত্রীর দাবি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়নি। নিজেকে সমর্পণ করেছে, কিন্তু বিনিময় চায়নি। বিচিত্র পরিস্থিতি। মেয়ে বাবা পেয়েছে। কিন্তু মেয়ের মাকে তিনি কিছুই দিতে পারেননি। পারেননি বলেই হয়ত মেয়েও তার এই পাওনাটাকে কোনোদিন বড় করে দেখেনি।

তবু কটা বছর তো ভালই কেটে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেও বাধা উপস্থিত হল। রাজেশ্বরবাবুর ধারণা, বাধা না এলেও মেয়ে তার মাকে নিয়ে চলে যেতই। অনেক আগে থেকেই মাকে নাকি সে বলছিল, প্রথম পরীক্ষাটায় পাশ করলেই তারা কোথাও চলে যাবে। মেয়েদের কোনো প্রাইমারি স্কুলে সে ঠিক চাকরি পেয়ে যাবে। চাকরি করে আরও পড়বে, আরও পরীক্ষা দেবে। এখানে এই পরিচয় নিয়ে তারা থাকবে না। অন্তু যা ভেবেছিল তা নয়, লক্ষ্মীর বয়েস আরও কিছু বেশি। একুশ পেরুতে চলেছে। কম মনে হয়। সে অনেক দিন ধরেই সব জানে, সব বোঝে।

কিন্তু উপলক্ষ স্বরূপ আঘাতটা এই সংসার থেকেই এলো আবারও। রাজেশ্বরবাবুর বাইরে রাত কাটানোটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর গানবাজনার প্রতি আকর্ষণও বাড়িতে

অজ্ঞাত নয় কারো। বড়লোকের সংসারের ঘরণীটি এসব উপেক্ষাই করে আসছিল এতদিন। এই দোষ ত্রুটি আভিজাত্যের অঙ্গ। কোনো রক্ষিতার প্রতি স্বামীর আসক্তি দিনকে দিন বাড়ছে এটুকুই সে আঁচ করেছিল। কখনো-সখনো এই নিয়ে কটূক্তি করত না এমন নয়, কিন্তু বেশি কড়াকড়ি করে কারো বাসনার ধকল সামলাবার মনোবৃত্তিও নেই আর। শুয়ে বসে গড়িয়ে আর পাঁচজনকে হুকুম করে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে।

বন্ধুর অসুখের খবর পেয়ে অঙ্কু চলে যাবার দিন কয়েকের মধ্যে তাঁর এই স্ত্রীটিও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল হঠাৎ। তার হার্টের রোগ ধরেছে। রাজেশ্বরবাবু বাড়ি ছিলেন না। গানের বাড়িতে তাঁর সন্ধানে লোক ছুটেছিল। সেখান থেকে লক্ষ্মীদের বাড়ির হদিস নিয়ে সেই লোক সেখানে গিয়েছিল। রাজেশ্বরবাবু সেখানেও ছিলেন না, গানের বাড়ির মালিকের সঙ্গে অন্য একটা গানের আসরে গিয়ে বসেছিলেন।

লোক ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এখানকার মা মেয়েকে দেখে গিয়েছিল সে। বহুকালের পরিচিত লোক।

রাজেশ্বরবাবু কিছুই জানতেন না। স্ত্রী পরদিনই সুস্থ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার পরেও চুপচাপ ক'দিন। আর আশ্চর্য, ওদিকে লক্ষ্মীর মা-ও যে কেন তাকে কিছুই বলল না, আজও জানেন না।

স্ত্রী দিন কয়েক বাদে জুড়ি-গাড়ি করে হঠাৎ একদিন দুপুরে নিজে এসে এ-বাড়ির মা-মেয়েকে দেখে গেল। সতীন আর সতীনের মেয়ে দেখে গেল। একটি কথাও বলল না। দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে গেল শুধু। তারপর বাড়ি ফিরে হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধালো। চোখ কান বুজে রক্ষিতা বরদাস্ত করা সহজ হয়েছিল, সতীন বরদাস্ত করতে পারেনি।

এদিকে মেয়ে মা-কে তার শেষ কথা জানিয়ে দিল, মা যদি যেতে রাজি না হয়, সে একাই নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াবে।

মা রাজি হয়েছে।

রাজেশ্বরবাবু কিছু টাকা শুধু মেয়ের হাতে দিতে পেরেছিলেন। মেয়ে নিতে আপত্তি করেনি। কিন্তু বেশি না, মাত্র হাজার টাকা নিয়েছিল।... তার থেকেও পাঁচশ টাকা তারা অঙ্কুর জন্য রেখে গেছে।

গোড়ায় গোড়ায় কার ওপর বিরূপ হয়েছিল অঙ্কু?

এই নিঃস্ব রাজেশ্বরবাবুর ওপর? আর ওই মা-মেয়ের ওপর?

সাত

দীর্ঘ আট ন বছরের পরদা তুলে একখানি জীবন-তরঙ্গের সব কটা ঢেউ গোনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। সেই তরঙ্গ কখনো বিশীর্ণ কখনো বিস্তীর্ণ, কখনো ক্ষীণ কখনো ক্ষিপ্র, কোথাও খণ্ডিত কোথাও উত্তাল খরতর।

আজ লক্ষ্ণৌয়ের খলিফা ওস্তাদ জামাল খাঁর দরবারে যে অঙ্কু বসে, তার সঙ্গে আট ন বছর

আগের যোগানন্দপুরের বা কলকাতার বা লাহোরের নূরনওয়াজ খাঁর আশ্রিত অঙ্কুর অনেক তফাত। এই দিনটির পিছনে অজস্র আঘাত আর অজস্র সংঘাত, বহু হতাশা আর বহু বেদনা, অনেক ক্ষত আর অনেক ক্ষতির ইতিহাস।

নূরনওয়াজ খাঁর কাছে একটা বছরও টিকে থাকতে পারেনি সে। সকলের অগোচরে নিঃশব্দে পালিয়ে আসতে হয়েছে। শুধু খাঁ সাহেব জানে কেন সে গেল, আর কেউ জানল না। সব থেকে বেশি অবাক হয়েছিল বোধহয় তারাবাঈ। সে কি আজও জানে?

মন থেকে বাঈজী-কন্যা তারাবাঈকে কোনদিন পছন্দ করেনি অঙ্কু। কিন্তু তার সুনজরে ছিল বলেই তো লাহোরের অমন ওস্তাদ খাঁ সাহেবের নেকনজর লাভ করেছিল সে। খাঁ সাহেব গোড়ায় কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাননি। দেখানোর রীতি নয়। কলকাতার মুরব্বির অনুরোধে তাকে নিতে হয়েছিল বলে নেওয়া। নিজের দু বেলার আহারের সংস্থান করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উর্দু জানে না, ছেলে পড়ানোর কাজ জোটানও দুঃসাধ্য। বেশ দিন কয়েক ঘোরাঘুরির পর এক ব্যবসায়ীর ঘরে খাতা লেখার কাজ জুটল। সামান্য মাইনে। তবে সস্তার দিনে তাতেই চলে যায়। যত দিন কাজ পেল না, লক্ষ্মীর মায়ের দেওয়া টাকাই কিছু ভাঙতে হল। সেই কটি টাকাই মস্ত সম্বল এখন।

খাঁ সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যাপারে খুব বেশি সময় লাগেনি অবশ্য। লাগেনি তারাবাঈয়ের সুপারিশের দরুন। কিছুদিন থাকার পরেই অঙ্কুর মনে হয়েছে, গুরুর ওপর বেশ একটু জোর আছে রমণীটির। সেটুকু শুধু প্রিয় শিষ্যার জোর নয়, রমণীর জোর। অন্য সাগরেদরাও গুরুর মন পেতে হলে আগে এই রমণীটির মন পেতে চেষ্টা করে লক্ষ্য করেছে। গুরুর অনেক হুকুম পরে তার হুকুমে নাকচ হতে দেখেছে।

অঙ্কু এদের মত তার কাছেও ভিখিরীর মত হাত বাড়ালো না। বলিষ্ঠ পুরুষেব মতই এগলো। আর তাতেই সম্ভবত ফলও হল। কয়েকদিন চুপচাপ থেকে একদিন তার বাড়িতে হানা দিল। বলল, আমি খাঁ সাহেবের কাছে এসেছি বটে, কিন্তু সব থেকে বেশি সাহায্য তুমিই করবে মনে মনে এ-রকম একটা ভরসা ছিল বলেই চোখ কান বুজে চলে আসতে পেরেছিলাম। কিন্তু এসে মনে হচ্ছে তুমি এই প্রবাসী অতিথিটিকে চেনই না।

তারাবাঈ এ-রকম স্পষ্ট অভিযোগ শুনতে অভ্যস্ত নয়। সে কৌতুক বোধ করল। বলল, আমি তোমাকে কিছু ভরসা দিয়েছিলাম বলে তো মনে পড়ে না।...

ভরসা মুখে দাওনি, কিন্তু আমি পেয়েছিলাম। আমি কলকাতায় তোমার মধ্যে যে শিল্পীকে দেখেছিলাম সে ভারী প্রসন্ন, উদার—দরদভরা মন তার। আমি তাকেই দেখে চলে এসেছি।

তারাবাঈ হেসে উঠল, বলল, তোমার চাটুবাক্যের ওপরও বেশ দখল আছে দেখছি।

অঙ্কুও হাসল। বলল, কটুবাক্যের ওপরেও আছে। এ-ভাবে হতাশ হয়ে ফিরতে রাজি নই। তোমাদের এ-রকম নির্লিপ্ত দেখলে আমি হাঙ্গারস্ট্রাইক শুরু করব, তার আগে বাংলাদেশের সব কাগজে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব কেন হাঙ্গারস্ট্রাইক করছি। তারপর যদি প্রাণে না বাঁচি, সেখানে বেশ একটা হৈ চৈ হবে, গান না শিখেও আমার বেশ নাম হয়ে যাবে, কিন্তু তোমাদের সকলে নির্দয় বলে জানবে।

তারাবাঈ হেসে সারা। বলল, আচ্ছা তোমাকে হাঙ্গারস্ট্রাইক করতে হবে না, দেখি কি করতে পারি।

গোড়ায় গোড়ায় নিজের ক্ষমতার মর্যাদা রক্ষার দায়েই তারাবাঈ সচেষ্ট হয়েছিল। অঙ্কুর ওই হাঙ্গারস্ট্রাইকের হুমকি খাঁ সাহেবকে হাসিমুখে শুনিয়েছিল। অঙ্কুর সামনেই। শিষ্যাকে প্রসন্ন দেখে খাঁ সাহেবও প্রসন্ন হয়েছিলেন। অঙ্কুকে ডেকে বলেছিলেন, আয় বেটা, তোর শেখার হিম্মৎ কেমন দেখি।

গুরুর প্রিয়পাত্রীকে প্রায় গুরুর মতই সমীহ করে থাকে অপর অনুগ্রহপ্রার্থীরা। সেটাই চিরাচরিত রীতি। বরং অনেক সময় সমীহ আরো বেশি করে। কারণ তার কোপে গুরুর কোপের মাত্রা অবিশ্বাস্য রকম চড়তে দেখা যায়। ফলে তারাবাঈয়েরও অনুগ্রহপ্রার্থীর সংখ্যা কম নয়। আর সর্বদা বিগলিত প্রার্থীরই মুখ তাদের। অঙ্কু এদের ব্যতিক্রম। সেও অনুগ্রহপ্রার্থী বটে, কিন্তু সে পুরুষের মতই এগিয়েছে, পুরুষের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। এই ব্যতিক্রম তারাবাঈয়ের ভালো লেগেছে। সেটা অঙ্কুও অনুভব করতে পেরেছে। পেরেছে বলেই আচরণে ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছে সে। গান লক্ষ্য, এই লক্ষ্যে পৌঁছুনোর তাগিদে দুই একটি রমণীর জীবনে নিভৃতচারী হতেও আপত্তি নেই তার।

অঙ্কু সুরসিক নয়। কিন্তু এই একটা বছর প্রগলভ হয়ে উঠেছিল সে। বানিয়ে কতরকমের গল্প শুনিয়েছে তারাবাঈকে, কতভাবে হাসিয়েছে ঠিক নেই। নিজের অল্প বয়সের প্রেমের গল্পও শুনিয়েছে তারাবাঈকে। না, অনুর কথা তখন মনেও আসেনি। বানানো গল্প বলেছে। তার সমবয়সী একটা মেয়েকেই নাকি ভয়ানক ভালবাসত সে। সাংঘাতিক ভালবাসত। একবার তাকে চিঠি লিখল, ওকে সেই মেয়ে বিয়ে করতে রাজি না হলে নির্ঘাত পুকুরের জলে ডুবে মরবে। চিঠি পেয়ে সেই মেয়ে জবাবে লিখল, যেদিন ডুবে মরবে সেদিন যেন অঙ্কু অতি অবশ্য তাকে লিখে জানায়। সে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখবে। আর আগে কাউকে বলে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতাও করবে না। মরা হয়ে গেলে জাল ফেলে যেভাবে মাছ তোলা হয় সেইভাবে অঙ্কুকে তোলার ব্যবস্থা করবে।...এর কিছুদিনের মধ্যেই সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল আর অঙ্কুর এত রাগ হয়ে গেল যে নেমন্তন্ন খেতে এসে সের দেড়েক মাংস খেয়ে ফেলল।

এসব গল্প শুনতে তারাবাঈয়ের ভালো লাগে খুব। এই ভালো লাগাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। শিল্পীর আড়ালে একটি বুভুক্ষু রমণী উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। নিভৃতের হৃদ্যতা বাড়তে লাগল। নিভৃতের গান ভিন্নতর ধারায় বইতে লাগল।

লংগর তুরক জিন ছুঁবো মোরী গগরিয়া
ভারী অব দেউঁ গারী।
হোঁ ব্রিজনারী নিরখ নিরখ সব
হস হস দে মোহে তারী।

তুমি একটি আস্ত লম্পট, আমার কলস ছুঁয়ো না বলছি, ছুঁলে ভয়ানক গালি দেব বলে দিলাম। দেখছ না, ব্রজনারীরা সব দেখে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে!

জবাবে কখনো হেসে কখনো বা প্রচ্ছন্ন করুণরসে আবহাওয়া ভারী করে তুলতে চেষ্টা করেছে অঙ্কু,

ক্যায়সে সুখ শোবে নিন্দরিয়া
প্যারী কি মূরতি চিত চঢ়ি।

কেমন করে ঘুমুব? আমার ঘুম তো আসছে না, চোখ বুজলেই প্রিয়ার মুখখানি যে আমার চোখে ভেসে উঠছে।

তার পরে বছর না ঘুরতে সেই একদিন।... গভীর রাত্রি পর্যন্ত গান হয়েছে। নূরনওয়াজ খাঁর ওখানে আসর না বসলেই এখানে বসে। কিন্তু এখানকার আসরে গায়ক দুজন আর শ্রোতা একজন। দুজনেই গায়, একজন গাইলে আর একজন শোনে। গান ছাড়াও রাত গড়ায় অনেক দিন। অঙ্কু হাল ছেড়েছে, সে নীতির দিকে তাকায় না, নীতির ভ্রূকুটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। ধীরে সুস্থে রয়ে সয়ে এক রমণী যেন গ্রাস করছে তাকে। তার যেন তাড়া নেই খুব। তবু অঙ্কুর থেকে থেকে মনে হয়, এই গ্রাসের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছতে আর দেরি নেই। তারাবাঈয়ের নিভৃত সান্নিধ্য আর নিভৃতের অন্তরঙ্গ স্পর্শে উন্মাদনা আছে বটে, কিন্তু এই পরিস্থিতি একদিনের জন্যেও খুব কাম্য মনে হয়নি তার। থেকে থেকে মনে হয়েছে, এই বাস্তব পরিহার করেই লক্ষ্যের দিকে এগনো সম্ভব হলে বুঝি ভালো হত।

সকালে এসে দেখল খাঁ সাহেব একলা ঘরে গুম হয়ে বসে আছেন। তাঁর দিকে অঙ্কুর চোখ ছিল না খুব। কতটুকু কি আদায় করে নেওয়া যেতে পারে সেদিকেই লক্ষ্য ছিল শুধু। মুখের দিকে চেয়ে অঙ্কু হঠাৎ থমকে গেল কেমন। খাঁ সাহেব একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে। গম্ভীর। অঙ্কু তাঁর গাম্ভীর্যের পরোয়া করে না খুব। নিজের জোর সে ভালই জানে। এই জোরের কাছে বৃদ্ধ গুরুটি অসহায় এখন। মোটামুটি যত্ন করেই খাঁ সাহেব তাকে তালিম দিচ্ছেন এখনো, কিন্তু কার ভ্রূকুটির ভয়ে যে দিচ্ছেন সেটা অঙ্কু ভালই জানে।

তবু আজ কেমন যেন লাগছে অঙ্কুর। হঠাৎ মনে হল, বুড়ো শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে। অনেকদিন তাঁকে হাসতে দেখেছে কিনা মনে পড়ল না। খাঁ সাহেব বিনা বাক্যে তানপুরা টেনে নিলেন। নিজে সচরাচর তানপুরা ধরেন না, সাগরেদরা ধরে। এই সকালে এক সে ছাড়া সাগরেদ কেউ নেই এখন। হঠাৎ যে ঝঙ্কার উঠল, অঙ্কুর মনে হল বাজনা নয়, আর্তনাদ একটা।

সমস্ত দিনে একটিও কথা হয়নি। থমথমে মুখ। সন্ধ্যায় শুধু বললেন, রাতে দরকারী কথা আছে তার সঙ্গে, এখানেই থাকে যেন।

সেই নিদাঘ রজনীতে বৃদ্ধ ওস্তাদ নূরনওয়াজ খাঁ এসেছিলেন তার কাছে। গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন। ভিক্ষে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। দিবি?

অঙ্কু নির্বাক। সশঙ্ক দৃষ্টি।

বৃদ্ধ খাঁ সাহেব বলেছিলেন, একটা 'চীজ'ও যদি তোকে দিয়ে থাকি, তুই চলে যা এখান থেকে। তোর উমর আছে, রক্তের জোর আছে—আমার কি আছে?

ডাকসাইটে ওস্তাদ নূরনওয়াজ খাঁ সাহেবের সেই ভিক্ষার মূর্তি অঙ্কু ভুলতে পারেনি।

আজকের এই সদ্য বর্তমানও সেদিনের সেই ইতিহাসের শেষ ঝাপটা কিনা বলা যায় না।

ঘুরতে ঘুরতে আজ লক্ষ্ণৌয়ে জামাল খাঁর এই আসরে এসে ঠেকেছে সে। পরিণতির ওই মোহনা থেকেও আবার কোথায় ছিটকে পড়বে, তা নিয়েও আর মাথা ঘামায় না।

আজ যদি আশার নৌকোয় বসতে পায়, কালকের দিকে তাকাবে না। নৌকোটার তলায় ফুটো কিনা তা-ও দেখবে না। কাল যদি মাঝদরিয়ায় ভাসতে হয়, কাল যুঝবে, কাল তীর খুঁজবে। আজকের দিনটা কালকের অনিশ্চয়তা দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখতে আর রাজি নয় সে।

এই ক'বছরে অঙ্কু অনেক দেখেছে। সুরের রাজ্যে অ-সুরের অনেক হানাহানি দেখেছে। অনেক নীচতা হীনতা হিংস্রতা ক্রূরতা দেখেছে। সাধনার পাশাপাশি অনেক—অনেক তামসিকতা দেখেছে। নিষ্ঠার পাশে অন্তরঙ্গ দোসরের মত অনেক অপচয়, অনেক ব্যভিচার দেখেছে।

না, আর তার কোনো মোহ নেই।

একদিন পান্নালালের সাধনাটাই পরম লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর মত মনে হয়েছিল তার। সাগরটাকে ছোট জলাশয় ভেবে অন্তরের তাড়নায় নির্দ্বিধায় লাফিয়ে পড়তে পেরেছিল তার মধ্যে। ওটুকু পার হলেই তো আশার তীর।

কিন্তু আশা-বৈতরণীর পারাপার নেই। যত এগোয়, তীর নেই, তল নেই, কূল নেই। আশা মরীচিকা। আলেয়ার মত কাছে আসে, দূরে সরে। দিকভ্রান্ত যে, আলেয়ার হাতছানি থেকে তার অব্যাহতি কোথায়?

পড়ি মেরি নাইয়া মাঝধার
আব কওন্ করে সাঁই পার।

নৌকো আমার মাঝদরিয়ায় পড়ে আছে, কে আমাকে হাত ধরে পার করে দেবে?

কিন্তু বেহাগের এই কান্না তার একান্ত নিভৃতের কথা। বাইরে বরং নটরাজের পূজারী সে। সেই মূর্তি কেমন?—স্বর্ণ-গৌর বর্ণ, অতিপ্রতাপ যোদ্ধাবেশী, শত্রু-শোণিতে রক্তবর্ণ, অশ্বারূঢ়, রণভূমিতে বিচরণশীল নট্ট-নারায়ণ—তার সঙ্গে আপস নেই কারো।

কিন্তু বাইরেরটা শুধু বাইরের জন্যে, নিভৃতের কথা যত নিভৃত হোক আর কেউ না শুনলেও অঙ্কু নিজে তো শোনে। সেখানে শুধু অবিরাম হাহাকার আর অফুরন্ত আকৃতি। দু-হাত তুলে এক শিশু মাঝদরিয়ায় ভাসছে আর অক্লান্ত যুঝছে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা, যদি কেউ হাত ধরে।

পড়ি মেরি নাইয়া মাঝধার
আর কওন্ করে সাঁই পার।

কে পার করবে? হাত ধরে কে পার করে দেবে আমাকে?

এ যাবৎ হাত অনেকে ধরেছে। ধরে কেউ আরো গভীরে নিয়ে গেছে তাকে, কেউ বা নির্মম অবজ্ঞায় সে হাত ছেড়ে দিয়েছে। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আশার আলো নিবিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এত বছরে যোগানন্দপুরের সেই অঙ্কুর সঙ্গে আজ এই অঙ্কুর যত তফাতই হাক, মূল বিশ্লেষণ করতে বসলে অনেক মিলও চোখে পড়বে। বিশেষ করে তার সেই চিরাচরিত অসহিষ্ণুতা আর ক্ষোভের মিল। কেউ এসে হাত ধরলে ডুবন্ত শিশুর মতই সে তাকে বিশ্বাস

করেছে, আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। একান্ত নিষ্ঠায় তার পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করেছে, তার গোলামী করেছে, তার বহু অনাচার আর স্থূল অভ্যাসের দাসত্ব করেছে।

কিন্তু যে মুহূর্তে বঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতার চাবুক পড়েছে গায়ে—সেই মুহূর্তে ভিন্ন মূর্তি তার। সংহার মূর্তি। শেষ বিদায়ের আগে, আবার অকূলে ভাসার আগে, এ পর্যন্ত অনেক কাণ্ডারীকে সুরের রাজ্য থেকে ত্রাসের রাজ্যে নিয়ে গেছে সে। অনেককে নাকের জলে চোখের জলে নাজেহাল করে ছেড়েছে।

কিন্তু এত পরিবর্তন সত্ত্বেও অক্ষু পিছন ফিরে তাকায়নি বড়। পিছনের টান নেইও কিছু। মা তো কলকাতায় থাকতেই চোখ বুজেছেন। তার হদিস পেলেই বিভু অবশ্য চিঠি লেখে। কিন্তু হদিস পায় না বড়। তবে তার সঙ্গে মনের যোগটা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি অক্ষুর। ক্বচিৎ কখনো সে-ই এক-আধখানা চিঠি লিখে হদিস দেয়। বিভুর বাবা বেনাখুড়ো অনেকদিন মারা গেছেন, তার কিছুকাল বাদেই লিখেছিল ওর মা-ও আর নেই। বিভুর শেষ চিঠি পেয়েছিল অক্ষু কাশী থাকতে।

আর সেই চিঠি পেয়েই হয়তো কাশী ছেড়েছিল সে।

সে কাশীতে আছে জেনে একটু অবাক হয়েই লিখেছিল বিভু, মৃগাঙ্কজ্যাঠা অর্থাৎ তার বাবার সঙ্গে এ পর্যন্তও কি তার দেখা হয়নি? তিনি তো বহুদিন ঘর-দোর তালাবন্ধ করে কাশীতে তীর্থবাসী হবার জন্যে রওনা হয়েছেন। চিঠি পেয়ে অক্ষু চুপচাপ দিন কয়েক ভেবেছিল।

দেখা না হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কটা বছরের মধ্যে অক্ষু ঘুরে বেড়াবার জন্য কটা দিন চোখ খোলা রেখে কাশীর পথে বেরিয়েছে হাতে গোনা যায়। এখানে অতিবৃদ্ধ তবলচি মিশিরজীর কাছে সে তবলা শিখছিল তখন। বারাণসীর নামকরা তবলার পণ্ডিত মিশিরজী। বয়সের ভারে মেরুদণ্ড দুমড়ে বেঁকে গেছে, চোখে ভালো দেখেন না, বযস আঙুল কটার সব রসও যেন নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। কিন্তু আসরে তবলা নিয়ে বসলে তবলার ওপর ওই দশ আঙুলে তখনো ঝড় তুলতে পারতেন মিশিরজী।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অক্ষু বামুনের ছেলে বলেই হোক আর তার আগ্রহ দেখেই হোক, বৃদ্ধটির স্নেহদৃষ্টি পেয়েছিল। যত্ন করে তবলা শিখিয়েছিলেন, শেখাচ্ছিলেন। আচরণে অন্তত অক্ষু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। গান লক্ষ্য তার, তবলা যে লক্ষ্য নয় তা কখনো বলেনি। আর তার গুরুরও সন্দেহের কারণ ঘটেনি কখনো। বাঙালী শিষ্যর নিষ্ঠার মধ্যে ফাঁকি ছিল না কোথাও। সেই নিষ্ঠা আর একাগ্র অধ্যবসায়ের ফলে অক্ষুর দুহাতের আঙুল কটার পক্ষাঘাত হলেও অবাক হবার কিছু ছিল না বোধহয়।

বাবার সঙ্গে অক্ষুর দেখা না হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু দেখা যে হতে পারে, সে চিন্তাটা এখন তার মনে এলো। অনেক দিনের পুঞ্জীভূত অভিমান তাঁর বুকে, সেই অভিমান নিয়েই তিনি দেশ ছেড়েছেন, ঘর ছেড়েছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে সে। দেখা হলে কি দেখবেন তিনি? ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখবেন?

সেই রাতেই নিঃশব্দে কাশী ছেড়ে চলে এসেছিল অক্ষু। মিশিরজীকেও জানায়নি।

ভেবেছিল সব শেষ হয়ে গেল। হোক সব শেষ। হলে শান্তি। কিন্তু তা হবার নয়। বুকের

অগ্নিদগ্ধ শুষ্কতার তলায় তলায় সৃষ্টির তোড়জোড় আর তার আয়োজনের বিরাম নেই। ছন্নছাড়ার মত ঘুরছে শুধু। বারাণসী লক্ষ্ণৌ গোয়ালিয়র কানপুর রামপুর। কিন্তু সুরাঙ্গনার অন্তঃপুর তেমনি অনেক দূর।

পড়ি মেরি নাইয়া মাঝধার
আব কওন্ করে সাঁই পার।

...হাত ধরে পার করার লোক কেউ নেই।

লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ জামাল খাঁর এই মজলিশে অঙ্কু আগেও এসেছিল। মাস ছয়েক আগে। এখন যেমন মজলিশ-ঘরের এর কোণে বসছে সে, তখন বাইরের বারান্দায় বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সমস্ত ভারতবর্ষে খাঁ সাহেবের নাম-ডাক। এক কালে তাঁর দর্শনলাভও সৌভাগ্য ভাবত অঙ্কু। এখন অবশ্য সে মোহ গেছে। গান আর মানুষ এই দুটো আলাদা করে দেখতে শিখেছে সে। অনেক দেখে শিখেছে আর অনেক ঠেকে।

মনে অনেক দিনের সংগোপন আশা খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বাঁধবে, তাঁর শিষ্য হবে। সে সুযোগ সহজলভ্য নয় আদৌ। গানের সাধকরা বস্তুতন্ত্রে অথবা ভোগবিলাসে বিমুখ নন সকলে। অন্তত অঙ্কু যাঁদের দেখেছে, গান বাদ দিলে প্রায় বেশির ভাগই তাঁরা ঘোর তামসিক সম্ভোগের উপাসক। অনেক টাকা থাকলে অঙ্কুর এগনো সহজ হত। অনেক ছেড়ে একেবারে কপর্দকশূন্য সে। দুবেলা ভালমত আহার জোটে না, রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। টাকা ছাড়া আর যা থাকলে এঁদের দাক্ষিণ্য লাভ করা সহজ হয়; সে বস্তু আরো দুর্লভ। তৃতীয় পথ, গুরুর গোলামী করা বা দাসত্ব করা। অঙ্কু সেবা বলতে রাজি নয়, কারণ যা করতে হয়, তার সঙ্গে এ যাবৎ শুচিতার যোগ দেখেনি।

কিন্তু দাসত্ব করার সুযোগই বা সহজে মিলবে কেমন করে। সেখানেও ভক্তবর্গের মধ্যে রীতিমত কমপিটিশন। সেই লাহোরের মতই। তার থেকেও অনেক বেশি। প্রথম বার জামাল খাঁ সাহেবের মজলিশে এসে অঙ্কু নিরাশ হয়েছিল। খাঁ সাহেব গুণী কেমন জানে, লোক কেমন তখনো জানে না। কিন্তু এসে দেখে নাম-যশ অনুযায়ী তাঁর ভক্ত-পর্ষদ সংখ্যাও অন্যের চতুর্গুণ। মোসাহেব আর ভক্তজন পরিবৃত হয়ে থাকেন সর্বদা। কাছে ঘেঁষার উপায় নেই।

তবু উপায় একটা বার করেছিল অঙ্কু। তার প্রাণ-সঙ্কট, উপায় না বার করলে চলবে কেন। চেষ্টা-চরিত্র করে কিশোর মহারাজকে হাত করেছিল সে। খাঁ সাহেবের খাস তবলচি নন্ কিশোর মহারাজ, কুন্তীবাঈয়ের খাস তবলচি।

নামে কিশোর হলেও মহারাজটি বয়সে প্রবীণ। ধীর গম্ভীর মানুষ। প্রায়ই অসুখে ভোগেন বলে মেজাজও ঈষৎ রুক্ষ। কিন্তু সেই রুক্ষতার তলায় কোমল প্রাণটি আবিষ্কার করেছিল অঙ্কু। কাশীর অতি বৃদ্ধ মিশিরজীর প্রথম জীবনের শিষ্য তিনিও, সেই সুবাদে পরিচয়। তার ওপর কিশোর মহারাজ অসুস্থ ছিলেন তখন, সেই সুযোগে নিঃসঙ্গ মানুষটির আরো কাছে আসার সুযোগ হয়েছিল তার।

দুদিনের পরিচিত এক বাঙালী ছোকরার দিবারাত্র এভাবে তোয়াজ করে তাঁকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করার চেষ্টা দেখে কিশোর মহারাজ প্রথম প্রথম বিরক্ত হয়েছিলেন। এই সেবার

পিছনে স্বার্থের গন্ধটা তাঁরা বড় বেশি চেনেন। বলেছিলেন, খাঁ সাহেবের শিষ্য হবার জন্যে আমার মোসাহেবী করে তোমার কিছু লাভ হবে না বাবুজী, মিছিমিছি দিনরাত এখানে পড়ে আছে কেন? আমার বেমার আমি নিজেই সারাতে পারব, তোমার সেবার দরকার নেই।

ছলা-কলা বাদ দিয়ে অঙ্কু সহজ রাস্তাই নিয়েছে। বলেছে, তোমার এখানে আছি বলে আমার দুবেলার খাওয়াটা জুটছে মহারাজ, থাকার জায়গাও। এখান থেকে গেলে কিছুই জুটবে না। সেবা সেই জন্যেই করছি—তোমার কৃতজ্ঞ বোধ করার কোন কারণ নেই।

কিশোর মহারাজ আর কিছু বলেননি। চেয়ে চেয়ে শুধু দেখেছিলেন খানিকক্ষণ। এরও আগে অঙ্কু তবলা বাজিয়ে শুনিয়েছিল তাঁকে। মিশিরজীর শিষ্য শুনে তিনিই বাজাতে বলেছিলেন। শুনে মহারাজ খুশি হয়েছিলেন। তার বোল চক্রধার গৎ তোড়া পেশকারের প্রশংসা করেছিলেন। অবাক হয়ে বলেছিলেন, তবলা নিয়েই থাকো না। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

অঙ্কু জবাব দিয়েছে, তাহলে আর মিশিরজীকে ছেড়ে এলাম কেন মহারাজ?

এর থেকে বড় যুক্তি আর হয় না। কিশোর মহারাজ চুপ করে গিয়েছিলেন। পরে সুযোগ বুঝে অঙ্কু নিবেদন পেশ করেছে একদিন।—আমার যা হোক একটা গতি করে দাও মহারাজ, বড় আশা, খাঁ সাহেবের কাছ থেকে কিছু পাব।

শোনা মাত্র মেজাজ বিগড়েছিল কিশোর মহারাজের, ক্যায়সে, বাতাও?

খাঁ সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, কি করে গতি করব, কুন্তীর কাছে সুপারিশ করে?

অঙ্কু জবাব দেয়নি। ভিতরে ভিতরে সেটুকুই প্রত্যাশা। প্রবীণ মহারাজটির কাছে এটুকু অসম্ভব প্রত্যাশা কিছু নয়। খানিক চুপ করে থেকে শান্তমুখেই বলছেন তিনি, কুন্তীবাঈ কারো জন্যে কিছু বলে না বাবুজী, এমন কি নিজের জন্যেও না। তবে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার, এখানে এলে তুমিই তাকে বলে দেখো। সুবিধে বুঝলে আমিও বলব।

মহারাজের অসুখের সময় কুন্তীবাঈকে মাঝে মধ্যে খোঁজ-খবর করতে আসতে দেখেছে অঙ্কু। কিন্তু অঙ্কু তার ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি। মহারাজ তিক্ত হেসে আবার বলেছিলেন, তাকে একটু হাত করতে পার কিনা দেখ, হাত করা সহজ নয়, কিন্তু পারলে হবে—মেয়েটা ভালো।

শোনা মাত্র অঙ্কুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। তারাবাঈকে মনে পড়েছিল তার। আবারও এক রমণীর জটিলতার মধ্যে পা বাড়াবে?

সুযোগ-সুবিধা পেলে তাতেও অঙ্কুর আপত্তি ছিল না হয়তো। গান পাবার সঙ্গে কোন কিছুরই দ্বন্দ্ব নেই তার। কিন্তু সুযোগ পাবে কেমন করে, কুন্তীবাঈ তারাবাঈ নয়—এই মূর্তির চতুর্দিক যেন নীরব অথচ ভারী স্পষ্ট একটা নিষেধ দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে অন্তত সেই রকমই মনে হত অঙ্কুর।

তাছাড়া ওস্তাদ নওয়াজ সাহেবের সঙ্গে তারাবাঈ-এর যে সম্পর্ক, কুন্তীবাঈ-এর সঙ্গে জামাল খাঁর সে সম্পর্কের সম্ভাবনা মনের কোণেও উঁকিঝুঁকি দেয়নি অঙ্কুর। এই বয়সেই কুন্তীবাঈ-এর প্রতিষ্ঠা মেয়ে-শিল্পীদের অন্তত ঈর্ষার কারণ। জামাল খাঁর মেয়ের বয়সী, সব থেকে প্রিয় শিষ্যা সে। খাঁ সাহেব সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলেই শিখিয়েছেন তাকে, শেখাচ্ছেন। তার

যশে গুরুর যশ আরো ছড়িয়েছে।

অক্ষু তখনো সাহস করে খাঁ সাহেবের মজলিশ-ঘরে পা দেয়নি। বাইরে থেকে অন্য সকলের সঙ্গে দেখত কুন্তীকে—সকলের থেকে স্বতন্ত্র মনে হত তাকে। তার একটু সুনজরের আশায় খাঁ সাহেবের কত হোমরা-চোমরা শিষ্য উদ্‌গ্রীব—অক্ষু পাত্তা পাবে কোথা থেকে? অক্ষু দেখত সভাপার্ষদবর্গ রীতিমত সমীহ করে চলে তাকে, শ্রদ্ধা করে। তারাবাঈ-এর প্রতি মোসাহেবদের শ্রদ্ধার সঙ্গে এই শ্রদ্ধার যেন মূলে তফাত। তারাবাঈ শ্রদ্ধা চাইত, কিন্তু এই শ্রদ্ধা স্বতঃস্ফূর্ত। গুরুর আদেশ হলে দুই একটা সুরের হয়তো একটু-আধটু মহড়া দিত কুন্তীবাঈ। পার্ষদরা তাই শুনেই আ-হা আ-হা করে গলে যেতে চাইত। কুন্তী হাসত হয়তো একটু, কখনো মাথা নুইয়ে উচ্ছ্বাস গ্রহণের সামান্য সৌজন্য দেখাতো।

বাইরে থেকে অক্ষু শুনত, আর দেখত চেয়ে চেয়ে। তারই সমবয়সী হবে, আটাশ-উনত্রিশ; কিন্তু ভাগ্যবতী আর কাকে বলে।

কুন্তীকে দেখে 'বাঙালী' রূপের কথা মনে হত অক্ষুর। বাংলা দেশবাসিনী বাঙালী নয়। রাগিণীর নাম বাঙালী। ভৈরব-পত্নী, ভৈরব-অঙ্গনা বাঙালী। তার রূপ আছে একটা। কাঞ্চীদাম বিভূষিতা, হাতে পুষ্পপাত্র, দীর্ঘ-নয়না, বাম হাতে উজ্জ্বল ত্রিশূল, তরুণারুবর্ণা, জটামণ্ডিতা—সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করা থাকলেও রূপে দশদিক আলো।

কুন্তীবাঈয়ের বাঁ হতে ত্রিশূল নেই, কিন্তু ত্রিশূলের মতই অমোঘ সেই অদৃশ্য নিষেধের ইঙ্গিত আছে। অঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত নয়, কিন্তু সর্বাঙ্গে যেন সব কিছু নিঃশেষের একটা প্রশান্ত প্রলেপ মাখানো।

কিশোর মহারাজ কুন্তীবাঈ-এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই সেবারের মত লক্ষ্ণৌ ছেড়েছিল অক্ষু। আলাপের বাসনা আর ছিল না, জামাল খাঁর কাছে নাড়া বাঁধার সঙ্কল্পও ত্যাগ করেছিল। গানের জন্যে সব করা যায়, সব বরদাস্ত করা যায় জানত।

কিন্তু কিছু যে যায়ও না জানত না।

কিশোর মহারাজ ছোট্ট একটা কাহিনী উদঘাটন করেছিলেন এক সন্ধ্যায়। তারই ধাক্কায় অক্ষু সেবারের মত ছিটকে চলে গিয়েছিল লক্ষ্ণৌ থেকে। কুন্তীকে তারাবাঈ-এর চোখে দেখলে হয়তো যেত না।

বারাণসীর উপানন্দ ভাসের নামটা শোনা ছিল অক্ষুর। বারাণসীতে থাকতেন না তিনি, থাকতেন এলাহাবাদে। এখনো সেইখানেই আছেন বোধহয়। কিন্তু কোথায় কোন্ নিভৃতে বাস করেন তিনি, এখন প্রায় সকলেরই অগোচর সেটা। মস্ত ধ্রুপদ আর ভজন সাধক তিনি। কোনো আসর বা সভায় তাঁর সাক্ষাৎ এখন আর মেলে না বলেই হয়তো তাঁর গানের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক রটনা শোনা যায়।

পণ্ডিত ভাসের একমাত্র কন্যা কুন্তীবাঈ। বুকের পাঁজর। শিশু অবস্থা থেকে গানের আর সুরের আবহাওয়ায় মানুষ করেছেন তাকে। নিজে গান শিখিয়েছেন দিনের পর দিন, বছরের পর

বছর তালিম দিয়েছেন। তখন থেকেই কিশোর মহারাজ তবলা বাজাতেন কুন্তীর সঙ্গে।

কিন্তু ধ্রুপদ বা ভজনের সঙ্গে চিত্তের যোগ হল না কুন্তীবাঈএর। খেয়ালের দিকে ঝোঁক তার, সে খেয়াল শিখবে ঠুংরি শিখবে। কারো সত্তার তাগিদে বাধা দেবার মানুষ নন পণ্ডিত ভাস। নিজেও তিনি খেয়ালের কম বড় ওস্তাদ নন। শেখাতেন, কিন্তু শিখিয়ে আনন্দ পেতেন না। কারণ নিজেকে তিনি ততবড় খেয়ালের পণ্ডিত আদৌ ভাবতেন না।

ওস্তাদ জামাল খাঁরও নিবাস তখন এলাহাবাদে। পণ্ডিত ভাসের সমবয়সী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরস্পরের গুণমুগ্ধ। এই দুজনের জন্যেই গোটা এলাহাবাদের বাতাসে সুর লেগেছিল।

মেয়েকে বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন তিনি। বললেন, খেয়ালই যদি শিখতে চাও, তাঁর কাছে যাও—খেয়ালে তিনি আমার থেকে অনেক বড়। কুন্তীকে পাঁচ বছর বয়স থেকে দেখে আসছেন জামাল খাঁ, অপরিসীম স্নেহ করতেন। বন্ধুকে বলতেন, মেয়ে তোমার আমাদের দুই ওস্তাদকেই ছাড়াবে দেখো। সাদরে শিষ্যা গ্রহণ করলেন তিনি।

খেয়ালের পেশা হিসেবে এক সময় লক্ষ্ণৌয়ের পরিবেশ বেশি উপযুক্ত মনে হল খাঁ সাহেবের। সেই সময়ের একজন অনুরাগী নবাব ভক্ত মোটা মাসোহারার লোভও দেখিয়েছিলেন তাঁক। তিনি লক্ষ্ণৌ চলে এলেন। ইতিমধ্য কুন্তীর নাম-ডাক ছাড়াচ্ছে একটু একটু করে। ছোট-খাট আসরের আমন্ত্রণ আসে, একাই গায়। কুন্তী মাস কতক বাবার কাছে থাকত, আর মাস কতক পিতৃতুল্য খাঁ সাহেবের কাছে। কারণ তার শিখতে তখনো অনেক বাকী। আজও শেখা হয়েছে বলে ভাবে না সে।

খাঁ সাহেবের চেষ্টা আর সুপারিশ যার পিছনে, গানের আসরে তার কদর হতে কদিন আর। খাঁ সাহেব যেখানে যান কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে যান, তার আলাদা মহড়ার ব্যবস্থা করে দেন। সুপারিশ ছাড়াও এই বয়সের আর এই চেহারার অমন মেয়ে-গাইয়েই বা কটা আছে আর? কুন্তীর গানের জগৎ বিস্তৃত হতে লাগল। কিন্তু যেখানে আলো, সেইখানে ছায়া। কুন্তীর আলোর পিছনে ছায়া পড়ল। সেই ছায়াটা খাঁ সাহেবেরই। এলাহাবাদের খাঁ সাহেব ততদিনে অনেক বদলেছেন। পণ্ডিত বন্ধুরও প্রভাবমুক্ত বহুদিন।

কুন্তীর মধ্যে তিনি নারীকে দেখলেন। দেখতে লাগলেন।

শেষে একদিন গুরুদক্ষিণা দাবি করলেন।

এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তি কুন্তী তার বাবাকেও করত কিনা সন্দেহ। কিশোর মহারাজ জানেন, কুন্তীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। তার সেই অশান্তি আর নির্বাক যাতনা কিশোর মহারাজ দেখেছেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-তনয়া সে। বাবার বুকের হাড়-পাঁজর যে ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে, তাও সে জানত। অশান্তির তাড়নায় সেই রাতে খাঁ সাহেবের ওখান থেকে এসেই কিশোর মহারাজকে গুরুর দাবির কথা বলেছিল সে। না বলে পারেনি। কিশোর মহারাজ তাকে পালাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কুন্তী কিছু বলেনি। চুপ করে ছিল। বোবার মত চুপ করেই কাটিয়েছে কটা দিন।

কিন্তু খাঁ সাহেবের দাবিটা পুরুষের জোরালো দাবি নয়। এই দাবিও নূরনওয়াজ খাঁর দাবির মতই। গুরুর ভিক্ষার মত। যৌবনোত্তর প্রায়-বৃদ্ধের কান্নার মত। যে গুরুর কাছে সে অনেক

পেয়েছে, আরো অনেক—অনেক পেতে বাকি—সেই গুরুর ভিক্ষার জন্যে হাত বাড়ানোর মত।

এক রাতে কুন্তীর দিকে একটি বার চেয়েই কিশোর মহারাজ বুঝেছিলেন, সে ভিক্ষা দিয়েছে। গুরু জিতেছে। গুরুর দাবি মিটেছে।

কুন্তীর গানও বাইরে থেকে দেখতে গেলে জিতেছে বই কি। এই দু'বছরের মধ্যে গানে তার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। পাঁচ বছরে দশ বছরে যা হয়নি, দু'বছরে তাই হয়েছে। কত জায়গায় কত আসর মাত করেছে ঠিক নেই। তার মত চাহিদার মেয়ে-শিল্পী এখন আর নেই।

কিন্তু সেই ভিক্ষে দেবার আগেই কুন্তীকে রক্ষা করার তাড়নায় তার বাবাকে চিঠি লিখে বসেছিলেন কিশোর মহারাজ। নিজে এসে মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্যে আকুলভাবে অনুনয় করেছিলেন। জবাবে তিনি মেয়ের প্রসঙ্গে একটি কথাও লেখেননি, শুধু তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি চলে এসো।

কিশোর মহারাজ যেতে পারেননি। এইখানেই আটকে আছেন।...কিন্তু এবারে বোধহয় যেতে হবে তাঁকে, শরীর ভাঙছে।

বাবার সঙ্গে মেয়ের আর সাক্ষাৎ হয়নি। আর হবেও না কোনদিন।

এই কাহিনী শোনার পর অঙ্কু লক্ষ্ণৌ ছেড়ে এসেছিল। গানের জন্যে সব দেওয়া যায়, কিন্তু কোথায় বুঝি শেষও আছে। মনে হয়েছিল, জামাল খাঁ আর কুন্তী দুজনেই সেই শেষ ছাড়িয়েছে।

ছ-সাত মাস বাদে জয়পুরে কুন্তীর সঙ্গে যোগাযোগ। সেখানকার মিউজিক্যাল কনফারেন্সের বিশেষ মাননীয়া অতিথি হিসেবে তার আগমন। অনিয়মে অনাহারে অঙ্কুর দেহ আরো রুক্ষ, আরো শীর্ণ হয়েছে। দুই চোখের গভীরে তৃষ্ণার আকৃতি আরো স্পষ্ট।

কুন্তীর গানে হৈ-চৈ পড়ে গেল জয়পুরে। পর পর দু'রাত গেয়েছে সে। প্রথম দিন মালকোশ আর ঠুংরি, পরদিন দেশকার আর ঠুংরি। অঙ্কু গান শুনেছ। শুনেছে আর দেখেছে। তানপুরায় গাল রেখে কুন্তীর সুরের অতলে ডুবে যাওয়া দেখেছে। অনুরাগীদের চাহিদায় দুইদিনই ঠুংরি গাইতে হয়েছে পরে। বাহবা বাহবা করে শ্রোতারা পাগল। কিন্তু অঙ্কুর মনে হয়েছে, ঠুংরির চপল অভিমান আর চপল আত্মসমর্পণ কুন্তীকে মানায় না। আগে যা গেয়েছে তার তুলনা নেই।

সেই দুটো রাতই বিনিদ্র কাটিয়েছে অঙ্কু। তার আবারও মনে হল, গানের জন্যে সব করা যায়, সব দেওয়া যায়। কিশোর মহারাজের আশ্রয় ছেড়ে কেন সে চলে এলো?

পরদিন সোজা গিয়ে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করল সে। যেমন একদিন করেছিল তারাবাঈয়ের সঙ্গে। কিন্তু তারাবাঈয়ের কাছে এগনোর সময় যে জোর ছিল মনের, যে চপলতা ছিল বয়সের—এখন আর তা নেই। বিনা ভণিতায় প্রস্তাব করল, খাঁ সাহেবের কাছে গান শেখার ব্যবস্থা করে দিতে হবে তাকে।

বাইরে এ-রকম আবেদন নিয়ে কেউ চড়াও হয়নি কোনদিন। দীর্ঘায়ত দু'চোখ প্রসারিত করে কুন্তী দেখল তাকে। মনে হল আগেও দেখেছে কোথায়। ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, ক্যায়সে—?

অন্ধু বলল, আমার মনে হয় তুমি ইচ্ছে করলে পারো।

উয়ো ক্যায়সে? আবারও ঈষৎ অসহিষ্ণু প্রশ্ন কুন্তীর।

অন্ধু নিরুত্তর। কিন্তু এরই থেকে জবাবটা পেল বোধহয় কুন্তী। মনে হল, তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে লোকটা। আবারও দেখল খানিক, তারপর স্বাভাবিক সৌজন্যে মিষ্টি করেই বলল, ম্যাঁয় আপকো কহীঁ দেখা হুঁ—কহিয়ে কহাঁ?

অন্ধু জবাব দিল, কিশোর মহারাজের বাড়িতে।

কুন্তীর মনে পড়ল হয়তো। কিন্তু বুঝতে দিল না। একটু হেসে খুব মোলায়েম করে বলল, ছোড়িয়ে। ম্যাঁয় মজবুর হুঁ, আপনে মুফত্ ইত্‌নী তক্‌লিফ কী।

কিছুই করতে পারে না সে। পারে বললে অন্ধু দ্বিধাগ্রস্ত হত কিনা বলা যায় না। তারাবাঈএর মত চোখের তারায় আমন্ত্রণের একটু আভাসও পেলে কি করত বলা যায় না। কুন্তী নির্লিপ্ত মুখে একেবারে ছেঁটে দিল তাকে। জলের দাগ না-লাগা পাতার মত আবেদনটা একধারে গড়িয়ে পড়ল।

সেই দিনই স্টেশনে একই ট্রেনে এই একজনকে উঠতে দেখল কুন্তী। দিল্লীতে একই গাড়িবদল করে একই সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে নামতে দেখল।

কুন্তী তাকে চেনে না।

আট

এবারে আর জামাল খাঁর মজলিশের বাইরের দাওয়ায় বসেনি অন্ধু। ঘরে ঢুকেছে। ঘরের এক কোণে বসেছে। রোজই বসেছে। পরিচিত গুণমুগ্ধ অনেকে এসে বসে। পার্ষদদের ধরে পড়েও আসে কেউ কেউ। কিন্তু দিনের পর দিন একটা লোক এসে এককোণে মুখ বুজে বসে থাকলে চোখ পড়ারই কথা। বিশেষ করে গুরুর শ্রীমুখের একটু সুর, একটু তান শুনেই যেখানে পার্ষদদের আ-হা করে মূর্ছা যাবার নিয়ম, সেখানে একজনের এই নির্বিকার ভাবটুকুও বিশেষ ব্যতিক্রম।

জামাল খাঁর চোখ পড়ল একদিন। ইশারায় কাছে ডাকলেন।—তুম কওন্?

রীতি অনুযায়ী তাঁর দুই হাঁটুতে হাত ছুঁইয়ে কপালে ঠেকালো অন্ধু। তারপর জবাব দিল, আমি কেউ না।

পর্ষদরা মুখ টিপে হাসতে লাগল, কুন্তীবাঈএর শ্লথ দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর এসে থামল। আগেও নীরব উদাসীনতায় একমাত্র সে-ই লক্ষ্য করেছে তাকে। জামাল খাঁ তির্যক চোখে দেখলেন একটু, ক্যা নাম তেরা ?

নাম বলল। তার পোশাকী শশাঙ্ক নামটা প্রাক্তন গুরু নওয়াজ সাহেবের হাতে পড়ে শশায় দাঁড়ানোর পর থেকে সর্বত্র অন্ধু ওই নাম চালিয়ে আসছে।

মুলুক কহাঁ?

বলল।

জামাল খাঁ চপল বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বঙ্গালকে রহনেওয়ালে কেয়া ইতনে তকল্লফী হোতে হ্যাঁয় কি আপনে কো মরদ ইয়া জানানা কহনে কো ভী হিচকিচাতে হ্যাঁয়?

সে কিছু না বলার জবাবে জামাল খাঁর এই রসিকতা। অর্থাৎ বাংলার লোকেরা কি এতই বিনয়ী যে, নিজেদের পুরুষ বা মেয়েছেলে বলে পরিচয় দিতেও সঙ্কোচ বোধ করে!

পার্ষদবর্গ হেসে উঠল। অঙ্কু নিরুত্তর।

জামাল খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন, গান শুন্‌না হ্যাঁয়?

এ-রকমই একটা দিনের প্রত্যাশায় ছিল অঙ্কু। নিঃসম্বল আবেদন শুকনো পাতার মত খসে পড়বে এ আর তার থেকে ভালো কে জানে? স্বাভাবিক রাস্তায় অনেক হেঁটেছে। এবারে অস্বাভাবিক পথে পা দিল। শান্তমুখে মাথা নাড়ল। বলল, না, আমি গানের ছাত্র, গুরু খুঁজছি, গুরু দেখে বেড়াচ্ছি—মনের মত পাচ্ছি না।

ওস্তাদ জামাল খাঁ এ রকম জবাব আর বোধহয় শোনেননি। সকৌতুকে বলে উঠলেন, তো কেয়া মেরা ভী ইমতেহান লেনেকো আয়ে হো! আমাকেও তাহলে যাচাই করতে এসেছ?

অঙ্কু নীরব। অর্থাৎ তাই। পছন্দ হলে তবে শিষ্য হবে। জানাল খাঁর মুখের হাসি গেল। পর্ষদদের কারো দৃষ্টি ঘোরাল, কারো বা ধারালো। এমন কি কুন্তীর নিস্পৃহতায়ও ঈষৎ বিস্ময়ের ফাটল ধরেছে।

খাঁ সাহেব বললেন, লেকিন তুমকো শার্গিদ বানাতা কওনা হ্যায়?

তেমনি ঠাণ্ডা অথচ সবিনয়ে অঙ্কু জবাব দিল, আমার মত চেলা দরকার আছে কিনা গুরু বুঝবেন, সেটা তাঁর বিচার।

মজলিশের হাওয়া বদলে গেছে। জামাল খাঁ তার মুখের দিকে চেয়ে বিচারই করলেন যেন একটু। তারপর বললেন, মালুম হোতা হ্যায় কি বহৎ ইমানদার আদমী হো তুম—আচ্ছা, ব্যয়েঠ্ যাও, শুনাও কুছ্—

অঙ্কুর বুকের ভিতরটা কি কেঁপে ওঠেনি? কিন্তু বুক কাঁপলে চলবে কেন, এরই ওপর মরণ-বাঁচন নির্ভর তার। জামাল খাঁর আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বসল. সবিনয়ে বলল, ফরমাইয়ে—

জামাল খাঁ গম্ভীর মুখে আদেশ দিনেল, যা খুশি গাও।

পার্ষদরা উদগ্রীব। এবারে কুন্তীবাঈও উৎসুক একটু। অঙ্কুর গুরু নেই যে গুরুর নাম নেবে। হঠাৎ কাশীর বৃদ্ধ মিশিরজীর কথা মনে পড়ল তার। তিনি বলেছিলেন, ভালো জানো একথা কখনো ভেবো না, কিন্তু আসরে গাইতে-বাজাতে বসলে আর কেউ তোমার থেকে বেশি জানে তাও ভেবো না। সেই রকমই ভাবতে চেষ্টা করল অঙ্কু।

কিন্তু সামনে ওস্তাদ জামাল খাঁ, পাশে কুন্তীবাঈ—ভাবা সহজ নয়।

চোখ বুজে তাকিয়া ঠেস দিয়ে মিনিট আট-দশ বিলম্বিত লয়ের ইমন শুনলেন খাঁ সাহেব। অন্যদিকে চেয় কন্তীবাঈও মন দিয়ে শুনল। পার্ষদদের চোখ একবার খাঁ সাহেবের দিকে একবার কুন্তীর দিকে। তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তারা নিরাপদে হেসে উঠবে অথবা নিরাপদে তারিফ করবে।

সোমের মাথায় খাঁ সাহেব থামিয়ে দিলেন তাকে। আদেশ করলেন, বাগেশ্রীকা কুছ্ ছুট খেয়াল শুনাও—

অর্থাৎ দ্রুত খেয়ালের কেরামতি দেখবেন। দেখলেন। কিন্তু মন্তব্য করলেন না। চার-পাঁচ মিনিট—তানের মাথায় থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পুরিয়া জানতে হো?

আচ্ছা, কিসি রাগ কা তারানা শুনাও—

অর্থাৎ এবারে ছন্দ আর দ্রুততাল পরীক্ষা। অঙ্কুর সঙ্কোচ বা ভয়ের লেশমাত্র নেই আর। কোথা থেকে কেমন করে এত জোর পেল সে-ও জানে না। মালকোশের ওপর তারানা গাইল খানিকক্ষণ।

তাকিয়া ছেড়ে এবারে নড়ে-চড়ে বিপুল দেহটা সোজা করলেন খাঁ সাহেব। তারপর মন্তব্য করলেন, বৃহৎ দরদ্‌ভরী আওয়াজ হ্যায়, অওর গলেমে জোয়ারি ভি হ্যায়—মগর তেরা তালিম কহাঁ?

পার্ষদরা এবারে এতক্ষণের রুদ্ধ নিশ্বাস মুক্তি দিয়ে বাঁচল। কেউ কেউ সবেগে মাথা নাড়ল দু একবার। তালিম অর্থাৎ শিক্ষা নেই মানে তো কিছুই নেই।

এতক্ষণে হাসল অঙ্কু। এই প্রথম আবেদনের সুরে বলল, এর ওপর তালিম থাকলে আর গুরু খুঁজব কেন ওস্তাদ?

লাল সুতো হাতে জড়িয়ে লোভান জ্বেলে মন্ত্র পড়ে নাড়া বাঁধা হল।

এ-রকম আরো হয়েছে, কিন্তু সেটা অপ্রকাশ্য। খাঁ সাহেব চেলা গ্রহণ করেছেন।

কুন্তীবাঈ একটুও সুপারিশ করেছে কিনা অঙ্কু জানে না। সে আরো নিস্পৃহ, আরো উদাসীন। কিশোর মহারাজ একটু-আধটু সুপারিশ করে থাকতে পারেন। বাংলাদেশের পসারের দিক চেয়েও বাঙালী শিষ্য একজন খাঁ সাহেবের থাকা দরকার—সে-রকম লোভও দেখিয়ে থাকতে পারেন। তাছাড়া তালিম দিলে ছোকরা শিখবে এও হয়তো মনে হয়েছিল খাঁ সাহেবের।

কিন্তু কিছুদিন না যেতেই খাঁ সাহেব ভয়ানক বিরূপ নয়া শিষ্যের ওপর। তাঁর মনে হল, ছোঁড়াটা কথার জালে ফেলে ঠকিয়েছে তাঁকে। এতটা সহায়সম্বলহীন কপর্দকশূন্য ভাবেননি আগে। অতএব চাকরকে দিয়েও যে কাজ করান না, সেই কাজই করাতে লাগলেন তাকে দিয়ে। গাঁজা সেজে দেওয়া থেকে জুতো সাফ করা পর্যন্ত। এতেও অনভ্যস্ত নয় অঙ্কু। যা বলেন মুখ বুজে করে।

কিছুকাল বাদে এতে সুবিধেও হল একটু। এই ভাবেই মানুষ ভৃত্যের প্রতিও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অঙ্কু নির্ভরশীলই করে তুলতে চায় তাঁকে। বাইরে যত গাল-মন্দই করুন, ভিতরে ভিতরে খাঁ সাহেব একটু সমীহও করেন হয়তো। তার নিষ্ঠা তিনি লক্ষ্য করেছেন। আর পাঁচ-জনের মত তোয়াজ তোষামোদ করে না ছেলেটা, ভৃত্যসুলভ মনোভাব নয় একটুও। যা করে মাথা উঁচিয়েই করে। গুরু বলে করে।

নইলে ইতিমধ্যে শিষ্যের মেজাজ গুরু ভালই চিনেছেন। এক তিনি ছাড়া আর কারো মুখ

থেকে এতটুকু বিদ্রূপের আভাসও বরদাস্ত করে না সে। একবার খাঁ সাহেবের এক পয়সাওয়ালা তরুণ সাগরেদ কি যেন অবজ্ঞাভরে ফরমাস করেছিল তাকে। অঙ্কু সকলের সামনে এমন কি গুরুর সামনেই তার দু'কাঁধ ধরে বেশ কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। খুব ঠাণ্ডা মুখে বলেছিল, এখান থেকে তুলে একেবারে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসবে।

ওস্তাদ অবশ্য এরপর অঙ্কুকেই শাসন করেছিলেন। তবু সাহস দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছিল। এমন কি কুন্তীবাঈও। কিন্তু তারপর থেকে এক ওস্তাদ ছাড়া আর কেউ ঘাঁটাতে সাহস করেনি তাকে।

সব গুরু যা করেন, খাঁ সাহেবও তাই করলেন। প্রথম প্রথম তালিম দিলেন কিছুদিন। তারপর ঢিলে দিলেন। নিতান্ত কখনো সদয় হলে ডাকেন, তাগিদ দিলে তেড়ে আসেন। এটা এ-রকম কেন হল, বা ওটা ও-রকম কেন হল জিজ্ঞাসা করলেও ওস্তাদ তেতে ওঠেন। কখনো বলেন ভাগো হিঁয়াসে, কখনো বা গর্জে ওঠেন, হাম যো বোলতা হ্যায় করো, কাঁহে বাকোয়াস করতা হ্যায়—এ কাঁহে হোগা ও কাঁহে হোগা ছাড়ো।

অন্য চেলারা এ-দিক ও-দিক মুখ ফিরিয়ে থাকে। তাদেরও ধৃষ্টতা মনে হয়। তবে সামনা-সামনি মনোভাব ব্যক্ত করার সাহস নেই কারো।

এক সন্ধ্যায় কুন্তীর সামনেই অপমানের একশেষ অঙ্কুর। খাঁ সাহেব একা ছিলেন ঘরে। একেবারে একা তাঁকে পাওয়া যায় না বড়। কুন্তীর আসার কথা ছিল কিনা তাও অঙ্কু জানে না। ওস্তাদকে খুব মৌজ করে গাঁজা সেজে খাইয়েছে। জলীয় পানের পর ওটা না হলে জমে না। অঙ্কু নিজে থেকে তার গা-হাত-পাও টিপে দিল খানিকক্ষণ। তারপর খাতা-পেন্সিল নিয়ে এসে বসল। আবেদন, অনেকদিন নতুন কিছু পাইনি ওস্তাদজী, একটা কিছু 'চীজ' দাও।

গুরুর কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। রক্তচক্ষু মেলে একবার তাকালেন শুধু, আর্জিটা বুঝলেন, তারপর আবার গুম।

হয়তো একসময় দিতেন কিছু, বা বলতেন কিছু। কিন্তু তার আগেই কুন্তীবাঈ এসে হাজির। রাগে গা জ্বলতে লাগল অঙ্কুর। সে বসেই রইল। কুন্তীবাঈ আর একধারে এসে বসল, তবু উঠল না। হয়তো তালিম নিতে এসেছে, কুন্তীবাঈ কারো সামনে তালিম নেয় না। তার মর্যাদা আলাদা। ওস্তাদ একা থাকলে আসে, অথবা ডেকে পাঠালে আসে।

এক হাঁড়িতে হাত পড়ছে মনে হলেই ক্ষেপে ওঠেন গুরুরা। গানের 'চীজ' বা জিনিস চাওয়াটা বরদাস্ত করতে পারেন না। তার ওপর এখনো বসেই আছে দেখে রাগে খাঁ সাহেবের নেশা ছুটে যাবার উপক্রম। গলা চড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, কেয়া? লিখ্‌নে মে গানা হোগা? খালি চীজ্ লিখ্‌না মাঙতা? মেরা পাস যেত্তা চীজ্ হ্যায় সব লিখ লো—মগর গায়গা হাম্!

কুন্তী মুখ টিপে হাসছে। অপমানে অঙ্কুর মুখ কালো। একবার ইচ্ছে হল, সামনের ওই বাদ্য-যন্ত্রটা দিয়েই ওস্তাদের মাথাটা দুফাঁক করে দেয়, তারপর কুন্তীর সঙ্গেও বোঝাপড়া করে নেয় একটা। কিছুই না করে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে।

ভিতরটা আবারও হতাশায় ভরে উঠছিল অঙ্কুর, অসহিষ্ণুতা বাড়ছিল। কিন্তু নিজেই সে

একটা উপায় আবিষ্কার করল শেষে। ওস্তাদের রেয়াজ করার সময় কারো উপস্থিতি নিষেধ। তাছাড়া তিনি রেয়াজ করেন গভীর রাতে।

কনকনে শীতের রাত, হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে। গলা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে অক্ষু চোরের মত খাঁ সাহেবের বাড়িতে আসত। দোতলায় তাঁর ঘরের নীচে এসে দাঁড়াত। ঠাণ্ডায় কান দুটো জমে যাবার উপক্রম, কিন্তু কান ঢাকলে চলবে না। বেশিক্ষণ কষ্ট হত না অবশ্য। কারণ সে আসার একটু বাদেই রেয়াজ শুরু হত। রাতের স্তব্ধতায় স্পষ্ট শুনতে পেত অক্ষু। প্রায় সকাল পর্যন্ত দোতলার ঘরে রেয়াজ চলত, অক্ষু নীচে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত সারাক্ষণ।

সপ্তাহে তিন-চারদিন এমনি রেয়াজ করতেন, কিন্তু অক্ষুকে রোজই আসতে হত। এই করে রেয়াজের দুরূহ কলা-কৌশল কিছু কিছু করায়ত্ত হতে লাগল তার। কিন্তু অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও গলায় ঠাণ্ডা লাগত প্রায়ই। গলা বসা থাকত।

এরই মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ একদিন।

এবারেও কিশোর মহারাজের নীচের তলার একটা ঘরে থাকত অক্ষু। আবারও হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু তার পরদিনই কুন্তীবাঈয়ের এক অনুষ্ঠানে গান করার কথা। বায়না নেওয়া হয়ে গেছে। কিশোর মহারাজের অসুস্থ হওয়াটা নতুন নয়, আর কুন্তীবাঈয়ের অন্য তবলচির অভাবও হয় না। খাঁ সাহেবই ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু কয়েকদিনের জন্যে জামাল খাঁ সাহেবও বাইরে গাইতে গেছেন কোথায়।

কুন্তীবাঈ চিন্তিত না হোক, বিরক্ত হয়েছিল বোধহয়। যাদের আসর, তবলচি তারাও যোগাতে পারে। সেখানে তবলচির অভাব হবে না। কিন্তু গায়িকাটির দিক থেকে সেটা মনঃপূত নয় খুব। কিশোর মহারাজের বাড়িতে আজকাল আর সে আসেই না বড়। সেদিন এসেছিল। কিশোর মহারাজ যেতে পারবেন কি না সঠিক জেনে নিতে এসেছিল হয়তো।

এতদিনের মধ্যে সামনা-সামনি কুন্তীর সঙ্গে একটা কথারও বিনিময় হয়নি অক্ষুর। তবে কুন্তী লক্ষ্য করত তাকে। খাঁ সাহেবের চেলাচামুণ্ডাদের কাছে সে সাক্ষাৎ দেবী বিশেষ। তার একটু কৃপাকটাক্ষের আশায় সকলেই পায়ের কাছে বুক পেতে দিতে প্রস্তুত। কুন্তীবাঈ তাদের কাউকে একটুখানি 'চীজে'র হদিস দিলে গোটা জীবনের মত বর্তে গেছে সে। কিন্তু সকলের মধ্যে এই একজনকেই ব্যতিক্রম দেখেছে। কোনদিন সামনে আসার চেষ্টা দূরে থাক, খাঁ সাহেবের অনুরোধে মজলিশে কুন্তী একটু-আধটু মহড়া দিতে বসলেও তাকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে দেখেছে। কোনদিন মুখ দিয়ে একটা তারিফের শব্দও উচ্চারণ করেনি। তার একটু চোখের ইঙ্গিতে খাঁ সাহেব তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন এখান থেকে, কিন্তু কুন্তীবাঈ সে-রকম বিরক্তি প্রকাশ কখনো করেনি। রূঢ় হাবভাব সত্ত্বেও কুন্তী শুধু অবহেলাই করেছে, তাকে অসম্মান করার ইচ্ছাটা কেন জানি কখনো হয়নি তার।

আজ কথা হল।

কুন্তী নীচে নেমে আসতে অক্ষু সামনে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, কিশোর মহারাজ আসরে যেতে পারবেন না তো?

কুন্তী মাথা নাড়ল। পারবেন না। চেয়ে রইল, অর্থাৎ তাতে কী?

তোমার তবলচি ঠিক আছে?

কুন্তী জবাব না দিয়ে আবারও মাথা নাড়ল আর তেমনই চেয়ে রইল। অর্থাৎ ঠিক নেই। কিন্তু তাতেই বা কী?

একটুও ভণিতা না করে অন্ধু সাদাসিধে ভাবে জিজ্ঞাসা করল, আসরে আমি যদি তোমার সঙ্গে বাজাই, তুমি কি আমাকে জব্দ করতে চেষ্টা করবে?

এইবার কুন্তীর মাথা নাড়তে সময় লাগল একটু। এ-রকম প্রস্তাব কল্পনা করাও শক্ত। টানা টানা দুচোখ মেলে চুপচাপ দেখল খানিক। তারপর মাথা নাড়ল। জব্দ করতে চেষ্টা করবে না। জিজ্ঞাসা করল, তুমি সাহস করো?

অন্ধু ঘাড় নাড়ল, করে।

আচ্ছা, কাল সকালে আমার বাড়ি এসো।

চলে গেল। কি বাজাতে পারে, কতটা বাজাতে পারে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। যতক্ষণ দেখা গেল তাকে, অন্ধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। কেন, কোন্ তাড়নায় এ প্রস্তাব করল নিজেও জানে না।

অন্ধু যথানির্দেশ পরদিন সকালে তার বাড়িতে হাজির। কুন্তীবাঈ বাজনা শুনল। কোনরকম মন্তব্য করল না। শুধু আসরের সময়টা জানিয়ে দিল তাকে।

না, এতবড় আসরে অপ্রস্তুত একটুও হয়নি অন্ধু। বরং তবলা বাজিয়ে এত আনন্দ আর বোধ হয় পায়নি কোনদিন। ভূপালি গাইছিল কুন্তীবাঈ, নিষ্ঠাভরে কারো মঙ্গল-কামনায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছিল যেন। গান জমেছিল, তবলাও। আসরে কুন্তীবাঈয়ের ভিন্ন মূর্তি। জব্দ করার চেষ্টা দূরে থাক, মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে ভরসা দিচ্ছিল তাকে, উৎসাহ দিচ্ছিল—নীরব হাসিতে দুই একবার বাজনার তারিফও করেছে।

গান শেষ হতে কুন্তীবাঈ নিজের জুড়িতে ডেকে নিল তাকে। গাড়ি তার বাড়ির দিকে ছুটল। ভিতরটা আবছা অন্ধকার। দুজনে মুখোমুখি বসে। মুখোমুখি ঠিক নয়, কুন্তীবাঈ পিছনের গদীতে হেলান দিয়ে আছে। অন্ধু ঠিক ঠাওর করতে পারছে না, মনে হয় চোখ দুটো বোজা। হয়তো বা সুরের ঘোরে বিভোর এখনো।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মাথা না তুলেই জিজ্ঞাসা করল, তবলা কতদিন বাজাচ্ছ?

অনেক কাল। তবে তেমন অভ্যেস নেই।

একটু বাদে আবার প্রশ্ন হল, কার কাছে শিখেছ?

কাশীর মিশিরজী।

চেনে কি না তাও বোঝা গেল না। গদী থেকে মাথা তোলেনি। দু'-চোখ বোজাই। খানিক চুপ করে থেকে মন্তব্য করল, ভালই বাজিয়েছ...সাথ্-সঙ্গত তেমন সুবিধের হয়নি, তানের জবাব খুব ভালো হয়েছে।

অন্ধুর ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তি হচ্ছে কেমন। এভাবে এত কাছাকাছি বসার দরুন কিনা জানে না। আরো অনেক ঘনিষ্ঠ অনেক প্রগল্ভ সান্নিধ্যে এসেছিল তারাবাঈয়ের। তখন সাময়িক তাড়না কিন্তু অনুভব করেনি এমনও নয়। কিন্তু আসলে তারাবাঈকে সে-ই ঠকাতে

পেরেছিল। বুকের নিভৃতে কোনো দাগ পড়েনি, কোনো ছাপ পড়েনি। কিন্তু অক্ষু হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, এই সান্নিধ্য সুবাঞ্ছিত। নিজের অগোচরে বহুদিন ধরে এই রকমই একটা আশা লালন করছিল যেন। নইলে তবলচি নেই জানা মাত্র সেধে বাজাবার আগ্রহ হল কেন?

অস্বস্তি এই আবিষ্কারের কারণে।

কুন্তীবাঈ একটু বাদে সোজা হয়ে বসল। মাঝের ব্যবধান আরো একটু কমলো। ভিতরে আবছা আলোয় দু'চোখ মেলে তাকে দেখল খানিক।

তবলা বাজাবে?

খুব অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব নয়।—তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কিশোর মহারাজ...?

তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকছেন। ঈষৎ অসহিষ্ণু শোনালো।

অক্ষুর কোথায় যেন লাগল একটু খচ্ করে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল. সেই অপরাধে তাঁকে ছেঁটে দেবে?

কুন্তীবাঈ অনেকক্ষণ কোনো জবাব দিল না। জবাব আর দেবেই না মনে হল। কিন্তু শেষে বলল, তিনি নিজেই নিজেকে ছেঁটে দিয়েছেন, অসুস্থ না হলেও অসুস্থ বলেন। আলোচনাটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়েছে মনে হল বোধহয়। নিরুত্তাপ প্রশ্ন করল, তুমি কি করবে বলো, বাজাবে?

অর্থাৎ, তবলা নিয়ে থাকলে সে খানিকটা সুযোগ তাকে করে দিতে পারে। এ-রকম সুযোগ মেলাও ভাগ্যের কথা বই কি।

কিন্তু এই ভাগ্যান্বেষী সে নয়। মৃদু অথচ স্পষ্ট জবাব দিল, না। তবলা যেটুকু শিখেছি গানের জন্যে শিখেছি।

আয়ত টানা টানা দুটো চোখ তার মুখের ওপর পড়ে আছে। এ-রকম প্রস্তাব নাকচ কবার মত জোরের উৎসটা কোথায় কুন্তীবাঈ চেয়ে চেয়ে তাই দেখছে যেন। তাবপর পিছনে হেলান দিয়ে গদীতে মাথা রাখল আবার। সমস্ত পথ আর একটি কথাও বলল না।

কিন্তু কুন্তীবাঈ ভাবছিল কিছু। জয়পুরের সেই সন্ধ্যাটা মনে পড়েছিল। লোকটা খাঁ সাহেবের কাছে গান শেখার সুপারিশের আবেদন নিয়ে তার শরণাপন্ন হয়েছিল। সেই আবেদনে ভিক্ষার সুর ছিল না, অন্তস্তলের এক অব্যক্ত যাতনা থেকে অব্যাহতি পাবার অসহিষ্ণু তাড়না ছিল। তারপর এই এক বছর ধরে দেখছে। তৃষ্ণার আকৃতি দেখছে, আকাঙ্ক্ষার একখানি শিখা জ্বলতে দেখছে। রসদ না পেলে পল্‌তে যেমন নিজেকে পোড়ায় তেমনি নিজেকে দগ্ধ করতে দেখছে লোকটাকে।

...আর আজ দেখল।

কুন্তীবাঈয়ের তরফ থেকে এ-রকম আমন্ত্রণের নজির নেই, প্রত্যাখ্যানেরও না। এই প্রথম আমন্ত্রণ, প্রথম প্রত্যাখ্যান। গান কতদূর হবে জানে না, কিন্তু গানের জন্যে তবলার এই হাতের জন্যেও যে মায়া নেই, এ কম আশ্চর্য নয়। তার সঙ্গে তবলা-সঙ্গতের একটু লোভনীয় ইশারায় ওস্তাদের সব কটি চেলা গান ছেড়ে তবলা শিখতে বসবে সে সম্বন্ধে কুন্তীবাঈয়ের এতটুকু

সংশয় নেই। পায়ের কাছে বুক পেতে দিয়ে তার গানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে যারা, নিভৃতের অতনু মুহূর্তে তাদের ওই বুকে কোন্ শিক্ষা জ্বলে সেটা কুন্তীবাঈ মুখের দিকে এক নজর তাকালেই বুঝতে পারে।

কুন্তীবাঈয়ের ভাবনা অস্বাভাবিক নয়।

বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়াতে দুজনেই নামল। অঙ্কু বলল, আমি যাই এবারে...

কুন্তীবাঈ দাঁড়িয়ে আর এক নজর দেখে নিল। তারপর ইশারায় ডাকল, এসো—।

আগে আগে সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠল সে। অঙ্কু পিছনে। সে যেন মূর্তিমতী সুরাঙ্গনার অনুসরণ-রত। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে অঙ্কু। অন্যথায়, নতুন কোনো সূচনায় যদি পদার্পণ করেও থাকে, সেটা পণ্ড হবার সম্ভাবনা। কুন্তীবাঈকে তারাবাঈ ভাবতে চেষ্টা করছে অঙ্কু, তার মত করেই দেখতে চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্যের সিঁড়ি টপকাতে হলে যে উপলক্ষ দরকার, সেই উপলক্ষের মত ভাবতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু ভাবা শক্ত হচ্ছে। কুন্তীবাঈয়ের জীবন-বৃত্তান্ত জানে, তবু তারাবাঈএর মত ভাবা যাচ্ছে না তাকে। অনেক তফাত, যোজন তফাত।

ঘরের মেঝেময় পুরু গালচে পাতা। এধারে-ওধারে গোটাকতক সৌখিন তাকিয়া। সামনের দেয়ালে মস্ত একটা আয়না। মাথার উপর ঝাড়-লণ্ঠন। আর চারিদিকে গান-বাজনার সরঞ্জাম। তানপুরা, তবলা, সারেঙ, আরো অনেক কিছু।

বোসো—।

কুন্তীবাঈ ওদিকের ঘরে চলে গেল। ফিরল মিনিট দশেক বাদে। বেশবাস বদলে এসেছে। চোখে-মুখেও জল দিয়ে এসেছে বোঝা যায়। একটু দূরে একটা তাকিয়া টেনে বসল সে। দুহাতে দুই খাবারের থালা নিয়ে একজন পরিচারিকা এলো। থালায় অল্প কয়েকটা মিষ্টি।

কুন্তীবাঈ বলল, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করল তাকে নিয়েযেতে।

আপত্তি না করে অঙ্কু উঠে গেল। এ নিয়ে ভদ্রতাসূচক একটা কথা বলাও যেন বাড়তি কথার মত। ফিরে এসে একটা থালা টেনে নিল। কুন্তীও তার সামনে বসেই খেল চুপচাপ। একটি কথা নেই, এতটুকু অভ্যর্থনার আতিশয্য নেই। ঠাণ্ডা, শান্ত।

পরিচারিকা পান দিয়ে গিয়েছিল। খাওয়া শেষ হতে কুন্তী পানদানীটা এগিয়ে দিল তার দিকে। নিজে মশলা খেল। তারপর বলল, গান করো, শুনি—

এই প্রস্তাবের জন্যেও প্রস্তুত ছিল না অঙ্কু। সে চুপচাপ চেয়ে রইল।

নির্লিপ্ত মুখে কুন্তী বলল, গানের পিছনে ঘুরে পণ্ডশ্রম করছ কিনা শুনলে বলে দিতে পারি।...বছর খানেক আগে খাঁ সাহেবের সামনে যেটুকু শুনেছিলাম তাতে কিছু বোঝা যায়নি।

অঙ্কু চেয়েই আছে। তাকে ডেকে আনার কারণ বুঝছে।...তার গাইতে আপত্তি নেই। পরীক্ষা দিতে আপত্তি নেই। কুন্তীর বিচার দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নিতে আপত্তি নেই। বুকের একটা দুর্বহ ভার খালি করে দেবারই যেন লগ্ন এটা।...নিষ্পত্তি হয়ে যাক্।

তানপুরাটা কাছে টেনে নিল অঙ্কু। শান্ত মুখে তানপুরা বেঁধে নিল। অব্যক্ত নীরবতায় যান্ত্রিক আওয়াজটা গুরুগম্ভীর গোঙানীর মত শোনালো খানিকক্ষণ।

গান গাইছে। সেই অতিপ্রিয়, অতি পুরানো গান। কিন্তু পুরানো নয়, এই প্রথম গাইছে যেন, বেহাগের সমস্ত আকুতির রুদ্ধ আগলটা আজ কপাট খুলে দিয়েছে ঃ

পড়ি মেরি নাইয়া মাঝধার
আব্ কওন্ করে সাঁই পার—।

নৌকো আমার মাঝদরিয়ায় পড়ে রইল, কে আমাকে হাত ধরে পার করে দেবে?

এতবড় ঘরখানার সমস্ত বাতাস ব্যথার ভারে টনটনিয়ে উঠছে ক্রমশ। কুন্তীবাঈয়ের তাকিয়ার ঠেস দেওয়া শ্লথ ভঙ্গিটা বদলাচ্ছে একটু একটু করে। নিজের অগোচরে সোজা হয়ে বসেছে একসময়। স্থির নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে, কিন্তু তাকে দেখছে না, বেহাগের জীবন্ত একখানি রিক্ত রূপ দেখছে যেন।

পঞ্চম আর নিষাদ থেকে মিড় দিয়ে যতবার মূল সুর-বিন্যাসে ফিরে আসছে অঙ্কু, ততবার চোখাচোখি হয়েছে তার সঙ্গে। ততবারই নিঃশব্দে তার আবেদনের অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। সুর থেকে গান্ধারে আর পঞ্চম থেকে নিষাদে যাওয়ার বৈচিত্র্যও কানে নতুন লেগেছে তার। কিন্তু কুন্তীবাঈয়ের আরো কিছু শুনতে বাকি। অবাক হবার মতো আরো কিছু ছিল।

এক-একটা লহমায় যতবার লোকটা নিষাদ থেকে পঞ্চমে, আর পঞ্চম থেকে কড়ি-মধ্যমের পথে শুদ্ধ-মধ্যম ছুঁয়ে আবার গান্ধারে এসে দাঁড়াল, ততবার সচকিত হয়ে উঠেছে কুন্তীর দুই চোখ। মনে হয়েছে, নিমজ্জমান লোকটা এবারে যেন তার আশ্রয়কেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে বার বার। বাতাস যেমন করে ফুলকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, তেমনি লঘু ছোঁয়া অথচ তেমনি নিবিড়।

গান থামল। ঘরের বাতাস নিস্তরঙ্গ জলের মত স্থির।

না, কুন্তীবাঈয়ের নিজেরও খেয়াল নেই। সে এক ভাবেই চেয়েছিল তার দিকে, একভাবেই দেখছিল। অনেকক্ষণ বাদে খেয়াল হল যেন। হাসল হঠাৎ।

সারাক্ষণের মধ্যে এই প্রথম হাসি। বলল, মাঝদরিয়াতেই তো পড়ে আছ মনে হচ্ছে।

মাঝের এই নীরবতার ফাঁকে অঙ্কুও সহজ হয়ে উঠতে পেরেছে। শান্তমৃদু জবাব দিল, পড়েছিলাম। কিন্তু বেহাগ সত্যি হলে পার করে দেবার লোক আসতে হবে। ভরসা হচ্ছে এলো।

কুন্তীবাঈয়ের বড় বড় দুই চোখ অঙ্কুর মুখের ভিতর দিয়ে অন্দর মহলে বিচরণ করে এলো একপ্রস্থ। তারপর হাসল আবারও। বলল, আচ্ছা, অনেক রাত হল, আজ বাড়ি যাও।

নয়

স্বপ্নের গাছে জীবনের ফুল ফোটে, ঘুমের ঘোরে তার ঘ্রাণ ভেসে আসে। কিন্তু চোখ মেলে তাকিয়ে সেই ফুল দেখলে আর তার ঘ্রাণ পেলে বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়। আবার অবিশ্বাসে দ্বিগুণ যাতনা। অঙ্কু ভাবে, এ কি সত্যি? এতবড় আশ্চর্য ব্যাপারটা এমন সহজে কি করে হল? নিবুনিবু দীপের শিখাটা আবার জ্বলে উঠেছে, শিথিল তারে সুর লেগেছে।

পরের ছ'টা মাসে অঙ্কুর জীবনে গান এসেছে, রূপ এসেছে, ছন্দ এসেছে।

আগে তারা অতিথির মত আসত, অতিথির মতই বিদায় নিত। এখন তারা অন্দর-মহলে এসেছে। সেই গান থেকে আপনিই রূপের সৃষ্টি হয়েছে, রূপের নূপুর আপনিই ছন্দ হয়ে বেজেছে। সুরের বাণী আপনিই প্রকাশের দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ওকে চেষ্টা করতে হয়নি।

সমবয়সী একটি ছেলে আর একটি মেয়ে সেই পুরনো আর সেই নতুন রাস্তা দিয়ে দিনে দিনে কাছাকাছি এসেছে। কখনো জ্ঞাতসারে, কখনো অগোচরে। পলে পলে পরস্পরকে তারা আবিষ্কার করেছে।

এর মধ্যে গোড়ায় গোড়ায় ছলনা যদি কেউ করে থাকে, অক্ষু করেছে। আর তারপর দুরন্ত বেপরোয়া মনটাকে স্বপ্নের মোহে নিঃশেষে কেউ যদি ডুবিয়ে দিয়ে থাকে—তাও সে-ই দিয়েছে। প্রথম প্রথম হৃদয় বস্তুটাকে আর একধারে সরিয়ে রেখেছিল অক্ষু। জীবনে দ্বিতীয় তারাবাঈয়ের আবির্ভাব ভেবেছে। তার থেকে বড় করে দেখেনি, তার সঙ্গে তফাৎ করে দেখতে চায়নি কুন্তীবাঈকে। তারাবাঈয়ের মত সে-ও উপলক্ষ্য। অনেক বড় উপলক্ষ্য, অনেক লোভনীয় উপলক্ষ্য—এই পর্যন্ত।

কিন্তু হৃদয় বস্তুটা কাছে এগিয়ে আসছিল ক্রমশ। উপলক্ষ্য লক্ষ্যের আসন জুড়ে বসছিল। গান থেকে কুন্তীবাঈকে তফাৎ করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না, বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ তার জীবনে কুন্তীবাঈয়ের আবির্ভাবে কোনো উচ্ছ্বাস ছিল না, কোনো আড়ম্বর ছিল না। কুন্তীবাঈ যেন অনাড়ম্বরে শুধুই গ্রহণ করেছিল তাকে। মাঝদরিয়ায় নৌকো ভাসছিল, কাণ্ডারীর আশায় হাহাকার করছিল একজন। তাই শুনে সে এসে হাল ধরেছিল, হাত ধরেছিল।

কিন্তু মাঝদরিয়ায় মানুষের আর এক রীতি। হাত যে ধরতে আসে, তাকে সে আঁকড়ে ধরতে চায়। তার সেই বেপরোয়া দুরন্ত আবেগে নাজেহাল হয়ে কুন্তীবাঈ কখনো ভুরু কোঁচকাতো, কখনো বা নিরুপায় হয়ে হেসে ফেলত। বলত, তুমি তো মূর্তিমান দস্যু একটি, তোমার গান কি করে হবে?

অক্ষু কখনো হাসত, কখনো বলত, শিব না হতে পারি, নন্দী-ভৃঙ্গীর একজন হব।

কথা বললে কুন্তীবাঈও কথা জানে। তবে বলে না বেশি। একদিন বলেছিল, নন্দী-ভৃঙ্গীরা কি পার্বতীর দিকে হাত বাড়ায়? দূর থেকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, পার্বতী আশীর্বাদ করেন তাদের।

বাইরে এখনো প্রায় তেমনি নিরাসক্ত, তেমনি নিস্পৃহ সে। খাঁ সাহেবের সামনে বা তাঁর মজলিশের চেলা-চামুণ্ডাদের সামনে অক্ষুকে ভাল করে চেনেও না যেন। তবু অক্ষুর মনে হয়, খাঁ সাহেবের বকাবকি গালিগালাজ ক্রমশ বাড়ছে। আগের থেকে 'চীজ' হয়তো দুই-একটা বেশি দেন, কিন্তু তার বিনিময়ে নির্যাতনও অনেক বেশি করেন। কথায় কথায় অপমান করেন।

অক্ষু কুন্তীবাঈয়ের কাছে ফেটে পড়ে একদিন। আগে যা মুখ বুজে সহ্য করত, কি জানি কেন, এখন আর তা পারে না। বলে, নেহাৎ নাড়া বেঁধেছি ভাই, নইলে মাথাটা কোনদিন আমি ওর দুখানা করে দিতাম।

কুন্তী জবাব দেয়, তোমার চোখ-মুখ দেখে আমার ভয় হয়, কোন্ দিন জানি তাই দাও। উনি গুরু ভুলো না।

অক্ষুর রাগ হয়। এই গুরুকে কোন্ অর্ঘ্য কুন্তী নিজে দিয়েছে জানে বলেই সর্বাঙ্গ জ্বলে

ওঠে তার। আবার শান্ত হয়ে নিজেই একসময় বলে, গুরুর মত গুরুর জন্যে বুক চিরে রক্ত দিতে পারি আমি। গুরু হবেন নারায়ণের মত শুচি দিয়ে ঘেরা—আনন্দময়, উদার। কিন্তু সেই গুরু পেলাম না।

এই খেদ কুন্তী একাধিক দিন শুনেছে। চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখেছে তাকে। একদিন মাথা নেড়ে বলেছিল, সত্যি কথা। কিন্তু তেমন গুরুও আছে, ভাগ্যে নেই, আমরা পাব কেমন করে।

কথাটা অক্কু তলিয়ে ভাবেনি। ভগবানে বিশ্বাসের মত এও একটা বিশ্বাসের উক্তি বলেই ধরে নিয়েছিল। সে যে তার বাবা পণ্ডিত উপানন্দ ভাসের কথা বলছিল সেটা খেয়াল হয়নি।

দিনের মধ্যে একবার না একবার দেখা হয় দুজনের। কুন্তীবাঈ আসে, কিশোর মহারাজ টের পান। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না বড়। কুন্তী নীচে থেকেই চলে যায়। কিন্তু কিশোর মহারাজের শীর্ণ শুকনো মুখে প্রশ্রয়ের আভাস দেখেছে অক্কু। তিনি একটুও বিরূপ নন তার ওপরে, বরং খুশি যেন।

কিন্তু কুন্তীবাঈ আসে খুব কম। অক্কুই প্রায় প্রত্যহ যায় তার ওখানে। গানের নানা দুরূহ শাখার আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। যে 'চীজে'র প্রত্যাশায় তীর্থের কাকের মত গুরুর সামনে বসে থাকে দিনের পর দিন, কুন্তীর কাছ থেকে তাই অক্কু আদায় করে নেয়—কখনো অনুনয়-অনুরোধ করে, কখনো বা রাগ করে, ধমকে। কিন্তু কুন্তী শেখাতে পারে না, শেখাতে চায়ও না। নিজে গায়, শুধু বলে, যেটুকু বোঝবার বুঝে নাও—বিরক্ত করো না।

না, গান যখন কুন্তী গায়, অক্কু বিরক্ত করে না। বিভোর হয়ে শোনে। শেষ হলেও বিভোর হয়ে থাকে।

কিন্তু কুন্তী একদিন যথার্থ অবাক অক্কুর রেওয়াজ শুনে। নিজের ঘরে বসে রেওয়াজ করছিল, বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ শুনছে ভাবেনি।

কুন্তী কান পেতে শুনেছে, তারপর ঘরে এসে কাছে বসেই শুনেছে। শেষ হতে অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়েছিল খানিকক্ষণ, জিজ্ঞাসা করেছে, এ তুমি শিখলে কোথা থেকে?

অক্কু নীরব।

খাঁ সাহেব দিয়েছেন?

না।

তবে?

তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি।

অক্কুর মনে হয়েছে, কুন্তীকে বলবে না কেন? তার কাছে গোপন করার আছে কি? বলেছে। তার নৈশ অভিযানের কথা বলেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চুরি করে খাঁ সাহেবের রেওয়াজ শোনার কথা বলেছে।

কুন্তীর বিস্ময়ের শেষ নেই। নিষ্পলক কতক্ষণ চেয়েছিল ঠিক নেই। তারপর বলেছে, তোমার গান ঠেকাতে পারে দুনিয়ায় এমন কেউ নেই, কিন্তু খাঁ সাহেব জানলে তাড়াবেন তোমাকে।

অক্কু হেসে মাথা নেড়েছে। জানে।

নিভৃতে বসে দিনের পর দিন দুজনে গানের নানা সমস্যা নানা জট ছাড়াতে গিয়ে আর এক জটিলতার সৃষ্টি করবে সেও অবধারিত। অঙ্কুর প্রত্যাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমশ। প্রত্যাশা গোপন করতে জানে না সে। গান থেকে রূপ বাদ দেওয়া যেমন, গান থেকে কুন্তীবাঈকে ছেঁটে ফেলার চেষ্টাটাও তেমনি। তেমনি দুর্বহ, যন্ত্রণাদায়ক। সে চেষ্টাও করেনি অঙ্কু। ফলে কুন্তী কখনো বিড়ম্বিত হয়েছে, কখনো গম্ভীর হয়েছে। কিন্তু যে লোক নিঃশেষে সমর্পণ করতে জানে, একেবারে তাকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবে কেমন করে?

নিজের অগোচরে প্রশ্রয় সে-ও দিয়েছে বইকি। আর সব সময় একেবারে অগোচরেও নয়। গান আর গানের আলোচনার মধ্য দিয়ে কতবার যে নিজেকে প্রকাশ করেছে, কুন্তীবাঈ সেই নিবিড় অনুভূতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেনি। গোড়ায় গোড়ায় চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষে চেষ্টা করতেও তার ভালো লাগেনি। অঙ্কু কালিদাসের ঋতুসংহার বর্ণনা করে, মেঘের মৃদঙ্গ-ধ্বনি মূর্ত করে তোলে। ঋতুসংহারের মতই সেই উচ্ছৃঙ্খল বর্ষার ঝাপটায় ইন্দ্রিয়ের পথে মানসপ্রিয়াকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে চায়, আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। আবার বাইরের এই অশান্ত বর্ষা থেকে মেঘদূতের অন্তরের বর্ষায় এসে উপস্থিত হয় সে, যে বর্ষা প্রশান্ত গম্ভীর, উদাত্ত সুন্দর। কিন্তু এই সব বর্ষার মধ্যে অঙ্কু কে?

অঙ্কু চাতক। তৃষিত চাতক। তার কপালে চিরতৃষিত চাতকের অভিশাপ।

কুন্তীবাঈ হেসে ফেলে। ঠাট্টা করে, কাব্যে চাতকেরও তো একটু জায়গা আছে।

অঙ্কু মাথা নাড়ে, বলে, কাব্যে থাকুক, কিন্তু জীবনে এলে দুর্বিষহ।

গম্ভীর হতে চেষ্টা করে কুন্তীবাঈ, বলে, জীবনে আসতে দিও না তাহলে—সময় থাকতে তাড়াও।

বলে বটে, কিন্তু অঙ্কুর এই চোখ থেকে চোখ ফিরিয়েও থাকতে হয় জোর করে।

এক সন্ধ্যায় বাংলা গান শুনতে চাইলে কুন্তীবাঈ। আগে কি গাইছে বুঝিয়ে দিতে বলল। অঙ্কুর যে গানটা মনে পড়ল, সেটার ব্যাখ্যা আগে করতে চাইল না সে। হাসছে মৃদু মৃদু, বলল, মানে পরে শুনো আগে গান শোনো, নিধুবাবুর টপ্পা—

কালো নয়নে আর কাজলে
কোরো না কালো।
নিশিত শায়কে ·রল কে বা
দেয় বলো।

কুন্তীবাঈয়ের মুখের ওপর চোখ রেখে গানটা শেষ করল, হাসছে মুখ টিপে। এই হাসি দেখেই কুন্তীবাঈ বুঝে নিয়েছে গানের বাণীতে রসের কিছু ব্যাপার আছে। মুখ ফুটে ব্যাখ্যা শুনতে চায়নি। গান থামিয়ে অঙ্কু নিজেই বলেছে।—তোমার চোখ তো এমনিতেই হৃদয়বিদারী ঘন কালো, কাজল পরে তাকে আরো কালো কর· ·ন। অর্থাৎ ওই স্বাভাবিক কালো চোখের দৃষ্টিবাণেই যার হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারো—এমন চোখে কাজল পরে আরো ধারালো করার দরকার কি? নিশিত শায়কে অর্থাৎ তীক্ষ্ণ তরবারীতে কে আর বিষ মাখায়, সে তো এমনিতেই কাটবে!

কুন্তীও তার চোখে চোখ রেখে ব্যাখ্যা শুনল। চোখের কোণে, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। ব্যাখ্যা শেষ করে অঙ্কু গানটা আবার গাইল। এই গান এবারে শ্রোতার গ্রহণে সম্পূর্ণ।

কুন্তীবাঈ মন্তব্য করল, কথাগুলো সুন্দর চাটুকারিতায় ভরা। তোমরা বাংলা দেশের লোকেরা বেশ মাথা খেলাতে জানো।

অঙ্কু তক্ষুনি প্রতিবাদ করে, বলে, দুর্নাম দিও না, আমরা হৃদয়ের কারবারী বলেই মরেছি।

মরেছ না মারছ কে জানে। কুন্তীবাঈ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

নিজের ঘরে বা গোমতীর নিরিবিলিতে বসে কত সন্ধ্যা কেটেছে। গভীর আগ্রহে অঙ্কুর ছেলেবেলার কথা শুনেছে কুন্তীবাঈ, পান্নালালের কাহিনী শুনেছে, ছন্নছাড়া জীবনের হতাশার গল্প শুনেছে, এমন কি তারাবাঈয়ের অধ্যায়ও শুনেছে। এই শোনার মধ্যে একজনের বেদনার অংশ গ্রহণের প্রশ্রয়ও ছিল বইকি। কতদিন তো তার পিঠে হাত রেখেছে, হাতের মৃদু তাড়নায় নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিয়েছে।

কিন্তু কোনো নিভৃত মুহূর্তেও নিজের জীবনের ক্ষত এক দিনের জন্যে উদঘাটন করেনি। অঙ্কু আশা করেছিল, করবে। ভেবেছিল, করলে শান্তি পাবে, সান্ত্বনা পাবে। কিন্তু অঙ্কু শোনার জন্যে জোর করেনি কখনো। জানেই তো। সব জেনেই তো সে কাছে এসেছে। আরো কাছে আসতে চাইছে।

এই চাওয়াটা উদগ্র হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

আভাসে-ইঙ্গিতে অনেক দিন কুন্তীর কাছে ব্যক্ত করেছে, তারা চলে যাবে এখান থেকে। দুজনে। শিব আর সুন্দরের রাজত্বে নিজেদের জগৎ সৃষ্টি করবে। দুজনে চেষ্টা করলে একটা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে পারে তারা।

কুন্তী প্রথম প্রথম হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরে গম্ভীর হয়েছে। ইদানীং আরো গম্ভীর হয়ে পড়ছে। কিন্তু একটা দ্বন্দ্বের সঙ্গে যেন নিঃশব্দে যুঝছে সে। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে চাইছে।

সম্প্রতি তার আচরণও ঈষৎ কঠিন, ঈষৎ রূঢ়। কিন্তু আর একজনের আবেগের উৎস তার নিজেরই বুকের মধ্যে। সেখানকার প্রেরণা দ্বিধা জানে না। সেই মত্ততার কাছে কুন্তীবাঈয়ের বিচ্ছিন্নতার বাঁধটা সব সময় টেঁকে না। কখনো-সখনো হাল ছাড়তে হয়, প্রশ্রয় দিতে হয়। অবরোধ একবার ঘুচলে তখনকার মত অন্তত অনেকটাই ঘোচে।

এমনি একটা রাত।

অঙ্কুর ভিতরে ভিতরে কম করে সাত-আট দিনের ক্ষোভ জমা। খাঁ সাহেবের কাজের পাল্লায় পড়ে এর মধ্যে একদিনও এদিকে উঁকিঝুঁকি দেবার ফুরসৎ হয়নি। তিনি যেন আড়ি করে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন তাকে। আর সকালের মজলিশে কুন্তী তো চেনেই না তাকে।

তার এ ধরনের ক্ষোভের মুখে পড়লে কুন্তী জবাব দেয় না, হাসে মুখ টিপে। সেদিন মন-মেজাজও কেন জানি একটু ভালো ছিল কুন্তীর। আরো একটু তাতিয়ে দিল তাকে। বলল, খাঁ সাহেবের ইচ্ছে তাঁর চাকর-বাকর সব তুলে দেন, অঙ্কু একাই নাকি একশো, শুধু সে থাকলেই হবে।

চোখ পাকিয়ে অঙ্কু শাসালো, আমি যদি কোনদিন খুন করে বসি ওকে, তার জন্যে তুমি দায়ী হবে।

কুন্তী হাসছে মুখ টিপে।

বাইরে যতই রাগ দেখাক অঙ্কু, ভিতরে রাগের লেশমাত্র নেই। তারও ভালো লাগছে। কুন্তীর ওই একটু একটু হাসি আরো ভালো লাগে। মনে মনে ভাবছে আজকের এই রূপটা কেমন। ভৈরব-পত্নী বাঙালীর মত নয়,পঞ্চমাঙ্গনা বড়হংসিকার মত যেন। মৃদুমন্দ হাস্যমুখী, মাধুর্যভরা ঈষৎ চঞ্চল দৃষ্টি, প্রিয়সঙ্গলাভে হৃষ্টচিত্ত, বিলাসী রোমাঞ্চিতাঙ্গী সর্বত্র সমাদর আর খ্যাতি বড়-হংসিকার।

সামনে তানপুরাটার একটা তার আঙুলে নাড়িয়ে দিয়ে কুন্তী জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

বড়-হংসিকা।

কুন্তী অবাক একটু প্রথম। তারপর হাসতে লাগল।—ভাগ্যিস মালবী বলোনি।

অতি কামাতুরা মালবী—প্রিয়জন-বিরহে আহার-নিদ্রা ছেড়েছে।

হাসতে গিয়ে অক্কুর হঠাৎ কি মনে হল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, কোন্ রাগ সব থেকে প্রিয় তোমার?

কি মনে হয়?

অঙ্কু আরো একটু কাছে সরে এলো। ভালো করে দেখল। অন্দরমহল দেখা। ভাবছে। কেন জানি তার হঠাৎ মনে হল জয়জয়ন্তী। বাইরে গম্ভীর, গুমোট—কিন্তু তার আড়ালে ব্যক্তিগত সত্তার যোগ। পূর্ণ শৃঙ্গারের রূপ জয়জয়ন্তী, অথচ অনাবিল—চাপা সঙ্গোপন বাসনার ওপর অকলুষ প্রলেপ।

বলল, জয়জয়ন্তী। ঠিক বলেছি?

কুন্তী হাসছে তেমনি। মাথা নাড়ল। ঠিক বলেনি।

তবে কি?

কুন্তীর হাসিভরা টানা টানা চোখ দুটো তার মুখের ওপর আটকে রইল খানিক। কিন্তু তাকে দেখছে না ঠিক, তার দিকে চেয়ে নিজেরই অন্তস্তল থেকে একটা সুর টেনে তুলেছে। সেই সুর কণ্ঠে এলো তারপর। তেমন উঁচু পর্দায় নয়, আবার খুব আস্তেও নয়।

গরজি ঘটা ঘ ন কারেরি কারে
পাওস রুত আয়ো
দুলহন মন ভায়ো

আকাশটা চারদিক থেকে ঘন কালোয় ছেয়ে গেল। কিন্তু যত বর্ষণই হোক, পাওয়ার ঋতুও তো এসেছে। প্রিয়কে যে ভালো লেগেছে।

এবারে অক্কুর অবাক হবার পালা। মেঘ। এই একটা রাগ মেয়েরা অন্তত পছন্দ করে না, গাইতে চায় না বলে ধারণা ছিল তার। বিচ্ছেদের অনুভূতি এর পরিণতি। প্রিয়কে ভালো লাগলেও মিলন বিধিলিপি নয়।

অঙ্কু বিশ্বাস করতে চায় না, বলল, কখনো গাইতে শুনিনি তো?

কুন্তী হালকা জবাব দিল, মনের জিনিস বেশি শোনাতে নেই।

অঙ্কু ভাবল, হবেও বা। সব মেয়ে ওই রাগ রপ্ত করতে পারে না। কিন্তু কুন্তী তো সব মেয়ের একজন নয়। তার বুকের তলায় মেঘের গুরুভার থাকাই তো সম্ভব। একটু বাদে ছেলেমানুষের মতো বলল, আমার যে কি মনের জিনিস আমি নিজেই জানি না।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে কুন্তী তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, আমি জানি, হিন্দোল—

সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি হিন্দোল, রুক্ষ প্রকৃতি, প্রচলিত সকল রীতির প্রতি বিদ্বেষ তার। অহংভাবের রাজসিক অভিব্যক্তি হিন্দোল—বিদ্রোহ মূর্তি।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু হাসি থামিয়ে কুন্তী আবার দেখতে লাগল তাকে। খুব কাছ থেকে তাকে চোখের ভিতর দিয়ে। তারপর ঈষৎ অন্যমনস্কের মত বলল, আমি জানি তোমার মনের জিনিস। ললিত—। জীবনের সব কিছুর মধ্যে, সব রুক্ষতার মধ্যে লালিত্য আনতে চাও তুমি। তুমি রূপ খুঁজছ, সুন্দর খুঁজছ—বাইরে তুমি রুক্ষ হিন্দোল, ভিতরে তুমি ললিত।

হঠাৎই যেন চমক ভাঙল কুন্তীর। তার দুই বাহুর ভিতর দিয়ে আর একজনের দুটি বাহু নিবিড় হয়ে আসছে ক্রমশ। নাকে-মুখে তপ্ত নিশ্বাস লাগছে। সে কতটা এগিয়েছে আজ, এই যেন প্রথম হুঁশ হল। কিন্তু দেরিতে হল। চোখে চোখে বিনিময়। চোখের তারায় তারায়।

কুন্তীর মনে হল ক্ষান্ত আর হবেই না বুঝি। এই রাত এমনি কেটে যাবে। সে যেন সদ্য ইন্দ্রিয়-সজাগ এক প্রবল শিশুর হাতের খেলনার মত। ইচ্ছেমত ভাঙছে, গড়ছে। হাতের পীড়নে ভাঙছে, অধরের তাপে গড়ছে।

কতক্ষণ কেটেছে কুন্তী জানে না। ক'টা পল, ক'টা মুহূর্ত, ক'টা ঘণ্টা—কিছুই জানে না। দুই হাতের অমোঘ বেষ্টনে সর্বাঙ্গ পুরুষদেহের সঙ্গে মিশে আছে তখনো। নিশ্বাসটা মুক্তি পেয়ে বেঁচেছে শুধু। মুখ তুলে লোকটা দেখছ তাকে। নিবিড় সান্নিধ্যের গ্রাসের মধ্যে রেখে তার দুই চোখের ভিতর দিয়ে অন্তস্তলের খবর নিচ্ছে।

অঙ্কু ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, কবে যাব আমরা এখান থেকে?

কুন্তী নির্বাক, নিস্পন্দ। চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে, তবে দু'চোখ টান করেই দেখছে সে। জীবন দেখছে, মৃত্যু দেখছে।

দুই ঠোঁট এগিয়ে এলো আবারও। আদিম তাড়নায় সমস্ত প্রতিরোধ ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করে দেবার মতো করে। অধর-গ্রাসের মধ্য দিয়ে সর্বাঙ্গ গ্রাস করল আবারও। তারপর এক সময় দম নিল একটু।—কবে যাব?

কুন্তী কথা না বললে ওই উষ্ণ ঘন অধরের নিপীড়নেই কথা সে আদায় করে নেবে যেন। সমর্পণের নিষ্ঠুর দাবিটাই সকল কথার শেষ কথা।

বিস্মৃতির স্তরে স্তরে চেতনার নাড়া পড়ল। কথার দাবি না থাকলে পড়ত না বোধ হয়। আস্তে আস্তে কুন্তী ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল নিজেকে। কতকটা পারল, কতকটা পারল না। চেয়ে চেয়ে দেখল খানিক। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, আমার কথা জানো সব?

জানি, সব জানি। অধীর অসহিষ্ণুতায় জানাজানির সব গ্লানি দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল সে।

কুন্তী চেয়েছিল। চেয়েই রইল। মস্ত একটা ঝড়ের আলোড়নের পর সে যেন এইখান থেকে এখানেই ফিরে আসছে ক্রমশ। এবারের কণ্ঠস্বর তেমনি মৃদু, কিন্তু স্পষ্টতর।—গানের জন্যে আমি সব ছেড়েছি, আমার জন্যে তুমি গান ছাড়বে?

এমন অবুঝ কথাও শুনতে হবে, এই মুহূর্তে এ-যেন অঙ্কু ভাবতেও পারে না। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, গান ছাড়ব না, গান পাব—দু'জনে মিলে গানের মধ্যে ভেসে যাব আমরা—তুমি বলো কবে যাব এখান থেকে ?

তবু বলতে সময় লাগল কুন্তীর। তার দেখাই যেন শেষ হয়নি। অনেকক্ষণ বাদে বলল, বলব, আজ নয়...

কবে?

আর একদিন। খুব শিগগীর।

খুব শিগগীরই বলেছে। পরদিনই। পরদিন রাত্রিতে।

দোতলায় খাঁ সাহেবের ঘরে ডাক পড়েছে। গিয়ে দেখে খাঁ সাহেব তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। অদূরে মূর্তির মত কুন্তীও। সে কখন এসেছে অঙ্কু টের পায়নি।

খাঁ সাহেবের চোখে চোখ পড়তে অঙ্কু থতমত খেয়ে গেল হঠাৎ। ভাঁটার মত দু'চোখ জ্বলছে। সমস্ত মুখ থমথমে। গুরুগম্ভীর আদেশ দিলেন, বয়েঠ্ যাও, রেয়াজ করো।

একচাপ দিশেহারা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা জোরালো আলো জম-জমিয়ে উঠলে তার ধোঁকা কাটতে সময় লাগে একটু। কিন্তু কাটলে পরে আনাচ-কানাচ সুদ্ধু দেখা যায়। দু-চার মুহূর্তের বিড়ম্বনা কাটিয়ে কুন্তীর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সব দুর্বোধ্যতার পুরু পর্দাটা যেন গোটাগুটি সরে গেল অঙ্কুর চোখের সমুখ থেকে।

ওস্তাদ জামাল খাঁ চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন আবার, বয়ঠো। রেয়াজ শুনাও।

অঙ্কু বসল। হাত বাড়িয়ে তানপুরাটা টেনে নিল। আঘাতটা এত বড় আর এমনই আকস্মিক যে, সে বোধহয় হাসতেও পারে চেষ্টা করলে। কুন্তীর দিকেই চেয়ে আছে। কুন্তী স্থাণুর মত অন্য দিকে মুখ করে বসে আছে।

রেয়াজ করল। ফাঁকি দিয়ে নয়, সমস্ত মন সন্নিবিষ্ট করে। যতটা জানে আর যতটা রপ্ত করেছে, তার সবটাই উজাড় করে দিল। তারপর থামল। তারপর জামাল খাঁর মুখোমুখি ঘুরে বসল।

তাঁরই রেয়াজের অন্তরঙ্গ কারিকরী শুনছিলেন জামাল খাঁ। লোমশ বুকের ভিতরটা বিষবাষ্পে ভরে উঠছিল। চাপা গর্জনে গরগরিয়ে উঠলেন, এ তুম কাঁহাসে শিখা?

আপনার থেকে। নিঃশঙ্ক জবাব।

উয়ো ক্যায়সে?

রাত্রিতে এসে, চুরি করে।

ক্রোধে বীভৎস হয়ে উঠল খাঁ সাহেবের সমস্ত মুখটা। ব্যঙ্গবাণে প্রথমে ঝলসে উঠলেন নিজেই, বা বা বা। আব্ তো একদম ওস্তাদ বন্ গায়ে তুম! একদম তান্ স্যা-ন্। পরক্ষণে সগর্জনে ফেটে পড়লেন একেবারে, বেইমান—বেশরম্—নিকল্ যা ইহাঁসে, অগর ফির তেরা চেহরা

ইহাঁ দেখা তো জুতেসে খবর লুঙ্গা।

অক্ষু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। স্থির শান্ত দুই চোখ মেলে কুন্তীকে দেখল আর একবার। সে অন্যদিকেই মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। অক্ষু নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

নীচে। রাস্তায়।

আচমকা আঘাতে বলির পশুর মাথাটা আলাদা হয়ে গেলেও ধড়টা দু'চার মুহূর্ত ধড়ফড় করে। কিন্তু আঘাতটা তার থেকেও বেশি হলে সেই বিক্ষেপটুকুও থাকে না বোধহয়। অক্ষু যেন ভারী অনায়াসে জীবন থেকে এমনিই এক অপরিসীম মৃত্যুর মধ্যে এসে গেছে।

সকল তাপ সকল আক্ষেপের অতীত অনিঃশেষ মৃত্যু।

বিছানাটা গুটিয়ে নিল। তোরঙ্গটা গুছিয়ে নিল। তানপুরাটা খোলের মধ্যে পুরল। নীরব নিথর মৃত্যুর মতই নিঃশব্দে কিশোর মহারাজের বাড়ি ছাড়ল।

কলকাতা।

অক্ষু কলকাতায় এলো কেন, কি করবে এরপর, কিছুই জানে না। কিছু ভেবে আসেনি, কোনো সঙ্কল্প নেই। এলো এই পর্যন্ত। ছন্নছাড়ার মত ঘুরল দিনকতক। কোনোদিন খেল, কোনোদিন খাবার কথা মনে থাকল না। এই পুরনো কলকাতাও যেন এক নতুন জায়গা। এখানে কেউ তাকে চেনে না, সেও কাউকে চেনে না। চেনবার বা চেনানোর এতটুকু তাগিদ পর্যন্ত নেই।

কিন্তু তবু চিনল একজন। অক্ষুর একমাথা চুল, খোঁচা দাড়ি, বিবর্ণ মূর্তি, ময়লা জামা-কাপড়—কিন্তু তা সত্ত্বেও চিনল তাকে। একটা ট্রাম স্টপেজের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কোথায় যাবে জানে না, আদৌ কোথাও যাবে কি না, তাও না। আশেপাশে কারা দাঁড়িয়ে আছে, তাও লক্ষ্য করেনি।

মাস্টার মশাই!

অক্ষু সবিস্ময়ে ফিরে তাকালো। তারপর চিনল। রাজেশ্বরবাবুর মেয়ে লক্ষ্মী। এই প্রথম নিজের সম্বন্ধে সচেতন হল অক্ষু। বেশবাস, চেহারা কিছুই যে ভদ্রলোকের মত নয়, এই প্রথম খেয়াল হল সেটা। দেখা না হলেই ভালো হত। সে তো এই দুনিয়ার সব চেনা মুখের আড়ালেই থাকতে চায়।

লক্ষ্মী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে চিনতে পারছেন না মাস্টারমশাই?

অক্ষু হাসল এবারে। হাসতে না পারা আরো অশোভন। এই সে লক্ষ্মী নয়, দস্তুরমত সমীহ করার মত মহিলা। আগের থেকে অনেক হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। বেশবাসে আতিশয্য নেই, কিন্তু রুচির ছাপ আছে। মুখখানা আগের মত অত গম্ভীর নয়, এই মুখে মর্যাদার একটা মিষ্টি অভিব্যক্তি মিশে আছে।

অক্ষু মাথা নাড়ল। চিনেছে। বলল, ভালো আছ?

জবাব না দিয়ে পথের অনেককে অবাক করে লক্ষ্মী পথের মাঝেই ঝুপ করে পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল তার। অক্ষু তটস্থ, একরাশ ধুলো-বালি মাখা পা তার।

লক্ষ্মী বলল, আমি তো ভালো আছি, কিন্তু এ-কি চেহারা হয়েছে আপনার। আমি তো

প্রথমে চিনতেই পারিনি। আপনি কলকাতায় আছেন তাও জানি না—

ছিলাম না। দিন কয়েক হল এসেছি।

ও, কোথায় আছেন এখন?

অক্ষু জবাব দিল না, হাসল শুধু। তিনটে দিন যে পার্কের বেঞ্চে শুয়েই রাত কাটিয়ে দিয়েছে এ আর বলে কি করে। লক্ষ্মী পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আর কিছু শুনতেও চাইল না, বলল, আমার সঙ্গে চলুন, বাবা আছেন বাড়িতে। আমি দু'বছর হল কলকাতায় এসেছি, ডে কলেজে মাস্টারি করছি—গোড়ার ধাপ আপনি পার করে না দিলে আর পার হতে পারতুম না।

একটা ট্রাম এসে দাঁড়াতে লক্ষ্মী এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। তার নীরব অথচ চোখের সানুনয় অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হল না। দু'জনেই ট্রামে উঠল। পাশাপাশি বসল। কণ্ডাক্টার সামনে এসে দাঁড়াতে লক্ষ্মীই তাড়াতাড়ি টিকিট কাটল। অক্ষু বাধা দিল না।

এ ভাবে পাশাপাশি বসাটা অস্বস্তিকর লাগছে। সে ভাব গোপন করে হঠাৎ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, রাজেশ্বরবাবু তোমাদের কাছে আছেন?

আমাদের নয়, আমার কাছে। মা তো এই পাঁচ বছর হল মারা গেছেন। বাবার একটা পা প্যারালাইজড, হাঁটতে চলতে পারেন না। আমার কাছে এনে জোর করে ধরে রেখেছি।

অক্ষু ঘাড় ফিরিয়ে দুই একবার দেখল লক্ষ্মীকে। জোর করতে পারার মতই মেয়ে বটে। অদৃষ্ট ওকে অনেক দুঃখের সঙ্গে এই জোরটুকু দিয়েছিল শুধু। দুঃখকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে আজ এই জোরের ওপরেই দাঁড়িয়েছে সে।...কিন্তু অক্ষু কি করল? এই মেয়ের পাশে বসে এতটুকু পথ অতিক্রম করতেও সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে সে।

রাজেশ্বরবাবু সত্যিই খুশি হলেন তাকে দেখে। তিন চার দিনের মধ্যে অক্ষু ছাড়া পেল না লক্ষ্মীর বাড়ি থেকে। সুন্দর গোছানো আড়াইখানা ঘরের ফ্ল্যাট। লক্ষ্মী কলেজে গেলে রাজেশ্বরবাবু শুধু মেয়ের গল্পই করেন। তাঁকে বৃদ্ধই বলা চলে এখন। কিন্তু এই মেয়ের জন্যেই এখনো তাঁর অনেক দিন বাঁচার সাধ। বাড়িতে অশান্তি লেগেই ছিল। এরই মধ্যে মেয়েকে রোজ দেখতে আসতেন তিনি। আর অবাক কাণ্ড, মেয়েও তাঁর বাড়িতে যেত তাঁকে দেখতে। মাথা উঁচু করেই যেত। মারা যাবার আগে লক্ষ্মীর মা নাকি মেয়েকে বলে গিয়েছিলেন, বড় হয়ে বাবার খোঁজখবর নিস, তাঁকে দুঃখ দিস না। বাড়ি এসে মেয়ে স্বচক্ষেই এক একদিন বাবার হেনস্থা দেখেছে। গঞ্জনা দেখেছে। বাড়িতে ছেলে লায়েক এখন। ছেলে আর ছেলের মা গার্জেন। সেখানে বাপ কেউ নয়।

মেয়ে একদিন বলে বসল, তুমি যদি আমার কাছে চলে না আস বাবা, তাহলে আমি বাইরের কোনো কলেজে চলে যাব, এখানে থাকব না।

আগেও অনেকবার বলেছিল। শেষে ওই মোক্ষম শাসানিতে রাজেশ্বরবাবু চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এসে বেঁচে গেছেন।

অক্ষুকে ধরে রাখতেই চেষ্টা করেছিলেন রাজেশ্বরবাবু। চেষ্টাটা প্রচ্ছন্ন নয় খুব। বলেছেন, যাবে কেন, এখানে থেকেই যা-হোক কিছু চেষ্টা করো না। বলেছেন, বাপ বলে বলছি না, ছেলেপুলে তো আমার আরো আছে, কিন্তু লক্ষ্মীর মত এমন মেয়ে হয় না। আর তোমাকে যত

ভক্তিশ্রদ্ধা করে ও, এমন বোধহয় আর কাউকে করে না।

চুপচাপ চেয়ে থেকে অঙ্কু তাঁর মুখের মধ্যে বাপের মুখই দেখেছে শুধু। তারপর মনের গভীর অনুভূতিটুকুই ব্যক্ত করেছে। বলেছে, লক্ষ্মীর মত মেয়ে আমিও কমই দেখেছি রাজেশ্বরবাবু, আমিই বরং ওর এতটা ভক্তিশ্রদ্ধার যোগ্য নই।

যাবার আগে লক্ষ্মী একবারও মুখ ফুটে বাধা দেয়নি। প্রণাম করেছে। হাসিমুখে বলেছে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে যখন ভালো লাগবে না, তখন একটু দম নেবার জন্যেও অন্তত চলে আসবেন এখানে। অবশ্য যদি আমি আবার এখানে থাকি—ছাত্রী আর গুরু দুজনেই হয়েছে ভালো।

বিধাতা বলে কি কেউ কোথাও আছে? থাকলেও ভ্রষ্ট-সাধনার কালিমাখা অঙ্কুর প্রার্থনা কি সে পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে? জানে না। তবু মনে মনে প্রার্থনাই করল সে, তুমি ভালো থেকো লক্ষ্মী, সুখী হয়ো।

দশ

যোগানন্দপুরের ভোল বদলেছে।

এত বদলেছে যে হঠাৎ চেনা দায়। অনেক পাকা ঘরবাড়ি উঠেছে, অনেক সবুজ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, অনেকগুলো বড় বড় বাঁধানো রাস্তা হয়েছে, গরুর গাড়ি গিয়ে ঘোড়ার গাড়ির ছড়াছড়ি—শহরে দু-পাঁচখানা মোটরও চলাচল করে।

হাট-বাজারের চেহারা বদলেছে, এমন কি লোকজনের হাব-ভাব চাল-চলন-বলনেও খানিকটা তফাৎ হয়েছে। যোগানন্দপুরের শেষ প্রান্তে একটা চটকল আর একটা কাগজের মিল বসেছে। ফাল্গুনের গা-জুড়নো বাতাসের সঙ্গে দূরের একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসে।

ছেলেদের ইস্কুল একটা ছেড়ে দুটো হয়েছে এখন। তাছাড়া একটা মেয়ে-ইস্কুল পর্যন্ত হয়েছে।

যোগানন্দপুরের যে মাটি থেকে জীবনের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল অঙ্কু—আজকের এই মাটির সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

যোগ চায়ও না। আঘাত পেলে শিশুর যেমন সর্বাগ্রে মায়ের কোলের কথা মনে পড়ে, শেষের ওই আঘাতে অঙ্কুরও যোগানন্দপুরের কথা মনে হয়েছে। মায়ের কোলে মায়ের বুকে ফিরবে। তারপর কি হবে মা জানে। লক্ষ্মীর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল এই জন্যেই। কিন্তু এই যোগানন্দপুর সেই মা নয়। সেই যোগানন্দপুর চোখ বুজেছে। এই যোগানন্দপুর যেন নতুন বয়সের শহুরে মেয়ে। অঙ্কু এই বাতাসটাকেই এড়াতে চায়। যৌবনের কোনো ছায়া, কোনো রোমাঞ্চ কাম্য নয়।

সে মৃত্যুর বিবরে প্রবেশ করেছে। ঠাণ্ডা, নিষ্ক্রিয় মৃত্যু। সেখান থেকে জীবনের আলোর মুখোমুখি হবার বাসনা আর নেই।

বিভু এখন গণ্যমান্য বিভূতি ঘোষাল। তার মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তি যোগানন্দপুরে একজনও

নেই। নতুন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সে, মেয়ে-ইস্কুলের কর্ণধার।

বাক্স-বিছানা ঘোষালবাড়ির দাওয়ায় রেখে অঙ্কু নিজের বাড়িটা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। যতটা জীর্ণ বিবর্ণ দেখবে ভেবেছিল, ততটা মোটেই নয়। নিয়মিত সংস্কারে তাদের ত্রিকোণ বাড়ির গায়েও যেন সংস্কারের বাতাস লেগেছে। অঙ্কু এখানে থাকতেই অনুদের বাড়িটা বেনা ঘোষাল কিনে নিয়েছিলেন। ওই বাড়িটাও ভেঙে নতুন করে করা হয়েছে।

বিভু বড়ি নেই, যোগানন্দপুরেও নেই। ব্যবসার কাজে বাইরে গেছে কিছুদিনের জন্যে। তাদের পৈতৃক ব্যবসা আগেরও চারগুণ ফেঁপেছে। পার্টনার নিতে হয়েছে একজন। ব্যবসার চাবি-কাঠিটি নিজের হাতে রেখেছে তখন পর্যন্ত।

বাড়ির চাবি হাতে এসেছে। বিভুর বউ চোখে না দেখলেও এই একজনের কথা অনেক শুনেছে। যত্ন-আত্তির ত্রুটি হয়নি। দু-বছরের ছেলে সহ লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর্তা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ-বড়িতে হবে। বাড়ির একটা চাকরকেও সারাক্ষণের জন্য ত্রিকোণ বাড়িতে মোতায়েন রেখেছে।

অঙ্কু অবাক হয়ে বিভুর ছেলেকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তারপর কোলে নিয়ে আদর করেছে। খাবার সময় অনুমানে বুঝল দরজার আড়ালে বিভুর বউ দাঁড়িয়ে। একবার ইচ্ছে হল সামনে ডেকে বিভুর বউকে দেখে, দুটো কথা বলে। ডাকল না। ডাকতে পারল না। মৃত্যুর বিবরে যে ঢুকেছে, জীবনের এই শ্রীর মধ্যে নিজেকে বেখাপ্পা উটকো গোছের লেগেছে। অস্বস্তি বোধ করেছে।

দিন কয়েকের মধ্যেই বড়তলা আর বামুনপাড়ার সকলে জানল, ত্রিকোণ বাড়ির নিরুদ্দিষ্ট ছন্নছাড়া ছেলেটা ফিরেছে।

অল্পবয়সী ছেলে-ছোকরারা সকলেই অপরিচিত। সমবয়সী সতীর্থরা কলেজে পড়তেই প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। কে কোথায় আছে এখন অঙ্কু জানে না। খোঁজও করল না। বৃদ্ধরা অবশ্য জানে কে এলো। মৃগাঙ্ক গোঁসাইয়ের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেটা এলো। তার হাবভাব চলন-বলন সুবিধের লাগল না কারো। কারো সঙ্গ মেশে না, কারো সঙ্গে কথা বলে না। দিন রাতের বেশির ভাগই কুমোরপাড়া ছাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা কুঁড়ে-ঘরে পড়ে থাকে। গান-বাজনা করে নাকি। শোনা যাচ্ছে গাঁজাও খায়। সেখানকার লাকজনের সঙ্গেই খাতির শুধু, তাদের মেয়ে-পুরুষেরা ভিড় করে আসে, সাধকজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাদেরই ঘর থেকে দিনের আহার পর্যন্ত আসে। বাড়িতেও গান-বাজনা শোনা যায় মাঝে মাঝে, তবে কম।

রটনার সবটাই মিথ্যে নয়। তথাকথিত ভদ্র-সমাজটিকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতেই চেয়েছে অঙ্কু। ছাত্রাবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে যে ঘরটায় সঙ্গীত-সাধনা চলত, সেইটাই নতুন করে আবার সংস্কার করে নিয়েছে। এখানকার এই সব লোকের সঙ্গে খাতির তার আগেও ছিল। এখন সেটা আরো বেড়েছে। কারণ গোড়ায় সে গান নিয়ে মগ্ন থাকত, এখন গান খুব বেশি করে না। হাতে অফুরন্ত সময়। তাদের সঙ্গে মেশে, গল্প করে, ঘরের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নেয়। অঙ্কুর ভালো লাগে এদের। মানুষকে এরা গোটাগুটি দেখে, তাকে দাঁড়ি-পাল্লায় ফেলে ওজন করে

না। চিরে চিরে দেখে না। কারো নিভৃতের ক্ষতের ওপর কৌতূহলের আঁচড় ফেলে না।

তাদের হাতে খাওয়ার গুজবটাও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। একটানা অনেকগুলো বছর সকলের হাতেই খেয়ে অভ্যস্ত সে। তাছাড়া স্বপাক আহারেও অভ্যস্ত। বিভুর বউয়ের পীড়াপীড়িতে দিন দুই ঘোষালবাড়িতে খেয়েছে, তারপর এক রকম জোর করেই নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিয়েছে।

কিন্তু সেই ব্যবস্থামত নিয়মিত দুবেলা রান্না করা হয়ে ওঠে না। তাছাড়া দিনের বেশির ভাগ সময় তো জংলা কুঁড়েতেই কাটে।

তার খাওয়া-দাওয়ার অব্যবস্থাটা কুমোরপাড়ার বুড়ো সর্দার মহেশের চোখে পড়েছিল। দুই একদিন কুঁড়েতে বসে চিঁড়ে-মুড়ি চিবোতে দেখেছে তাকে। সে-ই সব থেকে নিয়মিত আগন্তুক ওখানে। নাতনীর হাত ধরে গান শুনতে আসে রোজ। মহেশকে খুশি করার জন্য এক-আধটা নাম-ভজন গাইতে হয় রোজই। সেই প্রতীক্ষায় বসে থাকে সে। বলে, দা-ঠাকুর, তোমার গান তো কিছুই বুঝি না, কিন্তু গানের সময় তোমার মূর্তিটি দেখতে বড় ভালো লাগে।

তাদের হাতে খেতে আপত্তি নেই শুনে, আর খেলে কোনো অকল্যাণের ভয় নেই জেনে দিনের আহারটা এ ক'দিন তার ওখান থেকেই আসছে। মহেশের নাতনী জবা হাতে করে নিয়ে আসে। বছর তেরো বয়স মেয়েটার, ঢলঢলে কালো মুখখানি ভারী ভালো লাগে অঙ্কুর। বুড়োর চোখের মণি ওই নাতনী। তার ছেলে জাত-ব্যবসা ছেড়ে শহরের কলের কাজে লেগেছে। বুড়োর সেই খেদ যাবার নয়। কিন্তু তার কিছুটা সান্ত্বনা এই নাতনী। জবা এই বয়সেই নিজের হাতে কত সুন্দর খেলনাপাতি আর মূর্তি গড়ে সেই গল্প ফেঁদে বসলে মহেশের কালো মুখে আলো ঠিকরোয়। অঙ্কুকে নাতনীর হাতের জিনিস এনে দেখিয়েছে, উপহারও দিয়েছে। মেয়েটার বোধহয় গান ভালো লাগে, ডাগর দুই চোখ মেলে ঠায় বসে থাকে।

মহেশ গাঁজা খায়। একটু বেশি পরিমাণেই খায়। তাই ও জিনিসটা সঙ্গে করে নিয়েই আসে। কুঁড়েতে কোনো ভদ্রলোক না থাকলে অঙ্কুর অনুমতি নিয়ে গাঁজা ধরায়। অঙ্কুর অসুবিধে হয় না। এ পর্যন্ত নিজের হাতে গাঁজা অনেক সেজেছে—মুখে কোনোদিন ঠেকায়নি। কিন্তু নিছক খেয়ালের বসে এখানে এক-আধদিন ঠেকালো। দু'চোখ কপালে তুলে জবা অবশ্য নিষেধ করেছিল, খেওনি দা-ঠাকুর, আমি একদিন চুরি করে খেয়েছিলাম, খেয়ে একেবারে অজ্ঞান।

নাতনীর ভয়দেখে মহেশ হেসে বাঁচে না। গাঁজা ছোঁয়ার পরে মহেশ একেবারে একাত্ম ভক্ত হয়ে পড়েছে অঙ্কুর।

মুখে-চোখে জল দিয়ে অঙ্কু তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে দেখে একটি মেয়েই বটে। দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে। অঙ্কু ঘুমুচ্ছিল। গত রাত্রিতে আবার মহেশের গাঁজার কলকে হাতে নিয়েছিল। মহেশ নিঃশব্দে বাড়ির দোর পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে গেলে কাল আর আসা হত না। জিনিসটা যে ঠিক বরদাস্ত হয় না, অঙ্কু কাল নিজেই সেটা বুঝেছিল। আজ এই বেলা পর্যন্ত বেঘোর ঘুম। বিভুর চাকর ঠেলে তুলে দিয়ে গেছে।

সাক্ষাৎপ্রার্থিনীকে দেখে অঙ্কু মনে মনে অবাক হয়েছে। না, দেখে ঠিক নয়, দরজার দিকে ফিরে আছে, মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না।—কাকে চাই?

মেয়েটি ঘুরে বসল। দেখল দুই এক পলক।—অঙ্কুবাবুকে।

বলুন?

মেয়েটি তার দিকে চেয়ে থেকে গম্ভীর মুখে বলল, বলছি, বোসো—

ঠিক শুনল কিনা অঙ্কুর নিজেরই সন্দেহ। কাল মহেশের গাঁজার কল্কে সোজা ওর মাথাটা চড়াও করেছিল। নিজের চোখ-কানের ওপর দখলটা ঠিক মত ফিরেছে কিনা সেই সংশয়। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের মেয়ে, সুন্দরী না হোক ভারী সুশ্রী, সাদাসিধে বেশবাসেও রুচির শুচিতা চোখে পড়ে। কি বলবে বা কি করবে ভেবে না পেয়ে অঙ্কু সামনে বসে পড়ল।

মেয়েটি গম্ভীর মুখে আবার বলল, আমি এখানকার মেয়ে-স্কুল থেকে আসছি—

আমার কাছে?

হ্যাঁ।

একবার মনে হল তাকে বিভু বলে ভুল করছে হয়তো। কিন্তু একটু আগে তো তার নামটাই বলল। অঙ্কুর গোলমেলে লাগছে সব কিছু। জিজ্ঞাসা করল, কি দরকার বলুন...

ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে। তোমার নামে পাঁচজনে পাঁচরকম বলছে। আমার নাম অনুশ্রী—ওই ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস। উক্তির সঙ্গে সঙ্গে নির্লিপ্ত গম্ভীর ভ্রূকুটি।

এত কালের মধ্যে সামান্য একটু মানসিক যোগাযোগ থাকলেও সতের-আঠারো বছর আগের এক ফ্রক-পরা মেয়ের মুখের আদল অঙ্কুর চোখে পড়ত। চিনতে পারার কথা নয়, কিন্তু নাম শুনে খটকা অন্তত লাগার কথা একটু। তার বদলে অঙ্কু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইল।

পরমুহূর্তে সচকিত। খিলখিল হাসি। ঘরের এতকালের জরা কেটে যাবার মত উচ্ছ্বসিত মিষ্টি হাসি।—আমাকে চিনতেই পারলে না অঙ্কুদা, আমি অনু!

অনু! অনুশ্রী! গত রাতের কল্কের ঘোর কাটেনি যেন এখনো। ঠিক শুনেছে? ঠিক দেখছে? সেই অনু, ওই একতলা বাড়ির অনু! দুর্বোধ্য বিস্ময়ে চেয়েই রইল তেমনি।

এবারে অনুই যেন উল্টে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল।— কি কাণ্ড, এখনো চিনতে পারছ না নাকি?

অঙ্কু ঘাড় নাড়ল, পেরেছে।

অনু হেসে বাঁচে না। বলল, আমি আগেই জানি এই হবে। বিভুদার বউ বলল ডেকে পাঠাই, আমি বললাম, দাঁড়াও, জব্দ করে আসি—কক্ষনো চিনতে পারবে না। অনু চোখ পাকালো, এই অবস্থা তোমার, অ্যাঁ? নাম বললেও চিনতে পারো না?

অঙ্কুর ভালো লাগছে কিনা, খুশি হয়েছে কিনা নিজেই বুঝতে পারছে না। খুশি যদি হয়েও থাকে, তার তলায় তলায় অজ্ঞাত অস্বস্তি একটা। কি এক সঙ্কোচ। মৃদু হেসেই জবাব দিল, আমি ফ্রক-পরা অনুকে চিনতাম, অনুশ্রীকে চিনব কেমন করে?

অনু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, আমিও তো হাফ-প্যান্ট পরা অঙ্কুদাকে চিনতাম, তবু দেখেই চিনলাম কেমন করে?

বাড়িতে দেখছ বলে চিনেছ।

হ্যাঁ, তোমাদের মতই ভেবেছ। এতকালের মধ্যে একটা খোঁজও তো নিলে না।

অঙ্কু নিরুত্তর। সেই অনু এই হয়েছে জানলে খোঁজ নিত কিনা জানে না। অনেক ক্ষত জীবনে আসত কিনা, তাও জানে না। কিন্তু অনু এই দশ মিনিটে দেড় যুগের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল যেন। অনর্গল কথা বলল, অনেক প্রশ্ন করল, আর হাসল।

—সবে কাল সে শুনেছে অঙ্কুদা এসেছে, বিভুদার বউ খবর পাঠিয়েছে। এসে একটা খবরও কি করতে নেই মেয়েটা আছে না মরেছে? অনুশ্রী কাল বিকেলেই আসত, কিন্তু বিভুদার বউ বলে দিয়েছে সকালে এসে ঘুম থেকে না তুললে মহারাজের দেখা মিলবে না—তিনি সাধন-ভজনে চলে যাবেন। অনুর আবার ভ্রূকুটি, সাধন-ভজনটা কোন্ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে হয় শুনলাম?

অঙ্কুর কথা বলা দরকার, কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত। অনুর মুখের দিকে অন্তত অঙ্কুর শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকা বিসদৃশ। ওর কাছে সে কোন্ ত্রাসের মত ছিল একদিন, মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু জীবনের সেই সহজ অধ্যায়ে ফেরার চেষ্টা আরো বিড়ম্বনা। অঙ্কু কি জিজ্ঞাসা করেছে? হাসিমুখে অনু কি বলছে?

বলছে, এখানে এসেছে তা পাঁচ ছ'মাস হয়ে গেল। বিভুদার বকাঝকিতে না এসে পারেনি। কলকাতায় মাস্টারী করছিল। বড়দার সঙ্গে বাইরে বাইরেই থাকত, কলকাতায় এম. এ. পড়তে আসার পর বিভুদার সঙ্গে দ্বিতীয় দফা দেখা। প্রথম বারে তো সেই কত চেষ্টা করেও দেখা হলই না। অঙ্কুদা কি শুনেছে সে কথা? দ্বিতীয়বারে অবশ্য কলকাতায় এসে সে-ই বিভুদাকে এখানে চিঠি লিখেছিল। বিভুদা চিঠি পেয়েই কলকাতায় গিয়ে দেখা করেছে। অঙ্কুদার খোঁজ-খবর সেবারেও কম করেছে নাকি! বিবাগী লোকের খোঁজ আর কেমন করে পাবে। বিভুদা ক্বচিৎ কখনো চিঠি পেলে তাকে খবর দিত। আজও তো অনু ভাবছিল, বুক অবধি দাড়ি গেরুয়া-পরা এক সন্ন্যাসীকেই না জানি দেখতে হয় এসে।

অঙ্কুর কুন্তীবাঈকে মনে পড়ে গেল হঠাৎ। কুন্তী এ রকম হাসত? শেষের দিকে হাসত, সেই হাসিটা ঠিক এ-রকম নয়—তার হাসির মধ্যে এক -ধরনের ক্লিষ্ট অভ্যর্থনা মিশে থাকত কেমন।

সচকিত হল, অনু জিজ্ঞাসা করছে, বাইরে থেকে গানের মস্ত ওস্তাদ বনে এসেছ শুনতে পাই? বিভুদা বলছিল।

অঙ্কু মাথা নেড়ে হালকা জবাব দিল, হ্যাঁ, বিভুকে চিঠিতে গান গেয়ে শোনাতাম।

—আমাকে শোনাও না একটু। থাক বাবা, পুরুষমানুষকে গাইতে বসতে দেখলে আমার হাসি পায়। কলকাতার এক বড় গায়ককে একবার গাইতে দেখেছিলাম, তাঁর হাত-পা-মুখ নাড়া দেখে আমি সভা থেকে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচি—তুমি গাইতে গাইতে অত হাত-মুখ নাড়ো না তো?

তার চোখে-মুখে চপল শঙ্কা। অঙ্কু হেসে ফেলল।

মা? মা তো সেই কবে মারা গেছে। না, মাথা আর ঠিক হয়নি। ভাইটাকে কত কষ্ট করে

সে বড় করে তুলেছে, তার কাছেই থাকে। অন্তুদা তো সলুকে মোটে বছরটাকের দেখেছিল— কলেজে পড়ছে এখন। এখান থেকে সাইকেলে যায়, তবে পড়াশুনা? ওটার কিছু হবে মনে হয় না, দিনকেদিন বাঁদর হয়ে উঠছে। বই নিয়ে বসতে বললেই বলে মাথা ধরেছে, ভোগেও খুব— যে স্বাস্থ্য! সলুরও গান-বাজনার দিকে ঝোঁক, হাতের কাছে এ-রকম একজন গানের ওস্তাদ আছে শুনলে দৌড়ে আসবে—না, সেই বা হবে কেমন করে, ওদের তো আবার আধুনিক গান শুনি!

অবান্তর কথাও এত সরস মিষ্টি লাগে কি করে অন্তু ভেবে পায় না। লাগুক তা চায়ও না। অনুর সিঁথির দিকে চোখ গেছে অনেক আগেই। সীমান্তে লাল দাগের আভাস নেই। এই চেহারায় বিয়ে না হবার কথা নয়। চাকরি করে ভাইকে মানুষ করার ইচ্ছে বলে বিয়ে করেনি, না এম. এ. পাস মেয়ের পছন্দমত কারো সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি বলে করেনি? দেড় যুগ আগের একটা সম্পর্কের প্রহসন অন্তুর মনে পড়ছে। কিন্তু মনে পড়াটা হাস্যকর। অনুর মনে আছে? কলকাতায় সেই অনেক বছর আগে অসুখের সময় বিভু যেন এ-সম্বন্ধেই কি বলেছিল একদিন। কি আভাস দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যাক্, মনে করতে চেষ্টা করেও কাজ নেই। আবারও সেই অজ্ঞাত অস্বস্তিটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে ভিতর থেকে।

অনু বলল, বিভুদার বউয়ের কাছে শুনলাম, পয়লা নম্বরের বাউণ্ডুলে হয়েছ তুমি—দিন-রাত কোথায় থাকো, সময়মত নাওয়া নেই খাওয়া নেই—এসব কী!

যেন মাস দুই ছিল না এখানে, ফিরে এসে নালিশ শুনেছে, শুনে চোখ রাঙাচ্ছে। এও একটা প্রহসন। অস্বস্তি সত্ত্বেও অন্তুর মন্দ লাগছে না, হাসছে মৃদু মৃদু।

তার বাবার কথাও তুলল অনু, জ্যাঠামশাইয়ের খবর কিছু পাও? কি-চ্ছু না? কি করে পাবে, যে দুঃখ দিয়েছ তাঁকে। তোমার মত লোকের সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক রাখা উচিত না।

এবারে অন্তু জবাব দিল, বলল, এই অনুচিত কাজটা কেউ করছে না।

অনু ভুরু কোঁচকালো, তুমি তো সকলের সব খবরই রাখো। পরক্ষণে হেসে ফেলে ঈষৎ নীচু গলায় বলল, এতকাল যেখানে যেখানে কাটালে সেখানকার কেউও না?

ক্ষত-স্থানে আঁচড় পড়া সত্ত্বেও হাসির চেষ্টাটা বিষয় দুর্ভোগের মত। কিন্তু অন্তু আগে যা পারত না, এখন তা পারছে। হাসতেও পারল।

হাত-ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে অনু উঠে দাঁড়াল চট করে, আজ যাই, ইস্কুল আছে আবার—

একটা চাপা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অন্তুও উঠে দাঁড়াল। হালকা প্রশ্ন করল, ছাত্রীরা মাস্টার বলে মানে তোমাকে?

মানে না আবার! অনুর সামনে যেন ছাত্রই দাঁড়িয়ে একজন।—ভয়ে কাঠ একেবারে, গিয়ে দেখে এসো একদিন। তাড়াতাড়ি নিজেই আবার আমন্ত্রণটা বাতিল করে দিল।—না বাপু, তোমার গিয়ে কাজ নেই, যে ত্যাঁদড় মেয়ে সব আজকালকার, আমাকেই হয়তো জিজ্ঞেস করে বসবে, দিদিমণি, উনি কে?

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। নির্বাক অন্তুও। দেড় যুগের ব্যবধান ও এত

সহজে জুড়তে পারছে কি করে সেটাই মস্ত বিস্ময়।

অদূরে যোয়ান গোছের মিশ-কালো একজন প্রৌঢ় লোক দাঁড়িয়ে। অবাঙালী, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, গায়ে আধ-ময়লা খাটো ফতুয়া। তার দিকে অঙ্কুর চোখ পড়তে অনু পরিচয় দিল, ওর নাম জগুয়া, দেশ বিহারে, কিন্তু এতকাল ধরে তাদের সঙ্গে থেকে বাঙালী হয়ে গেছে—এখন বাংলা কাগজ পর্যন্ত ঠেকে ঠেকে পড়তে পারে। অনুর ভয়ানক ভক্ত, সেই ছোটবেলা থেকেই মা-মণি ডাকে। সবিস্তারে জগুয়ার পরিচয় দিয়ে অনু হাসল মুখ টিপে, বলল, এখানে ও এখন ইস্কুলের দারোয়ান আর আমার কড়া বডি-গার্ড।

বডি-গার্ড জগুয়া দু পা এগিয়ে এসে বাঙালী প্রথায় দু'হাত জুড়ে অঙ্কুর উদ্দেশে অভিবাদন জ্ঞাপন করল। দারোয়ান বলে তাকে হেলাফেলা করা চলবে না সেটা সে প্রথম সাক্ষাতেই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করল বোধহয়। যথাযোগ্য প্রত্যাভিবাদন পেয়ে ঈষৎ তুষ্ট মনে হল তাকে।

যতক্ষণ দেখা যায়, অঙ্কু দাঁড়িয়ে দেখল চুপচাপ। অনুশ্রী বার দুই পিছন ফিরে তাকিয়েছে, তারপর লজ্জা পেয়ে আর তাকায়নি। সে আগে আগে চলেছে। পিছনে জগুয়া। অঙ্কু দেখছে বডি-গার্ড দরকার বটে। জগুয়া মা-মণি ডাকে। হঠাৎই একটা বিকৃত চিন্তা এলো অঙ্কুর মাথায়, সম্পর্কটা বদলাবার আগে জামাল খাঁ কুন্তীকে কি বলে ডাকত? তারাবাঈকে নওয়াজ সাহেব কি বলে ডাকত? নিজের ওপরেই বিরক্তিতে হেসে ফেলল অঙ্কু। জগুয়া শিল্পীও নয়, গুরুও নয়, জগুয়া দারোয়ান।

ঘরে ফিরে এসে অঙ্কু চুপচাপ ভাবল খানিকক্ষণ। ভাবতে চেষ্টা করল। ভিতরে ভিতরে সে বিষম একটা নাড়া-চাড়া খেয়েছে আবারও। শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অবাঞ্ছিত ভাবছে। প্রথমেই স্থির করল, সে চলে যাবে এখান থেকে। সকলের অগোচরে যেমন এসেছিল, সকলের অগোচরেই তেমনি চলে যেতে হবে আবার। হারিয়ে যেতে হবে। মৃত্যু-বিবরের মানুষেরা জীবনের আলো সইতে পারে না। অনুর দিকে চেয়ে চেয়ে সেই আলোর সমারোহ দেখেছে। পূর্ণতার জোয়ার দেখেছে। সে এই রিক্ত দেউলে অন্তস্তলের দিকে ধীরে-সুস্থে তাকাবে যখন, বিষম হকচকিয়ে যাবে বোধহয়। অঙ্কু তার আগেই গা-ঢাকা দেবে এখান থেকে।

কিন্তু যাবে কোথায়? আগে হলে ভাবত না কোথায় যাবে। যে বন্দরে নোঙর ফেলেছিল, তার উৎসটায় গোটাগুটি টান ধরেছে। আশার প্রেরণা আর তাড়না দুইই শূন্যে মিলিয়েছে। সে-পথে মরীচিকারও সম্বল নেই আর। মাঝদরিয়ায় নৌকোটা ডুবেইছে শেষ পর্যন্ত। কাণ্ডারীর আশায় প্রেতের হাত-বাড়ানো হাস্যকর।

তাহলে কোথায় যাবে? গিয়ে কি করবে?

...কিন্তু যেতে তো হবেই। অনু এ-ভাবে এখানে আছে জানলে আসত না। সেই অনুকে এ-রকম দেখবে জানলে আসত না। কি রকব দেখল? কি-রকম জানে না, কিন্তু দেখে চোরের মত নিঃশব্দে পালিয়ে যাবার মত এক রকম যে, সেটা বুঝছে। বুঝে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে তার। ভাবছে, বাড়িটা বিক্রি করে দিতে পারলে কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত। না, এক্ষুনি যাওয়া তার হবে না—বিভু আসুক। সে যদি কেনে বাড়িটা, বা বিক্রির ব্যবস্থা করে দেয়। তারপর যাবে।

তিন দিনের মধ্যে জঙ্গলের কুঁড়ে ছেড়ে অঙ্কু বাড়ি-মুখো হল না। পরদিনই জগুয়ার সঙ্গে অনুর ভাই সলিল, অন্যথায় সলু, এখানে এসে দেখা করে গেছে তার সঙ্গে। অনুই পাঠিয়েছে জানে। বলেছে, দিদির সঙ্গে গতকাল বিকেলেই বিভুদার ওখানে গেছলাম, আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।

অঙ্কু জবাব দেয়নি। অনুর ভাইকে চুপচাপ খানিক দেখেছে। রোগা, বাবু-বাবু চেহারা। বছর আঠারো বয়স, বেশ-বাস আর কেশ-বিন্যাসে সযত্ন অবহেলার আভাস।

অঙ্কু জিজ্ঞাসা করল, তুমি গান-টান করো শুনলাম?

সলুর মুখে সলজ্জ হাসি।—দিদি বলেছে বুঝি? গান করি বলেই তো আবার দিনরাত বকুনি।

গাইতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চারিদিকে তাকালো সে। হারমোনিয়ামের বদলে তানপুরা চোখে পড়ল শুধু। গাইতে আপত্তি নেই। বিশেষ করে অঙ্কু ছাড়াও আরো শ্রোতা আছে যেখানে। বুড়ো মহেশের ও-পাশ থেকে ডাগর-ডোগর মেয়েটা দু'চোখ টান করে সেই থেকে চেয়েই আছে তার দিকে। সলু সেটা লক্ষ্য করেছে, ফলে গান শোনানোর উদ্দীপনাও বোধ করেছে।

হারমোনিয়াম ছাড়াই সরু গলায় গান শোনালো সলু।

মনোসরোবরে একটি কমল ফুটেছে,
কেমন করে ভ্রমর তা জেনেছে।

অঙ্কু গম্ভীর মুখ করেই শুনেছে। অপর শ্রোতা দুটি মুগ্ধ। গান শেষ হতে অঙ্কু শুধু বলেছে, বেশ—

সলু ফিরে তাকেও একখানা গান শোনাতে বলেছিল। অঙ্কু গম্ভীর মুখেই মাথা নেড়েছে, আমার গান তোমার ভালো লাগবে না।

অনুর এই ভাইটিকে দেখে অঙ্কু কে জানে কেন খুশি হয়নি তেমন। বোনের মত নয়। আট-ন মাসের ভাইকে কোলে করে যে অনু চোখের সামনে ঘুরঘুর করত, সেই ছবিটা চোখে ভেসেছে বার বার।

সলু চলে যেতে আবারও মনে হয়েছে, আর নয়—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাওয়া দরকার এখান থেকে। বিভু ফিরল কিনা বা কবে ফিরবে জিজ্ঞাসা করা হল না।

কিন্তু এর মধ্যে নিজে খোঁজ করতেও গেল না। গাঁজার মাত্রা রাতারাতি এমন চড়তে দেখে মহেশও অবাক হয়েছে, পরে সচেতন করতে চেষ্টা করেছে, দা-ঠাকুর, একবারে অত সইবেনি। আর তার নাতনী জবা মুখে নিষেধ না করলেও তার কালো মুখের টানা-টানা চোখে নিষেধের আকূতি ছিল।

মুক্তিটা সহজ পথে না এলে এইভাবেই মুক্তি খোঁজে বোধহয় মানুষ। তাকে যেতে হবে এখান থেকে। কিন্তু সেটা কোনো মুক্তির মাঝে যাওয়া নয়। অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে আত্মগোপন করা। তাতেও স্নায়ুর জোর চাই। তামসিক জোর। নিজেকে ক্ষয় করার মত জোর। এখানে এসে এই অনুকে দেখাটা বিধাতার ষড়যন্ত্রের মত।

স্নায়ু তেতে উঠলে ভাবনাটাও তাতিয়ে তোলা একটু সহজ হয়। অনু নয় অনুশ্রী। শ্রী শ্রী শ্রী—রমণীর অনেক শ্রী দেখেছে। আর দেখার সাধ নেই। নারীর বুকে মধু আছে—থাক, না

থাক, ও রকম একটা স্বপ্ন আছে বলে পুরুষের বাঁচোয়া। কিন্তু অক্ষু বাঁচেনি। কারণ নারীর বুকে বিষ যে আছে সেটা প্রত্যক্ষ সত্য। সেই বিষে কলজে ঝলসেছে তার।

মহেশের গাঁজার কলকে হাতে নিলে অনুকে আর কুন্তীবাঈকে আর তারাবাঈকে আর সব মেয়েকে এক করে দেখা যায়। ঝলসানো কলজেটাকে ওই কলকের ধোঁয়ায় দগদগিয়ে তোলা যায়।

কিন্তু ধোঁয়ার ঝোঁকটা বেশিক্ষণ থাকে না তবু। নিজের অগোচরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে এক একসময়। চোখের সামনে অনু আর অনুশ্রী মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। অমিল যত, মিল তার থেকে কম নয়। অবাক হয়ে ভাবে, দেড় যুগ বাদে দেখা হওয়া সত্ত্বেও অনুর কথাবার্তা আচরণে এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সঙ্কোচ নেই। আশ্চর্য!

কিন্তু বিভু আসার পর অক্ষুর সঙ্কল্প বানের জলে কুটোর মত ভেসে যাবার উপক্রম। তার হৈ-চৈ আর আনন্দের দাপটে কিছুদিনের মধ্যে অক্ষু উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করারও অবকাশ পেল না। এদের এই ভরা পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজের দৈন্য নিয়ে দাঁড়াতেও সঙ্কোচ।

বিভু নিজে এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। বড়ির দরজায় জগুয়াকে দেখেই অক্ষু বুঝেছে ভিতরে আর কে আছে। বিভু তাকে বাড়ির অন্দরমহলে ঠেলে নিয়ে গেছে। অনুর সামনে এসে বলেছে, তোমাদের বোঝা-পড়া কি ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে, না হবে?

ঘরে অনু আর বিভুর বউ ছিল। আজ আর বিভুর বউ উঠে গেল না। মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

অনু ছদ্ম-গাম্ভীর্যে জবাব দিল, হবে। একা এঁটে উঠতে পারি কি না পারি ভেবে তোমার আসার অপেক্ষায় ছিলাম।

কেন, তোমার জগুয়া তো ছিল। বিভুও গম্ভীর। অর্থাৎ তার অনুপস্থিতির দরুন বোঝাপড়ার ব্যাপারে দেরি করাটা উচিত হয়নি। অক্ষুর দিকে ফিরে প্রায় ধমকে উঠল, বোস চুপচাপ এখন, আগে তোর বিচার হবে, তারপর কথা।

অক্ষুর হাসিই পাচ্ছে। তার দাপটে গোটা পাড়া অস্থির ছিল একদিন। কিন্তু সে কোনো একদিন। আজ এই পরিবেশে নিজেকে বেখাপ্পা লাগছে। কৃত্রিম লাগছে। ওরা অতীত ভোলেনি। অতীতের পুঁজিটাকেই বড় করে দেখছে। অক্ষুও সেই রকমই দেখবে নাকি? অক্ষু হাসছে।

বিভু টেনে বসালো তাকে। নিজেও গ্যাঁট হয়ে বসল। বিভু এত কথা বলে...আশ্চর্য! কথা ঠিক নয়, পূর্ণতার কলধ্বনির মত। ওতে প্রয়াস নেই কিছু। স্ত্রীর দিকে ফিরে চোখ রাঙাচ্ছে সে, তুমি থাকতে ও এই ক'দিন ধরে বনবাসে কাটালো এ কেমন কথা?

বিভুর বউয়ের নাম বিমলা। অনুর বয়সী হবে, বেশ মিষ্টি দেখতে। মৃদু প্রতিবাদ করল, যার গরজ সে চোখ বুজে থাকলে আমি কি করব!

কিন্তু আপাতত সে মোটেই চোখ বুজে নেই। চোখ টান করেই অনু ফিরে এবারে বিভুকে চোখ রাঙালো, বিচারটা কার হচ্ছে?

বিভু বলল, ও-ও অপরাধীর সঙ্গে যুক্ত।

অনু মৃদু ঝাঁঝিয়ে উঠল, সবেতে যুক্তকে এত টানার লোভ কেন? আগে আসলের বিচার হোক।

হোক। অঙ্কুর দিকে ঘুরে বসল সে, তোর কড়া বিচার হবে। তোকে সরাসরি আত্মসমর্পণ করতে হবে।

অনু হাত দিয়ে বিমলাকে ঠেলে দিল, দেখলে, বিচারের নমুনাটা দেখলে?

বিমলা হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিল, অর্থাৎ ঠিক বিচারই হচ্ছে।

রাতের খাবারের ব্যবস্থা দেখতে উঠে গেল সে। বিভুর মুখে তখনো বিচারকের গাম্ভীর্য। বলল, গত দশ বছর—দশ বছর কেন, অনুর দিক থেকে দেখতে গেলে প্রায় সতোরো বছর পাত্তা নেই তোমার—এর প্রত্যেকটা দিনের হিসেব দাখিল করো।

অনু টিপ্পনী কাটল, কি করে করবে, মৌনী নিয়েছে দেখছ না!

এভাবে মুখ বুজে থাকাটা অঙ্কুর নিজেরই বেখাপ্পা লাগছিল। কিন্তু গল্পে যোগ দেবে কি, সলুর গানে যেমন মন দেওয়া অসম্ভব হচ্ছিল, এই খুশির আবহাওয়াও প্রায় তেমনি লাগছে। অন্তত সেই এক ধরনের অমনোযোগই কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে অঙ্কু।

তবু প্রতিদিনের না হোক, কোন্ কোন্ জায়গায় ঘুরেছে, কোথায় কতদিন ছিল, কত রকম গাইয়ের সংস্রবে এসেছে—বিভুর জেরায় পড়ে একটু একটু করে সেই গল্প করল। গল্পের ছলে অঙ্কুর নিজেরও সহজ হবার প্রয়াস ছিল, তাগিদ ছিল। ভিতর জ্বলছে জ্বলুক, কিন্তু সে জ্বালা প্রকাশ হয়ে পড়ার মত বিড়ম্বনা আর বুঝি নেই।

রাত মন্দ হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার পরে অনু যতবার উঠি-উঠি করছে, বিভু জোর করে বসিয়ে রাখছে তাকে। অনু চোখ রাঙিয়েছে, বা রে, রাত হচ্ছে না, লোকে বলবে কি—

বিভু জবাব দিয়েছে, লোকে শেষ জানলে আর কিছু বলবে না, বোসো।

অঙ্কুকে বলেছে, একদিকে ব্যবসা আর একদিকে দু-দুটো স্কুল—আমি আর পেরে উঠছি নে, বাবা মারা যাবার পর ছেলেদের ইস্কুলটা আগেই ঘাড়ে চেপেছে, এর ওপর আবার অনুর ইস্কুল—তুই স্কুল দুটোর ভার নে।

অনু তৎক্ষণাৎ ফোঁস করে উঠল, আমার ইস্কুলের ভার নিলে আমি রিজাইন করব।

সেই বিভু এমন বচনবাগীশ হয়ে উঠেছে অঙ্কু জানত না। গম্ভীর মুখে অনুর দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলেছে, নিজের ইস্কুলটাকে যে তুমি সতীন ভাবো জানতুম না।

অনু ছদ্মরাগে মুখ ফিরিয়েছে। তারপর বিমলার চিমটি খেয়ে হেসেও ফেলেছে। একটু বাদে সে-ই আবার ঠাট্টার ছলে নতুন পরিকল্পনা পেশ করেছে বিভুর কাছে।—তার থেকে এক কাজ করো, ইস্কুলে একটা গানের বিভাগ খুলে দাও।

বিভু পাল্টা ঠেস দিয়েছে তক্ষুনি, ও...তোমার আণ্ডারে কাজ করলে আপত্তি নেই বুঝি?

অনু মাথা নেড়েছে, আপত্তি নেই। বলল, আপত্তি হবে কেন, ছেলেবেলায় যত কিল-চড় খেয়েছি এখনো মনে পড়লে ব্যথা ধরে—শোধ নেব না?

সকলের সঙ্গে অঙ্কুও হেসে ফেলেছে।

কিন্তু রাতের নিরিবিলিতে ওই হাসির মাশুল শুনে দিতে হয়েছে। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি অঙ্কুর। বার বারই মনে হয়, অনুর এত হাসি-খুশি, এত সহজতা ভারী সহজ কিছু একটার ওপর প্রতিষ্ঠিত যেন। কি সেটা?

নিজের ওপরেই বিষম আক্রোশ অঙ্কুর। যা-ই হোক, ওরও ভিতরে ভিতরে একটুখানি ভালো লাগার প্রলেপ লেগেছিল কেন? সঙ্গোপন নিভৃতে এখনো আবার সেই আলোর আলো জ্বলে কেন? সেখান থেকে ও কোন্ ভিক্ষুক হাত বাড়াতে চায় আবার? ওর হাত দুটো কুন্তীবাঈ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দেয়নি? তার আগে তার হৃদয়ও তো দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখা গেছে ভেবেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে এক অপরিসীম শূন্যতার গ্রাসে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। এখান থেকে সরে যাবার তাগিদটা নতুন করে অনুভব করেছে আবার। অঙ্কু পালিয়েই যাবে।

পালানো দূরের কথা, বিভুর পাল্লায় পড়ে কুমোরপাড়ার জঙ্গলের কুটিরে পর্যন্ত গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারা গেল না এরপর। সে আসার পর বিমলার সঙ্কোচও অনেকটাই কেটে গেছে। সরাসরি এদের আন্তরিকতা প্রত্যাখ্যান করাটাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। অনু রোজ না হোক, প্রায়ই আসে। বিভু বা বিমলাই লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসে তাকে। বাইরে থেকে অঙ্কু অনেকটাই সহজ হয়ে উঠেছে। ফলে নিঃসঙ্গ অবকাশে দ্বিগুণ যুঝতে হচ্ছে তাকে।

কিন্তু তার পরিবর্তনের আভাস বিভুও খানিকটা পেয়েছে। পেয়েছে তার গান শুনে। অঙ্কু শোনায়নি। কারণ গানের সাধনা আর নেই তার। কুন্তীবাঈ সেই তাগিদটাও কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু প্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন ভাঙলে অসহায় মানুষ যেমন নিজের কুঁড়েঘরের মধ্যে মাথা গোঁজে, আশ্রয় খোঁজে—তেমনি করে যেটুকু তার সম্বল, এক-এক সময় তারই মধ্যে মিলিয়ে যেতে চায় অঙ্কু। আশ্রয় খোঁজে। কখনো গভীর রাতে, কখনো বা পাখি-ডাকা আসন্ন ভোরের অন্ধকারে গান কানে আসে বিভুর। সে গান বোঝে না, গানের ব্যথা অনুভব করে শুধু। মনে হয় বাতাসের কণায় কণায় একটা গুমোট ছড়াচ্ছে—জমাট বেঁধে বুকের ওপর চেপে বসতে চাইছে সেটা।

বিমলাও শুনেছে দুই একদিন। বলেছে, এত ভালো লাগে, অথচ মনটা এমন খারাপ হয়ে যায় কেন গো?

বিভু জবাব দিতে পারেনি। এই গান থেকেই অঙ্কু কত বদলেছে সেটুকু শুধু অনুভব করেছে সে। আর পাঁচজনের মত ওই জীবন সংসারের চলতি ধারায় পুষ্ট হয়ে উঠবে কি না, কেন যেন সেই সংশয় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে তার মনে। ওই সুরের সুগম্ভীর বিষণ্ণ আকৃতি মূর্ছনা ব্যথা বেদনা সবই পুরুষের। দোসর নেই এমন এক পুরুষের।

এগার

গানের ব্যাপারে এখানে অঙ্কুকে প্রথম প্রতিষ্ঠা দিয়েছে বলতে গেলে বিভুই। তার আবিষ্কারের খবরটা গোপন রাখেনি সে। তারই মারফৎ সর্বত্র ছড়িয়েছে।

শুধু যোগানন্দপুর বদলায়নি, শহরও আগের দ্বিগুণ বদলেছে। বর্তমানে গান-বাজনা শিল্প-

কলানুরাগীর সংখ্যাও সেখানে কম নয়। শহরে গান-বাজনার দুই একটা প্রতিষ্ঠানও ফেঁপে উঠেছে বেশ। সে-সব জায়গায় অক্কুর প্রচারের কাজটা পরোক্ষে বিভুই করেছে। তার মত উচ্চশিক্ষিত পয়সাওয়ালা মান্যগণ্যজনের প্রচারের দাম আছে। অক্কুকে দায়িত্ব দিয়ে আটকে রাখা যাবে না বুঝে এমনি একটা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সে-ই টিপে দিয়েছে। আছে একজন শিল্পীর মত শিল্পী—দেশে দেশে ঘুরে বছরের পর বছর যে একাগ্র মনে সঙ্গীত-সাধনাই করেছে শুধু—বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে কাটিয়েছে—পারো তো ধরে নিয়ে এসো।

তারা এসেছে। এসে তারাও অক্কুকে আবিষ্কার করেছে। জোর-জুলুম করে ধরে নিয়েও গেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখানোর ভার চাপিয়েছে তার ওপর। শেষ পর্যন্ত অনেকটা নির্লিপ্তভাবেই রাজি হয়েছে অক্কু। যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে উঠছে না, আর যেখানেই যাক বা যেখানেই থাকুক, শুধু হাওয়ার ওপর দিন চলবে না। সংস্থান কিছু চাই। সে যদি এ-পথেই হয়, হোক।

ক্রমশ শহরের আর শহরের বাইরেরও দুই একটা আসরে ডাক পড়তে লাগল তার। আশ-পাশের নাম-করা ওস্তাদরা চিনতে লাগলেন, খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। শিল্প-জগতের আর একটা নিয়মও আছে। যে শিল্পী আত্মপ্রকাশে বিমুখ, তার প্রতিই লোকের আগ্রহ দেখা দেয়। এই সুনাম রটলে তাকে নিয়েই টানা-হেঁচড়া চলে বেশি।

অক্কুর সুনাম রটেছে। সেই সঙ্গে কোথাও সে যেতে চায় না—জঙ্গলের একটা কুঁড়েঘরে নিজের সাধনায় মগ্ন থাকে—এ ধরনের প্রচারটাও মন্দ হয়নি। ফলে গানের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ছাত্র এসে জুটতে লাগল। অক্কু অনেককেই বাতিল করে দিয়েছে, অনেককেই আবার পারেওনি ছেঁটে দিতে। যার মধ্যে সততা দেখেছে, আকৃতি দেখেছে, তার কাছে হার মেনেছে।

একজনের প্রয়োজনের দিক থেকে রোজগারপাতি ভালই হচ্ছিল। কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে যাবার সঙ্কল্প অক্কু একেবারে ছাড়েনি। অনুর সঙ্গে দেখা হলে সেই তাগিদটা আরো বেশি অনুভব করে। দেখা প্রায়ই হয়। কোনদিন বিভুর বাড়িতে আড্ডা হয়, কোনদিন বা অনু চুপচাপ ত্রিকোণ বাড়িতেই চলে আসে। এসে অক্কুকেই চোখ রাঙায়, একটা স্কুলের আমি গণ্যমান্য অ্যাসিস্টান্ট হেড মিস্ট্রেস—দুদিন বাদে হেড মিস্ট্রেস হব, এভাবে যাতায়াত করলে পাঁচজনে বলবে কি?

পাঁচজনের কানাকানি এত দিনে শুরু হয়ে যাবার কথা। হয়নি, কারণ অনু আসে বিভুর বাড়িতে। আগেও আসত। বিভুকে তার আত্মীয় বলে জানে সকলে। এদের দুজনের চেষ্টাতেই ইস্কুল হয়েছে। অনু বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করেছে। বিভু তার ব্যবসা দেখা ছেড়ে ইস্কুল চালু করেছে। এম-এ পাস মেয়ে সমস্ত যোগানন্দপুর ছাঁকলে আর একটি মিলবে না। ওদিকে বিভুর ঘরেও লক্ষ্মী-সরস্বতী একসঙ্গে বাঁধা। তার ওপর সে বিবাহিত, ঘরে বউ আছে, ছেলে আছে। এত সব কারণে কথা যদি কারো মনে ওঠেও, মুখ-চাপা।

অক্কু সবই জানে। ইস্কুল করার গল্প ওদের মুখেই শুনেছে। এখনো ইস্কুল নিয়ে ওদের অনেক সমস্যা, অনেক আলোচনা শোনে। কিন্তু নিজের প্রসঙ্গ উঠলে এখন আর মুখ বুজে থাকে না অত। একটা সহজ কৃত্রিমতার আবরণে নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে। পারেও। এ ধরনের কথায় কখনো হাসে, কখনো গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, এভাবে যাতায়াত না করাই তো উচিত। কোরো না।

করব না? অনুর ভ্রূকুটি, কি করব তাহলে?

মাস্টারী করবে।

অনু হেসে ফেলে। তাই করতেই তো আসি, তোমাকে সায়েস্তা করতে হলে কি সোজা মাস্টারের দরকার!

সে চলে গেলে অঙ্কু কুন্তীবাঈকে সামনে দাঁড় করিয়ে নিজেকে চোখ রাঙায়, নিজেকে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করে। ভাবে, জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। অনেক মাশুল দিয়েছে, আর দেবে না। কিন্তু এই সঙ্গে এক বিপরীত অনুভূতিও নিজের অগোচরে উঁকিঝুঁকি দেয়। জড়িয়ে পড়ার মত সম্বলও তার হাতে আর নেই। মোহগ্রস্তের মত কোন একদিনের প্রতিশ্রুতির সঞ্চয় সে আর একজনের পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে এসেছে। আজকের অনুশ্রীর মধ্যে ন'বছরের সেই অনুকে যদি না দেখত সে—তাহলেও বোধহয় এত নিঃস্ব মনে হত না নিজেকে।

বিভুকে গোড়াতেই না জানিয়ে বাড়িটা বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই চেষ্টাও একটু-আধটু করেছে অঙ্কু। গোপনে দু-একজনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে কিন্তু খবরটা কেমন করে বিভুর কানে এলো।

সে অবাক প্রথমে। বাড়ি বিক্রি করার মতলব শুনলাম তোর?

অঙ্কু হাসতে চেষ্টা করেছে।

বিক্রি করে যাবি কোথায়? ওই জঙ্গলের ঘরে বাস করবি?

অঙ্কু হালকা জবাব দিল, এখানেই বরাবর থাকব তোকে কে বলল?

বিভু রেগেই উঠল, যাবি কোন্ চুলোয়?

অঙ্কু গম্ভীর।—হাতে পুঁজি থাকলে চুলোর অভাব কি।

ও! গম্ভীর বিভুও, হাতে তেমন পুঁজি আর কিছু তাহলে আজও চোখে পড়েনি তোর?

নিস্পৃহ মুখে অঙ্কু গুনগুনিয়ে একটা সুর ভাঁজতে লাগল। ভিতরের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধটা চাড়িয়ে উঠতে চাইছে। বিভু ধমকে উঠল, থাম্।

অঙ্কু থামলই বটে। বিভুর এ-রকম মেজাজ আর দেখেনি। খানিক গুম হয়ে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, তোর বাবা কাশীতেও তোর সঙ্গে একটাবার দেখা করেননি—কিন্তু যাবার আগে কলকাতায় গিয়ে তিনি অনুর সঙ্গে দেখা করেছেন...সে খবর জানিস?

ঘরের বাতাস হঠাৎই কমে গেল যেন। অঙ্কু অস্বস্তি বোধ করছে। মাথা নাড়ল, জানে না।

বিভু বলল, আমিও জানতুম না, অনেক পরে শুনেছি।

বিভু আরো কিছু বলেছে। তার সেই বলাটা আত্মশুদ্ধির মত। অসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় বলেছে। মূর্তির মত বসে অঙ্কু শুনেছে। শোনার পরেও তেমনি নির্বাক।

—অনু কলকাতায় এম-এ পড়তে এসেছে চিঠি পেয়ে বিভু দেখা করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে। কিন্তু সেই দেখাটা তারপর থেকে বার বার টেনেছে তাকে। না গিয়ে পারত না। আগের কথা মনে আছে, আগের প্রত্যাখ্যান মনে আছে, তবু। কাজের অছিলায় সপ্তাহে দু'তিনবারও যেত। মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে থাকতও দুই একদিন করে। দেখা হলেই অঙ্কুর খবর জিজ্ঞাসা করত। কেন করত, বিভু তখন খুব ভালো করেই জানে।

বিভুর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আবারও অকৃতজ্ঞ হয়েছিল সে। মনে মনে অবুঝ হয়ে উঠেছিল, আজ বিমলাকে বিয়ে করে সে অসুখী নয়। কিন্তু সেদিন সব সুখ সব শান্তি ক্রমশ আবার ওই এক সম্ভাবনার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছিল। সরাসরি বিভু আবারও বিয়ের প্রস্তাব করে বসেছিল। তার দাদার কাছে নয়, সোজা অনুর কাছেই। মনের অবুঝ তাড়না আবারও সে ব্যক্ত করে ফেলেছিল।

অনুকে এত অবাক হতে গেলবারেও দেখেনি সে। মাঝে আরো চারটে বছর কেটে গেছে, অনুর বয়েস আরো চার বছর বেড়েছে। ছেলেবেলার ছেলেমানুষি এবারে সে বর্জন করতেও পারে এই আশা ছিল। কিন্তু অনু বদলায়নি। এই দ্বিতীয়বারের প্রস্তাব সে আশা করেনি। তবু হেসেছে। হাসতে হাসতে বলেছে, কেমন করে হবে, এক গোত্র না?

বিভু গোত্র-বিচারের ধার ধারে না, সংস্কার মানে না। জবাব দিয়েছে, এক গোত্রের জবাব তো চার বছর আগেই দেওয়া হয়েছে। দরকার হলে গোত্রান্তরের পরে বিয়ে হতে পারে, সে রকম বিধান আছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অনু সেই এক কথাই বলেছিল, সে রকম দরকার বোধ কোরো না বিভুদা। তা হবার হলে এক গোত্রেও হত না। বিয়ের ব্যাপারে আমার কপালে যে অনেক দুর্ভোগ আছে সে তো ছেলেবেলা থেকেই জানো বিভুদা।

সেদিনের মত বিভু ফিরেছিল। বিবেকের দংশন নিয়েই ফিরে এসেছিল। কিন্তু মন তখনো ফেরেনি। অনু আগের মতই চিঠি লিখত। বিভু আগের মতই যেত। অঙ্কু তখন তারাবাঈয়ের কথা লিখেছিল বিভুকে। কিন্তু অঙ্কু জানে না, বিভু তখন কাণ্ডজ্ঞান খুইয়েছিল। যে অঙ্কু নিজের জীবন তুচ্ছ করে তার জীবন বাঁচিয়েছিল, তাকেই পরম শত্রু মনে হয়েছিল সেদিন। বিবেক দংশাতো, বৃশ্চিক দহনে জ্বলত, কিন্তু তবু মোহ কাটিয়ে উঠতে পারত না। তারাবাঈয়ের খবরটা বিভু অস্ত্রের মত ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল। বাঈজীদের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে অঙ্কুকে আবারও ছোট করতে চেষ্টা করেছে ওর কাছে—অনুর মন ফেরাতে চেষ্টা করেছে।

অনু বলত না কিছু, চুপচাপ শুনত। একদিন শুধু বলেছিল। সেই একদিনই যথেষ্ট। আর বলার দরকার হয়নি। বলেছিল, অঙ্কুকে তুমি ভালবাস আমি জানি বিভুদা, সেই ভালবাসার থেকে আমি যেন বড় না হয়ে উঠি। উঠলে একদিন নিজেকেই তুমি ক্ষমা করতে পারবে না।

বিভুর মুখের ওপর এতবড় চাবুক আর বোধ করি কেউ কোনদিন চালায়নি। কথায় কথায় সেইদিনই অঙ্কুর বাবার কথা অনু বলেছিল। বলেছিল, তিনি এসে অনুর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনিও মুখে কিছু বলেননি, অনুও মুখে কিছু আশ্বাস দেয়নি। কিন্তু তাঁর দেখা করাটাই বলার মত হয়েছিল, আর অনুর মুখ দেখেই তিনিও আশ্বাস পেয়েছেন। তিনি চলে যাবার পর বার বার ঠাকুমাকে মনে পড়েছে অনুর। মনে মনে বার বার তাঁর উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করেছে, ঠাকুমা, তোমার কথা কি মিথ্যে হবে?

অনুর একবারও মনে হয়নি মিথ্যে হবে। মনে আর বিভুরও হয়নি। শুধু সেই জানে, সেই উপলব্ধি করতে পারে, সেদিন কতবড় পতনের হাত থেকে অনু রক্ষা করেছিল তাকে। অঙ্কুকে আজও যে সে মুখ দেখাতে পারছে সে ওই অনুর জন্যেই।

সে এম-এ পাস করার পর বিভু অনেকবার তাকে যোগানন্দপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছে। মেয়ে-ইস্কুল করার পরিকল্পনা ফেঁদেছে। দরকারও ছিল একটা ইস্কুলের। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনু আসেনি। শেষে বিমলাকে ঘরে এনে বিভু তাকে ডেকেছে, বলেছে, এবারে এসো—যার জন্য আপেক্ষা করছ, যোগানন্দপুরে বসেই করো।

অনু এসেছে।

দিন দুই পরের কথা। নিজের ঘরে বসে নিজেরই অগোচরে অঙ্কু সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছিল। 'কোউ সমঝত নহীঁ' হামারে কহী'। আমার কথা কেউ বুঝল না। অঙ্কু ললিত গাইছিল। কুন্তীবাঈ বলেছিল, ললিত তার প্রিয়। কিন্তু এখানে আসার পরে সেটা এমন করে আর কখনো উপলব্ধি করেনি সে। তারও সমস্ত মন সমস্ত অন্তরাত্মা বলেছে, আমি রূপ খুঁজছি, সুন্দর খুঁজছি, জীবনে লালিত্য খুঁজে মরছি—কিন্তু কোউ সমঝত নহীঁ হামারে কহী—কেউ বুঝল না আমার কথা।

অন্যান্য দিন গানের মাঝে অনু এলে খানিক বাদেই অঙ্কু থেমে যায়। অনু তাই নিয়ে ঠাট্টাও করেছে, আমাকে দেখলেই তোমার গান পালায়। অনেক সময় গান শেষ না হলে অনু ঘরে আসেও না তাই। কিন্তু সেদিন না এসে পারেনি। এসে চুপচাপ শুনছিল। সেদিন অঙ্কু থামেনি। এতদিনের মধ্যে অঙ্কুর অন্তস্তলে ললিতা আসেইনি। ললিতার জায়গা কুন্তীবাঈ জুড়ে বসেছিল। ওই রাগিণী আর নারী দুজনকেই মন থেকে ঠেলে দিয়েছে সে। কিন্তু আজ সে-রকম হয়নি।

তার কথা বোঝবার আবেদন শুনেই কেউ যেন সামনে এসে বসেছে। বুঝতে চেষ্টা করছে। রাগিণী যেন সুরের জালে ধরা দিয়েছে। অন্তস্তলে ললিতার মূর্তিটি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হাসি-হাসি মুখখানি প্রশ্রয়ে ভরা, স্তনভারে নতাঙ্গী, সুবর্ণ-বর্ণা, পঙ্কজ আর সপ্তপর্ণ পুষ্পসাজ—আলস্যে দুই চোখ অর্ধেক মেলে সকালে ঘর থেকে বার হচ্ছে বসন্ত- প্রিয়া ললিতা।

কিন্তু গান আর বাস্তব এক নয়।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা অদৃশ্য। তাকে ধরার চেষ্টাটাই বিদ্রূপের মত বুকেব ভিতরটা কাটছে।

অনু জিজ্ঞাসা করল, কি গাইছিলে বল তো? বেশ লাগছিল আজ...

অঙ্কু গোপনে স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলল একটা। কুন্তীবাঈ হলে কিছু জিজ্ঞাসা কবত না, শুধু দৈন্য দেখত চেয়ে চেয়ে। অঙ্কু হেসে এড়াতে চেষ্টা করল।

অনু ছেলেবেলার মতই ফোঁস করে উঠল অমনি। অর্থাৎ আমার সঙ্গে গান নিয়ে একটা কথাও চলে না, কেমন? সলু গান সম্বন্ধে কতদিন কত লেকচার শোনায আমাকে, জনো?

তার দিকে চেয়ে হাসছে অঙ্কু। সেই সঙ্গে অস্বস্তিও বাড়ছে। মনেব তলায় ললিতা উঁকিঝুঁকি দিতে চাইছে আবারও।

অনু উৎসুক চোখে তাকে দেখল একটু, তারপর তরল গলায় জিজ্ঞাসা করে বসল, বিভুদার মুখে শুনলাম, বাড়িঘর বেচে দিয়ে তুমি এখান থেকে পালাবার মতলব আঁটছ, সত্যি নাকি?

অঙ্কু জবাব দিল না। হাসির চেষ্টাটাও যাতনার মত।

লঘু গাম্ভীর্যে অনু বলল, বাড়িটা তাহলে আমাদের কাছেই বেচে দাও না, ইস্কুলের জন্যে একটা বড় বাড়ি দরকার।

হাসির চেষ্টা ছেড়ে বৈষয়িক গাম্ভীর্যে অঙ্কু পাল্টা প্রশ্ন করল, কত দাম দেবে?

তুমি ছন্নছাড়া মানুষ, দামের কি দরকার। বিনা মূল্যেই বেচে দাও, পুণ্যি হবে। অনু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল, অস্ফুট কণ্ঠে হাসল একটু। আবার বলল, বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা তো হল, তারপর যাবে কোথায়? কোথাও আছে নাকি কেউ?

বিপন্ন বোধ করছে অঙ্কু সেটা বোধহয় গোপন থাকল না খুব। ঈষৎ গলা চড়িয়েই বলল, রাত হল খেয়াল আছে? ফিরতে হবে না?

সাধক পুরুষের কাছে বসে আছি, না ফিরলেই বা। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়তে অনু হেসে সারা।—অনেকদিন আগে শুনেছিলাম, তুমি নাকি কোন্ একজন বাঈজীর প্রেমে পড়েছিলে?

আচমকা ধাক্কা খেল অঙ্কু। বিভু বলেছিল বটে, কিন্তু এরই মধ্যে অনু সেটা এভাবে জিজ্ঞসা করবে ভাবেনি। কিন্তু ধাক্কা সত্বেও গুমোটের মধ্যে একটা জানালা খুলে গেল যেন। একটু থেমে অঙ্কু গম্ভীর মুখে বলল, একজন নয়, দুজনের।

কুন্তীবাঈকেও সে যে তারাবাঈয়ের মত বাঈজীর দলে ফেলল, নিজেরই খেয়াল নেই।

ও বাবা! অনু যেন ঘাবড়েই গেছে। তারপরেই নিরীহ প্রশ্ন আবার, তা তারা কি হল, কেউ টিঁকল না বুঝি?

অঙ্কু মাথা নাড়ল, না।

অনু হাসতে লাগল। বলল, আমার জোরটা বোঝো তাহলে।

ক্ষতস্থানে আবার নতুন করে আঁচড় পড়ছে কেন অঙ্কুর? ক্ষতটা উন্মুক্ত করে দেখানোর এ তাড়না কেন? বলল, সেই বাঈজীদের কথা শুনবে?

অনু চোখে চোখ রেখে দেখল একটু।—শুনে কি হবে?

এই লোকটাকে চিনতে পারবে। মাঝে সতেরোটা বছর কেটে গেছে বুঝতে পারবে। ভয় পাবে। আর এ বাড়িমুখো হবে না তাহলে।

থাক থাক। ছদ্ম ত্রাসে অনু দুচোখ টান করে ফেলল।—শুনে কাজ নেই তাহলে। কিন্তু উদ্গত হাসির কাছে ভয়টা হার মানল। হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়াল সে। বলল, চলি, আমার বডি-গার্ডই হয়তো গালে হাত দিয়ে ভাবছে, মা-মণি করছে কি! দরজা পর্যন্ত গিয়ে থামল। ফিরে তাকালো। বলল, বীরপুরুষকে চেনা আমার সতেরো বছর আগেই হয়ে গেছে। ইস্কুল পালিয়ে দৌড়তে দৌড়তে যেদিন এসে গরুর গাড়ি ধরেছিলে, চোখে জল চিকচিক করছিল, তারপর ছুটে পালিয়েছিলে। আমার চেনার জন্যে তোমার ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই।

অনু চলে গেল। ললিতা চলে গেল। অঙ্কু নির্বাক বসে।

বার

চরম অশান্তির মুহূর্তেই আবার এক আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটল।

অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। অঙ্কু একটুও প্রস্তুত ছিল না। সে হঠাৎই যেন বিভ্রান্ত হয়েছে, বিমূঢ় হয়েছে।

জঙ্গলের সেই কুঁড়েঘরেই আবার এসে আশ্রয় নিয়েছিল সে। এখানে নিয়মিত আসর বসছিল না ইদানীং। নাতনী জবাব হাত ধরে মহেশ কতদিন এসে ফিরে গেছে ঠিক নেই। বাড়ি এসেও দাঠাকুরের খবর করে গেছে।

সে যে এভাবে এখানে এসে পড়ে থাকবে আবার, ভাবেনি। এখন আবার উল্টো। এখান থেকে নড়তেই চায় না। বিভু ডাকতে এসে ফিরে গেছে, অনুর বডি-গার্ড জগুয়া এসে ফিরে গেছে। অঙ্কুকে বিশেষ করে মহেশের নাতনী জবাকে একটু-আধটু আধুনিক গান শোনানোর আশায় সলুও এসে অনেকক্ষণ ধরে বসে থেকে ফিরে গেছে। অঙ্কুদার মুখের দিকে চেয়ে গান করার ইচ্ছেটা সে আর প্রকাশ করে উঠতে পারেনি। ছাত্ররা এসে ফিরে গেছে, যে-প্রতিষ্ঠানে গান শেখায় সে, সেখানেও পরপর অনেকগুলো দিন কামাই হয়ে গেল।

অঙ্কু পালিয়ে আসেনি। পালাতে আর চায়ও না। সে পূর্ণতার খোঁজে এসেছিল। নিজেকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু এমন নিঃস্ব নিজেকে আর মনে হয়নি কখনো। ধান-কাটা ক্ষেতের মত জীবনটার আনাচ-কানাচ সুদ্ধ রিক্ত। বসন্ত-অঙ্গনা ললিতা পূর্ণতার সহচরী। এতবড় বিশীর্ণ অপূর্ণতা নিয়ে অঙ্কু হাত বাড়াবে কেমন করে?

তাই আবারও সে গানের মধ্যে ডুবতে চেয়েছে। কিন্তু আগের সেই ক্ষুধাতুর প্রেরণা নেই। প্রেরণার লক্ষ্য বদলেছে অঙ্কুর। পূর্ণতার বাহ্য তাগিদটা বড়, নিজেকে ভোলাবার তাগিদটা বড়। সুর আর লক্ষ্য দুইই দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে দ্বিগুণ হতাশা, দ্বিগুণ যাতনা। রাগরাগিণীগুলিকে এবারে ব্যগ্র দুই হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইছে সে—হৃদয় দিয়ে নয়। কিন্তু শ্রী বসন্ত ভৈরব পঞ্চম মেঘ নট—এরা কেউ যেন চেনে না তাকে। মালশ্রী ত্রিবণী গৌরী মধুমাধবী তোড়িকা ললিতা হিন্দোলী ভৈরবী গুর্জরী সৈন্ধবী বিভাষা ভূপালী বড়হংসিকা মালবী মন্দারী কৌশিকা গান্ধারী কল্যাণী আভীরী হাম্বীরা—একে একে সব সুরাঙ্গনাদের দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়েছে সে—খুঁড়ছে। কিন্তু সকলে বিমুখ। সকলের দরজা বন্ধ।

এই নিদারুণ ক্ষোভের মুখে একজনের আবির্ভাব।

বৃদ্ধই বলা চলে, কিন্তু মুখখানা তাজা। দেখতে সুশ্রী। বয়েস ষাটের ওধারে হতে পারে। পরনে গেরুয়া বসন, গায়ে ঢোলা আলখাল্লা। গলায় মোটা একটা রুদ্রাক্ষের মালা। আবক্ষ সাদা দাড়ি।

বিকেলের দিকে অঙ্কু হঠাৎ মুখ তুলে দেখেছিল তাঁকে। জংলা কুঁড়ের দাওয়ায় কখন বসেছেন টের পায়নি। চুপচাপ বসে গান শুনেছেন। চোখাচোখি হতে হিন্দীতে নিজেই বললেন, আমি ভিনদেশী ফকির মানুষ; তোমার গান শুনে এসে বসেছি।

গভীর রাতের আবছা অন্ধকারেও অঙ্কু লোকটিকে দেখেছে। ঠায় বসে আছে। অঙ্কু বিরক্ত হয়েছে লোকটার ওপর—সব কিছুর ওপরেই বিরক্তি তার। কিন্তু মনে মনে অবাকও হয়েছে, সেই থেকে বসে একাগ্রভাবেই শুনছে লোকটা। উঠে এসে অঙ্কু দুই এক কথা জিজ্ঞাসাও করেছে। কোথা থেকে আসা হয়েছে, কোথায় যাবেন, এখানে বসে আছেন কেন,

ইত্যাদি। হেসে লোকটি সেই এক জবাবই দিয়েছেন, ফকির মানুষ, আসা-যাওয়ার ঠিক নেই— ভালো লেগেছে তাই বসে আছি।

পরদিন সকাল থেকে এই এক ব্যাপারই লক্ষ্য করল অঙ্কু। কুমোরপাড়ার লোকেরা এ-রকম সৌম্যমূর্তির একজন সন্ন্যাসী গোছের লোককে বসে থাকতে দেখে ভিড় করে এলো। অনেকে ফলমূল চিড়ে-বাতাসাও দিয়ে গেল। লোকটি হিন্দীতে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এই বেশ-বাসে থাকলেও সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকলাপ বা কেরামতি তাঁর কিছু জানা নেই। তাঁদের কেউ নন তিনি।

বেশির ভাগ মেয়ে-পুরুষ সাধুর ছলনা বলে ধরে নিল উক্তিটা। ফলে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বাড়ল বই কমল না। অঙ্কু বারকতক ভেবেছে লোকটাকে এবারে ধমকে তাড়াবে এখান থেকে। কিন্তু পেরে ওঠেনি। যতবার সে সুরের মধ্যে ডুবে যেতে চেষ্টা করছে, ততবার লোকটির কান খাড়া হতে দেখেছে। কোন আগন্তুক এলে ইশারায় তিনি নিজেই তখন তাকে সরে যেতে বলেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের অনেকরকম ভড়ং-চড়ং দেখেছে অঙ্কু, কিন্তু এ-রকমটা দেখেনি।

সেই রাতেও অঙ্কুর সুরের অন্তঃপুরে ঢোকার অবিরাম চেষ্টা ব্যর্থ। আর সেই ব্যর্থতার সাক্ষী বাইরের ওই লোকটা। বাইরেরও ঠিক নয় এখন, দেউড়ির কাছেই দরজায় ঠেস দিয়ে বসে। অঙ্কুর কেমন মনে হয়েছে, সারাক্ষণ তার দিকে চেয়ে চেয়ে নিঃশব্দে হেসেছে লোকটা, হাসছেও। সত্যি সত্যি হাসতে দেখলে হয়তো ঘাড় ধরেই তাড়িয়ে দিত এখান থেকে। হাসতে দেখেনি। অথচ মনে হচ্ছিল হাসছে। বয়স্ক লোকেরা যেমন শিশুর হাস্যকর ক্রিয়া-কলাপ দেখে গাম্ভীর্যের আড়ালে হাসি লুকিয়ে রাখে—তেমনি।

গভীর রাতে একসময় তানপুরা ফেলে অঙ্কু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, জিজ্ঞাসা করেছে, কে তুমি? কি চাও এখানে?

মিষ্টি জবাব, আমি ফকির, কিছু চাই নে।

কিছু চাও না তো দুদিন ধরে এখানে বসে আছ কেন?

বসে থাকতে ভালো লাগছে।

পরদিন সহ্যের সীমা ছাড়াল অঙ্কুর। সন্ধ্যার মধ্যে বহুবারই সেই চাপা হাসিটা লক্ষ্য করেছে সে। তার সমস্ত ব্যর্থতা লোকটা বুঝছে যেন, উপলব্ধি করছে যেন। কিন্তু কিছু বলার আগেই কথা শুনে অবাক।

হাসিটুকু স্পষ্টই এবার। বললেন, এভাবে চেষ্টা করে কি হবে? তোমার দিল্ তো তোমার সঙ্গে নেই দেখছি, সে আর কোথাও ঘুরছে—সেটাকে কষে বাঁধো আগে, তারপর বোসো।

উঠে অঙ্কু আবারও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চেয়ে চেয়ে দেখেছে খানিক। আবারও সেই একই প্রশ্ন, কে তুমি?

একই জবাব, ফকির।

বুকের দাহ অঙ্কুর দুই চোখে পুঞ্জীভূত। বলল, তুমি এখান থেকে যাবে কিনা?

নিঃশঙ্ক জবাব, সময় হলেই যাব—কিন্তু আমি গেলেই কি তোমার জ্বালা জুড়াবে?

অঙ্কু হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু তারপরই মনে হল, এও এক ধরনের অভিভূত করার

অস্ত্র, অনেক রকম বচন-বিন্যাস জানে এরা। বলল, আধঘণ্টার মধ্যে ঝুলি-ঝোলা নিয়ে যদি না ওঠো এখান থেকে তাহলে সময় হয়েছে কিনা আমি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেব।

ক'টা দিন একটানা গুমোটের মধ্যে কাটিয়েছে। বুকের ভেতরটাও যেন বাতাস-শূন্য। অক্ষু পায়ে পায়ে হেঁটে চলল। বাতাস চাই, অনেক বাতাস চাই। তারপর আবার এসে বসবে। আর তখনো যদি এই লোকটাকে এখানে দেখে, তার দুর্ভাগ্য কেউ ঠকাতে পারবে না।

কতদূর গিয়েছিল খেয়াল নেই, কতক্ষণ কেটেছে তাও না। কটা দিনের মধ্যে সময়মত নাওয়া-খাওয়া হয়নি। সে না গেলে বিভুর ঠাকুর তার খাবারটা বয়ে এনে দিয়ে যায়। কিন্তু তাও সময়মত খাওয়া হয় না একদিনও। মাথাটাও তার ভার লাগছে। দু' চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কিন্তু শুলে আর ঘুম আসবে না জানে। তার ঘুম গেছে।

ফিরতি পথে অক্ষু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ঘর এখনো বেশ খানিকটা দূরে।

সেখান থেকে তানপুরার গুরু-গম্ভীর গোঁ-গোঁ আওয়াজ এখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

তারই কুঁড়েঘরে চড়া সুরে তানপুরা বেঁধে নিয়েছে কে। গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনির মত নিটোল পরিস্ফুট একটা শব্দ-তরঙ্গের অনুধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে। সবল আঘাতে আঘাতে কে যেন যন্ত্র-তার থেকে সুর ছেঁকে তোলার আবহাওয়া রচনায় মগ্ন হতে চলেছে।

কে? ওই ফকির ছাড়া আর কে হতে পারে? এতবড় দুঃসাহস তার...

সংবিৎ ফিরতে অক্ষু ছুটল কুঁড়ের দিকে। অন্ধকারে কতবার হোঁচট খেল ঠিক নেই। কিন্তু কাছাকাছি এসেই মাটির সঙ্গে পা দুটো যেন আটকে গেল তার।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

গান নয়, শুধু কণ্ঠের জাদুতে অক্ষু যেন পঙ্গু হয়ে গেছে হঠাৎ। শঙ্খধ্বনির মত সবল জলদ-গম্ভীর অথচ মিষ্টি—সংযত প্রশান্ত দ্বিধাশূন্য।

ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং।
শিব আত্মা পরমাত্মা
অন্তরাত্মা ত্বম।
আদি অন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব
রজঃ সত্ত্ব ত্বম।

ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং।
চিদানন্দ মহানন্দ
যতি ছন্দ ত্বম।
শিব প্রভা শিব শোভা
জ্যোতি আভা ত্বম।

এ কি গান না স্তোত্র-পাঠ! যাই হোক, এ কি শুনল অক্ষু? এ কি কানে এলো তার? কানে এলো, মাথায় এলো, বুকে এলো, দেহের অণুতে অণুতে এলো। এ কি? সঙ্গীতের সমস্ত উৎসগুলি যেন এরই মোহনায় এসে নির্বাণ লাভ করেছে। সুর-তরঙ্গ নিয়ে পালোয়ানী নেই,

কালোয়াতী নেই, তাল-নির্ঝর নেই—সহজ উদাত্ত খাড়া সুরে স্বর ছড়াচ্ছে। দাবি নেই, আবেদনও নেই, বক্র গতি-বিন্যাসও নেই—শুধু মহিমা বিস্তার আছে। নিজেরই অন্তস্তল দেখার মত প্রসন্ন জ্যোতি আছে—সমস্ত অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেবার মত শান্ত সবল দীপ্তি আছে।

তুমি সত্য, তুমি শান্ত, তুমি সর্ব আনন্দ, তুমি সকল জ্ঞানের আভরণ।

ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং...

বুকের অতলে কত যুগ-যুগান্তরের জমাট বাঁধা কান্নার স্তূপে আনন্দের আঁচ লেগেছে। মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর বাতাস ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বগামী, চিরভাস্বর জ্যোতির্ময়ের দরবারে জগৎবাসীর এই একটি খবরই পৌঁছে দেওয়ার আছে, মরজগতের এই আমরা তোমার মহিমা-মগ্ন হয়ে আছি। এই মহিমা ঘোষণার ঝঙ্কারে স্তব্ধ প্রকৃতি থর-থর কেঁপে উঠছে। যে মহেশ্বরের পঞ্চমুখ থেকে আদিরাগের অভ্যুদয়, বেদান্ত-ছাঁকা স্তোত্র-ভজনের মধ্য দিয়ে আদিসঙ্গীতের মূল উৎসটি শেষে তাঁরই দরবারে পৌঁছে দেওয়াই যেন সমগ্র রূপ-রসের একমাত্র লক্ষ্য। উদাত্ত ঘোষণায় এই অখণ্ড ধারণাটি প্রকাশ-মগ্ন কেউ।

গান হোক, স্তোত্র হোক, ভজন হোক—থামল এক সময়। প্রশান্ত বিলয়ে এসে নীরব নিথর সব কিছু।

আত্মবিস্মৃতের মত অক্ষু কখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে জানে না। ফকির চোখ বুজে বসে আছেন। ধ্যানস্থ যেন। অক্ষু নির্বাক চেয়ে আছে। ক্রমশ সংবিৎ ফিরে পেয়েছ। চেয়েই আছে। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে কেমন। সেই ফকিরই বটে, যাকে একটু আগে সে শাসিয়ে গেছে। কিন্তু কে এ? কে? কে?

লোকটি চোখ মেলে তাকালেন। চোখোচোখি হল।

কে আপনি?

ম্যায় তো এক ফকির হুঁ। মৃদু গম্ভীর জবাব।—বয়েঠ্ যাও।

চোখ বুজে বোধ হয় আহ্নিকেই মগ্ন হলেন তিনি আবার। মুহূর্তগুলি ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ। রাত বাড়ছে। ঘণ্টা দুই পার হয়ে গেল বোধ হয়। অক্ষু নির্নিমেষে দেখছে। চোখ দুটো জ্বালা করছে তেমনি। তবু নিষ্পলক।

আবার তিনি উঠলেন এক সময়। ঝোলা এনে খাওয়া-দাওয়ার তোড়জোড় করলেন। শুকনো মেওয়া, শুকনো খেজুর, কিসমিস, বাদাম, আর ফল কিছু। নিজে খেলেন, অক্ষুকে দিলেন। বললেন, খা লেও—

যেন তাঁরই ঘরে অক্ষু আশ্রিত।

খাওয়া-দাওয়ার পর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আধ-বসা হয়ে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করলেন তিনি। অক্ষু ঠায় বসে।

রাত গভীর।

তানপুরার গভীর নিনাদে চমক ভাঙল অক্ষুর। ফকির তাকে ইশারায় তবলা নিয়ে বসতে বলছেন। সঙ্গীত শুরু হবে এবার। তাই শোনার জন্যে সমস্ত প্রকৃতি যেন উন্মুখ-প্রত্যাশী এতক্ষণ ধরে।

অঙ্কুকে কে বুঝি হাত ধরে সুরের রাজ্য দেখিয়ে চলেছেন। বিমুখ রাগরাগিণীদের অন্তঃপুরের দরজা খুলে গেছে। তারা এসে এসে নতি জানিয়ে যাচ্ছে। এরা পরিচিত সকলেই, অথচ খুব যেন পরিচিত নয়। নিটোল গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ধ্রুপদ-ধামারের ঈষৎ প্রমত্ত-মন্থর গতি-ভঙ্গি। বীর্যের সঙ্গে মাধুর্যের মিলন।

'তোম বিন ঘোম ঘোম' ধুরিয়া মল্লারের ধ্রুপদটি আগেও কোথায় শুনেছিল অঙ্কু। কিন্তু এ-রকম শোনেনি। এর যেন জাত-গোত্র আলাদা। বিচিত্র মর্মস্পর্শী মূর্ছনার সঙ্গে বুকের সব ক'টা তারেরযোগ। সুরের মাদকতায় অঙ্কু অভিভূত শুধু, বিচার-বিশ্লেষণ করার মত চৈতন্যটুকুও অবশিষ্ট নেই, আর তবলায় আঙ্গুল চলছে কিনা তাও খেয়াল নেই।

পূব আকাশে রঙ বদলের জটলা চলেছে। একটু বাদে ভোর হবে। রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। অঙ্কুর বুকের অন্ধকারও। গান থেমেছে।

কিন্তু সুরের আবেশ কাটেনি। ফকির চোখ বুজে বসে আছেন, হাসছেন মৃদু মৃদু। তাঁর মোটা হাতখানা অঙ্কুর গায়ে মাথায় বিচরণ করছে। অঙ্কু ফকিরের দুই পায়ে মাথা রেখে পড়ে আছে। চোখ দুটো আর জ্বালা করছে না, সমস্ত জ্বালা জল হয়ে গলে গলে তার পা দুখানা ভিজিয়ে দিল।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ বাদে অঙ্কু মুখ তুলল। ভোরের প্রথম জ্যোতিধারা যেন লোকটির প্রসন্ন হাসির সঙ্গে এসে মিলেছে। চোখের জলে অঙ্কু ঝাপসা দেখছে সব কিছু, ওই মুখখানাই শুধু একটুও ঝাপসা নয়।

কে তুমি?

ফকির। ম্যায় এক ফকির হুঁ। ফকির হাসছেন।

না, এর বেশি পরিচয় ফকির-গুরু আব দেননি।

বেশি জিজ্ঞাসা করলে, বেশি কৌতূহল প্রকাশ পেলে বিরক্ত হয়েছেন। তাকে শিষ্য গ্রহণ করেছেন। এখানেই আছেন। বলেন, এই শিষ্যের খোঁজেই তাঁর এখানে আসা।

অঙ্কুর বিস্ময় ধরে না। এ কোন্ অদৃষ্টকারের সদয় কৌতুক বুঝে ওঠে না। সে কি এই সদ্য বর্তমানের মধ্যে বাস করছে না? আধুনিক, লেখা-পড়া-জানা এই মনটাকে কি সে সব সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তা থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসবে? এ কেমন করে সম্ভব হল।

গল্পে আছে, গুরু খুঁজে খুঁজে এক ভক্ত দেহপাত করতে বসেছিল। গুরু মেলেনি। শেষে অভিমান করে ঘরর মধ্যেই বসেছিল। সঙ্কল্প, অনাহারে এই দেহ বিসর্জন দেবে।

কোথায় ছিলেন তার গুরু কে জানে। একদিন আপনি এসে দেখা দিলেন। বললেন, সময় হলে তবে গুরু মেলে, তোর সময় হয়েছে তাই এসেছি।

কিন্তু অঙ্কু কোন্ সুকৃতির ফলে এমন গুরু পেল? অপচয় ছাড়া তার এই জীবনে আর কোন্ সঞ্চয় আছে?

কিন্তু মুশকিল বাধতে লাগল গান শেখার সময়। ফকির-গুরু বলেন, যা শিখেছিস সব ভুলতে হবে—শুধু আধারটি আছে আর কিছু নেই। তালিম নেবার সময় অঙ্কু অনেক সময় বেশ দুরূহ এক-একটা কেরামতি দেখিয়ে বসে—কম দিন তো হল না, শিখেছেও কিছু। অন্য শ্রোতা

হলে বাহ্‌বা পেত। কিন্তু এই গুরু দাবড়ানি দিয়ে ওঠেন। বলেন, হঠাৎ বড়লোক হলে হাঁক-ডাক করে পুঁজি দেখিয়ে বেড়ায়, বনেদী বড়লোক কিছুই দেখায় না, লোকে তালাস করে খুঁজে নেয়। তোর কি পুঁজি আছে আমি জানি, এত দেখাবার লোভ কেন?

সংগীত-সিদ্ধ ফকিরের আবির্ভাবের খবর দেখতে দেখতে চারদিকে রটে গেল। বহু লোক আসতে লাগল। কিন্তু সকলেই নিরাশ হয়ে ফিরল। এমন কি বিভু আর অনুও। কারণ সংগীতের আসর বসে গভীর রাত্রিতে। বিভু আর অনুর সংশয়, এ আবার কার পাল্লায় পড়ল কে জানে। অঙ্কুর বাড়ি আসা ঘুচেছে, গুরু নিয়ে মেতে আছে। এটা তাদের খুব ভাল লাগল না। বিভু তার ফকির-গুরুকে অনেকবার গান শেখানোর অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। অনুর অনুরোধে একদিন অবশ্য একটা ভজন গেয়েছিলেন। শ্রোতা বুঝে গান গেয়েছিলেন গুরু। সে গানও অনুকূল পরিবেশের অভাবে অভাবনীয় কিছু মনে হয়নি কারো। তারা চলে গেলে গুরু হেসে বলেছেন, ওরা আমাকে পরীক্ষা করতে চায় কেন রে?

অঙ্কু জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু এরপর ফকিরের প্রসঙ্গে তাদের বেশি কৌতূহল বা অবজ্ঞা দেখলে বিরক্ত হয়েছে।

কিন্তু সংশয় এক এক সময় অঙ্কুর মনেও উঁকিঝুঁকি দিত। ফকির তাকে আগের শিক্ষাদীক্ষা সব ভুলে যেতে বলেন কেন? এত বছরে সে যতটুকু শিখেছে সেও তো খুব কম নয়। অল্পে সন্তুষ্ট যারা থাকতে পারে, তাদের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে যথেষ্টই শিখেছে। অঙ্কুর অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার ধাত নয় বলেই যত যাতনা। কিন্তু ফকির কেন তাঁকে ওই সবের দিকে ঘেঁষতে দেন না? তবে কি তিনি উঁচু স্তরের খেয়ালের সাধনা-সংগীত ছাড়া আর কিছুই জানেন না? সেই দুর্বলতা ঢাকার জন্যেই এই অনুশাসন?

ঠকছে কিনা, অঙ্কুর মনে সেই খটকা যে এসেছিল সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু মুখে কখনো সেই সংশয় প্রকাশ করেনি। কিন্তু গুরুর নির্দেশ আমান্য করেই এক-একদিন নিজের রাস্তায় চলত সে।

এক দিন। দিন নয় রাত্রি। আসর বসে গভীর রাতে, কিন্তু সেদিন ফকির তানপুরা টেনে নিলেন সন্ধ্যার পরেই। তাঁর ইঙ্গিতে অঙ্কু অন্য আগন্তুকদের বিদায় করেছে।

ফকির অঙ্কুকে বললেন তবলা নিয়ে বসতে।

গান শুরু হল। গানের আগে গুরু যেমন নীরবে বসে ধ্যান করেন খানিকক্ষণ, প্রণতি জানান দেবতাদের উদ্দেশে, সে-সব কিছুই করলেন না সরাসরি গান শুরু করলেন।

অঙ্কু অবাক। ফকির আজ তার পরিচিত রাগ-রাগিণী গাইছেন—যে সাধনা সে এতকাল ধরে করে এসেছে সেই সবই যেন সমুদ্রের পরিপূর্ণতায় তাঁর কণ্ঠপথে নিঃসৃত হচ্ছে। একের পর এক গান করে গেলেন ফকির। একের পর এক রাগ-রাগিণীর মহড়া দিয়ে গেলেন। অঙ্কুর তবলার পাকা হাতও ধরে এসেছে। গুরুর সঙ্গে যুঝতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে উঠেছে সে।

প্রায় ভোরের দিকে গুরু থামলেন। অঙ্কু চিত্রার্পিত।

এইবার ফকির যেন ধ্যানে বসলেন খানিকক্ষণের জন্য। তারপর তানপুরার ঝঙ্কারে ঘরের বাতাস বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তারপর গানের মধ্যে আবার যেন প্রথম দিনের সেই মহা-ঘোষণা মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল।

'ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং।
শিব আত্মা পরমাত্মা
অন্তরাত্মা ত্বম।'

শেষ হল। প্রথম দিনের সেই অনুভূতিই যেন দ্বিগুণ আলোড়ন তুলল আজ। অঙ্কু ভয়ে কাঁপছে। গুরু তার পরীক্ষার জবাব দিলেন, সংশয়ের জবাব দিলেন। এবারে যেন কিছু বলবেন তাকে।

বললেন।—কোন্ গান শেখার ইচ্ছে তোর আগে বেছে নে। যদি আগের ওই সোজা রাস্তার গান হয়, তাহলে আমাকে ছেড়ে দে, আমাকে দরকার নেই।

অঙ্কু আবার ওই পায়ে মুখ লুকালো। আর না, আর তার কোনো সংশয় নেই, কোনো দ্বিধা নেই। আজ তার সব দম্ভ ঘুচে গেছে।

মুখে বলেনি কিছু। পায়ে মাথা রেখে পড়ে আছে শুধু। গুরু হাসছেন মুখ টিপে।

অনেকক্ষণ বাদে অঙ্কু সেই এক কথাই জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে বলো?

ক'বার বলব রে বাবা, আমি ফকির বলেছি না। নে, ওঠ্।

তের

একটা বছর পলকে কেটে গেল।

জীবনের সব থেকে পরিপূর্ণ, সব থেকে নিটোল একটা বছর। এটা এত তাড়াতাড়ি গেল বলেই অঙ্কুর খেদ। সময়টার দিকে সে তাকাবার অবকাশ পায়নি পর্যন্ত। অবকাশ পেল, ফকিব গুরু আবার যখন বিদায়ের প্রসঙ্গ তুললেন। তাঁকে ধরে রাখার জন্যে মাস তিনেক আগে সে একটানা প্রায় দেড় দিন অনশন পর্যন্ত করেছে। গুরুকে শাসিয়েছে, কোথায় যাচ্ছেন ঠিকানাটা রেখে যান—শেষ খবরটা তাঁকে পাঠানো হবে।

এই একটা বছরের হিসেব নিতে বসলে অঙ্কুর নিজেরই বিস্ময়ের সীমা থাকত না হয়তো। কিন্তু হিসেব জিনিসটা কৃপণের সান্ত্বনা। সমুদ্র নিজের বুকের ঢেউ গোনে না। পরিবর্তনের ঢেউগুলো অঙ্কুর নিজের অন্তত চোখে পড়ছে না।

ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, আবহাওয়া অনুকূল ছিল, ফকির-গুরু উপযুক্ত বীজ বুনে দিয়েছেন, আগাছা সরিয়ে দিয়েছেন। ফসল ফলেছে। বছর না যেতে একই মানুষের মধ্যে ভিন্ন গুণী দেখেছে সকলে। ফকির-গুরু তাকে শহরে, শহরের বাইরে, কলকাতায় এমন কি কলকাতা থেকে দূরে দূরের সঙ্গীত অনুষ্ঠানেও পাঠিয়েছেন। বলেছেন, আত্মগরিমা নয়, আত্মপ্রত্যয় দরকার। অনুরাগীর চোখ-কান দিয়ে এবারে নিজেকে দেখা দরকার চেনা দরকার। সমস্ত বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে এখন নিজেই জোর করে ঠেলে দিয়েছেন তাকে। দেশের আর বিদেশের বড় বড় খলিফা সঙ্গীতবিশারদ আর বিচারকরা তাকে ডেকে খোঁজ-খবর করেছেন এসব জিনিস কোথা থেকে পেল—গুরু কে?

অঙ্কু হাসে। ফকির-গুরুর কি পরিচয় দেবে?

ভজন আর ধ্রুপদের এক নতুন ধাপ আবিষ্কারের প্রস্তুতি উপলব্ধি করেছেন রসজ্ঞ জনেরা। যেখানে গেছে, সর্বোচ্চ মান নিয়ে এসেছে অঙ্কু। সেই মান গুরুর পায়ের কাছে রেখে সে শাসিয়েছে, ফের আমাকে কোথাও পাঠাবে তো আর ফিরবই না বলে দিলাম—তোমার শিষ্যর খ্যাতির বিজ্ঞাপন দরকার আছে নাকি?

ফকির হাসেন, বলেন, আছে রে পাগলা, আছে—বাইরের সাজও দরকার, ওটা ভিতরে না ঢোকে দেখিস।

সেই খ্যাতিটা মুষলধারেই বর্ষণ হচ্ছে ইদানীং। অঙ্কু রাগ করে, ফকির-গুরু হাসেন। অঙ্কু বলে, ওটা দরকার তো তুমি এমন আড়ালে সেঁধিয়ে আছ কেন, যত খুশি খ্যাতি নাও গে যাও না।

গুরুকে এমনি দাবড়ানি দিয়েই কথা বলে অঙ্কু। মিটি মিটি হাসেন তিনি, বলেন, তোর খ্যাতিটা তাহলে তোর বলেই ভাবিস তুই?

ভাবি তো, আমি মানুষ না?

গুরু জোরেই হেসে ওঠেন, মানুষ যখন আর ভাবনা কি।

অন্যান্য ওস্তাদদের কাছে একদিন 'চীজ' আদায় করার জন্যে কত ছোট কাজ, কত কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হয়েছে তাকে, মনে পড়লে হাসি পায়। এই গুরুর কাছ থেকে যা কিছু আদায় করার, এমনি ধমকে আর চোখ রাঙিয়েই আদায় করেছে সে। উপোস করবে ভয় দেখিয়ে আদায় করেছে, বাক্যালাপ বন্ধ করে আদায় করেছে। এই গুরুর দিতে কিছু আপত্তি নেই। শুধু এক একটা জিনিস গলায় আর বুকে আর মনের তারে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত অন্যটা দিতে চান না। কিন্তু সে ব্যাপারে অঙ্কুর সেই চিরাচরিত অসহিষ্ণুতা। বলতে ছাড়ে না, জানি—গুরুদের সব পুঁজি নিজের পেটের মধ্যে আগলে রাখা স্বভাব, শিষ্যদেরই সব থেকে বেশি হিংসা করেন গুরুরা।

কিন্তু এও উপলব্ধি করে, মা যেমন করে সব দিক বিবেচনা করে শিশুকে আহার দেয়, প্রশ্রয় দেয়—যা দেবার আর যতটা দেবার ঠিক তেমনি করেই ফকির-গুরু দিচ্ছেন তাকে।

শুধু গানের ব্যাপারে নয়, ফকির-গুরু সকল রকমেই সেই মৃত্যুর বিবর থেকে জীবনের আলোয় টেনে তুলেছেন তাকে। জীবনের সদর পথে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। নিষ্ক্রিয়তা গেছে, অবচেতন আচ্ছন্নতা কেটেছে, নিজেকে ছোট ক'রে দেখার অভিশাপ অপগত। আগের মতই প্রাণোচ্ছল দুরন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে মনটা। আগের থেকেও বেশি। আলো কোনো কালো বরদাস্ত করে না। কোথাও কালো দেখলে অসহিষ্ণু রাগে তাকে যেন বিধ্বস্ত করে ফেলতে চায় অঙ্কুও।

গুরু অনেকদিন সাবধান করেছেন তাকে, খবরদার রাগ করবি নে, ওই রাগ তোর শত্রু। দরকার হলে রাগ দেখাবি, কিন্তু সত্যি সত্যি রাগ করবি না। রাগ পাপ। পাপ পুষে গান হয় না।

ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও আঁতকে ওঠে। গোড়ায় গোড়োয় অঙ্কুর বেলাও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ত্রিকোণ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হবার ফলে বিভু, আর এক-একদিন বিমলাকেও ধরে নিয়ে অনু এখানকার কুঁড়েতে হানা দিয়ে চলেছে। এখন আসাটা অনেক সহজ

হয়ে গেছে, কারণ এতদিনে অঙ্কুর সঙ্গে তার ভাবী সম্পর্কটা প্রায় সকলেই জেনে গেছে। এমন কি অনুর বডিগার্ড জগুয়া পর্যন্ত মা-মণির সেই শুভদিনটির প্রত্যাশায় ভিতরে ভিতরে দিন গুনছে।

কিন্তু সেদিন মেয়েদের পক্ষে এখানে আসাটা খুব সহজ ছিল না। এটা গাঁজার আখড়া বলেই জানত সকলে, আর এখানে সাধুর আবির্ভাব মানে তো বড় দরের গাঁজাখোরের আবির্ভাব।

অনু অথবা বিভুও প্রথম প্রথম যে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করেনি আগন্তুকের সম্বন্ধে, কার পাল্লায় পড়ল ভেবে চিন্তিত হয়েছে—সে কথা মনে হলে নিজেরাই লজ্জা পায় এখন। সাধকটিকে চিনেছে তারা। তাঁর সঙ্গে খাতির হবার পরে চিত্রার্পিতের মত বসে তাঁর গান শুনেছে, সাধনা দেখেছে—দিনের পর দিন শিষ্যকে তালিম দেওয়া, দীক্ষা দেওয়া দেখেছে। অঙ্কুর মধ্যে সেই বিস্মৃত দিনের জীবনের উন্মেষ দেখেছে। অজ্ঞাত সাধকটির প্রতি মনে মনে তারা কৃতজ্ঞ।

সদাপ্রসন্ন ফকির-গুরু সকৌতুকে অনুকে লক্ষ্য করেছেন। কাছে ডেকে বসিয়ে কথাবার্তা বলেছেন। ইস্কুলে মেয়ে পড়ায় শুনে মুখে খুশি ধরে না। তার ওপর বিভুর মুখে ভাবী সম্পর্কের সমাচার শুনে আনন্দে আটখানা। অনু এলেই হাত জড়িয়ে কাছে টেনে নেন তাকে, ঠাট্টা-মস্করা করেন। অনু বলে, আমাকে আপনার শিষ্য দুচক্ষে দেখতে পারে না—গান জানি নে তো।

গুরু বলেন, তোকে ঠিক মত দেখেনি বলেই ওটা অন্ধ হয়ে ছিল এতকাল।

অনু নালিশ করে, জানেন, আমাকে ধরে কি মার মারতো ছেলেবেলায়!

গুরু হাসেন। বলেন, তার ফল দেখছিস না, কি মারটা খেল নিজেই। এবারে ওকে ক্ষমা করে দে।

অনু অভিমানও করে, আপনি নিজেই তো দিলেন সর্বনাশটি করে, এরপর সামলাবো কেমন করে?

গুরু তার গায়ে-পিঠে হাত বুলোন, পাল্টা চোখ রাঙান, হ্যাঁরে বেটি, সর্বনাশ থেকে ওকে বাঁচালাম সেটা দেখলি না?

অঙ্কু গুরুর কাছে অনুর খাতিরটা দেখত, আর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত কেমন। স্মৃতির ভাণ্ডারে তার অনেক কালিমা জমে আছে। সুরলক্ষ্মীর অন্তর্জগতে প্রবেশের তাড়নায় সে নিজেই একদিন অনায়াসে অনুর মত মেয়েকে ছলে-বলে গুরুর কাছে অর্পণ করতে পারত বোধহয়। সেই কালোর ত্রাস তার আজও যায়নি। আড়ালে অনুকে বকাবকি করত, কেন তুমি এত ঘন ঘন এখানে আস?

অনু ফিরে চোখ গরম করে, কেন তুমি ঘন ঘন বাড়ি যাও না?

এরপর ক'দিন না আসাতে ফকির-গুরু উতলা হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আসনি কেন?

অনু অম্লান বদনে জবাব দিয়েছে, এলে রাগ করে।

অঙ্কু সেদিনও তার আদর-আপ্যায়ন লক্ষ্য করছিল। অনু চলে যেতে গুরু ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তুই সারাক্ষণ অমন চোখ পাকিয়ে দেখছিস কি আমার দিকে চেয়ে?

অঙ্কু নিরুত্তর।

কি দেখছিলি, বল্ না?

অঙ্কু মিথ্যে কথা বলতে পারত, যা-হোক কিছু গোঁজামিল দিতে পারত। কিন্তু পারেনি। অসহিষ্ণু জবাব দিয়েছে, গুরুদের অনেক কাণ্ডকারখানা দেখেছি এ পর্যন্ত, তাই ভয় হয়।

ফকির-গুরুর চেহারাটাই যেন বদলে গেল হঠাৎ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, দেখলেন খানিক। ধারালো কণ্ঠে বলে উঠলেন, যে-সব কাণ্ডকারখানা দেখেছিস তা মনে থাকবে বরাবর, না ভুলে যাবি?

অঙ্কু হতভম্ব।

পরক্ষণে প্রসন্ন হাসিতে গুরুর মুখখানা ভরে উঠতে দেখেছে। সেদিন আর বলেননি কিছু। এরপর অনু আসতেই আনন্দে উপচে উঠতে দেখা গেছে তাঁকে। ছদ্ম তর্জন করেছেন, তুই আর এখানে আসিস না বেটি, ও আমাকে সন্দেহ করে।

অনু হতভম্ব চোখে আসামীর দিকে ফিরে তাকিয়েছে। ফকিরের সামনেই জিজ্ঞাসা করেছে, বলেছ নাকি কিছু?

অঙ্কুর নিজের ওপরেই রাগ। তেমনি রূঢ় জবাব দিয়েছে, বলেছি তো।

অনু নির্বাক, তাজ্জব।

ঘর ফাটিয়ে হা-হা শব্দে হেসে উঠেছেন ফকির-গুরু। ছোঁয়াচে হাসি, এরা দুজনও না হেসে পারেনি। অঙ্কুর মনে হল, ওই এক হাসিতে স্মৃতির যত কালি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অনু মুখ ঘুরিয়ে বসেছে, আসামীর মুখদর্শনেও আপত্তি যেন। ফকির-গুরুকে বলেছে, গান বাদ দিয়ে এবারে মাথা ঠিক থাকে এমন কিছু ওষুধ থাকে তো দিন।

ফকির-গুরু হেসেছেন।—আছে। দেব।

জঙ্গলের সেই কুঁড়েঘরও একদিন নিশ্চিহ্ন। বিভু পাকা দালান তুলে দিয়েছে। কারো নিষেধ মানেনি। প্রতিষ্ঠানের সূচনা সেটাই। নামকরণ হল পঞ্চবটী। পুরাণের পঞ্চবৃক্ষ নেই? দেখো, কোথায় আছে। নিয়ে এসো। নেই, এর সঙ্গে অঙ্কুর আপস নেই কোনো। দিনে দিনে ছাত্রসংখ্যা আর অনুরাগীর সংখ্যা বাড়ছে অঙ্কুর। সামনের হলঘরটায় লোক ধরে না। মাসে দু মাসে সঙ্গীতানুষ্ঠানও হয়। কাছাকাছির গুণীরা অন্তত আসেন। কিন্তু ফকির-গুরু পারতপক্ষে সকলের সামনে বার হন না বড়। গানের আসরে অঙ্কুর একার আকর্ষণই যথেষ্ট।

অঙ্কুর সঙ্গে অনুর সত্যিকারের ছোটখাট বচসা হয় সলুকে নিয়ে।

ছেলেটা বাঁকা রাস্তায় চলা শুরু করেছে সে-খবরটা গোপনে বিভুই প্রথম জানিয়েছিল অঙ্কুকে। গত বছর ফেল করেছিল। সেই প্রসঙ্গেই বিভু বলেছিল কথাটা। কলেজ পালিয়ে কোথায় কোথায় ঘোরে, বাজে ছেলের সঙ্গে মেশে। সিনেমা আর সিনেমার গানের নেশা। বিড়ি-সিগারেটও খেতে দেখেছে বিভু তাকে।

অনু শুনলে দুঃখ পাবে বলেই অঙ্কুকে বলেছিল। অঙ্কু সরাসরি অনুকে জানিয়েছে। বলেছে, ছেলেটাকে এভাবে প্রশ্রয় দিও না।

অনু ফিরে তাকেই দোষী করেছে, তোমাকে ভয় করে, তুমি একটু-আধটু ডাক দিলেই তো

পারো। গানের এত ঝোঁক, নিজে যদি একটু ডেকে বসাও তাহলে আর পাঁচ জায়গায় ঘুরবে কেন?

যে-গানের দিকে ঝোঁক তার, সে এই গান নয়। তাছাড়া লেখাপড়া শেষ হোক আগে, তারপর ঝোঁক থাকে গান হবে।

অনু তর্ক করতে ছাড়ে না, ভাইয়ের ব্যাপারে বলতে গেলে খানিকটা অন্ধ দুর্বলতাই আছে তার। তাছাড়া অঙ্কু কখনো ওকে ডাকে না বলে মনে মনে অভিমানও আছে একটু। বলে, তোমার বেলায় কি হয়েছিল, পড়াশুনা শেষ করে গান ধরেছিলে?

অঙ্কুর রাগ হয়, কিন্তু বলতে পারে না কিছু। অনুর কড়া শাসনের দিক থেকে আর একটা বাধাও ছিল। ছেলেটা এমনিতে দুর্বল বড়, ভোগে প্রায়ই। একদিন অঙ্কুকেই বলেছিল, ও বেশিদিন বাঁচতে আসেনি—মূর্তি দেখছ না।

কিন্তু ভাইয়ের রুগ্ন মূর্তির মধ্যে অনু নিজেই কিছু দেখেছিল। ইস্কুল-দালানেরই দোতলার দুটো ঘর নিয়ে সে থাকত তখন। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা যখন-তখন আসত তার কাছে। সলুর ভাব-গতিক তারও ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। পড়াশুনা বা কলেজ-কামাই করে যখন-তখন তাকে জানলায় হুমড়ি খেয়ে বসে থাকতে দেখত।

অনেক ভেবেচিন্তে সে বিভুকে বলল, ভাইয়ের এভাবে মেয়েদের ইস্কুলে থাকাটা আর ভালো দেখায় না, সে আপাতত তার ওখানেই থাকবে। সলুকেও তাই বলল।

রাগ করে ক'দিনের মধ্যে সলু দিদির সঙ্গে কথাই বলল না, কিন্তু তাকে যেতে হল। পরে সময় নেই অসময় নেই ইস্কুলে আসত দিদির সঙ্গে দেখা করার জন্যে। অনু তাও বন্ধ করল। বলল, আমি তো রোজই প্রায় যাচ্ছি, তোর আসার দরকার কি! এটুকু কঠিন হওয়াও তার পক্ষে সহজ ছিল না খুব।

কথায় কান দেবার সময় নেই অঙ্কুর। তবু কথা একটু-আধটু তার কানেও আসত। মহেশের বাড়িতে সলুর পাকা আড্ডা হয়েছে একটা। নিজের হারমোনিয়ামটাও তার বাড়িতেই চালান করেছে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সেখানেই আড্ডা দিতে আসে। গান করে। জবা আর মহেশ দুজনেই তার গানের ভক্ত। পাড়ার আর পাঁচটা মেয়ে-পুরুষও গান শুনতে আসে। অনেক ভক্তিমূলক গানও নাকি ছেলেটা খুব মিষ্টি করে গাইতে পারে। কিন্তু ওদের মধ্যে আশপাশের প্রাচীন পুরুষেরা ব্যাপারটা তেমন ভালো চোখে দেখে না। মহেশের নাতনী বেশ ডাগর-ডোগর হয়ে উঠছে, এ-রকম মেলামেশা পছন্দ নয় তাদের।

কিন্তু তাদের ভ্রূকুটির পরোয়া করে কে, জবার বাবা তো মাসান্তে একবার আসে কিনা সন্দেহ, তার মা শ্বশুরের ভয়ে বোবা। পাড়ার লোকের ছোট-মনের কথা মহেশই এক-এক সময় হাসতে হাসতে অঙ্কুর কাছে গল্প করে। বলে, দা-ঠাকুরের আপনজন ওই একরত্তি ছেলে, তাকে নিয়েও ওদের সমিস্যে।

মহেশের সঙ্গে আগের মত দেখা-সাক্ষাৎ অঙ্কুর আর হয় না বলাই বাহুল্য। এখানকার গাঁজার পাটও অনেকদিন উঠেছে। জবা বলতে গেলে আর আসেই না এখানে। তবু দেখা হলেই অঙ্কুও মহেশকে প্রকারান্তরে সাবধান করে দেয়, ছেলেটার এখন পড়াশুনার সময়, তোমার

ওখানে গান-বাজনা নিয়ে বসা হয় এ যেন কখনো আর না শুনি। কিন্তু মহেশ ততটা গুরুত্ব দেয় না। গান কি জিনিস আর গান-বাজনার ঝোঁকটা কি জিনিস, ও তো দা-ঠাকুরকে দিয়েই সে দেখেছে।

সলু পারে তো অক্ষুর সামনা-সামনি আসে না। তবু বিভুর বাড়িতে গেলে এক-আধ সময় দেখা হয়ে যায়। অক্ষু বকা-ঝকা করে তাকে, পড়াশুনার খোঁজখবর নেয়। জিজ্ঞাসা করে, মহেশের বাড়ির গানের আড্ডা বন্ধ হয়েছে, না হয়নি?

আর একদিন পাঁচ কথা কানে আসতে শাসিয়েছিল, ফের যদি তোকে আমি ওই পাড়া দিয়ে হাঁটতে দেখি, ভালো হবে না।

কিন্তু শুধু হাঁটতেই নয়, মহেশের সঙ্গে বসে গাঁজার কল্‌কে হাতেই দেখেছিল সে তাকে। পঞ্চবটী সাজাবার জন্যে গোটাকয়েক মূর্তির ফরমাস দিতে এসেছিল মহেশকে। অক্ষুকে মহেশ নিজের হাতে গাঁজা সেজে খাইয়েছে কত, তাই সলুর গাঁজা খাওয়াটা এমন কিছু গর্হিত কাজ বলে ভাবেনি সে। কিন্তু দা-ঠাকুরের মূর্তি দেখে হতভম্ব সেদিন। ঘাড় ধরে আলতো করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ছেলেটাকে, গাঁজার কল্‌কে আছড়ে ভেঙেছিল। আর যেরকম গোটাকয়েক ঝাঁকুনি দিয়েছিল ছেলেটাকে ধরে, মহেশের মনে হয়েছিল, ওই রুগ্ন বুক থেকে প্রাণপাখী বেরিয়েই যায় বুঝি।

অক্ষুদার নামে দিদির কাছে নালিশের অন্ত নেই সলুর। অনু চুপ করে থাকে, নয়তো ফিরে ভাইকেই বকে। কিন্তু মাঝে-সাঝে একটু-আধটু অভিমান অক্ষুর কাছেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। অক্ষু দ্বিগুণ বিরক্ত হয়, ফিরে পাঁচ কথা বলে। অনুর ভাই বলে নয়, চোখের ওপর ওই বয়সের একটা ছেলে বিপথে যাবে, সে বরদাস্ত করে উঠতে পারে না।

সলু পরের বারও ফেল করল পরীক্ষায়।

অনুর মুখ গম্ভীর। এখন আর সে অনুযোগ করে না, কিন্তু মুখ দেখলেই মনের অবস্থা বোঝা যায়। ফেলের খবর শোনামাত্র অক্ষু দপ করে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু অনুর মুখের দিকে চেয়ে আর বলা হয়নি কিছু। উল্টে বরং অনুর কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়েছিল। মনে মনে ভেবে রেখেছিল, বিয়ের পর সলুকে নিজের কাছে নিজের বাড়িতে চোখের ওপর রাখতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিয়েটা এতদিনে হয়ে যেতে পারত। বিভু বারকতক তুলেও ছিল কথা। কিন্তু ফকির-গুরু যে ক'টা দিন আছেন, সেই কটা দিন আর পঞ্চবটী ছেড়ে যেতে মন ওঠেনি তার। তারপর তো আছেই বিয়ে। কিন্তু শেষে এই বিয়েটা দিয়ে যাওয়ার ছল করেই ফকির-গুরুকে আরো কিছুদিন আটকাবার মতলব করেছিল সে। বিভুকে বলেছিল, বাবার খোঁজ নিতে, বিয়েতে তাঁর আসা দরকার, অন্তত তাঁকে জানানো দরকার।

বাবার কাশীবাসী হবার আগে অনুর সঙ্গে দেখা করে যাওয়াটা ভোলেনি অক্ষু। কিন্তু বহু জায়গায় চিঠি লেখালেখি করেও বিভু তাঁর কোনো সন্ধান পায়নি। গেল আরো মাস দুই বাদে। হরিদ্বার থেকে একদিন তাঁর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছুল।

অঙ্কু কাঁদেনি। কাঁদতে পারেনি। পারলে হালকা বোধ করত। শুধু বিভু জানে, খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনু কেঁদে ফেলেছিল।

গুরু-দশার এক বছরের মধ্যে আর বিয়ের প্রশ্ন নেই। ফকির-গুরুকেও আর ধরে রাখা যাবে না। তিনি জানালেন, আর থাকলে এবারে তাঁর ক্ষতি হবে। অঙ্কু জোর করেনি। শুধু মনে হয়েছে বুকের একটা দিক খালি হয়ে যাবে।

আগের দিন সন্ধ্যার মধ্যে সকলে বিদায় নিয়ে গেছে। কাল সকালের পরে ফকির-গুরুকে আর যোগানন্দপুরে দেখা যাবে না।

গভীর রাত পর্যন্ত গুরু-শিষ্য সঙ্গীতচর্চায় মগ্ন। তারপর চুপচাপ দুজনেই।

অঙ্কু হঠাৎ এক সময় বলল, আমি কার শিষ্য কোনদিনই কি জানতে পারব না! লোকে ঘরোয়ানা জানতে চায়, জিজ্ঞাসা করে—আমি কিছু বলতে পারি না। তোমার মত ত্যাগী তো আমি নই, আমার লোভ আছে—বলতে ইচ্ছে করে।

ফকির-গুরু অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন তার দিকে। স্নেহ-ঝরা দুটি চোখ। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, খুব বলতে ইচ্ছে করে?

অঙ্কু তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকালো, খুব করে।

বলিস, পণ্ডিত ভাসের ঘরোয়ানা। পণ্ডিত উপানন্দর শিষ্য তুই।

ঘরের মধ্যে আচমকা বোমা ফাটলেও অঙ্কু বোধ হয় এত চমকে উঠত না, এত বিস্মিত হত না।

পণ্ডিত উপানন্দ—কুন্তীবাঈয়ের বাবা! কুন্তীবাঈয়ের বাবা পণ্ডিত উপানন্দ ভাস!

তীক্ষ্ণ দুই চক্ষু মেলে বৃদ্ধের সমস্ত মুখখানা যেন ফালা ফালা করে দেখছে অঙ্কু। তাই তো, তাই তো হবে। তা না হলে এমন অসম্ভব সম্ভব হবে কেমন করে! স্তব্ধ, নির্বাক সে।

পণ্ডিত ভাস খানিক চুপ করে থেকে আরো কিছু বলেছিলেন। আরো একটুখানি রহস্য উদঘাটন করেছিলেন।

—অঙ্কু লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আসার পর কুন্তীবাঈ বহুদিন বাদে এলাহাবাদে বাবার কাছে এসেছিল। তাঁকে খুঁজে বার করেছিল। বাইরে একজনের মতই সাক্ষাতের আশায় বহুদিন বসেছিল। তারপর দেখা হয়েছে। দূর থেকে মাটিতে মাথা রেখে বাবার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেছে। তারপর ঠাণ্ডা মুখে আর্জি পেশ করেছে একটা। জীবনে ওই একটা প্রার্থনাই মেয়ের।

মেয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন পণ্ডিত উপানন্দ ভাস। অঙ্কুর কাছে এসেছেন। মঞ্জুর করতেন না, আসতেনও না হয়তো। মেয়ে বলেছিল, বুকের কাছের শিষ্য পেলেন না বলে বাবার যেমন খেদ, বুকের কাছের গুরু পেল না বলে তেমনি হাহাকাব করে বেড়াচ্ছে একজন।

তাই শুনে শেষ পর্যন্ত এসেছেন। বললেন, এসে ভালো করেছেন। কি হয়েছে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেননি তিনি। কিন্তু অনুমান করতে পারেন কি হয়েছে। বুকের ভিতর তেমন করে আগুন না জ্বললে মেয়ে ওভাবে তার বাবার কাছে আসত না। প্রার্থনা করত না। অঙ্কুর কৃতজ্ঞতা বোধ করার দরকার নেই। মেয়ের হয়ে খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন তিনি।

অঙ্কু নির্বাক, নিস্পন্দ।

আজ সে কি করবে? কুন্তীবাঈকে ঘৃণা করবে? জীবনের চরম অভিশাপ ভাববে? সে কি মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল তাকে? জীবন আর তাহলে কাকে বলে? ভালবাসা আর কাকে বলে? তার সংজ্ঞা কী?

জীবনের আলো এমনি করেই বুঝি জীবনকে স্পর্শ করে। জীবনের এমন স্পর্শ, মুক্তির এত আলো আর বোধ করি সে পায়নি। গত এই এক বছর ধরেও না।

হঠাৎ সচকিত হল সে। পণ্ডিত উপানন্দ চেয়ে আছেন তার দিকে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ওই দুটি চোখে এমন স্থির অগ্নিশিখা আর কোনদিন দেখেনি। বললেন, আমার আরো কিছু কথা আছে তোর সঙ্গে।

অঙ্কু চেয়ে আছে। অপেক্ষা করছে।

বললেন, একদিন তুই আমাকেও সন্দেহ করেছিলি, বলেছিলি, গুরুদের অনেক কাণ্ডকারখানা তোর দেখা আছে। শুনে বড় খুশি হয়েছিলাম। এই সাধনার তলায় তলায় যত পাপের বাসা দেখেছি, ততো আর কোথাও না। এ যেন তোর মনে থাকে। পাপ মাথার ওপর এসে ভেঙে পড়লেও পাপের সঙ্গে আপস করিস না। যদি করিস, গুরুর অভিশাপ লাগে যেন। গান যেন সেইখানেই শেষ হয়। পাপ লুকিয়ে গান আমি চাই না।

চোদ্দ

আবারও বছর ঘুরে এলো একটা।

অঙ্কুর মনে হত এর প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত গুরুর আশীর্বাদপুষ্ট। পণ্ডিত উপানন্দ যোগানন্দপুরের ছোট্ট একটা প্রতিষ্ঠানে এক বছরের ওপর কাটিয়ে গেলেন, নিজে হাতে ধরে শিষ্যের মত শিষ্য গড়ে গেলেন একজন—সঙ্গীত-জগতে এটা বিশেষ একটা খবর। প্রায় অবিশ্বাস্য খবর। প্রায় রহস্যময় খবর। শহরের তরুণ সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে পঞ্চবটী আগেই আশ্রমের মত হয়ে উঠেছিল। তাদের নতুন উদ্যম আর উদ্দীপনায় খবরটা সর্বত্র ছড়িয়েছে। কলকাতায়, বাংলাদেশে, বাংলার বাইরেও অনেক সঙ্গীত-রসজ্ঞদের কানে খবরটা পৌঁচেছে।

যশ আর খ্যাতির ডালি গুরুজী থাকতেই অঙ্কু প্রচুর পেয়েছে। কিন্তু তার জন্যে সে-দিন তাকে মেহনত করতে হয়েছে—পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু তার দ্বিগুণ ডালি আজ আপনি আসছে—এইখানে বসে, এই পঞ্চবটীতে। কার শিষ্য অঙ্কু গোঁসাই তা যেন আর না বললেও হয়। অমন গুরুকে এ রকম করে না পেলে এমন শিষ্য হয়? গুরু যে সব উজাড় করে দিয়ে গেছেন এই একজনকে। এই একজনকেই। সঙ্গীতের রোমাঞ্চ-নাট্যে সাধক উপানন্দ ভাস রহস্যময় চরিত্র। তাঁর দেখা মেলে না। কিন্তু অঙ্কু গোঁসাই আছে পঞ্চবটীতে, তার দেখা মেলে। তার মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করে গেছেন তিনি। অতএব তাঁকে বুঝতে চাও তো যাও পঞ্চবটীতে।

অঙ্কু ফাঁপরে পড়ে যায় এক একসময়। তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া লেগেই আছে। পঞ্চবটীর সভ্যসংখ্যা বাড়ছেই। ফিরেও যাচ্ছে কত। বেতার-অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা আর্জি পাঠাচ্ছেন,

রেকর্ডওয়ালারা কলকাতা থেকে এসে ধর্ণা দিচ্ছেন।

গুরুজী অনুকে বলেছিলেন, শিষ্যর মাথা ঠিক রাখার ওষুধ দিয়ে যাবেন।

ওষুধ দিয়েই গেছেন বটে। যশ আর খ্যাতির ডালি স্তূপের মত বাইরেই জমছে, ভিতরে জমছে না। নিজের এতটুকু আত্মবিভ্রম সম্বন্ধে সচেতন হলেই রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে চায়, গুরুর ছবির নীচে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গুরু দিক-দিশারী।

কিন্তু গুরুর একটা উপদেশ স্মরণ থাকে না সব সময়। গুরু বলেছিলেন, রাগের মুখোস পরতে পারিস দরকার হলে, কিন্তু সত্যি রাগ কখনো করবি না। কিন্তু কোথাও আত্মিক শুচিতার এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে বা কোনরকম নীচতা-হীনতার আভাস পেলে দপ করে জ্বলেই ওঠে সে। প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করতে, কিন্তু পেরে ওঠে না। ওটা পিতৃধারা। তবে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় না আগের মত, কিছু একটা করে বসার আগে গুরুর কথা মনে পড়ে বোধহয়। নিরুপায়ের মত মনে মনে গুরুকেই বকাবকি করে তখন।

অনু আর বিভু ইস্কুলের নানা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত এই ক'টা মাস। ইস্কুলের উন্নতির ব্যাপারে তাদের মনেও অনেক পরিকল্পনা, অনেক উদ্দীপনা। বড় বাড়ি একটা না করলেই নয়, সেটাই সব থেকে বড় সমস্যা এখন। স্থানাভাবে বহু মেয়ে এসে ফিরে যাচ্ছে। এই ব্যস্ততার ফাঁকেও বিভু প্রায়ই এসে ধরে নিয়ে যায় তাকে। এখানকার এই ভিড়ের মধ্যে অনুকে নিয়ে আর আসে না বড়। দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত এখানে ভিড় লেগেই আছে।

অনু ঠাট্টা করে, টিপ্পনী কাটে। কখনো ডাকে ছোট গুরু বলে, কখনো ডাকে গোঁসাইজি। কখনো আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, এই মহা-মানব নিয়ে জীবনে যে কত দুর্দশা আছে কে জানে!

অঙ্কুর ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটুকুর প্রত্যাশায়ই আসে। এক একদিন নিজের মনেই হেসে ওঠে, ভিতরে ভিতরে সেও কোনো একটা দিনের প্রতীক্ষায় আছে যে!

বিভু অনুকে রাগাতে ছাড়ে না, বলে, দুর্দশার লোভে তো আর সবুর সইছে না দেখি তোমার।

অনু রাগ দেখায়, নয়তো আবার একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলে, যা বলেছ, ফাঁসীর আসামীর ফাঁসীটা হয়ে গেলেই যাতনার শেষ।

গান নিয়েও টিপ্পনী কাটে অনু। সব গানেরই একটা ছক আবিষ্কার করেছে সে। গান ক'রকমের হয়? ক'রকমের হয় অনুর হাতে গোনা। সাত রকমের হয়। যেমন, মনের জনকে প্রসন্ন হবার জন্যে আবেদন-নিবেদন, মনের জনের বিরহে কান্নাকাটি, প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে ক্ষোভ আর বিদ্বেষ বর্ষণ, শাশুড়ী আর ননদিনীদের জ্বালায় মনের জনের সাক্ষাৎ মেলে না সেই খেদ, তাদের ফাঁকি দিয়ে অভিসার-গমনের উপায় আবিষ্কারের জল্পনা-কল্পনা, সাকী-সহচরীদের কাছে কান্নাকাটি করে গোপনে সাহায্য ভিক্ষা, আর সব শেষে সাকী-সহচরীদের সহযোগিতায় গোপনে মিলনের সুযোগ লাভ—ব্যস্। গান মানে এই সাতটার একটা বা দুটো বা অনেকগুলো।

বিভু মুখ টিপে হাসে। বিমলা অনুর মৌলিক গবেষণা শুনে হেসে বাঁচে না। অঙ্কুও হাসে।

এই হাসির মধ্যেই কেটে যেতে পারত গোটা বছরটা। কেটে যাওয়ার কথা। কিন্তু কাটল না।

আলোর পিছনে ছায়া অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ বুঝি। সেই ছায়া গোটা আলোর উৎসটাই গ্রাস করতে পারে এমন নজিরও বিরল নয়।

গ্রাস করেছিল।

কুমোরপাড়ায় ছোট একটা আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল একদিন। আর গোটা যোগানন্দপুরে তার কালিমা ছড়িয়েছিল।

এই একটা বছরে সলু তার প্রবৃত্তি নিয়ে কতটা এগিয়েছিল, বিচ্ছিন্নভাবে সেটা খুব চোখে পড়েনি কারো। গৃহস্থেরও বদ্ধ দরজার অর্গল ভাঙতে পারে—এমন প্রবৃত্তি। ইতিমধ্যে পাড়ারই এক পড়শীর ঘরে জবার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। জবার মা শহরে স্বামীর ঘর করছে এখন। বাড়িতে মহেশ একা থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে সলুর চোখ দুটো জবা গোটাগুটি খেয়ে গিয়েছিল। সলু চোখ ফেরাতে পারেনি। জবারও দাদুর ঘরের বদ্ধ কড়াকড়িটা বরদাস্ত হয়নি।

একদিন জবা নিরুদ্দেশ। সেই আবিষ্কারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জানা গেল, নিখোঁজ আর একজনও। অনুর ভাই সলু। জবা এক-কাপড়ে ঘর ছেড়েছে। আর, সলু দিদির বাক্সর বহু টাকা হাতিয়ে।

কুমোরপাড়ার লোকদের চোখ-মুখ ধারালো কদিন। সেই মুখে খুন নাচছে। তারা আঁতিপাতি করে খুঁজছে। জবার বাবা খবর পেয়ে এসে খুঁজছে। জবার স্বামী খুঁজছে। খুঁজছে বিভু আর বিভুর লোকজনেরাও। তারা বিমূঢ়। অনু নিস্পন্দ, কাঠ। অঙ্কু স্তব্ধ।

দু'দিন বাদে সকালের দিকে কুমোরপাড়ার পথে কি এক উত্তেজনার আভাস পেয়ে অঙ্কু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। ঠিক সময়েই এলো কি অঙ্কু, নাকি দেরি হয়ে গেল? না, সবে ধরে আনা হয়েছে ওদের শুনছে। বেশি দূরে যায়নি, কাছাকাছি এক গাঁয়ে আত্মগোপন করে ছিল। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে তেমনি করেই ধরে আনা হয়েছে ওদের।

খুন অঙ্কুর মাথায়ও চেপেছে। সেই খুন দেখেই হয়তো জিঘাংসু প্রতিশোধপরায়ণ মানুষগুলোর চেতনা ফিরেছে। প্রবল ধস্তাধস্তি করে শেষ পর্যন্ত সলুকে ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে। মড়ার মত মাটিতে পড়ে ধুঁকছিল সে। সর্বাঙ্গ থেঁতলে গেছে, নাক-মুখ দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত ঝরছে।

অর্ধ-চেতন রোগাটে দেহটা কখনো হিড়হিড় করে টেনে, কখনো আলতো করে পঞ্চবটীতে নিয়ে এলো অঙ্কু। এক হাতে চুলের মুঠি ধরে সবলে টেনে তুলল তাকে। দেখল একটু। পরমুহূর্তে অপর হাতের গাল-বেড়ানো আচমকা আঘাতে ঘরের মধ্যে সাত হাত দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল আধমরা ছেলেটা। ঘরের শিকল তুলে দিয়ে অঙ্কু তক্ষুনি ছুটল আবার।

কুমোরপাড়াতেই কানে এসেছিল, জবাকে পাওয়া মাত্র টুঁটি চেপে ধরে ঘরে নিয়ে গেছে তার দাদু। সকলকে শাসিয়েছে, নাতনীকে কুচি কুচি করে কেটে মাটিতে পোঁতার আগে কেউ যেন তার ঘরমুখো না হয়। যে আসবে তাকেও সে খুন করবে। ভিড়ের মধ্যে জবার বাবা বা স্বামীকে দেখেনি অঙ্কু। জবার শ্বশুরবাড়ির পাড়াসুদ্ধ লোকেরা তখনো দিকে দিকে জবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বোধহয়। খবর পেলে নেকড়ের মত ছুটে আসবে।

মহেশের দাওয়ায় এসে অঙ্কু দেখে চারদিক থেকে দরজা-কপাট বন্ধ। বাইরে বন্ধ

উত্তেজিত মূর্তির জটলা। সকলকে ঠেলে অঙ্কু এগিয়ে এলো। ক্ষিপ্ত হাতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

মহেশ, দরজা খোল। আমি দা-ঠাকুর। মহেশ—

ধমনীতে রক্ত ফুটছে অঙ্কুর। আগের দিনের সেই শক্ত পেল্লায় দরজা ভাঙতে সময় লাগল। তার ওপর ভিতর থেকে বাড়তি অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঘর শূন্য। তিন-তিনটে ঘরই। হঠাৎ এক সময় সকলের চোখ পড়ল খিড়কির দরজাটা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। তার ওধারে ঝোপঝাড়, বিষ-কাটারীর জঙ্গল। তার ওধারে নতুন সড়ক।

অঙ্কু মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিল। সত্রাসে বোবা-মূর্তিগুলির দিকে তাকালো একবার। না, জবার বাবা বা স্বামী নেই এদের মধ্যে। জবার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এখনো খবর পায়নি তাহলে। লোকগুলো কে কি বুঝল জানে না। তাদের জবার স্বামীর ঘরের দিকে যেতে নির্দেশ দিল সে। জবার বাবা আর স্বামীকে খুঁজে বার করতে বলল। বলল, মহেশের হাত থেকে নিশ্চয় ভিন গাঁয়ের ওরাই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে জবাকে।

পঞ্চবটীর দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল সে।...জবাকে নিয়ে মহেশ কতদূর গেছে? কতদূর যেতে পেরেছে? অঙ্কু জানে না। কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে চাইছে, অনেকদূর গেছে, অনেক দূরে যেতে পেরেছে এই ক'ঘণ্টায়—আরও অনেকদিন ধরে অনেক দূরে যেতে পারবে তারা।

পথে বিভুর সঙ্গে দেখা। তারও মুখ শুকনো, চোখে ত্রাস।

কি শুনছি—?

আয়। আব একটি কথাও না বলে অঙ্কু পঞ্চবটীর দিকে নিয়ে চলল তাকে।

ঘর খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিভু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। সলু মেঝেতে পড়ে আছে, জ্ঞান নেই, একেবারে বেহুঁশ। মেঝেতে বক্তের চাপ জমে জমে আছে।

জ্ঞান আর হয়ওনি।

তিন দিনের দিন বিভুদের বাড়িতে প্রবৃত্তির শেষ মাশুল গুনে দিয়ে গেছে সে।

অনু পাথর।

অঙ্কুও।

পুলিসের টানা-হেঁচড়া চালানো যেত। কিন্তু কেউ সে-চেষ্টা করেনি। অনু সে-চেষ্টা করতেও বলেনি। কিছুই বলেনি সে। অঙ্কুর মতামত চেয়েও বিভু জবাব পায়নি কিছু। সে নিস্পন্দ, নির্বাক। বিভুও গণ্ডগোল বাড়াতে চায়নি। জনতার মধ্যে কাকে ধরবে, কাকেই বা টানাটানি করবে? মাঝখান থেকে পাঁক ছড়ানো সার হবে শুধু।

ডাক্তার তিন-তিনটে দিন চিকিৎসার সময় হাতে পেয়েছিলেন। কাজেই মৃত্যুর সম্বন্ধে মামুলী রিপোর্ট দিয়েছেন তিনি। দুর্বল দেহ, মানসিক ভীতি এবং ধকল, সবশেষে জনতার হাতের নিগ্রহ। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার পক্ষে কারণগুলো যথেষ্ট।

একমাত্র জগুয়া চুপ করে থাকেনি। তার চোখ দুটো জ্বলন্ত কয়লার মত ধকধকিয়ে উঠেছে বার বার। অঙ্কুকে বলেছে, বাবুজী, আপুনি শুধু লোকগুলাকে একবার দেখায়ে দেন, আমি একটা একটা করে ওদের মাথাগুলো খসায়ে মা-মণির পায়ের কাছে এনে ফেলি।

অঙ্কুর কানে গেছে কিনা বোঝা যায়নি। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল।

এরপর একমাসের মধ্যে তাকে পঞ্চবটীর নিজের ঘর থেকে বেরুতে দেখা যায়নি বড়। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বিভু পর্যন্ত বহুবার এসে ফিরে গেছে। দেখা হলেও তার দিকে চেয়ে রীতিমত উতলা হয়েছে। এ-সময়ে অনুর যাকে সব থেকে বেশি প্রয়োজন, তারই হাব-ভাব দেখে কখনো অবাক সে, কখনো বিরক্ত।

অনু মুখ বুজে যাতনা সয়েছে। শেষে দুপুরের নিরিবিলিতে নিজেই এসেছে একদিন। এ-সময়ে এ-রকম এক জনের কাছ থেকে অন্তত এই ব্যবহার কেউ আশা করে না। যাতনার সঙ্গে ক্ষোভও কম নয় অনুর, তার ধারণা, মৃত্যু অপেক্ষাও ভাইয়ের অপরাধটাই মানুষটা এখনো বড় করে দেখছে।

কিন্তু দেখামাত্র মুহূর্তের জন্যে অন্তত শোক ভুলে অবাক হয়েছিল অনু। এ যেন সেই মানুষই নয়। সমস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় ক'দিনের মধ্যেও তেল-জল পড়েনি, চোখ দুটো বসা, উদভ্রান্ত দৃষ্টি। বিবর্ণ পাংশু।

অসুখ নাকি তোমার?

অঙ্কু মাথা নাড়ল, না।

অনুর ক্ষোভ গেল। এমন কি শেষে সে-ই সান্ত্বনা দিল, বলল, ও যে বরাত করে এসেছিল তাই হয়েছে, এই প্রায়শ্চিত্ত কপালে লেখা ছিল, তুমি আর কি করবে—তুমি তো ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেই ছিলে। অনু কেঁদে ফেলল।

অঙ্কু চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে একটা, মন চাইছে অনু এক্ষুনি চলে যাক এখান থেকে।

হঠাৎ একদিন ছাত্রদের নিয়ে আর গান নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে চেষ্টা করেছে অঙ্কু। নতুন উদ্যমে দিন দুই কেটেছেও ভালো। কিন্তু তারপর বিস্ময়ের শেষ নেই সঙ্গীতানুরাগী ছাত্রদের। এতবড় গায়ক অঙ্কু গোঁসাই, গান গাইতে গাইতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সুরের জট ছাড়াতে গিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে যায়, কোন্ রাগ গাইছে তা পর্যন্ত ভুলে যায়। গান ছেড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা বন্ধ করে। পণ্ডিত ভাসের ছবির দিকে তাকাতে পারে না।

অনুক্ষণ তাঁরই কণ্ঠস্বর কানে বিঁধছে অঙ্কুর, কানের ভিতর দিয়ে বুকে গিয়ে কাটা-ছেঁড়া করছে।—পাপের সঙ্গে আপস যদি করিস, গুরুর অভিশাপ লাগে যেন, গান যেন সেইখানেই শেষ হয়। পাপ লুকিয়ে গান আমি চাই না।

দুই হাতে নিজের চুল টেনে ছিঁড়তে চায়। সমস্ত ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। অসহ্য তাড়না করে চলেছে নিজেই নিজেকে। মেয়েটাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে নিজেই মারলি? শেষ আঘাতটা তুই-ই দিয়ে সব শেষ করলি?

কে বলল? চমকে উঠে চার দিকে তাকায় অঙ্কু। দরজা জানালা বন্ধ। ওর বুকের ভিতর থেকেই বলছে কে।

পণ্ডিত উপানন্দ বলেছিলেন, রাগ তোর শত্রু। রাগ পাপ। পাপ পুষে গান হয় না—ওই শত্রু তার গলা বেষ্টন করেছে, নিশ্বাস বন্ধ করে মারছে। ওই পাপের বেষ্টন ছিঁড়ে-খুঁড়ে টেনে ফেলতে চেষ্টা করছে গলা থেকে। নিজেকে অবিশ্রান্ত বোঝাচ্ছে। বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে। যত বোঝাচ্ছে, শত্রু তাতো বেশি গলা আঁকড়ে ধরছে।

খবরটা বিভুই জানালো অনুকে। অঙ্কুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার বাড়িতে আনা হয়েছে। মাথায় কিছু একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে তার। অনুর ভিতরের শোকের ছাপটা এরই মধ্যে মোছবার নয়। এক রকম মুখ বুজেই দিন কাটাচ্ছিল সে। তবু এরই মধ্যে সব থেকে প্রিয় ওই লোকটার ব্যবহার ভয়ানক বিসদৃশ লাগত তার। সেই এক মাস আগে অনু নিজেই গিয়েছিল পঞ্চবটীতে, তারপর আর দেখা হয়নি। কিন্তু এ অবস্থা কে ভেবেছে?

অনু ছুটে এসেছে বিভুর বাড়িতে। দেখে একেবারে স্তব্ধ। দেখলে ভয় করে এমন। বিভু সরে এলো। অনু এগিয়ে তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় ডুকরে উঠল, তোমার কি হয়েছে? তুমি এমন হয়ে গেলে কেন?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অঙ্কু বিড়বিড় করে বলল, গুরুর অভিশাপ লেগেছে।

কেন? কেন? কেন? তুমি কি করেছ?

অঙ্কু চমকে উঠে আত্মস্থ হয়েছে যেন। গলা চড়িয়ে জবাব দিয়েছে, আমি কিচ্ছু করিনি, কি আবার করব?

বিভু ডাক্তার এনেছে। কিন্তু ডাক্তার দেখানো সহজ হয়নি। চিকিৎসকের অনুমান, বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ মানুষের অনেক তুচ্ছ কারণে, এমন কি মনগড়া কারণেও এ-রকম হয় অনেক সময়। অনেক চেষ্টা করেও চিকিৎসা তেমন করা গেল না। বাড়িতে ধরেও রাখা গেল না তাকে।

এদিকে পঞ্চবটীর এতবড় প্রতিষ্ঠান যেমন চলছিল তেমনি চলছে। মাসে দুমাসে এক একটা বড় জলসাও হয়। গুণীরা আসেন। অঙ্কু ওই মূর্তিতে আসরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসে, গান করবে। হয়তো ভালোই শুরু করে, কিন্তু তারপরই সব গণ্ডগোল। মনে হয় রাগ-রাগিণীরা সব তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্য ব্যস্ত। অঙ্কুর মনে হয়, পাপমনে ডাকছে বলেই তাদের ত্রাস। পাপের আগুনে তাদের অঙ্গ জ্বলে যাবে, ঝলসে যাবে।

গান হয় না। অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। কেউ কেউ কানাকানি করে, কেউ হাসাহাসি করে, কেউ বা অবাক হয়। যারা জানে না, তারা ভেবে পায় না এই শিল্পীর এত নাম কেন? উদ্যোগী কর্মীরা ধরাধরি করে আসর থেকে অন্যত্র তুলে নিয়ে যায় অঙ্কুকে। শ্রোতাদের কাছে অসুস্থতার কৈফিয়ত দেয়। বারকতক এ-রকম হবার পর অনুগত ভক্তরাই চেষ্টা করে সে যাতে আর আসরে গাইতে না বসে। আলগা প্রশংসায় তাকে ভোলাতে চেষ্টা করে। তার মত শিল্পী হয় না, এ-সব ছোটখাট আসরে তার গাইতে না বসাই ভালো, সে শুধু দেখুক, শুনুক।

দিন যায়, মাস যায়।

বিভু আর অনু চেষ্টার ত্রুটি করেনি, করছে না। কিন্তু তাদেরই সব থেকে বেশি এড়িয়ে চলতে চায় যে, তাকে কেমন করে সুস্থ করে তুলবে তারা ভেবে পায় না। দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে অনু অনেক সময় কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দেখে তাকে। গোড়ার গোড়ায় লোকলজ্জা

ভুলে দৌড়ে নেমে এসেছে। কিন্তু সামনে এলেই হনহনিয়ে চলে যায়, বিরক্ত হয়। নিজের ইচ্ছেয় আসে না বোঝা যায়, কেউ যেন তাকে টেনে নিয়ে আসে। বিভুর মারফৎ অনু পণ্ডিত ভাসের অনেক সন্ধান করালো, কোথায় আছেন তিনি সেই হদিস পেতে চেষ্টা করল। আশা, তাঁকে একবার আনা গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু একেবারে নিখোঁজ তিনি।

বিভুর ভয় ধরেছে। অনু একা পঞ্চবটীতে গেলে বা যেতে চাইলে আপত্তি করে। অবশ্য জগুয়া থাকে সঙ্গে। পঞ্চবটীর ছেলেরাও কাছাকাছি থাকে সব সময়। তবু ঘরে তো থাকে না কেউ। কিন্তু অনু নিষেধ শোনে না। বিভুর কাছে কেঁদেই ফেলে এক একদিন। বলে, বিভুদা, আমি কি করব বলো, সব দিকে এ কি হয়ে গেল আমার।

সেদিনের কথা অনু ভুলবে না, ভুলতে পারে না। পঞ্চবটীতে অবশ্য যায় খুব কমই, গেলেও অনেকদিনই ফিরে আসতে হয়, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ থাকে। সেদিন বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল শুধু। ঘরে ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল সে। ভয়? না, ভয় তার নেই। সে ভয়ের মধ্য দিয়ে কাটাচ্ছে, তার বাড়া ভয় আর কি হতে পারে।

গুরুজীর ছবিটার সামনে অক্ষু হাতজোড় করে বসেছিল। আর বিড়বিড় করে বলছিল কি। অনু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল একটু। সামনাসামনি হলে ভয় পাবারই কথা। কিন্তু অনু কাছে এসে দাঁড়াল। অক্ষু বিষম চমকে উঠল, তারপর সরোষে বলল, কেন তুমি এভাবে আস?

অনু স্থির চোখে চেয়ে রইল খানিক।—কি ভাবে আসব?

আসবে না, আমার কাছে কেউ আসবে না—কি মতলবে আসবে?

অনু নিরুত্তর। চেয়ে আছে। দুই চোখে জল টলটল করছে। অক্ষু তাকাতে পারছে না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল সে।

অনু এক-পা দু-পা করে এগিয়ে ঘুরে তার সামনে এসে দাঁড়াল আবার। কাঁধে একখানা হাত রাখল, অন্য হাতে খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখখানা তার দিকে তুলে ধরল। অক্ষুর কি জানি কি হল। মনে হল, ওই মুখে তার সব আশা, ওই বুকে তার একমাত্র আশ্রয়। হঠাৎই আর্ত আকূতিতে দুই হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল তাকে। তার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল নিজেকে। ওই বুকের তাপে অধরের তাপে হিমশীতল মৃত্যু থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে চাইল।

অনু বাধা দিল না, নড়ল না। তার আশা হল, মানুষটার মধ্যে সুস্থ প্রাণের সাড়া জাগছে।

অক্ষু ফিস ফিস করে বলল, অনু, আমাকে বাঁচাও, আমাকে ছেড়ে দিও না, বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে জমে গেল, সব পাথর হয়ে গেল। আমার গান কই?

বাহুবেষ্টনে অনু আগলেই রাখতে চাইল তাকে। দেহের উষ্ণতা দিয়ে রক্ষাই করতে চাইল। বলল, কি হয়েছে তোমার বলো?

গুরুর অভিশাপ লেগেছে।

কিছু লাগেনি। কি করেছ তুমি? কেন অভিশাপ লাগবে?

অক্ষু চমকে উঠল। হাত দুটো শিথিল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল সে।

কিন্তু অনু ছেড়ে দিল না। নারীর সকল সম্বল দিয়েও এই একজনকে এমন মর্মচ্ছেদী যাতনার গহ্বর থেকে টেনে তুলতে দ্বিধা নেই একটুও। এই মুহূর্তে শুধু এই সম্বলটুকুর কথাই মনে হয়েছে তার। দুই হাতে আরো নিবিড় করে ধরে রাখল তাকে। পরিপুষ্ট অধরের সমস্ত আগ্রহ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটোকে সজীব করে তুলতে চাইল। সমস্ত যাতনা সকল জ্বালা নিঃশেষে শোষণ করে নেওয়ার তাগিদ। তারপর অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি করেছ তুমি?

সবেগে মাথা নাড়তে চেষ্টা করল অচ্ছু।

অধর তাড়নায় অনু আবারও থামিয়ে দিল তাকে। না শুনে সে থামবে না, ছাড়বে না। তারপর আবারও সেই একই প্রশ্ন, কি করেছ তুমি আমাকে বলো, আমাকে বলতে পারো না এমন কি কথা আছে তোমার?

জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে অচ্ছু এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে, কাঁপছে। কুন্তীবাঈয়ের কাছ থেকেও সে এমনি করেই কথা আদায় করতে চেষ্টা করেছিল। কুন্তীবাঈও তাকে আশ্বাস দিয়েছিল, তারপর পায়ের আঘাতে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। ঠেলে সে সত্যি দেয়নি, সেটা আর মনে হল না অচ্ছুর। মনে হল, কোনো মেয়ের বাহু নয়, একটা দড়ি সবলে তার কণ্ঠবেষ্টন করে ছিল এতক্ষণ। উদভ্রান্তের মত বলে উঠল, আমি কিছু করিনি, আমি ভালো আছি। কেন আস তোমরা? কেন আমাকে সন্দেহ করো?

বছর ঘুরে এলো।

যোগানন্দপুরের পথে পথে, শহরের পথে পথে বিকৃতমস্তিষ্ক এক মানুষকে ঘুরে বেড়াতে দেখে লোকে। আড়ালে একজন আর একজনকে আঙুল দিয়ে দেখায়। ওই অচ্ছু গোঁসাই—মস্ত গায়ক ছিল। খুব নাম করেছিল। কিন্তু এই গানই শেষে খেল লোকটাকে, পাগল হয়ে গেল।

কিন্তু পাগল অচ্ছু হতে পারছে না। গোটাগুটি পাগল হলে সব ফুরিয়েযেত। বাঁচত। অফুরন্ত যাতনায় জ্বলে-পুড়ে শুধু খাকই হচ্ছে ভিতরটা, মরছে না তবু। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই—ঘোরে শুধু। আর নিজের মনে সারাক্ষণ বিড়বিড় করে কথা বলে। কেউ সাহস করে কাছে এসে শোনে না, কি বলে সে। বলে, আমার গান কোথায় গেল, আমার গান আমাকে ফিরিয়ে দাও, গান ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে? আমি পাপ পুষে রাখব না, পাপ ঢেকে গান করব না—গান দাও, গুরুজী, অভিশাপ দিও না।

রেকর্ডে রেডিওতে হামেশা নিজের গান নিজের কণ্ঠ কানে আসে। দাঁড়িয়ে পড়ে। কান পেতে শোনে। দুচোখ জলে ভরে আসে। সেই এক অস্ফুট আর্তি, ও কে গাইছে? আমার গান কই? ভগবান, আমার গান ফিরিয়ে দাও। গুরুজী, অভিশাপ দিও না, গান দাও।

পঞ্চবটীর ছেলেরা হঠাৎ একদিন পরিবর্তন দেখল আবার একটা।

প্রতিষ্ঠানের আসন্ন বাৎসরিক উৎসব নিয়ে ব্যস্ত তারা। প্রতিষ্ঠাতাকে বাদ দিয়েই সব বিধি-ব্যবস্থা করতে হয় তাদের। ঘটা করেই তোড়জোড় করছে। এর মধ্যে লোকটা এসে পর পর দুদিন ঘর বন্ধ করে কাটালো। একটা বারের জন্য ঘর খুলল না। ডাকাডাকি করতে ভিতর থেকে একবার শুধু আদেশের স্বরে বলে দিল, তাকে যেন বিরক্ত না করা হয়।

ছেলেরা দরজা ভাঙবে, না বিভুকে গিয়ে খবর দেবে ভেবে পাচ্ছে না।

তৃতীয় দিন খুব সকালে দরজা খুলে গেল। ছেলেরা মনে মনে অবাক। এ মূর্তি যেন ঠিক সেই মূর্তি নয়। কোথায় যেন কি একটা পরিবর্তন ঘটেছে।

অন্বু লোক ডাকিয়ে চুল ছাঁটল। দাড়ি কামালো। তেল-সাবান মেখে চান করল। তারপর দুপুরে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। বড়তলার ত্রিকোণ বাড়িতে এলো যে কেউ জানল না। আধঘণ্টা বাদে তেমনি নিঃশব্দেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর দু' তিন দিন পরিচিতজনেরা শহরের পথে দেখেছে তাকে। সাহস করে কেউ কেউ এবারে কাছেও এসেছে। কিন্তু অন্বু কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

সন্ধ্যার পরে ছেলেদের ডেকে শান্ত মুখে উৎসবের সমাচার শুনল। কি হবে, কারা আসবে শুনল। তারপর বলল, গান এবারে সে-ও গাইবে।

ছেলেরা নীরব। এখন তারা আপত্তি করবে না। উৎসবের দিন যেভাবে হোক নিরস্ত করবে তাকে।

উৎসবের আগের দিন।

দরজা বন্ধ আবার। অন্বু নিবিষ্ট মনে চিঠি লিখছে একখানা। সামনে আর একখানা বড় রেজিস্ট্রি খাম।

পরদিন অর্থাৎ উৎসবের দিন বিকেলের দিকে চিঠি ডাকে দিল, খাম রেজিস্ট্রি করল।

বাৎসরিক অনুষ্ঠানে লোক কম হয়নি।

শিল্পীরা এসেছেন, শ্রোতার ভিড় বাড়ছে। অনুশ্রী আর বিভুও এসেছে। ছেলেদের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠাতার হঠাৎ পরিবর্তনের আভাস পেয়েই সাগ্রহে এসেছে তারা। অন্বুকে দেখে আশায় আশ্বাসে বুক দুরু দুরু তাদের।

এত ধীর এত ঠাণ্ডা এত শান্ত যেন আর তাকে দেখেনি।

কিন্তু আসরে গিয়ে বসা থেকে ছেলেরা তাকে নিরস্ত করতে পারল না। কে জানে কেন বাধাও দিতে পারল না তারা। সর্বাগ্রে বিনা আমন্ত্রণে আসরে উদ্বোধনী ভজন গাইতে বসেছে সে।

বিভু ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে। অনুর সর্বাঙ্গের রক্ত বুঝি মুখে এসে জমাট বাঁধছে। ছেলেরা অসহায়ের মত অপেক্ষা করছে। শ্রোতাদের অনেকেই চেনে অন্বুকে। স্থানীয় শ্রোতারা সকলেই চেনে। কাজেই সেদিক থেকে অস্ফুট গুঞ্জন উঠছে একটা। অনেকে ব্যথিত, অনেকে মর্মাহত, অনেকে বা বিরক্ত। কেন যে ভুলিয়ে বা যা-হোক করে বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষটাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়নি, মনে মনে সেই খেদ আর সেই অভিযোগ তাদের।

পিছনের এক কোণে জগুয়া পর্যন্ত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

তানপুরাটা যে-ভাবে চড়া সুরে বাঁধা হচ্ছে, সেই গম-গমানি কানের পর্দায় ঘা দিচ্ছে। ফলে নিরুপায় তবলচি আর সারেঙ্গীবাদকও তাঁদের যন্ত্র তেমনি চড়া সুরে বেঁধে নিলেন।

সভা স্তব্ধ হঠাৎ। আসর স্তব্ধ। সেই আচমকা ওঁ টঙ্কারে বিষম চমকে নড়ে-চড়ে উঠলেন

অনেকে। গমগমে একটা টানা স্বর চড়তে চড়তে বাতাস ঠেলে, তাঁবু ভেদ করে, সকলের বুকে কাঁপন ধরিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এ কি আর্তনাদ? বিকৃত-মস্তিষ্কের উৎকট ব্যাপার কিছু?

না। সকলের উর্ধ্বে কেউ যেন বসে আছেন, কণ্ঠস্বরটা সকলকে ছাড়িয়ে, বাতাস ছাড়িয়ে, মেঘ ছাড়িয়ে আগে যেন তার কাছেই পৌঁছে দেওয়া দরকার।

...পৌঁছুল। সেইখানে বিলয়।

সেই বিলয় থেকে শুরু। গান শুরু। সৃষ্টি শুরু।

ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং।
শিব আত্মা পরমাত্মা
অন্তরাত্মা ত্বম।
আদি অন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব
রজঃ সত্ত্ব ত্বম।

পণ্ডিত ভাসের সেই সহজ উদাত্ত খাড়া খাড়া চড়া সুর—দাবি নেই, আবেদন নেই, গতি-বিন্যাসের জটিলতা নেই—শুধুই মহিমা বিস্তার। স্তব্ধ নির্বাক শ্রোতাদের বুকের তলায় সেই কান্না গুমরে উঠছে, সেই আলোর ঢেউ উথলে উঠছে।

ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং।
চিদানন্দ মহানন্দ
যতি ছন্দ ত্বম।
শিব প্রভা শিব শোভা
জ্যোতি আভা ত্বম।

অনু কাঁদছে। বিভুর চোখও শুকনো নয়।

পিছনের কোণে জগুয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে।

গান থেমে গেছে। কিন্তু সচেতন নয় যেন কেউ।

মঞ্চ থেকে শিল্পী নেমে আসছে দেখে সকলের চমক ভাঙল। আনন্দ-কলরবের ধুম পড়ে গেল। আরো গানের তাগিদে পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু অচ্ছু আর ফিরে গেল না আসরে। ধীর, শান্ত। আসরের শুদ্ধির কাজটুকুই সে করে দিয়ে এলো যেন। এবারে গান চলুক।

ভক্তরা ছুটে এলো। পায়ের ধুলো নিল। ছেঁকে ধরল তাকে। কিন্তু অচ্ছু নিজের মধ্যে নেই যেন। দু'হাতে আস্তে আস্তে তাদের সরিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে চলল। সামনে দাঁড়িয়ে বিভু আর অনু।

বিভু দুই হাতে সবলে আঁকড়ে ধরল তাকে। অন্তু নির্বাক, শান্ত।

অনু ধরা গলায় বলল, চলো, বাড়ি চলো।

অন্তু বলল, আজ না। তোমরা যাও।

অনু হাত ধরল তার, আজ না কেন? আসর ছেড়ে তুমি কোথায় চলেছ?

কাজ আছে। আজ তোমরা যাও।

কাল আসব?

না। সময় হলে আমি আসব।

কিন্তু—। অনু থেমে গেল। বিভু হাতে চাপ দিয়ে তাকে ইশারা করছে চুপ করতে। ইশারার তাৎপর্য বুঝল অনু। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়, ধৈর্য ধরতে হবে—আর যেটুকু সময় লাগে, দিতে হবে।

অন্তু ঘরের দিকে চলে গেল।

তারাও আর আসরের দিকে ফিরল না। এরপর আবার আসরে ফেরা মিথ্যে।

কেউ জানল না, সকলের অগোচরে সেই রাতের উৎসব-মগ্নতার আড়ালে, পঞ্চবটী পিছনে ফেলে, জঙ্গলের পাশ দিয়ে, কানা দামোদরের ধার ধরে, কে একজন নিঃশব্দে চলে গেল।

কেউ জানল না, পঞ্চবটীর ওই ঘরে সেই একজনকে পরদিন আর দেখবে না কেউ।

পরদিন।

জগুয়ার মুখে খবর পেয়ে বিভু ছুটল অনুর ইস্কুলের দিকে। দোতলায় উঠে গেল। দোতলায়ই অনু থাকে। ঘরের বাইরে থেকে গোটাকতক মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, ফিস-ফিস জটলা করছে।

ঘরে ঢুকে বিভু হতভম্ব।

অনু মেঝেতে বসে আছে মূর্তির মত। বিবর্ণ, পাংশু, নিশ্চেতন প্রায়। তার সামনে খোলা দলিল একটা। আর একটা চিঠি।

দলিলটা ত্রিকোণ বাড়ির। বাড়ির মালিক বাড়িটা ইস্কুলের প্রয়োজনে অনুর নামে লেখাপড়া করে দিয়েছে।

চিঠিও তারই। অন্তুর।

গুরুর কথা লিখেছে। গুরুর শেষ আদেশের কথা। তারপর আদ্যোপান্ত সলুর মৃত্যুর কথা। একটা কথাও গোপন করেনি। লিখেছে, তার আঘাতই ওর মৃত্যুর শেষ আঘাত কিনা জানে না। চরম আঘাত কিনা জানে না। হয়তো তাই....। তবু সেটা কতবড় অপরাধ তার, সেটাও জানা নেই। তার থেকে অনেক বড় অপরাধ সে গোপন করে ছিল, সব হারাবার ভয়ে সত্য গোপন করে সে বুকের মধ্যে পাপ পুষেছিল। পাপ পুষেই সব হারিয়েছিল। পাপ লুকিয়ে গান আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল।

আর তা করবে না।

পনের

*   *   *   *

...পঁচিশ বছর পরের এই দিন। পঞ্চবটীর পঞ্চবিংশতি উৎসবের এই তমোঘন রাত্রি। সেই অনুষ্ঠানের ওই সন্ন্যাসীকে বিভূতিবাবু তখন চেনেননি, পরে চিনেছেন। অকস্মাৎ প্রকৃতির সকল স্তব্ধতার মাঝে ওই কণ্ঠস্বর কানে আসতে বুঝেছেন।

সেই অনুষ্ঠানের ওই সন্ন্যাসীকে তখন চেনেননি অনুশ্রী দেবীও। অনুষ্ঠানের আসনে বসার পর তাঁর অব্যক্ত অস্বস্তির কারণ নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় তখনো। ওই কণ্ঠস্বর শুনে তিনিও পরে বুঝেছেন, উত্তেজনায় আর মর্মছেঁড়া যাতনায় আর্তনাদ করে উঠেছেন। রক্তচাপের আধিক্যে তারপর জ্ঞান হারিয়েছেন।... কিন্তু জ্ঞান তো আবার হবে। বিভূতিবাবু তাঁকে কি বলবেন, কি বোঝাবেন? ডাক্তার সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, আবার উত্তেজনার কারণ ঘটলে সামলানো শক্ত হবে।

অন্ধকার রাতে সকলের অগোচরে মোটরে জীবননাট্যের এই শেষ পাট চুকিয়ে এসে ফেরার পথে গাড়িতে বসে বিভূতিবাবু তাই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন কি করবেন। দীর্ঘকাল রক্তচাপে ভুগে, আর এই রাতের অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে এভাবে অনুশ্রীর জ্ঞান হারানোটা কি আশীর্বাদ ওপরওলার? কে যেন বিভূতিবাবুর মনের তলায় এই ইশারাই করল। একটা পথ যেন পেলেন তিনি। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

স্কুল-ফটকের সামনে গাড়ি থেকে নামলেন যখন, ভোর হয়ে এসেছে। রাতে ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে নীচে নেমে সোজা এসে গাড়িতে উঠেছিলেন। এই ফিরলেন।

পা টিপে দোতলায় উঠলেন। ঘরের সামনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে জগুয়া বসে আছে।

ঘরের মধ্যে একবার চুপি চুপি দেখলেন বিভূতিবাবু। অনুশ্রীর জ্ঞান হয়নি তখনো। হয়তো বা ঘুমুচ্ছেন। মাথার কাছে অনুগত মেয়ে দুটি ঝিমুচ্ছে। তাদের ওপর দিয়েও মানসিক ধকলটা কম যায়নি।

তেমনি পা টিপেই বিভূতিবাবু নীচে নেমে এলেন আবার। শয্যায় এসে বসলেন। নিজেই যেন মোহগ্রস্ত হয়ে আছেন এখনো।

...যার খোঁজে গিয়েছিলেন বিভূতিবাবু, দেখা পেয়েছিলেন। দু'ঘণ্টা পরে হলেও মোটরে অনুসরণ করে তার সাক্ষাৎ পেতে দেরি হয়নি খুব। ড্রাইভার সামনে এগিয়ে লোকটির পথ আগলেই গাড়ি থামিয়েছিল...।

পঞ্চবটীর পঁচিশ বছরের উৎসবের সেই সন্ন্যাসীটি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। বিভূতিবাবু নেমে এসেছিলেন। আকাশ মেঘে কালো। আসন্ন উষার আলোরও আভাসমাত্র নেই।

নির্বাক দৃষ্টিবিনিময়। কিছুক্ষণ...। অনেকক্ষণ যেন।

...অচ্চু?

অচ্চু মরে গেছে। শান্ত জবাব।

মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠেছিলেন বুঝি বিভূতিবাবু। বলেছিলেন, মরে গিয়ে থাকলে সে

আবার এলো কেন? কি দেখতে এসেছিলে তুমি? কেন চলে যাচ্ছ?

নির্লিপ্ত গম্ভীর জবাব শুনলেন, সেখানে প্রেতের তর্পণ হচ্ছে। তর্পণে প্রেত ফিরে আসুক কেউ চায় না। প্রেতের মুক্তি চায়। মুক্তি পেয়েছি।

কিন্তু অনু? নিজে মুক্তি পেয়ে তাকে কি দিয়ে গেলে? সে কি পেল?

সে-ও তর্পণ করছে। সত্যি সত্যি প্রেত ফিরে এলে সে বিড়ম্বিত হবে। তার ব্যথার আশ্রয়টাও যাবে।

বিভূতিবাবু স্তব্ধ, বোবা যেন। শুধু মনে হয়েছে কোথায় যেন একটা মর্মান্তিক সত্য নিহিত কথা ক'টার মধ্যে। তবু অস্ফুটস্বরে বলেন, কিন্তু তার এ-দশা তুমি করলে কেন?

জবাব না দিয়ে লোকটি আঙুল দিয়ে আকাশটা দেখিয়ে দিলেন শুধু।

কিন্তু তুমি এসেছিলে কেন?

একটু থেমে জবাব দিলেন, শেষ টান থেকে এই মুক্তিটুকু নিতে বোধ হয়...।

আর একটি কথাও বলতে পারেননি বিভূতিবাবু। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোকটি অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছেন একটু একটু করে। চাপা কণ্ঠস্বর শুধু কানে এসেছে, ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং...

সকাল তখন সাতটা। একটি মেয়ে এসে খবর দিল, মা-মণির জ্ঞান হয়েছে, তাঁকে খুঁজছেন।

বিভূতিবাবুর তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। উপরে উঠে এলেন। অনুশ্রীর মুখে আবারও গত রাতেরসেই রকমই আর্ত প্রত্যাশা। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, গিয়েছিলে? দেখা পেয়েছ?

জবাব না দিয়ে বিভূতিবাবু গম্ভীর মুখে চেয়ে রইলেন একটু। মেয়ে দুটিকে ঘর থেকে যেতে ইশারা করলেন। দরজার কাছে জগুয়া দাঁড়িয়ে।

অনুশ্রী আবারও বলতে যাচ্ছিলেন কি, তার আগেই বিভূতিবাবু প্রায় বিরক্ত মুখেই ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কার দেখা পাব?

অনুশ্রীদেবী অসহিষ্ণু তাড়নায় উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। বাধা পেয়ে পারলেন না। বলে উঠলেন, আমি যে তাকে পঞ্চবটীতে দেখেছি বিভুদা, রাতে নিজের কানে তার গান শুনেছি— তুমি বিশ্বাস করছ না? সেই গান সেই গলা আমি যে নিজের কানে শুনেছি বিভুদা—

বিভূতিবাবু গায়ে না মেখে হালকা জবাব দিলেন, আর কিছুদিন গেলে আরো অনেক কিছু দেখবে, অনেক কিছু শুনবে—এখন বেশি কথা বলো না, চুপ করো।

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন অনুশ্রী, না—ভুল নয় বিভুদা, ভুল হতে পারে না, তুমি শুনলে না কেন? তুমি তো এখানেই ছিলে, তোমারও তো শোনার কথা!

বিভূতিবাবু ধমকেই উঠলেন এবারে। বললেন, শুনব, আর কিছুদিন তোমার পাল্লায় পড়লে আমাকেও শুনতে হবে। চুপ করো এখন, এক্ষুনি ডাক্তার এসে বকাবকি করবে। একটু থেমে আবার বললেন, কেউ আসেনি, তুমি কিছুই দেখোনি, কিছুই শোনোনি, বুঝলে? কালও

ভুল বকে বকে শেষে অজ্ঞান হয়েছ, আজও সকাল না হতে সেই রকমই শুরু করেছ। মা-মণির কাণ্ড দেখে তোমার এখানকার এই মেয়ে দুটো পর্যন্ত হতভম্ব।

অনুশ্রীদেবী চুপ। সত্যিই সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে তাঁর। বিমূঢ় মুখে ফ্যালফ্যাল করে বিভূতিবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ দরজার দিকে চোখ গেল বিভূতিবাবুর। আর সঙ্গে সঙ্গে চকিত শঙ্কার ছায়া পড়ল মুখে।

দরজার গায়ে জগুয়া দাঁড়িয়ে। সে শুনেছে সব। তার চোখেমুখে কি কথা যেন উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিছু বলার জন্য উদগ্রীব সে। 'সেকেটারী' বাবু এমন অদ্ভুত কথা বলছেন কেন জগুয়া ভেবে পাচ্ছে না। সে যেন চেঁচিয়ে বলতে চায়, মা-মণি ভুল করছেন না, ভুল বকছেন না। যা বলছেন ঠিক। কেউ একজন এসেছিল। সেই গান, সেই গলা সে নিজের কানে শুনেছে, 'সেকেটারী' বাবুরও তো শোনার কথা—

বিভূতিবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দরজার দিকে এগোলেন। জগুয়াকে ডাকলেন ঠাণ্ডা মুখে, যেতে যেতে বললেন, শুনে যাও, একটা কাজ সেরে এসো চট্ করে—

সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন বিভূতিবাবু। জগুয়া পিছনে। জগুয়া এখনো কাজের কথা শোনার আগে কিছু তাঁকে বলতে চাইছে। কিন্তু 'সেকেটারী' বাবুর স্থির তীক্ষ্ণ দুই চোখে চোখ পড়তে হকচকিয়ে গেল কেমন।

বিভূতিবাবু যেন একটি একটি করে শব্দ নির্গত করলেন মুখ দিয়ে, বললেন, ডাক্তারবাবু কাল বলে গেছেন তোমার মা-মণির এতটুকু উত্তেজনা বাড়লে ক্ষতি হবে। সব শেষও হয়ে যেতে পারে। শুনেছ?

বিমূঢ় মুখে জগুয়া ঘাড় নাড়ল। শুনেছে।

বিভূতিবাবু চুপচাপ দেখলেন একটু। তারপর তেমনি মৃদু ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রাতে এ-দিক দিয়ে গান গাইতে গাইতে গেছে কেউ? তুমি শুনেছ কিছু?

জগুয়া চেয়ে আছে। তার কালো মুখখানা তেলতেলে হয়ে উঠছে একটু একটু করে। চোখের কালো তারা দুটো চকচক করছে।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। শোনেনি।

মানুষের দরবারে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

—পরনাম ঠাকুর সাহেব...

—নমস্তে মহারাজ...

—গোড় পড়ি লম্বরদার (মোড়ল) সাহাব...

অনুগত বা মাথা-বিকনো গাঁয়ের পড়শীদের এই বিনম্র সম্ভাষণ ব্রিজমোহনের কানের পর্দা ছাড়িয়ে মগজ বা বুকের দিকে বিশেষ এগোয় না। শুনে শুনে এমনি অভ্যস্ত যে, কে প্রণাম জানালো সব সময় লক্ষ্যও করে না। গাঁয়ের প্রধান 'পঞ্চ'-এর প্রধান আর গাঁয়ের ভূস্বামীদের মধ্যে সব থেকে রইস মানুষ হিসেবে এই স্তুতি তার প্রাপ্য। ওরা ওদের কর্তব্য করে। কেউ না করলে সেটা চোখে পড়তে পারে। করলে সেটা আর চোখে পড়ার মতো কি? আর কর্তব্য করবে না এমন হিম্মতই বা কার? এর মধ্যে ছোট জাত বা অচ্ছুত কেউ সামনে পড়ে গেলে শশব্যস্তে সেই লোক নিজেই তার ছায়ার নাগাল থেকে সরে দাঁড়িয়ে আনত হয়। তারা নিজেরাই জানে মহারাজের ছায়া মাড়িয়ে ফেললে সেটা প্রায়শ্চিত্ত করার মতোই পাপ বা অপরাধ।

কিন্তু গাঁয়ের এই সব নিচের সারির মানুষেরা তাদের যে মাথা কাটার ক্ষমতা ধরে এমন লোকটাকে ইদানীং যেন একটু সদাশয় আর উদার দেখছে। যেমন আজও দেখল। একজনের দিকে মালিক বড় বড় দু' চোখ তুলে তাকালো, প্রসন্ন চাউনিতে শুধু ঠোঁট নয়, পরিপুষ্ট কুচকুচে কালো পাকানো গোঁফজোড়াতেও একটু বাৎসল্যের হাসি চিকিয়ে উঠল। পরের জনকে মাথা নেড়ে প্রতি-নমস্কারের স্বীকৃতি দিল। তার পরের জনকে সদয় মুখে ফিরে রাম রাম বলল। আর পায়ে পড়ি বলে যে-লোকটা নতি জানালো সে অচ্ছুত, মালিক তাকে কিনা খুব মোলায়েম করে আর্শীবাদ জানালো, ফিরে বলল, হামারা আশিস তুমহারা পর রহল্অ।

হুজুর পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পরেও লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকে দেখছিল।

প্রবল-প্রতাপ মহারাজের এই সদয় আচরণ দেখে তারা অবাক হয়, আবার ঘাবড়েও যায়। যারা ভুক্তভোগী তারা জানে কারো সর্বনাশ করার বা ঘাড় মটকাবার মতলব আঁটলে ঠাকুর ব্রিজমোহনের ঠোঁটের ফাঁকে, গোঁফজোড়ায় আর চোখের তারায় মোলায়েম হাসির ঝলক দেখা যায়, মুখে অমায়িক বচন শোনা যায়। তখন মনে হয় মানুষটার ভিতরে একখানা ছুরির ফলা ঝিকমিক করছে। যার দিকে অমন নজর তার তখন হৃৎকম্প। জানে মরবে কি ঘর পুড়বে ; কি সুডৌল মেয়ে বা বউয়ের ইজ্জতে টান পড়বে এই আশঙ্কায় কণ্টকিত। ওদের মতো লোকের ঘরে সুঠাম সুশ্রী মেয়ে বউ থাকাটাও অভিশাপ। রাশভারী ভূস্বামী ব্রিজমোহনের কার ওপর নজর লাগল সেটা এক ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাক-পক্ষীরও জানার উপায় নেই। তার ভোগের সুড়ঙ্গ-পথ নিশ্ছিদ্র। কিন্তু বশম্বদ ইয়ার-বকশী এমন কি নিজের দামাল ভাইপো বাবুয়ার ভোগের ব্যাপারেও এই ঠাকুরসাহেব উদাসীন একটুও নয়। তাদের নজরে পড়লেও সুশ্রী মেয়ে বউয়ের ইজ্জত ঘরের মরদের হাতে থাকা কঠিন। বেশি জানাজানি কানাকানি না হলে জানোয়ারদের ভোগের আগুনে ইজ্জত আহুতি দিয়ে কেউ নিঃশব্দে ফিরে আসে, মুখ বুঁজে ঘর করে বা ঘরে থাকে। তাদের মরদেরাও বুদ্ধিমানের মতোই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। এটা তারা

ওপরওয়ালার মার ভবে। আরো বড় মার, এ-রকম ঘটনায় কাউকে নিয়ে নিজেদের মধ্যেই বেশি চেঁচামেচি হৈ-চৈ পড়ে গেলে সেই মেয়ে বা বউয়ের আর ঘরে ফেরা হয় না। ভোগের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা তাকে কোঠে বাড়ি অর্থাৎ পতিতালয়ে চলে যেতে হয়।

দুর্গ্রহের মতো এমন লোকের হঠাৎ দিল বদল হয়ে গেল এ এই ছুপা গাঁওয়ের কোন গরিব অচ্ছুত বা মেহনতী মানুষ বিশ্বাস করবে! আবার এই নরম হাব-ভাব আচরণ গাঁও-ভর মানুষের প্রতি হুঁশিয়ারির হুমকিও তো ভাবা যায় না। গ্রামসুদ্ধু মানুষের সে সর্বনাশের মতলব আঁটছে এ-ই বা হয় কি করে! দু'জন পাঁচজন তো নয়, খুব ছোট, ছোট আর মাঝারি সব স্তরের লোকের ওপরেই তার পাথুরে বুকে যেন স্নেহের দূর্বা-ঘাস গজিয়েছে। আগে এই সব লোক মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে নতি জানালেও দাঁড়ানো দূরে থাক, মুখের দিকে চেয়েও দেখত না। সেই লোকই কিনা এখন প্রণাম নমস্কার রাম রাম বা গোড়-পড়ির জবাবে ডাগর দু'চোখ তুলে তাকায়, স্নেহের ভাব উপচে ওঠে, মিঠা মিঠা হসে, অল্প অল্প মাথা নেড়ে পাল্টা সম্মান জানায়, এমন কি কারো ভাগ্যে থাকলে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার ঘরের কুশল খবরও নেয়।

এই নিয়ে চিরদিনের ভাগ্যহীন মানুষদের নিজেদের মধ্যেই আলোচনা হয়, জটলা হয়। ভয়ংকর এই মানী জনের হঠাৎ এমন ভোল-বদল কেন? ইলিকশন না কি বলে তাও তো আর চার বচ্ছরের মধ্যে নেই শুনেছে। এই তো গেল বছরে বেশ শোরগোলের মধ্যে সেটা হয়ে গেল। ইলিকশন মানে ভোটের লড়াই। গাঁয়ের লোকেরা এ লড়াই আরো দু'একবার দেখেছে। বুড়োরা আরো বেশি দেখেছে। কিন্তু গেল বারের মতো উত্তেজনা আর কখনো দেখা যায়নি। আগে আগে যা হয়েছে তাতে খুব একটা হৈ-চৈ ছিল না। গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে কে ভোটের কাগজে ছাপ মারল আর কে ঘরে বসে থাকল তা নিয়েও কারো খুব মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু গেল বারে যে গরম কাণ্ডখানা হয়ে গেল তা আর কখনো হয় নি। এই লড়াই ছিল মামা-ভাগ্নের লড়াই। ঠাকুর ব্রিজমোহনের সঙ্গে তার নিজের ভাগ্নের লড়াই। সেই একটা সময়ে ব্রিজমোহনের নরম মুখ দেখেছিল আর মিষ্টি কথা শুনেছিল সকলে। কেবল এই ছুপা গাঁওয়ে নয়, আশপাশের গ্রামগুলোর অচ্ছুত পাড়ায় পর্যন্ত তাকে টুঁড়তে দেখা গেছে। আর তার মুখে তখন আশমানের চন্দা এনে দেবার মতো আশার কথাও শোনা গেছে। বেশি ভোটের ছাপ পেয়ে গাঁয়ের মানুষদের হয়ে সে 'ছেম্ব্লির মেম্বর' হয়ে যেতে পারলে তাদের এত কালের জলের কষ্ট দূর হবে, সব অচ্ছুত পাড়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে সে দু'তিনটে করে টিপকল বসানোর টাকা আদায় করবে, একটা দুটো পুকুর কাটার ব্যবস্থাও হবে, চাষের মজুরির হার নিয়ে আর কোনরকম গণ্ডগোল হবে না—এমন আরো কত ভালো ভালো কথা।

...বিশ্বাস করুক বা না করুক গাঁয়ের মানুষদের ভোটের কাগজে ছাপ মেরে বাক্সে ফেলে আসতে হয়েছে। না গিয়ে উপায় কি, ঠাকুর সাহেবের পিয়ারের ভাতিজা বাবুয়া আর তার সাগরেদরা সবাইকে ছাগল-গোরুর মতো ভোটের জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, ভোটের কাগজে ছাপ মারিয়ে এনেছে। বাবুয়া হুকুম করলে যাবে না কার কাঁধের ওপর এমন একের বেশি মাথা আছে। বাবুয়া হল ব্রিজমোহনের ভূমি-সেনা দলের চাঁই, গাঁওভর মানুষের ত্রাস। চাচার মতো তার মুখে অত নরম কথা আসে না। সে বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল, চাচার হয়ে ভোটের কাগজে ছাপ মারতে যে যাবে না তার 'ভাগমে আগ লা-গ-বো।'

এমন হুমকির ফলে আশি বছরের বুড়োবুড়িকে পর্যন্ত ভোট বাক্সের দরজায় লাইন দিতে হয়েছে। সেই ভোটের লড়াইয়ে ব্রিজমোহন নিজের ভাগ্নের কাছে হেরে যেতে পারে ছুপা গাঁওয়ের অচ্ছুত বা খেটে-খাওয়া গরিব মানুষদের তা কল্পনার মধ্যেও ছিল না। তারা হাঁ-মুখ করে শুনেছে লড়াইয়ে ব্রিজমোহন হেরেছে আর তার ভাগ্নে পবনকুমার জিতেছে। এই ছুপা গাঁওয়েরই ছাওয়াল বটে পবনকুমার, কিন্তু থাকে পাটনায়। অনেক লিখি-পড়ি জানা মরদ, আর হিম্মতও তেমনি। তার দল নিয়ে মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসে, ডাকলে সাহস করে বেশি লোক আসবে না জানে, তাই নিজেই মহল্লায় গিয়ে 'মিটিন' করে, মুখে চোঙা লাগিয়ে গরিবদের দিলভরি কথা শোনায়, পাওনা বুঝে নেবার জন্য রুখে দাঁড়াতে বলে, জুলুমবাজ মাতব্বরদের শাসায়, হুঁশিয়ারি দেয়। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আশপাশের কত গ্রামে বড়লোক ভূস্বামীদের পোষা ভূমি-সেনাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে কত রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেল, কত গরিবের তাজা প্রাণ গেল, কত জনকে ঘরে আগ লাগিয়ে তারা পুড়িয়ে মারল। পাটনা তো মাত্র পঞ্চাশ-ষাট সত্তর কিলোমিটার দূরে, কিন্তু সরকারের নিদ্ টোটে না, অনেক পরে সরকারি মুরুব্বিদের যদিই বা কেউ আসে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেয়, কোনো গোল নেই সব ঠাণ্ডা এখন। যা হয়ে গেছে সেটা জাত-পাতের খুনোখুনি নয়, চাষী-মজুরদের সঙ্গে ভূমির মালিকদের ফয়সলার খুনোখুনিও নয়— কেবল আপনা আপনা অলগ অওর ছুট দুশমনির ছোট ব্যাপার। কিন্তু প্রত্যেক গাঁয়ের গরিবরাই জানে, যে-সব নৃশংস ব্যাপার ঘটেছে আর এখনো মাঝে মাঝে ঘটছে তা ছোট ব্যাপার কিছু নয়।...যেখানেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেছে, আগুন জ্বলেছে, দল নিয়ে সেখানে ছুটে গেছে কেবল ব্রিজমোহনের এই ভাগ্নে পবনকুমার। তারপর পটনায় ফিরে গিয়ে সে ঝড় তুলেছে— গ্রামে যে খবরের কাগজ পড়তে পারে তার চারদিকে গোল হয়ে বসে শ্রমিক-মজুর-অচ্ছুতরা সে কি বলে বা বলছে শোনে, আর তাই বিশ্বাসও করে।

...এই ছেলেটা শিগগীরই একদিন কোনো না কোনো ভূ-স্বামীর ভূমি-সেনাদের হাতে জান খোয়াবেই ধরে নিয়ে এ-দিককার অনেক গাঁয়েরই গরিব মানুষদের বুক ঠেলে চাপা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ঠেলে বেরিয়েছে। ছুপা গ্রামের অচ্ছুত আর গরিবরা প্রাণের ভয়ে ভোটের কাগজে ব্রিজমোহনের নিশানায় ছাপ দিয়ে এলেও লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত এমন জাঁদরেল মামাকে হারিয়ে ওই ভাগ্নেই জিতল দেখে ভিতরে ভিতরে কত যে খুশি হয়েছে তারাই জানে। কিন্তু বাপরে বাপ, এ কি অতি আপনার জনকেও জানতে বা বুঝতে দিতে আছে! জানা-জানি হলে কেউ জানে বাঁচবে!

...ভাগ্নের কাছে ভোটের লড়াইয়ে হেরে ব্রিজমোহন নরম হয়েছে বা তার মতি-গতি স্বভাব বদলেছে এমন আদৌ নয়। উল্টে তার সেই থমথমে মুখ দেখে ত্রাসে বুক কেঁপেছে সকলের। আর তার আদরের ভাতিজা বাবুয়া সকলকে একরকম শাসিয়েই রেখেছিল, এ গাঁওর কেউ তার কাকার সঙ্গে বেইমানি করেছে প্রমাণ হলে সে যেন তার দিন গোনে।

...ভাইপো বাবুয়া আর ভাগ্নে পবনকুমার দু'জনেই প্রায় সমান বয়সী। বছর তিরিশ একত্রিশ হবে দু'জনারই বয়েস। একজন বড় ভাইয়ের মা-বাপ-মরা ছেলে, আর একজন বড় বোনের। কিন্তু কত তফাৎ দু'জনের! একজন হাতে মাথা কাটে, অন্যজন গরিবের সেই মাথা বাঁচানোর জন্য নিজে মাথা বাড়িয়ে দেয়।

...কিন্তু আশ্চর্য, গত চার পাঁচ মাস ধরে ব্রিজমোহনেরই শুধু হাবভাব নরম বা উদার দেখছে না ছুপার মানুষ, তার ওই দয়ামায়াশূন্য ভাতিজা বাবুয়ার হামলা আর হুমকিও যেন কিছুটা ঠাণ্ডা এখন। মাস কয়েক ধরে তারও দাপটে একটু ভাঁটা পড়েছে। অতর্কিতে যখন-তখন যেখানে-সেখানে হানা দেওয়া কমেছে। আশ-পাশের অনেক গাঁয়ের লোকই সর্বদা তার আর তার ভূমি-সেনা দলের ভয়ে কাঁটা। গরিবেরা তাদের ক্রোধের শিকার, নয়তো লোভের শিকার। তারও স্বভাব বদলেছে আর চরিত্র বদলেছে এ কখনো হয় নাকি। বিষের থলে থেকে বিষ টেনে নেওয়া সম্ভব হলে কেউটে-গোখরোর মতো ভয়ঙ্কর সাপও নাকি আবার বিষ না গজানো পর্যন্ত মিইয়ে থাকে। এই চাচা-ভাতিজারও তেমনি কিছু একটা হয়েছে মনে হয়। কিন্তু কি-ই বা হতে পারে? ছুপার বাতাস বদলে যাবার মতো কিছু তো ঘটেনি, আর পুনপু নদীর জলও একই রকম বইছে।

...মাস ছ'সাত আগে পঞ্চ-এর খুব বড় একটা বৈঠক অবশ্য বসেছিল মহাবীরজীর মন্দিরের সামনের শালতলার মস্ত আঙিনায়। পঞ্চ নয়, সরপঞ্চ বলা যেতে পারে সেটাকে। এমনি বৈঠকের থেকে অনেক বড় ব্যাপার। পঞ্চের ছোট-বড় বৈঠকই ওখানে হয়। সেই বিচার সভায় হাজির থাকার হুকুম এলে অচ্ছুত অথবা গরিব চাষী মজুররা ভয়ে কাঁপে। কোন্ অপরাধে কার ঘাড়ে কোপ পড়বে বলে এই তলব কেউ জানে না। পঞ্চ-এর পাঁচ মাতব্বরকে পাঁচ পাঁচটা জ্যান্ত বাঘ মনে করে গাঁয়ের সাধারণ মানুষেরা। এদের আসল মোড়ল বা মাথা ব্রিজমোহন তো বটেই, কিন্তু পঞ্চ-এর বৈঠকে সে কখনো মুরুব্বির আসনে বসে না। বৈঠকের সেই আসন মন্দিরের প্রধান সেবক জনার্দন পূজারীর জন্য বাঁধা। টাকা আর প্রতিপত্তির জোরেই ব্রিজমোহন "ঠাকুর সাহেব"। গরিব গ্রামবাসীদের মুখে ওটা মস্ত মর্যাদার সম্ভাষণ। কিন্তু আসলে সে ঠাকুর নয় ছত্রী। সব জাতকে টেক্কা দিতে পারে এমন উঁচু বর্ণের ছত্রী নাকি। পঞ্চ-এর বৈঠকে মুরুব্বির আসন সে যে জনার্দন পূজারীকে ছেড়ে দেয় এটা তার শিক্ষা ভদ্রতা আর বিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সকলেই জানে, জাত-পাতের গুরুঠাকুর ওই জনার্দন পূজারী ব্রিজমোহনের হাতের পুতুল। নিজে সাধু সেজে তাকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কলকাঠি নাড়ার সুবিধে। পরের দু'জন মহাবীর প্রসাদ আর জগদেও মিশির। ব্রিজমোহনের পরে দু'জনেই এরা শাঁসালো জোতদার। আর পঞ্চ-এর পঞ্চম মাতব্বরটি হল ইট সিমেন্ট চুন সুরকি আর লোহালক্কড়ের শাঁসালো কারবারী গণপত লালা। এই তিনজনও ব্রিজমোহনের পিয়ারের মানুষ, এদেরও সে-ই পঞ্চ-এ টেনেছে।

...তা এবারের মতো মহাবীরজীর মন্দিরের সামনে পঞ্চ-এর এত বড় বৈঠক অবশ্য গাঁয়ের মানুষ শিগগীর দেখেনি। সেটা কোনো বিচার বিধানের বৈঠক ছিল না। সেই বৈঠকে গাঁয়ের সমস্ত মহল্লার সর্দার আর তাদের সাগরেদদের ডাক পড়েছিল। এমন কি খেটে-খাওয়া সর্দারনী আর অচ্ছুত পাড়ার বুড়ো আধ-বুড়ো মোড়লরা আর তাদের বউরাও বাদ পড়েনি। পরে অবশ্য এরকম একটা বৈঠকের কারণ সকলেই বুঝেছে। গত দু' আড়াই বছর ধরে গ্রামে গ্রামে চাষী মজুরদের ওপর ভূমি-সেনাদের অকথ্য অত্যাচারের খবর দিল্লিতে বড় সরকারের কানেও পৌঁছেছে। জর্জরিত শোষিত মানুষরাও নিরুপায় হয়ে কোথাও কোথাও পাল্টা বিদ্রোহ করেছে, লাহসুনায় একজন অত্যাচরী ভূস্বামীকে খুন করেছে। তার জবাবে ভূমি-সেনারা সেখানে খুনের হোলি খেলেছে আর আগ লাগিয়ে দেওয়ালির রোশনাই ছুটিয়েছে, লুঠ আর ধর্ষণের উৎসব

লাগিয়েছে। মাসাউরহি আর জাহানাবাদে চাষী মজুরদের প্রতিবাদের জবাবে ভূমি-সেনারা রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে। এইসব খুনের সঙ্গে ধর্ষণেরও অবধারিত যোগ—যুবতী মেয়ে বউ ছেড়ে কিশোরীদেরও রেহাই নেই। কত জায়গায় কত হরিজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পাটনার কাছেই বানওয়ারা গ্রামে পাঁচজনকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। এ-সব খবরও দিল্লির বড় সরকারের কানে তোলার লোক আছে গ্রামবাসীরা জানত না। কিন্তু দেখা গেল আছে। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে নাকি এই সরকারের একটু টনক নড়েছে। তাই তত্ত্ব-তল্লাসি শুরু হয়েছে। গ্রামের মাতব্বরদের ডেকে বৈঠক বসছে, তাতে চাষী-মজুর-হরিজন প্রধানদের ডাকা হয়েছে। সরকারের কর্তা-ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত। গরিবদের নালিশ আর অভিযোগ শুনতেই তাদের আসা, তদের অসুবিধের কথা জানতে আসা, কারো ওপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন হয় কিনা খবর নিতে আসা।

যাদের ডাকা হয়েছিল সকলেই তারা সেই সভায় গিয়েছিল বইকি। সকলকে এনে হজির করার দায়িত্ব পড়েছিল ব্রিজমোহনের ভাতিজা বাবুয়ার ওপর। না গিয়ে পারে! সরকারের কর্তারা তাদের অভয় দিয়ে বলেছিল, সত্যি কথা বলার জন্য কারো ওপর কোনরকম নির্যাতন হবে না এই দায়িত্ব সরকারের। অতএব যার যা বলার নির্ভয়ে বলতে পারে। জনার্দন পূজারীর আগে থাকতে শেখানো বুলি তারা নির্ভয়েই বলে এসেছে। চাষী মজুররা তাদের ন্যায্য পাওনাই পাচ্ছে, এখানকার ভূস্বামীরা তাদের ওপর সদয়, ভূমিসেনারাও গরিবদের স্বার্থই দেখে, তাদের পাওনার ওপর ভাগ বসায় না বা কম মজুরীতে কাউকে কাজ করতে বাধ্য করে না। অচ্ছুতরাও এক বাক্যে স্বীকার করেছে, এই গাঁয়ে জাত-পাত নিয়ে কোনো গোল নেই, হামলা নেই—যেটুকু সংস্কার সেটুকুই কেবল আছে, বিপদে আপদে ঠাকুর মহারাজ মালিক আর লম্বরদার সাহেবরা আপনার জনের মতোই তাদের ওপর সদয়!

ব্যস, সেই প্রহসন সেখানেই শেষ। ওই 'মিটিন'-এর কতটুকু দাম তা গাঁয়ের গরিবরা যতটুকু জানে, ব্রিজমোহন তার থেকে বেশি ছাড়া কম জানে না। তার পরেও তার ভাতিজা চাষী মজুরদের কাছ থেকে ভূমিসেনাদের প্রাপ্য কর আদায় করেছে। এর পরেও অচ্ছুত ঘরের দুই একটা নতুন বয়সের মেয়ে ওদের ভোগের বলি হয়েছে। ফলে ছ'সাত মাস আগের সেই 'মিটিন'-এর জন্য ব্রিজমোহন বা তার ভাতিজা বাবুয়ার গরম মেজাজ ইদানীং একটু নরম দেখছে, এ-রকম ভাবার কোনো কারণ নেই।

...তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে? এটাই সকলের কখনো নির্বাক আর আপনজনের জটলায় সবাক জিজ্ঞাসা।

ব্রিজমোহন কখনো একটু স্নেহের চাউনি বিলিয়ে, কখনো একটু সদয় হেসে, কখনো সামান্য মাথা নেড়ে আর কখনো বা দুই এক কথায় কুশল জিজ্ঞাসা করে, নয়তো আশীর্বাদ জানিয়ে আনত অনুগ্রহভাজনদের আপ্লুত করে পায়ে পায়ে যে মস্ত জমিটার দিকে এগিয়ে আসছিল, সেই জমি পনেরো মাস আগেও তার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। একটু আধটু নয়, কম করে চৌদ্দ বিঘের জমি। অন্যত্র তার আরো যে-সব জমি আছে সে তুলনায় এই হিসেবের চৌদ্দ বিঘে

বলতে গেলে কিছুই নয়। চাষ আবাদের আরো ঢের জমি আছে তার। জমি ছাড়াও তার মতো অত বড় খাটাল আশপাশের চার পাঁচটা গাঁয়ের মধ্যে আর কোনো ভূস্বামীর নেই। সেই খাটালের দুধ দই ননী কাছাকাছির আধাশহরগুলোতে চালান যায়। এগুলি সেখানে খুব জনপ্রিয়। অনেক টাকা আসে। তাই চোখের সামনের এই চৌদ্দ বিঘে সোনা-ফলানো জমি ভারত সরকারের দখলে চলে গেল বলে আর্থিক ক্ষতিটাই তার মনস্তাপের কারণ নয়। তাছাড়া হিসেব কষলে এই আর্থিক ক্ষতিও খুব কিছু নয়। জমির মোটামুটি ন্যায্য দাম ধরেই সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ মিলেছে। কিন্তু নিজের হাতে থাকলে এর চার গুণ দাম পেলেও ব্রিজমোহন কি এই জমি বিক্রি করার কথা একবারও ভাবত? উল্টে এ-রকম প্রস্তাব নিয়ে যে আসত তার ঘাড়ের ওপর মাথা থাকত কিনা সন্দেহ। ঘরের ভাগ্যলছমীকে কেউ যদি টাকা দিয়ে কিনতে চায় এমন দুঃসাহস বরদাস্ত করার মানুষ ব্রিজমোহন নয়।

কিন্তু তাই হয়েছে। সব থেকে পিয়ারের জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ জমি ধরে রাখতে ব্রিজমোহন সাদা রাস্তায় হেঁটেছে, কালো রাস্তায়ও হেঁটেছে। এটা এই রাজ্যের অর্থাৎ বিহার সরকারের প্ল্যান হলে ব্রিজমোহন তুড়ি মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারত। টাকা ঢাললে এ-রাজ্যে কি না হয়। ভূ-স্বামীদের হাতে রেখে ভোটের দরিয়া কে না পার হতে চায়? অবশ্য এই দরিয়া পার হতে গিয়ে এবারে তার নিজের নৌকোই ডুবেছে। সেটা ভিন্ন ব্যাপার, ভিন্ন চক্রান্ত। কিন্তু এই জমি দখলের পরোয়ানা যার হাতে সে এখানকার সরকার নয়, খোদ ভারত সরকার। গাঁয়ের যত প্রবল-প্রতাপ মানুষই হোক, তার সঙ্গে লড়াই আর কতটুকু সম্ভব?

ওই জমির যত কাছে আসছে ব্রিজমোহন, তার বড় বড় দু'চোখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠছে।

এটা তার মস্ত মোকামের লাগোয়া জমি বলা যেতে পারে। বাড়ি থেকে পঞ্চাশ ষাট গজ এগোলেই এই সুফলা জমির শুরু। এই পয়মন্ত জমি পনেরো মাস আগে পর্যন্ত তার দৌলতের নিশানা উড়িয়েছে। সকলেই জানতো শীতের আঘনী ফসল, বসন্তের রবি ফসল, আর ভাদোইয়ের হরিৎ ফসলের যৌবনে ঝলমল ওই জমির পরেই ঠাকুর ব্রিজমোহনের মোকাম। মোকামের সামনে মস্ত উঠোন, তার এক কোণে বড় আর গোল করে বাঁধানো তুলসীমঞ্চ, বারো মাসই এই মঞ্চে তুলসীর তরতাজা ঝাড়। আঙ্গনার (উঠোন) চারদিকে ইঁটের বড় বড় ঘর, সিমেন্টের মেঝে, রক্তবর্ণ ঝকঝকে টালির ছাদ। মোকামের একটা দিক আবার কোঠা মানে দেড়তলা। কোঠার একতলার ছাদ পোড়ামাটির, দোতলার টালির। আঙ্গনার একদিকে সকলের জন্য আলাদা আলাদা বাসের ঘর, সব থেকে বড় আর ভলো ঘরটা অবশ্যই মালিক মহারাজের। আঙ্গনার অন্য দিকের ঘরগুলোতে ধান চাল সাফাই গম সরষে চাষের অন্যান্য ফসল আর আনাজ ঠাসা থাকে। গরিব বা নিচু জাতের মেয়ে বউরা অপরাহ্নে আঙ্গনায় বসে ফসল ঝাড়াই বাছাই করে দিয়ে যায়। ঠাকুরাইন হেলে দুলে এসে এসে তাদের কাজ তদারক করে, কখনো সে-ও তাদের সামনে মেচিয়ার ওপর বসে যায়। ওদের কাজের হাত তখন তৎপর হয়, আর ঠাকুরাইনের মেজাজ বুঝে তারা গলা মিলিয়ে ফসল তোলা বা ফসল ঝাড়াইয়ের গান শোনায়। এখনো এর ব্যতিক্রম হয়নি বটে, কিন্তু সামনের ওই ভরা যৌবন জমির ফসল আর পুরবাইয়ার

(পূবের বাতাসের) মাতোয়ারা মিতালির ঝর-ঝর সড়-সড় শব্দ-রোমাঞ্চের যোগ-বিহনে এই গানে আগের সেই আমেজ আর আসে না। ছোলাছুলি বা হঠাৎ দমকা বাতাসে এই গরিব বউ ঝিউড়ীদের বসন আর বেসামাল হয় না। হাতের কাজ বজায় রেখে, মুখের গান বজায় রেখে বসন সামলাতে গিয়ে আর তারা হেসে কুটিপাটি হয় না, শরীফ মেজাজ ঠাকুরাইনও কারো দিকে কটাক্ষপাত করে বলে ওঠে না, এ গোরী—সামাল নে আঁচরোয়া, কোই কউয়াকা আঁখ না লাগে।

গোরী বলতে সুন্দরী যুবতী মেয়ে। ঠাকুরাইনের চোখে তখন সব সুন্দর, পৃথিবীটাই যুবতী। তাই পল্‌কা ভ্রূকুটি করে আঁচল সামলাতে বলে। কোনো কাকের চোখে পড়লে ঠুকরে শেষ করবে।

আজ সামনের সেই জমির সবুজের বাহার শেষ। সেই সঙ্গে বহুয়া (মানী) ব্রিজমোহনের মান-ইজ্জতগার মাতোয়ারায় এখন ওই খোঁড়া-খুবলানো জমি থেকে কেবল ধুলো ওড়ে, সেই ধুলোতে মোকামের তকতকে আঙ্গনা ছেয়ে যায়, ঘর নোঙরা হয়।

কিন্তু ইদানীং ব্রিজমোহনের আচরণ বদলানোর হেতু তার এই সাধের জমি সরকারের দখলে চলে গেছে বলেও নয়। এর ফলে উল্টে তার ভিতরটা আরো হিংস্র হয়ে ওঠার কথা। তাই হয়েছে।

তার হাব-ভাব চাল-চলন একটু নরম হতে দেখা যাচ্ছে অন্য কারণে। তার মনের তলায় একটা চক্রান্তের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই চক্রান্তের পিছনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে কল-কাঠি নাড়ছে, সে লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষ ঠাকুর কুন্দন সিং। শুধু লোহার গাঁও কেন, অন্য সব লাগোয়া গ্রামের লোকও তাকে লোহার মানুষ বলেই জানে। এ-দিকের সমস্ত তল্লাটের মধ্যে ভূস্বামী হিসেবে সে-ই সব থেকে বড় আর সব থেকে ধনী জাঁদরেল পুরুষ তাতে কারো সন্দেহ নেই। বছর ছাপ্পান্ন সাতান্ন হবে বয়েস, ব্রিজমোহনের থেকে কম করে দশ এগারো বছরের বড়। এরমধ্যে ওই লোহার মানুষের একটা হার্ট অ্যাটাকও হয়ে গেছে। কর্তব্যের দায়ে তখন আর পাঁচজন ভূস্বামীর মতো মুখে বিষাদ আর উৎকণ্ঠার প্রলেপ মাখিয়ে ব্রিজমোহনও তার মহল্লায় ছুটে গেছে। কয়েকটা দিন সেখানে থেকেও গেছে। পাটনা থেকে দু'জন বড় ডাক্তার আনিয়ে তার চিকিৎসা চলছিল। সেই ডাক্তারদের মুখেও খুব একটা আশ্বাসের কথা শোনেনি কেউ। ব্রিজমোহনও আশা করেছিল শিউজী আর কিষেণজীর কিরপায় ভূস্বামীদের মধ্যে এবারে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে, তার ক্ষমতার পতাকা সব-থেকে উঁচুতে উড়বে।

...তা হল না। ওই লোহার মানুষ বেঁচে গেল। বেঁচেই শুধু গেল না, দেখতে দেখতে আগের মতোই তরতাজা হয়ে উঠল। এই ছাপ্পান্ন সাতান্ন বছর বয়সেও তার মেজাজ আর চালচলন ছাব্বিশ সাতাশের মতোই।

অবস্থাপন্ন ভূস্বামীদের কেউ তেমন লিখি-পঢ়ি জানা লোক নয়। সে-তুলনায় ব্রিজমোহন বিদ্বান মানুষ। একটা পরীক্ষায় পাশ দিয়ে কিছুদিনের জন্য কলেজের মুখও দেখেছিল। কিন্তু কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে তুলনা করলে এ-দিক থেকেও সে কিছুটা নিষ্প্রভ। কুন্দন সিং বি. এ. পাশ। দিগ্‌গজ গ্র্যাজুয়েট। আর যে ভাগ্যের কাছে গেলবারে ব্রিজমোহন অবিশ্বাস্যভাবে ভোটে হেরে

গেল, সেই পবনকুমার তো একেবারে এম-এ পাশ। এ-ও যে ওই ভাগ্নের সঙ্গে কুন্দন সিংয়ের যোগসাজসের ফল তা কি ভাবতে পেরেছে? নইলে কি এমন ছাত্র ছিল ওই ভাগ্নে, তার মতোই সেকেণ্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল, আর তারপর শহরের হস্টেলে থেকে মামার টাকার জোরে মাতব্বরি করে যাচ্ছিল। ব্রিজমোহনের সব থেকে বড় ভুলটা সেখানেই হয়ে গেছে। কান ধরে তখন তাকে ক্ষেত-খামার দেখার ভার দিয়ে নিজের চোখের সামনে রাখা উচিত ছিল। তা না করে তার ইচ্ছে বুঝে লেখা-পড়া করার স্বাধীনতা দিয়েছিল।

...বি. এ. পাশ করা পর্যন্ত ভাগ্নে পবনকুমার সব ছুটি-ছাটাতেই গাঁয়ে আসত। তখনো কি ব্রিজমোহন বুঝেছে দুধ-কলা খাইয়ে কাল-সাপ পুষছে সে! গ্রামে আসত, হৈ-চৈ করে ফূর্তি করে বেড়াতো, আশপাশের গাঁয়ে গিয়েও ছোট-বড় সকলের সঙ্গে ভাব জমাতো। আবার লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিংয়ের মোকানেও যাতায়াত করত। ব্রিজমোহনের প্রধান চর আর অনুচর তোতারাম সেই তখনই একটু সতর্ক হবার মতো আভাস দিয়েছিল, বলেছিল, কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে ভাগ্নের বেশ ভাব-সাব দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে বসে দিব্বি গপ্প-টপ্প করতে দেখে। তোতারামের ওইরকমই বোকা-বোকা বলার ধরন, কিন্তু লোকটা যে কত তুখোড় চালাক তা ব্রিজমোহনের থেকে এখন কে আর বেশি জানে। কিন্তু তখন তার কথায় কান দেয়নি। ভাগ্নে এখানে এলে আট ক্রোশ সাইকেল ঠেঙিয়ে লোহার গাঁওয়ে যেত কুন্দন সিংয়ের ছোট ভাইয়ের কাছে পড়তে। সেই ছোটভাই তখন পাটনায় ভাগ্নের কলেজের মাস্টার। ওই মাস্টারভাইও কলেজ ছুটি হলে লোহার গাঁওয়ে দাদার কাছে আসে। ভাগ্নের সেখানে যাবার ব্যাপারে কারো আপত্তি নেই, কারণ বড় তরফের ঘরের খবর আর তার মতলব জানতে বুঝতে সুবিধে হয়।

...ব্রিজমোহনের টনক কিছুটা নড়েছিল ভাগ্নে পবনকুমার এম. এ. পাশ দিয়ে বেরুবার আগেই। তখনই গাঁয়ের চাষী-মজুদের প্রাপ্য ঠিক-ঠিক না দেওয়া আর অচ্ছুতদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মামা-ভাগ্নের কথা কাটাকাটি হয়েছিল। ঝগড়া আরো চরমে উঠেছিল মামাতো ভাই বাবুয়াকে অত আস্কারা দেবার জন্য। ভূমি-সেনার দল নিয়ে তাদের স্বার্থ দেখার নামে তার অত্যাচার বরদাস্ত করতে চায়নি। তারপর থেকেই ভাগ্নে মামাবাড়ি আসা ছেড়েছে। পাটনায় সেইসময় থেকেই সে চাষী মজুর অচ্ছুত হরিজনদের হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে, জায়গায় জায়গায় গিয়ে তাদের দাবি নিয়ে গরম-গরম বক্তৃতা করেছে, ভূমি-সেনাদের এককথায় শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে। ছুপা গাঁওয়ের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে না হোক, একেবারে লাগোয়া গ্রামগুলোতে গিয়েও নিজের মামার আর তার ভূমি-সেনাদের অত্যাচার নিয়ে বক্তৃতার ঝড় তুলেছে। কিন্তু কখনো লোহার-গাঁও বা তার আশপাশে গিয়ে পাণ্ডাগিরি করেনি বা কুন্দন সিংয়ের গায়ে কোনরকম হুল ফোটাতে চেষ্টা করেনি। তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। অথচ কুন্দন সিংয়ের ভূমি-সেনার সংখ্যা ব্রিজমোহনের দেড়গুণ হবে।

...তখনো ছুটিছাটায় সে মামাবাড়ি আসেনি, কিন্তু ব্রিজমোহনের পাকা খবর, লোহারগাঁওয়ে কুন্দন সিংয়ের মোকামে সে ছুটি কাটাতে এসেছে। তখন তার ভাইয়ের কাছে পড়তে আসার কোন প্রশ্ন নেই। সেই মাস্টার ভাই পাটনার কলেজে তখন আর মাস্টারিও করছে না। ততদিনে সে দিল্লির লোকসভায় গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। সেটা রাজ্যের বিধানসভার মতো ছোটখাটো

ভোটের ব্যাপার নয়। আট-দশ লক্ষ লোক নিয়ে সেই ভোটের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে নাকি বড়দরের সেনাপতির কাজ করেছে ব্রিজমোহনের এই ভাগ্নে। কপাল বটে কুন্দন সিং লোকটার, এতবড় ভোটযুদ্ধে জিতে তার ছোটভাই কিনা দিল্লির শাসক দলের মেম্বর। সেই জোরে লোহারগাঁওয়ের কুন্দন সিং আরো শক্ত-পোক্ত লোহার মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে।

...ভাগ্নের বেচাল দেখে, বিশেষ করে তার ভূমিসেনাদের বিরুদ্ধে লোক খেপানোর চেষ্টা দেখে শুধু ব্রিজমোহন কেন, ছোট-বড় সব ভূস্বামীদেরই শিরায় রক্তে আগুন ধরার কথা। সকলেরই এই ভূমিসেনারা প্রধান বল। সব জাতের মেহনতী মানুষদের পদানত করে রাখার এরা সেরা যন্ত্র। পরোপকারের মুখোশ পরে সন্ত্রাসের অস্ত্র ঘুরিয়ে ভূস্বামীদের বনিয়াদ এরাই নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন রাখে। ব্রিজমোহন কাজের অছিলায় আর ছেলেদের দেখার অজুহাতে পটনায় এসেছে। তার দুই ছেলেই পাটনায় হস্টেলে থেকে স্কুলে পড়ে। এসেছে যখন, ভাগ্নের সঙ্গেও দেখা করেছে। মাথা গরম করে ফল হবে না সেটা বোঝা হয়েছে। তার কুশল আর পড়াশুনার খবর নিয়ে স্নেহের বকুনির সুরে বলেছে, তুহার কা মতলব, কাহে তু এইসন চলত?

ভাগ্নের ফিরে মোলায়েম প্রশ্ন, এ মামা—হামারা কইসে চলনে পর তুহারা খুশ বাঢ়ে?

—হামরা খুশিয়াকে লিয়ে তু না শোচত, বোল, ঠাকুর কুন্দন কেয়সে তুহারা আপন হইলন? তু না জানত ও কইসন্ আদমী?

এবারে তার মুখের ওপর ভাগ্নের স্পষ্ট জবাব, সে কেমন লোক খুব ভালো করেই জানি, খুব কঠিন লোক, কিন্তু তোমার থেকে ঢের সাচ্চা লোক।

এরপর এমন ভাগ্নের মুখ দেখাও পাপ। ব্রিজমোহন উঠে এসেছে।... কুন্দন সিংয়ের মতো সে লোক-দেখানো ভাঁওতাবাজী কিছু করেনি সত্যি কথা। গরমি কালে ওটা করে লোহারগাঁওয়ের গরিব আর অচ্ছুত পাড়ায় দুটো কুঁয়া আর দুটো টিপ-কল করে দিয়েছে। নিজের ভূমিসেনার তদারকিতে একটা 'পুকুর' কেটে দিয়েছে, আর একটা পাঠশালা করে দিয়েছে যেখানে অচ্ছুতদের ছেলেমেয়েরাও ফারাকে বসে পড়তে পারে। নাম হয়েছে কুন্দন সিংয়ের, কিন্তু এসবের বেশির ভাগ হয়েছে সরকারের টাকায় এ কি ওই ভাগ্নে হারামজাদা জানে না? পাঠশালার টাকা তো এসেছে তার ওই দিল্লির ভাইয়ের সুপারিশের জোরে। উল্টে কত টাকা নিজের হারেমে ঢুকেছে তার খবর কে রাখে?...যা কিছু হয়েছে, সবই করিয়েছে তার ভূমিসেনাদের দিয়ে, এটাই তার বড়রকমের চালবাজী। এমন ধূর্তামি ব্রিজমোহনেরও মাথায় আসেনি সত্যি কথা। নইলে সরকারের টাকায় দুটো কুঁয়া আর দুটো টিপকল তো ছুপার পঞ্চ-এর মাতব্বরেরাও করে দিয়েছিল। সেসব খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে গেল সেটা গরিবদের ভাগ্যের দোষ ছাড়া আর কার দোষ!

...আর সাচ্চা লোক কুন্দন সিং? তার কত জায়গায় বাগানবাড়ি, কত জায়গায় কটা বেনামী মোকান, আর সেসব জায়গায় কতরকম মেহফিলের হুল্লোড় হত, বিলায়তি মদের বন্যা বইতো, কত বাঈওয়ালীর পায়েলের ঝংকার উঠত, আর কত গরিব গেরস্ত ঘরের সুন্দরী বউয়ের ঘুঙট্ খসত—সে খবর তোরা রাখিস?...কুন্দন সিংয়ের যখন বিয়ে, ব্রিজমোহনের তখন বছর বারো তেরো বয়েস। নেওতা পেয়ে সেও তো গেছল। নতুন বউ নয় তো, গতরে

যেন ছোট্ট একখানা হাত্তির বাচ্চা। কানা-কানি শুনেছে, কনের খুব ছোট বয়সে কুন্দনের বাপ নাকি মেয়ের বাপকে কথা দিয়েছিল ওই মেয়েকে বউ করে ঘরে আনবে। তাকে আনতে হয়নি, কারণ সে ততদিনে চোখ বুজেছে। বাপের কথার মর্যাদা রাখতে কুন্দন সিং নিজেই নাকি ওই মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনেছে। লোকে তখন বাহবা দিয়েছে। কিন্তু অমন বউয়ে মন মজবে কুন্দন সিংয়ের ? দেখতে দেখতে সেই বউ ফুলে ফেঁপে আরো ঢোল হয়েছে। একটা ছেলেপুলে পর্যন্ত হয়নি। ছোট ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাই তার ছেলেমেয়ে বলে উদারতা দেখায়। আর সাঁঝ লাগতে না লাগতে বাইরে ফুর্তি লুঠতে বেরোয়। এই বয়সেও কি তার চরিত্রখানা ধোয়া তুলসীপাতা নাকি। সব খবর রাখে তোতারাম। সেও লোহার গাঁওয়ের লোক ছিল। অবশ্য অনেক বছর আগেই সে ছুপায় চলে এসেছে। সে ছিল একদিকে কুন্দন সিংয়ের মোসায়েব অন্য দিকে ভাঁড়। তোতারামকে সবাই মজার মানুষ ভাবে, সকলেই পছন্দ করে। কুন্দন সিংও করত, এখনো করে। তার টানে তোতারামের এখনো লোহার গাঁওয়ে যাতায়াত খুব। এই যাতায়াতের আসল উদ্দেশ্য কেবল ব্রিজমোহন জানে আর তোতারাম জানে। ব্রিজমোহনের চরদের মধ্যে তোতারামের মতো সেরা আর ধূর্ত কেউ না। কুন্দন সিংয়ের হাঁড়ির খবর পেতে হলে তোতারাম রঙের টেক্কা। তাকে জিগ্যেস করলে কুন্দন সিংয়ের হালের চরিত্রেরও সরা-চাপা হাঁড়ি উল্টে অনেক কেচ্ছা বার করে দেবে।

কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে ব্রিজমোহনের লোক দেখানো সম্পর্কটা খুব আপনার জনের মতো তো বটেই, আবার বড় ভাই আর ছোট ভাইয়ের মতোও। দেখা হলে ব্রিজমোহন নত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানায়, কুন্দন সিংও তাকে বুকে টানে। ভূস্বামীদের দরকারি জমায়েতে দেখা হয়, সামাজিক আদানপ্রদান উপলক্ষেও দেখা হয়, পালা-পার্বণে পরস্পরের কাছ থেকে ভেট আসে।...পাটনায় ভাগ্নের সঙ্গে ওইরকম কথা হবার পর ব্রিজমোহন তার বগ্‌গি (ঘোড়া) গাড়িতে চেপে বিনা উপলক্ষেই কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছল। নিজেদের মধ্যে যত রেষারেষিই থাক, স্বার্থে ঘা পড়ার সম্ভাবনা দেখলে সব ভূস্বামীরাই এককাট্টা। ভূমিসেনাদের গায়ে আঁচড় পড়ার সম্ভাবনা দেখলে তো বটেই। এদের স্বার্থ আগলানোর দায় কুন্দন সিংয়ের অন্য ভূস্বামীদের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়।

প্রাথমিক জড়াজড়ি কোলাকুলি আর কুশল বিনিময়ের পর ব্রিজমোহন কাজের কথায় চলে এসেছিল।... ভূমিসেনাদের নিয়ে খবরের কাগজে নানারকম রিপোর্ট বেরুচ্ছে, বানিয়ে বানিয়ে অত্যাচারের কথা লেখা হচ্ছে, পোলিটিক্যাল ধান্দাবাজরা যা-তা বলে আর বক্তৃতা করে চাষী মজুর হরিজনদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, এ নিয়ে একটু আলোচনার জন্যেই তার রহুয়ার কাছে আসা।

চিন্তাচ্ছন্ন মুখে কুন্দন সিংও মাথা নেড়েছে। সে-ও কাগজে দেখছে, অনেক কথা কানেও আসছে বলল। সে নাকি তার ভূমিসেনাদের সমঝে দিয়েছে কোথাও বেশি বাড়াবাড়ি না হয়— হাওয়া বুঝে অন্যদেরও তাই করা উচিত। তার পরে গোল যারা পাকাচ্ছে তাদের মুখ বন্ধ করার কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। শেষে একটু চুপ করে থেকে কুন্দন সিং আলতো করে জিগ্যেস করেছে, তুহার ভাঞ্জাকা (ভাগ্নের) কা খবর...ও উলট্ দলোয়াঁমে রহলঅ শুনথ...!

এই প্রসঙ্গের অপেক্ষাতেই ছিল ব্রিজমোহন। পাকানো গোঁফে একটু মোচড় দিয়ে গম্ভীর গলায় জবাব দিল, রহুয়া (মাননীয় মহাশয়) সাচ শুন্‌ল, লেকিন হমার উহার কু-চলন্ কভু না বরদাস্ত হই—রহুয়া তুম উহারকে মাফি না করব, হম এ কহ্‌ত আইল তুম্ না শোচত ও হমারা বহনপতো।

একটু চুপ করে থেকে কুন্দন সিং নির্লিপ্ত মুখে বলল, ছোঁড়া আচ্ছা ভইলী (ভালই ছিল), লেকিন যব পতঙ্গকা পাঁখ্ উড়ল বাড়ে তব মুশকিলোয়াঁ—তুম্ থোড়াসে সমঝই দিহ...মিল্ নেসে হামভি কহব।

কতটা বলেছে বা কি-রকম সমঝে দিয়েছে তা দুটো বছর না যেতেই ব্রিজমোহান হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। গেলবারে ভোটে সে ভাগ্নের কাছে হেরেছে কেবল ওই কুন্দন সিংয়ের জন্য তা কি দশখানা গাঁওয়ের কারো জানতে বুঝতে বাকি আছে? প্রথমে যখন শোনা গেল প্রবল-প্রতাপ মামার বিরুদ্ধে ওই ভাগ্নে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছে তখন তো তার কাছেও সেটা হাসির ব্যাপার মনে হয়েছিল। তারপর একটু একটু করে হাওয়া-বদল বোঝা গেছে।

...দস্তুর অনুযায়ী সবার আগে ব্রিজমোহন ওই কুন্দন সিংয়ের আশীর্বাদ চাইতে গেছল। আর যে-যে গাঁয়ে সম্ভব তার সভায় হাজির থেকে তার হয়ে গ্রামের মানুষদের কিছু বলার আরজিও পেশ করে এসেছিল। আর্শীবাদ অবশ্যই মিলেছে, কিন্তু লোহা-পানা মুখ করে কুন্দন সিং জানিয়েছে, তার তবিয়ত ভালো যাচ্ছে না, সভায় গিয়ে বক্তৃতা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তা না হলেও তো যতটুকু সম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়েই ফিরেছিল ব্রিজমোহন।

তারপর?

তবিয়ত খারাপের অজুহাতে কেবল ছুপা গাঁয়ের সভাতেই সে আসেনি। কিন্তু নিজের ওই ঝর্ঝরে মোটরগাড়িতে চড়ে নিজের তেল পুড়িয়ে ভাগ্নের কোন্ সভায় না গেছে আর তার হয়ে বক্তৃতা করেছে? এমন কি ছুপার লাগোয়া গ্রামগুলোতেও সে এসেছে, ভাগ্নের হয়ে ভাষণ দিয়েছে! ব্রিজমোহন তখনো অবশ্য ভাবেনি ভোটের লড়াইয়ে সত্যি হারবে। কারণ লোহার গাঁয়ের যত প্রতিপত্তির মানুষই হোক কুন্দন সিং, অন্য সব গাঁয়ের লোক তাকে ভয় করলেও ভক্তি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস কতটুকু করে?

ভাগ্নের কাছে ভোটে হারার জন্যেও ব্রিজমোহন গরিব বা অচ্ছুত গ্রামবাসীদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করছে তা নয়। মাস পাঁচেক আগে মনে নানা-রকম অশান্তি নিয়ে সে পাটনায় তার পরম বিশ্বাসের জ্যোতিষী পাণ্ডেজীর কাছে গিয়েছিল। অনেকদিন তার খোঁজ নেয়নি বা তাকে মনেই পড়েনি এ-ও একটা অপরাধের মতো মনে হচ্ছিল। নইলে আপদ বিপদের ছায়া দেখলে আগে তো তার কাছেই ছুটে যেত। ভোটের আগে তার সঙ্গে দেখা করলে ক্রিয়াকলাপ করে সে হার বাঁচাতে পারত কিনা কে জানে। ওই জনার্দন পূজারীর কথা শুনে পাণ্ডেজীর কথা আরো মনে পড়েনি। পূজারী তার ভালোর জন্য রোজ মহাবীরজীর পায়ে ফুল চড়ায়। সে বলেছিল, এ লড়াইয়ে লম্বরদারকে (মহামান্য) হারাতে পারে এমন মানুষ জন্মায়নি। কিন্তু ভুল ব্রিজমোহনেরই। পূজারী জ্যোতিষী নয়, মুশকিল আসানও করতে পারে না। অন্ধ বিশ্বাসে বলেছে।

খুব মন দিয়ে জন্ম-কুণ্ডলি দেখে পাণ্ডেজী বলেছে, এখন বছর দুই তার সময় খুব খারাপ।

বিশ্বাসী লোক শত্রুতা করবে, অনেকে চক্রান্ত করবে। ব্রিজমোহনকে সে ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই ভাব-সাব রেখে চলার পরামর্শ দিয়েছে। তুচ্ছ লোকও তার ক্ষতির কারণ হতে পারে। ক্রিয়াকলাপের জন্য টাকা গুঁজে দিয়ে আর বিপদতারণ তাবিজ-কবজ নিয়ে সে ফিরেছে। বড় রকমের চক্রান্তের আভাস সে নিজেও কি পাচ্ছে না? কুন্দন সিং কিছু রেখে-ঢেকে বলার লোক নয়। শুভার্থীর মতো সে তোতারামকে বলেছে, ব্রিজমোহনকে একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলতে বোলো, ছুপার আর আশপাশের খুব সাধারণ কিছু লোক নিয়ে তার আর পঞ্চ-এর কাজ-কর্মের ওপর চোখ রাখার জন্য একটা গোপন কমিটি হয়েছে বলে খবর আছে। কে-যে চর আর কে নয় বলা শক্ত, বোঝা শক্ত। মহাবীর প্রসাদ আর জগদেও মিশিরকে মুখের ওপর বলে দিয়েছে, সাধারণ লোকের ভালোর জন্য পঞ্চ-এর হাতে দেওয়া সরকারের কত টাকা গাঁয়ের মানুষদের জন্য খরচ করা হয়েছে আর কত টাকার হিসেব নেই। ছুপার সাধারণ লোকদের মধ্যে কুন্দন সিংয়েরও চর না থাকলে এ-সব মোটামুটি ঠিক-ঠিক খবর তার কানে ওঠে কি করে? কমিটি যদি হয়ে থাকে সেটা ভাগ্নের তৈরি, আর স্বয়ং কুন্দন সিংই তার মাথা, এতে কি কোনো সন্দেহ আছে? এই কারণেই খুব হত-দরিদ্র সাধারণ আর অচ্ছুতদের সঙ্গেও ব্রিজমোহনের ব্যবহার আর আচরণ এখন নরম। এমন তারা অভ্যস্ত নয় বলেই অবাক হয়। সকলের সঙ্গে প্রীতির ভাব দেখে অভ্যস্ত হলে আশপাশের গ্রামেও সেটা আলোচনার বিষয় হবে। যে চরদের নিয়ে তার বিরুদ্ধে গোপন কমিটি, তাদের তখন সুবিধে থেকে অসুবিধে বেশি হবে। পাটনার পাণ্ডেজীও ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই ভাব-সাব রেখে চলতে পরামর্শ দিয়েছে। ভূমি-সেনাদের নিয়ে এখন কি-ভাবে চলতে হবে, গাঁওয়ের মানুষদের সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করতে হবে, ভাতিজাকে ডেকে ভালো করে সমঝে দিয়েছে। সাপকেও এখন মিঠা বাত শোনাতে হবে, ঠেঙাতে হলে গোপনে ঠেঙাতে হবে। বলেছে, আব্ লাঠিয়া শক্তি কম পড়লঅ তো বুদ্ধিতে কাম করত।

...তিন দিন আগে রাখী-বন্ধন উৎসব গেছে। ব্রিজমোহন অনেককে রাখী পরিয়েছে, অনেক মিঠাই বিলিয়েছে। আর বিস্ময়ে আনন্দে তাদের হাবু-ডুবু খেতে দেখেছে। অন্যান্য বারের থেকে আরো ঘটা করে ভেট সাজিয়ে তার প্রধান দূত তোতারামকে পাঠিয়েছে কুন্দন সিংয়ের ডেরায়। প্রথামত কুন্দন সিংয়ের ভেটও উৎসবের দিনই ব্রিজমোহনের ডেরায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু তোতারাম এখনো লোহার গাঁও থেকে ফেরেনি। ফিরতে দেরি হবে জানা কথাই। কারণ শুধু ভেট পৌঁছে দেবার জন্যেই তো আর তাকে পাঠানো নয়। তাকে তো সাপের হাঁচি বুঝে আসতে হবে। কিন্তু এই সকালেও সে ফিরল না দেখে ভিতরে ভিতরে একটু উৎকণ্ঠায় আছে।

বয়েস পঁয়তাল্লিশ হলেও ব্রিজমোহন সুপুরুষ আর শৌখিন পুরুষ। এখন সে ঢিমে-তালে বাড়ির কাছাকাছি একটু পায়চারি করতে বেরিয়েছে। তার পরনে মিহি ধুতি, গায়ে মুগার ফতুয়ার ওপর রেশমী চাদর, পায়ে হরিণের চামড়ার চওড়া ব্যাণ্ড লাগানো হাল্কা কাঠের চপ্পল। নিজের ওই জমির মাঝা-মাঝি এসে দাঁড়িয়ে গেল। চাউনি আরো ক্রূর কঠিন। দু'চোখে সাদা আগুন ঠিকরোচ্ছে।...বাইরে বুঝতে দেয় না, ভবিষ্যতে এখানকার একটি মানুষই তার বদলা নেবার আসল লক্ষ্য, তার বড় শিকার। এখানকার এই সরকারি কাজের ভার নিয়ে আছে যে, সে

সিনিয়র জিওলজিস্ট শাওন ভার্মা। আগে এই জমিরই এক-ধারের কাঁচা ক্যাম্পে থাকত। এখন সেখানে তার জন্য দুটো পাকা ঘর আর টালির ছাদের স্থায়ী ক্যাম্প হয়েছে। অনেকটা জায়গা ছেড়ে এক সারিতে আরো ছটা পাকা ঘর তোলা হয়েছে। সেখানে তার অধীনের ভদ্র কর্মচারী আর টেকনিশিয়ানরা থাকে। জমিতে এখনো গোটাকতক কাঁচা ক্যাম্প মাথা তুলে আছে। ওগুলো সরকারের মাইনে করা দক্ষ শ্রমিক আর কারিগরদের জন্য।

...পাকা ক্যাম্পগুলো তৈরি হবার পর ব্রিজমোহনের মনে যেটুকুও আসা ছিল তা-ও নির্মূল। সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে-জন্য ওই জমি নেওয়া, তা বরবাদ হয়ে গেলে অর্থাৎ তামার আকরের (কপার-ওর) সন্ধান না মিললে নামমাত্র মূল্যে সমস্ত জমি আবার তাকেই ফেরত দেওয়া হবে। নাম-মাত্র মূল্যে কারণ ওই জমিকে আবার সুফলা করে তুলতে হলে তো অনেক সময় লাগবে, অনেক মেহনত করতে হবে। দফায় দফায় সরকারের লোক এসে নানা রকমে সয়েল-টেস্ট করার সময়ও ব্রিজমোহন বোঝেনি এ-জমি তার হাত-ছাড়া হতে যাচ্ছে। জিগ্যেস করতে তারা শুধু বলেছে, এই জমিতে তামার খনি মেলা সম্ভব কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তা এমন পরীক্ষা তো সমস্ত বিহারে কত হচ্ছে তার লেখা-জোখা নেই। তামাম ভারতে বিহারের মতো অত রকমের খনির জায়গা আর কোথায় আছে? কিন্তু তা বলে কিছু-কিছু মাটি খুঁড়ে সয়েল টেস্ট করলেই কি সর্বত্র খনির হদিস মিলছে! হ্যাত্ তেরি বহন্ কে—

প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য এই লোকের অর্থাৎ শাওন ভর্মার মুখ দেখা যায়নি। জমি সরকারের দখলে চলে যাবার পর তাকে আর তার কিছু লোককে কাঁচা ক্যাম্প করে এখানে থাকতে দেখা গেছে। তখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষারই পর্যায়। মেশিন টেশিন বসিয়ে জমির একটা দিক খুঁড়ে দেখা হচ্ছে, আর প্যাক করে-করে মাটির নমুনা পাটনায় পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ক্রমশ খোঁড়ার পরিধি বাড়ছে, লোক আসা বাড়ছে, লরিতে যন্ত্রপাতি আসা বাড়ছে।

পঞ্চু-এর দোস্ত আর অনুগত বন্ধু মহাদেও প্রসাদ আর জগদেও মিশির তার মাথায় ঢুকিয়েছে ওই শাওন ভার্মা কোমর বেঁধে তাদের দলে এলে এই বিপদ কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। পাটনায় ছোটাছুটি করে দুই একজন সরকারী কর্মচারীর কাছ থেকেও ব্রিজমোহন এই আভাসই পেয়েছে।...কাজটা খুবই কঠিন, তবু সাহস করে কল-কাঠি নাড়লে ওখানে কাজের ভার নিয়ে বসেছে যে-লোক, শুধু সে-ই পারে সমস্ত প্ল্যান বান-চাল করে কাজ বন্ধ করতে। ড্রিলিং মেশিনে কত গভীর পর্যন্ত খোঁড়া হল সেই হিসেবে কারচুপি করে, প্রত্যেক পর্যায়ের মাটির স্যাম্পল ঠিক-ঠিক না পাঠিয়ে সময় বুঝে সে যদি ঘোষণা করে ওই জমিতে তামার আকর মিলবে না—তাহলেই কেবল কাজ বন্ধ হতে পারে। এ-পর্যায়ে কাজ বন্ধ হলে ব্রিজমোহনের লোকসানের থেকে লাভ ঢের বেশি। কারণ তখন পর্যন্ত অতবড় জমির আট ভাগের এক ভাগেও হাত পড়েনি, জলের দরে গোটা জমি ফেরত পেলে তো প্রায় সবটাই লাভ।

নাম জানার আগে পর্যন্ত ব্রিজমোহন ভেবেছিল বছর আঠাশ উনত্রিশের ওই মিষ্টি-মুখ ছেলেটা বাঙালী। তার চাল-চলন হাসি কতাবার্তার ধরন সবই খাঁটি বাঙালীর মতো। এখনো এ-দিককার বেশিরভাগ ভাড়াটে শ্রমিক মজুররা তাকে পরদেশী বাবু বলে ডাকে। নাম শোনার পর তার সম্বন্ধে অনেক খবরই নিয়েছে ব্রিজমোহন। পাটনার লোক পাটনায় জন্ম, কিন্তু

ছেলেবেলা থেকে তার বাস আর লেখাপড়া সবই কলকাতায়। এই লোককে হাত করার জন্য কলকাতায় তার বাপের খোঁজও নিয়েছে বইকি ব্রিজমোহন—যদি কোনো যোগাযোগের সুতো বেরোয়। সুবিধে হয়নি। বাপ সেখানকার এক হিন্দী খবরের কাগজের দপ্তরে লেখার কাজ করে।

কিন্তু গ্রামের সব থেকে শাঁসালো মাতব্বর যদি দোস্তি করতে চায় কতটুকু আর অসুবিধে? বিশেষ করে তোতারাম যেখানে তার চর অনুচর আবার দূতও। ছেলেটা শরাবের সমজদার হলে আরো সুবিধে হত। কিন্তু ও-সব ছোঁয়ও না। তবু তোতারামের মারফৎ সাদর নেওতা পেয়ে সে সাগ্রহেই এসেছে। আসবে না কেন, গ্রামের প্রধান ভূস্বামী সহায় থাকলে স্থানীয় শ্রমিক মজুর পেতে সুবিধে, সরঞ্জাম পেতে সুবিধে, আর নির্বিঘ্নে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও সুবিধে। এখানে এনে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেবার আগে শাওনের ওপরঅলা এবং প্রধান মুরুব্বি প্রকাশ দীক্ষিত কিছু দরকারী উপদেশ দিয়ে রেখেছে। গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে যতটা সম্ভব ভাব-সাব রেখে চলবে, কোন রকম জাত-পাতের গণ্ডগোলের ধারে কাছে ঘেঁষবে না, আর ইয়ং ম্যান বিয়ে করোনি—কোনোরকম অ্যাফেয়ারের আঁচড় গায়ে লাগতে দেবে না, এ-সব গ্রাম খুব ডেঞ্জারাস জায়গা মনে রেখো, গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে পারলে এরা ছাড়ে না।

প্রকাশ দীক্ষিত কড়া রিজিওন্যাল অফিসার, কিন্তু ভালমানুষ। মাঝবয়সী। কাজের জন্যেই শাওনকে তাঁর পছন্দ। এই লোকের সুপারিশেই এই বয়সে সিনিয়র জিওলজিস্ট হতে পেরেছে। তাঁর অফিস এখন পাটনায়, সেখানেই থাকেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এখন বিহারের অনেক জায়গায় কাজ হচ্ছে। জিপ নিয়ে সর্বত্র ইন্সপেকশনে যান। সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন ছুপার কাজও দেখতে আসেন। যেদিন আসেন সেদিনই ফেরেন।

শাওন ভার্মার মানুষ চিনতে একটু সময় লাগে। যাকে যেমন দেখে তাকে তেমনি ভাবে। গোড়ায় ব্রিজমোহনকেও বেশ ভালো মানুষ আর দিলের মানুষ মনে হয়েছিল। তার থাকা খাওয়ার সুবিধে অসুবিধে নিয়ে ভদ্রলোক ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মাঠের ক্যাম্পে না থেকে তার বাড়িতে থাকা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল।

তারপর তার মতলব বোঝা গেছে। প্রথমে ব্রিজমোহন তোতারামের মারফৎ টোপ ফেলেছে। তারপর মহাদেও প্রসাদ আর জগদেও মিশিরকে দিয়ে সেই টোপ আরো লোভনীয় করে তুলতে চেষ্টা করেছে। তারাও বিফল হওয়ায় নিজে এগিয়েছে। মতলব বোঝার পর শাওন ভার্মার উদ্‌বেগের সীমা ছিল না। কিন্তু সবিনয়ে সকলকে সে একই জবাব দিয়েছে। তার কোনো হাত নেই, করারও কিছু নেই। স্যাম্পল যাচাইয়ের পর পাটনার অফিস থেকে যেমন যেমন নির্দেশ আসছে সে তাই করে যাচ্ছে। পাটনা অফিস থেকে সপ্তাহে একবার দু'বার করে তার ওপরওয়ালা নিজে এসে সব তদারক করে যাচ্ছেন, স্যাম্পল নিয়ে যাচ্ছেন আর কাজের হুকুম দিচ্ছেন।

ব্রিজমোহন অবশ্য তারপরেও মিষ্টি ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে। আর এখনো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু ওই জবাবের পর দুঃখ করে বলেছিল, তুমি এমন মিঠা মানুষ ভার্মা সাহেব যে এ ক'দিনের মধ্যেই আমার আপনার লোক হয়ে গেছ...কথাটা রাখলে শুধু আমার কেন, তোমার নিজেরও ভালো হত।

বিনয়বচনের আড়ালে সেই প্রথম লোকটার ক্রূর মূর্তি উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে। বাইরে বোঝা না গেলেও শাওন ভার্মা ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ ঘাবড়েছিল। এরপর প্রকাশ দীক্ষিত ইন্সপেকশনে আসতে তাকে সব না বলে পারেনি। শুনে অতদিনের অভিজ্ঞ মানুষটাও স্তব্ধ খানিক। তারপর বলেছে লোকটার কত প্রতিপত্তি আমি জানি, তুমি যা বলেছ ঠিকই বলেছ, তার সঙ্গে খুব সদ্ভাব রেখেই চলতে চেষ্টা কোরো, আর বারবার ওই কথাই বুঝিয়ে দিও যে তুমি কেউ নও—কেবল হুকুম তামিল করে যাচ্ছ।...ফাঁক পেলে আমিও তার সঙ্গে আলাপ করে রাখতে চেষ্টা করব।

আলাপ করেছেন। শাওন তার কাছে ঠাকুর সাহেবের কত প্রশংসা করেছে। বলেছেন, আপনার সাহায্য পেলে ভারত সরকার আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আর শেষে বলেছেন, শাওন ভার্মা খুব কাজের ছেলে আর ভালো ছেলে, কিন্তু অল্প বয়েস...আর একটু মুডি...আপনি এখানে তার গার্জেনের মতো হয়ে গেছেন শুনে আমি নিশ্চিন্ত।

ফিরে এসে ওকে হেসে বলেছেন, সেয়ানে সেয়ানে এক-প্রস্থ কোলাকুলি হয়ে গেল দু'জনের কারোই বুঝতে বাকি নেই।...যাক্, এর পর ওই লোক তোমার সোজাসুজি কোনো ক্ষতি করতে সাহস করবে মনে হয় না। তুমি যতটা পারো ওর সঙ্গে সদ্ভাব রেখেই চলো—

ব্রিজমোহনের তীক্ষ্ণ চোখজোড়া প্রথমে শাওন ভার্মার পাকা ক্যাম্প ঘর দুটোর দিকে ঘুরে এসেছে। দরজা বন্ধ মানে সাইটের কাজ দেখতে বেরিয়েছে। দু' চোখ জমির চারদিকে চক্কর খেতে লাগল। কিন্তু অতবড় জমিতে এখন কলকজা যন্ত্রপাতি ড্রিলিং মেশিন মাটি তোলার ক্রেন জেনারেটার ইত্যাদির ছড়াছড়ি। স্থানীয় মজুরের সংখ্যাও কম নয়, সরকারের উঁচু হারে বাঁধা মজুরীর লোভে অনেকেই ক্ষেতির কাজ ছেড়ে এখানে এসে ভেড়ার জন্য হাঁ করে আছে। সরকারের কাজে এ-সব জায়গায় শ্রমিকের অভাব হয় না ; হয়ওনি। এ-বেলায় ছুত-অচ্ছুতের একসঙ্গে কাজ করতে কারো দ্বিধা নেই।

জমির ওপর শ্যেন চক্ষু চালিয়ে ব্রিজমোহন যাকে খুঁজছে সে শাওন নয়। একটি মেয়ে। না, সে এখানকার কোনো মজুরনি টজুরনি নয়। অচ্ছুত হলেও অনেক উঁচু দরের মেয়ে। ছুপার সক্কলে, বিশেষ করে মরদরা ওই মেয়েকে খুব ভালো করে চেনে। শুধু মরদরা কেন, সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেলে ষাট-সত্তর বছরের বুড়োদেরও কি বাসনার আগুন বুকের তলায় ধিকি ধিকি জ্বলে না? এ সময়ে অনেক দিনই ওই মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে ব্রিজমোহন। রোজ সকালে দুপুরে বা বিকেলে একবার করে সে আসেই, আর কখন আসে সে-খবরও ব্রিজমোহনের কানে ঠিক ঠিক পৌঁছয়। শুধু সকাল দুপুর বা বিকেল কেন, সন্ধ্যার পরে বা রাতেও ওই পাকা ক্যাম্প ঘরেই এই মেয়ের আনাগোনার খবর ব্রিজমোহনের অগোচর নয়। তখন অবশ্য শাওন ভার্মার অসুখ। পক্সের গুটিতে গা ছেয়ে গিয়েছিল, তাকে সেবা যত্ন করার তাগিদে আসা।

...আজ এ সময়ে আসেনি। এলে একা আসে না। সঙ্গিনী জুটিয়ে দল বেঁধে আসে। যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। দেখে বেড়ায়। সরকার যেন ওই মেয়েকেও এখানকার কিছু তদারকির ভার দিয়েছে—এমনি হাবভাব।

তিতলি।

তিতলি মানে প্রজাপতি।...গত এক বছর ধরে তার সঙ্গে ওই ক্যাম্প ইন-চার্জ ও শাওন ভার্মার ভাব-সাব যে হারে বেড়ে চলেছে, ব্রিজমোহনের কাছে সেটা খুব দুশ্চিন্তার কারণ না হোক অসহ্য ক্রোধের কারণ বটেই। আজ দু'বছরের বেশি হয়ে গেল, ছুপার সকলের সেরা ওই মেয়ের ওপর তার চোখ। দু বছর ধরেই তাকে অধীর অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। হচ্ছে। কারণ কি একটা সংস্কারের দরুন একুশ পূর্ণ হবার আগে হীরা মল্লা ওই মেয়েকে ছাড়বে না। ব্রিজমোহনের ধারণা, সংস্কার টংস্কার কিছু না, সকলের চোখে ওই মেয়েকে আরো লোভনীয় আরো দামী করে তোলাই উদ্দেশ্য। হীরা মল্লা সম্পর্কে তিতলির পিসি, বাপ বলদেও মল্লার দূর সম্পর্কের বোন। বলদেও মল্লা আধা-পাগল, কারো সঙ্গে কথা বলে না, দিন রাত মদে চুর হয়ে নিজের ঘরে সেঁধিয়ে থাকে। সাড়ে তিন বছর বয়সে তিতলির মা বাসন্তীয়া মারা যেতে ও হীরা মল্লার হেপাজতে মানুষ। এসব হীরার মুখেই শুনেছে ব্রিজমোহন, বাসন্তীয়াকে কখনো চোখে দেখেনি। রূপের ডালি আর গুণের ডালি ছিল নাকি সেই মা। গুণ বলতে গান। তার গানে বনের পশুপাখি ভুলত নাকি। তিতলি মায়ের রূপ পেয়েছে, কিন্তু গুণ পাওয়ার জন্য সেই ছেলেবেলা থেকে অনেক মেহনত আর অনেক খরচ করতে হয়েছে হীরাকে। তার সবটুকু উশুল করতে হবে না? হীরা মল্লার সাফ কথা। আর তিতলি শুধু রূপ আর গুণ নয়, সেই রসের ডালিমটিও হয়ে উঠেছে। হীরা মল্লার মতলবের আভাস ব্রিজমোহন পেয়েই গেছে। তাই নিশ্চিন্ত। তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মানুষ এই গ্রামে বা আশপাশে আর কে আছে?... তার প্রতীক্ষারও মিয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। এটা শ্রাবণ মাস। কার্তিকের গোড়াতেই দেয়ালি। তার দিন কয়েক আগে তিতলির একুশ পূর্ণ হবে। দেয়ালির উৎসব সপ্তাহের মধ্যেই ওই রূপ-গুণ আর রসের ডালি তার ভোগ দখলে আসবে। ছুপা থেকে কত দূরের কোনমোকানে তিতলিকে রাণীর হালে এনে রাখবে ব্রিজমোহন তা-ও স্থির করেই রেখেছে।

দুশ্চিন্তা খুব নেই কারণ হীরা মল্লা কঠিন মেয়ে। কিন্তু ওদের এই মিতালি কি করে বরদাস্ত হয়। ভাবলে দোষ অবশ্য শাওনের নয়। সে সেধে ওই মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে যায়নি, আর এমনিতেও লোকটা চুপচাপ গোছের। কিন্তু তিতলি যদি প্রজাপতির মতো রূপ ছড়িয়ে রং ছড়িয়ে তার কোনো খেয়াল-খুশির ডালে এসে বসে আর সেই ডাল যদি রক্ত-মাংসের কোনো মরদ হয়—তাহলে তার মধ্যেও রং ধরবে না রসের বন্যা বইবে না এমন মরদ কি দুনিয়ায় আছে? এটুকু বুঝেও ব্রিজমোহনের সমস্ত রাগ ওই শাওনের ওপর। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তার এত সাধের জমিটা খাচ্ছে, আর চোখের সামনে দাঁড়িয়েই তিতলির ভাবের দোসর হয়ে উঠছে।

...ঘরে ব্রিজমোহনের বন্দুক আছে একটা। ব্যবহার করার দরকার পড়ে না, ওটা কেবল ইজ্জত আর প্রতিপত্তির প্রতীক। কিন্তু ব্রিজমোহনের রক্তে যখন আগুন ধরে, ইচ্ছে হয় বন্দুকটা এনে লোকটার মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়।...ভাতিজা বাবুয়ার হেপাজতে বন্দুকের মতোই আরো ভয়ংকর জিনিস আছে। জমির ফয়েসলায় না আসার জন্যেই কাকাকে জিগ্যেস করেছিল, চুপচাপ লোকটাকে খতম করে দেবে কি না।

আগে হলে বা সরকারের লোক না হলে ব্রিজমোহন দ্বিধা করত না। কিন্তু এখন সময় বড় মন্দ। ভয়ংকর রকমের শোরগোল পড়ে যাবে।...ওর মুরুব্বি সেই প্রকাশ দীক্ষিতকে খুব

সহজে লোক মনে হয়নি। ওর মুখ থেকে সব জেনে শুনে আর বুঝেই সেধে আলাপ করতে এসেছিল। কিছু ঘটলে সে সোজা ব্রিজমোহনের দিকেই আঙুল তুলবে।

—নমস্কার ঠাকুর সাহাব, ভোর ভৈল রহুরাকা দরশন মিলল, দিনোয়া বড়িয়া বিতি—

ডাক-পিওন চলতরাম। হিন্দী ভাষী। কিন্তু রইস লোকদের সঙ্গে যথাসাধ্য ভোজপুরী চালাতে চেষ্টা করে। ভোর বলতে এখন সকাল সাড়ে দশটা পার। চলতরাম ওর ঠিক নাম কিনা কেউ জানে না। কিন্তু চিঠি বিলি করতে করতে চলার থেকে বসেই বেশি। পান তামাকু বা চিলিম পেলে তো কথাই নেই, তখন মশগুল হয়ে বসে। এর কথা তাকে বলে, তার কথা একে। এই গুণে ঠাকুর সাহেবেরও সে খাতিরের মানুষ।

—নমস্কার, খুশ রহ। চোখের ইশারায় সামনের জমি দেখিয়ে মুচকি হেসে জিগ্যেস করল, তুহার ডাক বিলি হো গইল?

ওখানেই দু'বেলা গোছা গোছা ডাক বিলি করে চলতরাম। এই মুচকি হাসির অর্থ বোঝা তার কাছে জলভাত ব্যাপার। ভোঁদা ইঁদুরের মতো মুখ চোখ করে জবাব দিল, ও জমিন তো আভি সাহারা (মরুভূমি) লাগলঅ, দুফর আওর সাঁঝোয়ামে ফিন আ-কর ডাক বিলি করব।

মনের মতো জবাব বটে। একজনের সঙ্গে একটা মেয়েকে না দেখে লোকজন যন্ত্রপাতিতে ভরা ওই জমি ওর চোখে সাহারার মতো খাঁ খাঁ, তাই দুপুরে আর সন্ধ্যেয় এসে ডাক বিলি করবে।

ব্রিজমোহনের পাকানো গোঁফজোড়া দিয়ে হাসি উপচে পড়ছে।—তুহারা ও ক্যাম্প ইন-চার্জ সাহাবকা রং-ঢং কইসন চলতৈ?

—হায় মালেক, কা কহি, রং-ঢঙকা জোয়ারিসে এ ভাদুয়ামে (ভাদ্র মাসে) ফাগন আ গইলঅ।

ব্রিজমোহন হাসি মুখে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বলে গেল, কোনো খবর থাকলে যেন দুফরে বা সাঁঝে পান-তামাক খেতে আসে। চলতরাম এটুকুতেই কৃতার্থ। খবর না থাকলেও খবর তৈরি করে নিয়ে যেতে কতক্ষণ?

ঘরে ফিরে দেখে যার জন্য ভিতরটা উদগ্রীব হয়েছিল সেই তোতারাম দাওয়ায় একটা ছোট মাচিয়ার ওপর বসে। কিন্তু সেখানে তখন আরো ছ'সাত জন লোক মহারাজার দর্শনের আশায় বসে আছে। এটা প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। কেউ খুব ছোট জোতদার, ঋণের টাকা শুধতে না পারায় দর্শনের কর্তব্য করে যায়, কারো ওপর তার মস্ত খাটাল দেখাশুনা আর সেখানে লোক খাটানোর ভার, কেউ গঞ্জে মহারাজের দুধ-দই-ননী বিক্রির দালাল, কেউ চাষীদের মোড়ল, কেউ সবিনয়ে পুরনো আরজি স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে, কারো বা নতুন আরজি বা প্রত্যাশা নিয়ে আসা। সকালে বা বিকেলে দাওয়ার ওপর গোটাকতক ছোট মাচিয়া আর গোটা দুই বড় চার-পাইয়া পাতা থাকে। মর্যাদা অনুযায়ী আগন্তুকরা কেউ একক আসনে অর্থাৎ ছোট মাচিয়ায় বসে, সাধারণেরা দুতিন জন করে বড় চার-পাইয়ায় বসে। আরো নিম্ন শ্রেণীর অচ্ছুত দর্শনার্থী এলে তারা দাওয়ার উঠোনে বসে। সভা ভাঙলে উঠোনে গোবর গঙ্গাজলের প্রলেপ পড়ে।

উঠোনে কেউ ছিল না, সকলেই দাওয়ায় বসে। আঙ্গনায় মহারাজের পা পড়তেই মাচিয়া আর চার-পাইয়া ছেড়ে সকলে উঠে দাঁড়ালো, আনত হল। সেই ফাঁকে ব্রিজমোহনের দু'চোখ

এক লহমার জন্য তোতারামের মুখের ওপর। এটুকুর অর্থ তোতারাম ভালোই জানে। অর্থাৎ এদের সামনে একটিও দরকারি কথা নয়। খুশি মুখে সকলকে একবার দেখে নিয়ে মহারাজ তার স্পেশাল মাচিয়ায় বসতে বসতে মাথা নেড়ে সকলকে আসনস্থ হবার পরোয়ানা দিল। দু-একজনকে কুশল প্রশ্ন করে কৃতার্থ করল, তারপর চাউনি যেন এই সবে তোতারামের মুখখানা আবিষ্কার করল।—কা রে তোতারাম, লোহার গাঁওসে আনেমে তুহার তিন রোজ লাগলঅ বা?

—কা করে মহারাজ, তোহার খাতিরকে লিয়ে ঠাকুর কুন্দন সিং হমারাকে এইসন কম-কমসে (জাপ্টে জাপ্টে) প্রেম দরশাইলে কি হমারকে ছোড়াওত (ছাড়াতে) দুফরসে সাঁনঝ হো গইলঅ।

সকলে হাসছে। ব্রিজমোহনের মুখেও আত্মপ্রসাদের হাসি। জিগ্যেস করল, কুন্দন সিংকা হাল কইসন বা?

—কা কহি মহারাজ, উনকা ঝাণ্ডা আসমানসে উপর উড়ত।

—কুন্দন সিংকা রখসা-বন্ধন (রাখী বন্ধন) উপহার ছুবুয়াকা হাতোয়াসে হামে দে গেইলঅ...হমারা ভেট-উপহার উনকা পসনমে আইল কি না?

—পসন! বিশোয়াস না হই, তোঁহার উপহার দেখিকে ঠাকুর কুন্দন সিংওয়াকা দোনো আঁখিয়া কটরাসে নিকল করকে নাকিয়াতক পৌঁছ গইলঅ, ওকরা আধা ঘণ্টা বাদ আপনে হাতোয়া দোনা আখিয়াকে জায়গামে বইঠা দেলেঃ।

আর যারা উপস্থিত তারা যা বোঝার ভালোই বুঝছে আর হাসছে। ভেট দেখে যার এই অবস্থা হয় তার ঝাণ্ডা কেমন আসমানের ওপর ওড়ে বোঝো।

—এ তোতা তুহার বাতিয়ামে লাগাম দিহ! আর কা কা চিজ দেখ্‌লী?

—দেখনু বারগা বহল রহলঅ...আর যব হংগামে পর জোততিয়া, হাওয়াই জাহাজকি মাফিক গণগণ করতিয়া (বলছে জোয়াল পরালেই ওরা হাওয়াই জাহাজের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করে ছোটা শুরু করল)—আর দেখ্‌লী খাটাল খাটালে গোরু ভঁইষ বামারে (অঢেল) দুধ দহি ফেতিয়া, সর দহি দুধ খাইকে ধিয়ান-পুতান (ছেলেপুলেরা) সব মস্তিমে আওর মৌজমে রহতিয়া।

শুনে যেন খুশি ব্রিজমোহন।—বহুত আচ্ছা...তব তুকে খাইকে লিয়ে কা কা চিজ দিহলঅ?

—পাওভর ছাতুয়া ছটাক ভর নমক, এত্যা এত্যা বড়া রামলাড্ডু (পেঁয়াজ)—এত্যা এত্যা বড়া হারা হারা মরচাই। মুখখানা এবারে বেশ সীরিয়াস, কেমন করে ছাতু মেখে তা খেল দেখাতে দেখাতে বলল, এইস্যাকে মুঠা ভরকে সানত সানত (ছানতে ছানতে) রহলী আর যব এইসা করকে মুঠরা বাঁনধকে মু সে দহলী, তব এইসন মজগর (মজা) লাগত রহলঅ যাইসন পুরি জিলাবি ঝলক মারত।

এবারে সকলে জোরেই হেসে উঠল, কেবল তোতারাম বাদে। ব্রিজমোহনের উদ্দেশ্য ষোল-কলায় পূর্ণ, এই জন্যেই তোতারামকে ছাড়া তার চলে না। লোহার গাঁওয়ের যে বিরাট ভূস্বামীর এত নাম এত ডাক, আসলে সে কেমন লোক আর তার কেমন দিল বোঝো এখন।

ফাঁক পেলেই কুন্দন সিং-এর সঙ্গে নিজের তফাতটা এই ভাবে তোতারামের মারফত সকলকে বুঝিয়ে দিতে ছাড়ে না। যারা এসেছে এর পর তাদের নিয়ে ব্রিজমোহনের বিশেষ আগ্রহ নেই। দু'চার কথায় তড়িঘড়ি সকলকে বিদায় করে তোতারামের দিকে ঘুরে বসে জানতে চাইলো তার ফিরতে এত দেরি হল কেন আর সেখানকার খবর কি?

তোতারাম জানান দিল, খবর বিশেষ ভালো না, আর দেরি হবার কারণ, রাখী-বন্ধনের পরদিনেই ভোজির (বৌদির) প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন পড়েছে বলে কুন্দন সিং থেকে যেতে বলল, আসলে সে কি করছে না করছে আমার মারফত মহারাজকে সেটা জানানোর মতলব।

ব্রিজমোহন মাচিয়ার ওপর নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসেছে।—কেন, সে কি করেছে?

—গাঁয়ের সমস্ত অচ্ছুতদের আর শুধু গরিব মানুষদের ডেকে ভূমি-সেনাদের দিয়ে এন্তার লাড্ডু আর মিঠাই বিলিয়েছে—ওই দিনে তার মোকানের সামনে হাজারের ওপর অচ্ছুত ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী আর গরিব মানুষ জমায়েত হয়েছিল...আর একবার যখন কুন্দন সিং নিজের হাতে কয়েকজন অচ্ছুত বুড়ো-বুড়ীকে মিঠাই বিলি করেছিল তখন তার ফটক খিঁচে নেওয়া হয়েছে, বোধহয় খবরের কাগজে ছাপা হবে।

ব্রিজমোহনের ফর্সা মুখ রাগে লাল। ধুরন্ধর লোকটার এসব শয়তানি চট করে মাথায় আসে বটে। এক বছর আগে তার ওই হাতি মার্কা বহু মারা গেছে বলে তো তার দুঃখের শেষ নেই, বেঁচে থাকতে কোনদিন গা টিপে দেখেছে কিনা সন্দেহ। আর আজ তার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে এই লোক দেখানো ঘটা। এদিকে অচ্ছুত আর গরিবের রক্ত-মাংস নিঙড়েই তো তার এত দৌলত।

—আর ?

—আর তার ভূমিসেনারা কি কাজ নিয়ে আছে তাই দেখালো।

—কি কাজ নিয়ে আছে ?

—ভূমিসেনাদের দিয়ে লোক খাটিয়ে অচ্ছুতদের জন্য আরো একটা কুঁয়া আর একটা পুকুর কাটিয়ে দিচ্ছে। আর লিখিপড়ি জানা ভূমিসেনারা তার পাঠশালে পড়ানোর কাজও করছে। তোতারাম আরো জানান দিল, লোক দিয়ে কুন্দন সিং তাকে পাঠশালা দেখতেও পাঠিয়েছিল। আগে থেকে শেখানো ছিল নিশ্চয়, তাই তোতারাম গিয়ে দেখে ভূমিসেনা মাস্টাররা অচ্ছুত পড়ুয়াদের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে পড়া শেখাচ্ছে।

রাগে ব্রিজমোহনের মুখ দিয়ে একটা অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে আসছিল। তারপর গুম খানিক।

তোতারাম এর পর দু'দফা খারাপ খবরের ফিরিস্তি দিল। গত দু' বছরের মধ্যে হরিজনদের ওপর যত অত্যাচার হয়েছে দিল্লিতে তার খাতা খোলা হয়েছ। সে খাতায় ব্রিজমোহনের নামও আছে, আর দ্বিতীয় হল ভূস্বামীদের নিমকমটেকস (ইনকামট্যাক্স) আর দৌলত ফাঁকির লিস্টিমে ব্রিজমোহনের শির সবার ওপরে। কুন্দন সিং খুব মিঠা করে মহারাজকে জানাতে বলেছে, সে মুশকিলে পড়লে তারও দুখ হবে, তাই এখন খুব ঠাণ্ডা মাথায় চলা দরকার, আর

নিজের বুদ্ধিতে না চলে পাকা লোক দিয়ে তার দৌলতের হিসেব যেন খুব সাফ রাখে।

ব্রিজমোহন গর্জন করে উঠল, সব ঝুট। অগর কুছ অহত তো ওকরাকে (ওর) ভাইয়াকা দুশমনি তু না জানথৈ?

তোতারাম অপরাধী মুখ করে মাথা নেড়ে সায় দিল, হাম তো জানথ মালিক...।

তাকে বিদায় করে ব্রিজমোহন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল। তার ধারণা, কুন্দন সিং ভাঁওতা দিচ্ছে, ভয় দেখিয়ে তাকে বে-সামাল করছে, শান্তি নষ্ট করছে। না, অচ্ছুত বা হরিজনদের ওপর অত্যাচার ব্রিজমোহন কখনো ঢাক পিটিয়ে করেনি। আর ছ'মাস ধরে ভাতিজা বাবুয়ারও সে রাশ টেনে ধরে আছে। হরিজন অচ্ছুতদের ওপর অত্যাচারের প্রমাণ কেউ করতে পারবে না। কুন্দন সিং নিজে নিশ্চয় অচ্ছুতদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে বলেই এখন তাদের ওপর নানাভাবে দরদ দেখিয়ে ঢ্যাড়া বাজাচ্ছে।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটাই তার দুশ্চিন্তার কারণ। আয় অনুযায়ী ট্যাক্স যা দেয় সেটা কিছুই নয়। আর দৌলতের হিসেবও খুব আট-ঘাট বেঁধে করে রাখেনি এটাও সত্যি কথা। কিন্তু পাটনার ইনকামট্যাক্স দপ্তরকে ডিঙিয়ে তার নাম দিল্লি দপ্তরের লিস্টিতে উঠবে কেন আর কি করে? কেউ উড়ো খবর দিতে চাইলেও সে তো পাটনার দপ্তরে দেবে। হ্যাত তেরি বহনকে...

ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও এ দ্বিতীয় ব্যাপারটা মনের তলায় কাঁটার মতো একটু খচখচ করতেই থাকল। যদিও কুন্দন সিংয়ের দৌলতের হিসেব খুব সাফ আছে এ সে একটুও বিশ্বাস করে না। কিন্তু তার পার পাবার রাস্তা খোলা আছে বলেই সে এই নিয়েও তাকে সতর্ক করার নামে অনায়াসে হুমকি দিতে পেরেছে।

...ভালোই করেছে। এই বিপদের সম্ভাবনার দিকটা সে তেমন ভাবেনি।

২

অচ্ছুত পাড়ার একেবারে শেষ মাথায় দুটো ছাপরা ঘর। এর পঞ্চাশ ষাট গজের মধ্যে আর কোনো ঘর নেই বা কারো বাস নেই। ঘর দুটো ছাড়িয়ে বিশ তিরিশ গজ উত্তরে গেলেই জঙ্গল শুরু। জঙ্গলটা প্রথম থেকেই ঘন নয় খুব। কিন্তু যত ভিতরে ঢোকা যায় ততো গহীন। শাল পলাশ মহুয়া আর সাবাই ঘাসের গভীর জঙ্গল। সমস্ত বিহারের পাঁচ ভাগের এক ভাগই বনভূমি। সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু এ-দিকের এই জঙ্গলটার ওপর সরকারের তেমন নজর নেই। বছরে দু'বছরে এক-আধবার বনবিভাগের লোক এসে অনেক গাছ উজাড় করে কাঠ নিয়ে যায় আর সাবাই ঘাস কেটে নিয়ে যায়। সাবাই ঘাস দিয়ে কাগজ তৈরি হয়। বনবিভাগের লোক এসে ওই জঙ্গলে হানা দিলে একটি মাত্র লোকের শান্তির ব্যাঘাত ঘটে, পাগলামি বাড়ে, মাথায় খুন চাপে। সে ওই দুই ছাপরা ঘরের বাসিন্দা বলদেও মল্লা।

তিতলি মল্লার বাপ। আর হীরা মল্লার দূর সম্পর্কের ভাই। হীরা মল্লার থেকে সাত আট বছরের বড়। বছর সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বয়েস। দিন রাতের বেশির ভাগ সময় মদের নেশায় চুর হয়ে থাকে। কিন্তু তখনো আর এই বয়সেও তার গায়ে অসুরের শক্তি। আর তেমনি ক্ষ্যাপা

মেজাজ। নেশা করলে বুকে থুতনি ঠেকিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে। মুখ তুললে দু'চোখ জবার মতো লাল। বনবিভাগের লোক জঙ্গলে হানা দিলে ভয়ে তিতলির মুখ শুকোয়। বাপ কখন জানি একটা খুন-খারাবী কাণ্ড করে বসে। বাপ ওই জঙ্গলটাকে নিজের খাস সম্পত্তি ভাবে। কাউকে জঙ্গলে ঢুকতে বা ওখান থেকে বেরুতে দেখলে মেজাজ বিগড়য়। বেখেয়াল বাপ যখন-তখন ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় এমন কি মদ-মাতি (মত্ত) অবস্থায় গভীর রাতেও ওই জঙ্গলে চলে যায়। একটা লানটেন পর্যন্ত সঙ্গে থাকে না। অন্ধকারেই যায়। ওই জঙ্গলটা যেন তার আরামের আর বিশ্রামের জায়গা। তিন বছর বয়সে মা মারা যাবার পর আট ন' বছর বয়েস পর্যন্ত ভাগাভাগি করে তিতলি তিন জায়গায় থাকত। কখনো বাপের কাছে ওই পাশের ছাপরা ঘরে, কখনো মায়ের নিজের অনেক ছোট বোন এক মৌসীর কাছে,আর কখনও হীরা ফুফুর কাছে। বেশিরভাগই থাকত মৌসী আর ফুফুর কাছে। কারণ তখন পর্যন্ত বাপের এমন উন্মাদ দশা না হলেও নেশার মাত্রা চড়লে তার মেজাজ অনেক সময়েই বিগড়োতো। এমনিতে এত ভালবাসে, কিন্তু সেই মত্ত অবস্থায় মারের চোটে এক-এক দিন আধ-মরা করে ফেলত ওকে। একবার তো গলা টিপে মেরেই ফেলেছিল প্রায়। তিতলি তখন মৌসী বা ফুফুর কাছে না পালিয়ে গিয়ে করবে কি? পরে অবশ্য বাপু নিজেই ওকে আনতে যেত। তখন তার চোখে জল দেখত। বলত আর কক্ষনো মারবে না। কিন্তু নেশা চড়লে ভুলে যেত। ওই বয়সেই তিতলি বাপের মেজাজ বুঝতে শিখেছিল। তার নেশা চড়তে দেখে বা চাউনি দেখে আগে থাকতে বিপদের আভাস পেত। নিঃশব্দে তখন বাড়ি ছেড়ে পালাতো। তাছাড়া মৌসী বা ফুফু নিজে থেকেও এসে ওকে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখত। ফুফুর থেকে মৌসীকেই অবশ্য তিতলির ঢের বেশি ভালো লাগত। মৌসী ওকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসত। ওর ওপর দখল নিয়ে মৌসী আর ফুফুর মধ্যে রেষা-রিষি আর ঝগড়া দেখে তিতলি মজাই পেত। মৌসীর সোয়ামী আর ছেলে আছে, ফুফুর কেউ নেই (কেন নেই বড় হয়ে তিতলি সেটা খুব ভালো করেই জানে)—ফুফু কোমর বেঁধে তার সঙ্গে এসে ঝগড়া করত, তোর তো সবই আছে, এই মেয়েটার দিকে আবার নজর দিস কেন?...ভাবতে গেলেও তিতলির বুকের ভিতরটা টনটন করে —কলেরা হয়ে সেই মৌসী অকালে মারা গেল। তিতলি আজ ভালো করেই জানে মৌসীর ওই মৃত্যু তার জীবনে কত বড় দুর্ভাগ্য।

সে যাক, বাপের কাছে থাকতেই তিতলি কত দিন আর কত রাতে দেখেছে মানুষটা যখন তখন ওই জঙ্গলে মাঝরাতে বেরিয়ে গিয়ে সকালে ফিরছে। শীত বরষা বা গরমী কাল কোনো সময় কামাই নেই। গরমের সময় জঙ্গলে বিষাক্ত সাপের ছড়াছড়ি, মহুয়া পাকলে ভালুকের উৎপাত বাড়ে সকলেই জানে। কিন্তু বাপুর ভয়-ডর নেই, আর আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত কোনো অঘটনও হয়নি। জঙ্গলে যখন ঢোকে, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা থাকে অবশ্য, কিন্তু নেশায় চুর হয়ে থাকলে ওই ডাণ্ডা আর কি বা সহায়। তোতা-চাচা বেশ মজার কথা বলে। সাপুয়া বা ভালু নাকি ওর বাপুর রক্তে নেশার গন্ধ পায়, মাতোয়ালা হবার ভয়ে তারা কামড়ায় না বা কাছে ঘেঁষে না।

তিতলি সেদিন বিকেলে এসে দেখে, যে ঘরটায় বাবা থাকে, বাইরে থেকে সেটার শিকল তোলা। অর্থাৎ বাপু জঙ্গলে গেছে।

ছেলেবেলায় বলদেও মল্লাকে স্ব-জাতের মানুষেরা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ গোছের একজন ভাবত। জাতের পেশা নৌকো বাওয়া। কিন্তু তাকে কোনদিন ওই পেশার দিকে এগোতে দেখা যায়নি। খুব ছেলেবেলা থেকে তার গানবাজনার দিকে ঝোঁক, আবার লেখাপড়ার দিকেও। পাঠশালায় পড়েছে, আড়াই ক্রোশ হেঁটে যাতায়াত করে চার পাঁচ বছর স্কুলেও পড়াশুনা করেছে। সব থেকে বেশি ঝোঁক ছিল যাত্রাগানের দিকে। দশ ক্রোশ দূরেও ভালো কোনো নোটঙ্গী দল এসেছে শুনলে তাকে বাড়িতে আটকে রাখা যেত না। মারো ধরো সে পালাবেই। নিজেরও সুন্দর গানের গলা ছিল, কোথাও কারো কাছে তালিম নেয়নি, শুনে শুনে শেখা। নিজেই আবার ছড়া বেঁধে নিজের খেয়াল খুশির সুরে গাইতো। তাও সকলের ভালো লাগত, কান পেতে শুনত। জাতের লোকেরা ভাবত কালে দিনে এই ছেলে বিশেষ একজন হবে।

সেই পথেই এগোচ্ছিল। স্কুলের পড়া বন্ধ হতে যাত্রা-পালাই তার ধ্যান জ্ঞান। বই যোগাড় করে তার মধ্যে ডুবে থাকত। রামায়ণ মহাভারতেই তো কত পালার ছড়াছড়ি, ভাগবতে কিষণজী আর বলরামের কত লীলা, বেহুলা-লখিন্দর চাঁদ সওদাগর সাবিত্রী সত্যবান— বলদেওর কাছে এ তো সবই জীবন্ত চরিত্র। পালা তো আর পাঁচরকমের হয় না, তাই পালা লেখার থেকে এ-সব পালার জন্য নতুন গান বাঁধার দিকেই ঝোঁক বেশি। নিজে গান বাঁধত, নিজে সুর দিত, নিজে গাইত। জোয়ান বয়সের আগেই স্বজাতের মধ্যে সে গর্ব করার মতো একজন হয়ে উঠেছিল।

...নিজের এই জগৎ সৃষ্টির শুরুতেই বলদেওর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেল একটা। গলাতে কি একটা রোগ দেখা দিল। গুটি গুটি দানায় গলার ভিতরটা ছেয়ে গেল। অবিরাম কাশি আর যন্ত্রণা। অনেক টোটকা টাটকি করল, অনেক তাবিচ কবচ পরল, কিন্তু গলা আর সারে না, গলার আওয়াজও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শেষে শহরের নামকরা বয়েদের কাছে গিয়ে ধন্না দিতে হল। গলার ঘা আর গুটি যদি সারল, সেই স্বর আর ফিরে এলো না। গলার আওয়াজই কিরকম ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই রাগ বেশি, গোঁ বেশি, মান অভিমান বেশি। এই আঘাতের ফলে নিজের ওপর আক্রোশ, শিউজী কিষণজী হনুমানজীর ওপর আক্রোশ, যারা তাকে ভালবেসে সহানুভূতি দেখাতে বা উপদেশ দিতে আসে, তাদের ওপরেও ক্ষিপ্ত।

এই আক্রোশে জোয়ান বয়সের আগেই সে মদ ধরেছিল।

...ক্রমে একমসয় ভবিতব্য মেনে নিয়েছে। রোজগার না করলে মদের যোগানই বা আসে কোথা থেকে। বছর দুই বাদে আবার কাজে মন দিয়েছে। গলায় গান না থাক, সুর তো আছে, দেখা গেল গান বাঁধার ক্ষমতা আগের থেকে বেড়েছে বই কমেনি। নিজের মাথা খাটিয়ে ছকে-বাঁধা পালার রস অদল-বদল করেও আসর জম-জমাট করে তুলতে পেরেছে। বছর কয়েকের মধ্যে আবার সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। নিজের গানের ভূমিকাই শুধু গেছে। কিন্তু তার বাঁধা পালায়, তার বাঁধা সুরের গানে এক-একটা নোটঙ্গী দল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বড় বড় নোটঙ্গী দল তার কাছে সেধে এসেছে। বলদেও মল্লার কোনো পিছুটান নেই, কারো ওপর মায়া

মমতা নেই। যে দল বেশি টাকার টোপ ফেলবে আর দামী মদের বোতল এগিয়ে দেবে—সে সেই দলের কর্ণধার।

বলদেও মল্লার প্রধান শত্রু মদ। দ্বিতীয় শত্রু নিজে। নিজে বলতে তার দুর্জয় ক্রোধ।

এই দুই শত্রু তাকে খেয়েছে। তার সর্বনাশ করেছে। অথচ তার মতো দরদী শিল্পী শুধু নিজের জাতের মধ্যে কেন, সমপর্যায়ের অন্য সমাজের মধ্যেও দ্বিতীয় নেই। আর শান্ত থাকলে তার বুক-ভরা ভালবাসার স্পর্শ তিতলিও ছেলেবেলায় কি একেবারে পায়নি? ওর খাওয়া পরার দিকে চোখ, স্বাস্থ্যের দিকে চোখ, কখনো এতটুকু অসুখ হলে তার সে কি উৎকণ্ঠা আর উদ্‌বেগ। খুব ক্বচিৎ হলেও এখনো তিতলির মনে হয় তার দিকে চেয়ে বাপুর দুই বিমনা চোখে স্নেহ উপচে উঠছে, সেই স্নেহ বুঝি জল হয়ে গাল বেয়ে নেমে আসবে।

...তবু এই বাপুকে তিতলি ঘৃণাই করে। সময় সময় মনে হয় এত ঘৃণা পৃথিবীতে সে আর কাউকে করে না। এই রাগ আর বিতৃষ্ণার সবটুকুই মায়ের কারণে। তিতলির জীবনে মা আর কতটুকু ছিল? সাড়ে তিন বছর। মায়ের মুখও মনে পড়ে না, কখনো-সখনো ভারি সুন্দর একখানা মুখ কল্পনায় আসে, আর সময় সময় কিছু কিছু ধু ধু দৃশ্য চোখে ভাসে। সেই কল্পনার মুখ ওকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে খুব মিষ্টি সুরে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতো।...কোথায় যেন বেশ বড় আর সুন্দর বাড়িতে ও থাকত। সে বাড়িতে খুব গম্ভীর গোছের একজন বয়স্ক লোকও থাকত, ওর সঙ্গে কত মজা করত, খেলা করত, সেই লোকটা মেঝেতে উপুড় হয়ে ঘোড়া হত, আর তিতলি তার পিঠে চেপে হ্যাট-হ্যাট করত আর খিলখিল করে হাসত। ...সে কি তার মামাবাড়ি...আর সেই লোকটা তার মামা? কারণ আট-ন' বছর বয়েসের সময় তিতলি তার ফুফু আর মৌসীর কাছে শুনেছিল, দু'বছর বয়সে ওকে নিয়ে তার মা বাসন্তী (সকলে বলত বসন্তীয়া কি মিষ্টি নাম মায়ের!) বাবাকে ছেড়ে এক মামার কাছে চলে গেছল। তারপর আরো দেড় বছর বাদে অর্থাৎ তিতলির সাড়ে তিন বছর বয়সে এক সন্ধ্যায় তার মা ওকে এই বাপুর কাছে রেখে সেই রাতেই আবার চলে গেছল। এর দিন তিন চার বাদে সেই মামাবাড়ি থেকে মায়ের মৃত্যুর খবর এসেছে।

...তিতলি ফুফু আর মৌসীর কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছে মামাবাড়ির সেই লোক এই রকম ঢ্যাঙা রোগা বা তার এই গোছের মুখ কিনা—যে ওর সঙ্গে খেলা করত, ঘোড়া হয়ে ওকে পিঠে তুলত। কিন্তু এই কৌতূহলের জবাবে ফুফু বা মৌসী কিছুই বলতে পারত না।

...কিন্তু অনেক পরে, মৌসী মারা যাবারও অনেক বছর পর থেকে এ পর্যন্ত তিতলি তার মায়ের সম্পর্কে অনেক জেনেছে। ফুফুর মুখে শুনেছে। যত জেনেছে যত শুনেছে, বাপের ওপর রাগ আর ঘৃণা ততো বেড়েছে। কান বিষিয়েছে, মন বিষিয়েছে।

মা বাসন্তীর সতেরো বছর বয়সে বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ফুফু কেন, বেঁচে থাকতে মৌসীও বলত রূপে গুণে এমন মেয়ে হয় না, জাত বর্ণ দেখতে গেলে একটু উঁচু পর্যায়ের মানুষ ছিল মায়ের বাবা। তাছাড়া কাঠের ব্যবসায় তার অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। মৌসীর অন্তত বাপের বাড়ির গর্ব খুব ছিল। বলত তার বাবা গোঁড়া মানুষ হলে এ বিয়ে হত না। বাবার গুণী জামাইয়ের সাধ ছিল। জামাইয়ের গুণ দেখেই খুশি মনে তার হাতে মেয়ে দিয়েছিল।

হ্যাঁ, মায়ের পঞ্চমুখে প্রশংসা ফুফুও করত। তার মুখে শুনেছে তিতলির জন্মটাই নাকি এক আশ্চর্য ব্যাপার। তোর বাপ তো যতক্ষণ মাথা ঠিক থাকে পালা লেখে গান বাঁধে আর সুর লাগায়—আর বাকি সময় পেট-ভর শরাব ঠেসে মাতোয়ালা হয়ে থাকে—বালবাচ্চা হবে কি?

...বিয়ের চার বছর গড়িয়ে যায়, ছেলেপুলে হয় না, এ-দিকে মায়ের নাকি একটা বাচ্চার দারুণ সখ। শিউজীর মন্দিরে পুজো দিচ্ছে, মানত করছে, তাবিজ কবচ নিচ্ছে—কিন্তু কিছুই হয় না। একদিন মা স্বপ্ন দেখল ত্রিশূল হাতে জটাজূটধারী সাধু, তার অঙ্গ দিয়ে জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে—সে মাকে বলছে, বাচ্চা পেতে হলে তোর মরদকে তিন মাহিনা শরাব না ছুঁয়ে থাকতে হবে।

...এরপর বাপুর সঙ্গে মায়ের লড়াই। মা এমনিতে খুব ভালো কিন্তু সে নাকি দারুণ জিদ্দি মেয়ে ছিল। স্বপ্নের কথা শুনে বাপু প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। শেষে বিরক্ত হয়েছে, রাগ করেছে। তিন মাস ছেড়ে তিন দিনও সে মদ না খেয়ে থাকতে পারবে না। ওদিকে মাও নাছোড়। তিন মাসের জন্য মদ না ছাড়লে বাপুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, বাপের বাড়ি চলে যাবে। বাপু মাকে বুঝিয়েছে ওটা তার মনের চিন্তা, মা ভাবত অত বেশি মদ খায় বলেই বালবাচ্চা হয় না। মা অবশ্য তাই ভাবত, আর ফুফুকে সেকথা বলতও। বাপুর ধারণা ওই চিন্তা থেকেই মা অমন স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু মা কোনো কথা শুনবেই না, তিন মাসের জন্য শরাব ছাড়তেই হবে। বাপু দু'দুবার চেষ্টা করেও পারেনি। দু'তিন দিন পরেই আবার আকণ্ঠ মদ গিলে মাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্য গায়ে হাত তুলেছে পর্যন্ত। মা তখন শেষ রাস্তা বেছে নিয়েছে। বাপু একদিন ঘরে ফিরে দেখে মা নেই। নেই তো নেই, কোথাও নেই। ফুফু বলে, মদ খেয়ে বাপু মায়ের ওপর অত্যাচার করত, শরাব পেটে পড়লে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। কিন্তু এমনিতে মাকে দারুণ ভালও নাকি বাসত। ভালো অবস্থায় মাকে চোখে হারাতো। মায়ের গানের গুরু বলতে গেলে তো বাপুই। বিয়ের আগেও মায়ের গানের ঝোঁক ছিল খুব, সুরেলা জোয়ারী গলা ছিল। কিন্তু মায়ের আসল শিক্ষা আর তালিম সব বাপুর কাছে। ফুফুরা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে, দারুর নেশায় বেএকতিয়ার হয়ে ঘরে ফেরার পরেও মাকে গানের তালিম দেবার ব্যাপারে কামাই নেই। আর তখন ভুলচুক হয়ে গেলে বাপু চড় মেরে মায়ের গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিত। অন্য সময় নেশা করেও গায়ে হাত তুললে মা ফুঁসে উঠত, কিন্তু তালিমে ভুল করে ও-ভাবে মার খেলেও কিছুই বলত না।

...যাক, সেই মা ঘর ছাড়া হতে বাপুর মাথায় প্রথমে খুন চেপেছিল। বাপের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যায়নি বুঝেছে। আক্রোশে ক'টা দিন শরাব ছাড়া আর কিছু পেটেই দেয়নি। শেষে আর থাকতে না পেরে মাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য শ্বশুরবাড়ি এসেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে তিন মাস মদ খাবে না। মা বিশ্বাস করেনি। অমন প্রতিজ্ঞা বাপু আরো কবারই করেছে। মা বলেছে, মুখের কথায় হবে না, বাজনা ছুঁয়ে আর সরস্বতীয়া মাইর নাম করে শপথ করতে হবে তিন মাস শরাব খাবে না।

বাপু শপথ করেছে। সত্যিই খায়নি। কিন্তু ওই তিন মাস তার হাতে মাকে কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে ভাবা যায় না। নেশার পিয়াস মাথায় চড়লে বাপু পাগলের মতো হয়ে যেত।

তখন কি মার মারত মাকে, মেরে এক একদিন আধমরা করে ফেলত। কিন্তু মা মুখ বুঁজে এই অত্যাচার সহ্য করত। বাপুর নেশার কষ্ট কমানোর জন্যে কতভাবে চেষ্টা করত ঠিক নেই— বয়েদের কাছ থেকে এ জন্য ওষুধও নিয়ে আসত। রেগে গিয়ে বাপু এক-একদিন সেই ওষুধ মায়ের মুখে ছুঁড়ে মারত।

...তিন মাস কাটার আগেই মা বুঝেছিল পেটে বাচ্চা আসছে। কিন্তু তিন মাসের আগে বাপুকে কিছুই জানতে দেয়নি।

এই করে তিতলির জন্ম। এই আদরের নাম বাপুই নাকি রেখেছিল। তিতলির একটা পোশাকী নামও আছে। কেশর। কিন্তু অপরে ছেড়ে এই নাম সে নিজেই ভুলতে বসেছে।

ও আসার পর আনন্দের চোটে বাপু নাকি বলেছিল মদ আর খাবেই না। কিন্তু তিন মাস বাদে মৌজের জন্য একটু আধটু খেতে শুরু করে আগের থেকেও ভয়ংকর শরাবী হয়ে উঠল। ডবল মদ খেতে লাগল। আর নেশা চড়লেই তার বাদশাই মেজাজ। পানের থেকে চুন খসলে মাথায় রক্ত চড়ে। মারের চোটে তখন হাড় কালি। আর এত শরাব খেলে পালা লেখা গান বাঁধা আর সুর বাঁধার কেরামতি কমতে বাধ্য। নৌটঙ্গী দলের কর্তারাও তার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। বাপুর রোজগার কমতে লাগল। এমনিতেই মাকে খুব কষ্ট করে সংসার চালাতে হত। তার ওপর তিতলি আসাতে খরচ বেড়েছে। কিন্তু বাপুর রোজগারের বেশির ভাগ তো নেশাতেই চলে যেত। সেই রোজগারও কমছে অথচ নেশা বাড়ছে। বাপুর নিজের প্রতিভার গুণে আর মায়ের গানের টানে বাড়তি কিছু বড়লোক সমজদারের আনাগোনা ছিল। এদিক থেকে বাপু কোনো সংস্কারের ধার ধারত না, তারই শিক্ষায় আর তালিমে বহু এমন মনমাতানো গান গায়, সে কি কাউকে না শুনিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজে গাইবার জন্যে? নিজে শোনার জন্যে? এই পয়সাঅলা সমজদারদের কয়েকজনকে নিয়ে বাড়িতে প্রায়ই গানের বৈঠক বসত। মাও আপত্তি করত না, খুশি মনেই অতিথিদের গান শোনাতো। লজ্জারই বা কি আছে, ওই সমজদারদের বহুরাও তো গান শুনতে আসত, দারুণ তারিফ করত, আর তেমনি ভালও বাসত।

...কিন্তু মা বাসন্তী দেখত, রোজগারে টান পড়লেও বাপুর নেশার রসদের অভাব হত না। বুঝতে পারত, রসদ বাপুর ওই রহুয়া দোস্তরাই যোগাতো।

...পনেরো ষোল বছর বয়েস হতে হীরা-ফুফুর মুখে মায়ের জীবনের মর্মান্তিক পরিণামের কথা শোনার পর থেকেই বাপুর ওপর তার কান বিষিয়েছে, মন বিষিয়েছে। বাপুকে সে ভীষণ ঘৃণা করে।...তার অত্যাচারে উৎপীড়নে পাগল হয়েই তিতলিকে নিয়ে মা বাসন্তীয়া ঘর ছেড়েছিল, বাপকে ছেড়ে চলে গেছল। তিতলির তখন বছর দেড়েক মাত্র বয়েস। দুধটুকুও জুটত না। নেশার আগুন মাথায় চড়লে বাপু মাকে কোনদিন হয়তো খুন করেও ফেলতে পারত। কারণ মায়ের মেজাজও তখন ভীষণ তিরিক্ষি। বাপুকে কথার আগুনে ঝলসে দিতে চাইতো। ফুফু নিজেও বানোয়ারা গ্রামে গিয়ে মায়ের ওপর বাপুর সেই অকথ্য অত্যাচার নিজের চোখে দেখেছে, আর অত মারের পরেও মায়ের তেজ দেখেছে। বাপু নাকি তখন বানোয়ারা গ্রামেই থাকত।

...ফুফুর মুখ থকেই তিতলি অনেক পরে জেনেছে ওকে নিয়ে বাবার কাছ থেকে পালিয়ে

মা মামাবাড়ি যায়নি, এখানে বা মৌসীর কাছেও আসেনি। বাবার সেই বড়লোক দোস্তদের একজনের আশ্রয়ে ছিল, মায়ের গান শুনে মুগ্ধ হত যারা তাদের একজন। বাপু তার বা মায়ের নাগাল পেতে চেষ্টা করেছিল কিনা বা কতটা চেষ্টা করেছিল ফুফু জানে না। মাস দুই তিনের জন্য নিজেই সে এরপর কোথায় চলে গিয়েছিল। তারপর বানোয়ারা গ্রাম ছেড়ে বাপু বরাবরকার মতো এই ছুপা গাঁওয়ে চলে এসেছে। তখন থেকেই তার মাথায় গোলমাল দেখা দিতে শুরু করেছে। হাতে টাকা এলে শরাব ছাড়া আর কিছু বড় খেত না। টাকা না থাকলে আরো ক্ষেপে যেত। কিন্তু টাকা এখানে বসেও বাপু মন্দ রোজগার করেনি। তার খ্যাতি তো সর্বত্র ছড়িয়েছিল। তখন পালা-টালা আর লিখত না, কিন্তু মন দিলে তখনো চমৎকার গান বাঁধতো, সুর লাগাতো। তাই নোটঙ্গী দলের অনেকে তার কাছে আসত। কিছু রোজগার হত। তাছাড়া এখানে দু-একজন ভক্তও জুটেছিল। তাদের মধ্যে তোতারাম একজন। তার বাস ছিল লোহার গাঁওয়ে। এখানে এসে ঠাকুর ব্রিজমোহনের নেকনজরে পড়ে গেছল। তার আশ্রয়েই থেকে গেছে, তার কাজকর্ম দেখে শোনে। ঠাকুর ব্রিজমোহনের ছিকরেটারি বলে নিজের পরিচয় দেয়। অনায়াসে গরিব বড়লোক সকলের ঘনিষ্ঠ আর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, এমন একটি চৌকস লোক ব্রিজমোহনের দরকার ছিল। লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষ কুন্দন সিংয়েরও সে স্নেহের পাত্র, তার ঘরের খবর মনের খবর রাখে—এ জন্য ব্রিজমোহনের কাছে তার সব থেকে বেশি কদর। তোতারামের গানবাজনার খুব সখ ছিল, আর তিতলির বাপের নামডাকও শোনা ছিল। এই সুবাদেই তার আনাগোনা আর বাপুর ভক্ত হয়ে ওঠা। তোতারামের গান-বাজনার নেশা অবশ্য অনেক দিনই গেছে, তার বদলে গাঁজাভাঙের নেশা অনেক প্রিয় হয়ে উঠেছে। তবু কেবল এই একজন ভক্তই বাপুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি। আসে, দেখাশোনা করে, বাপু অসুস্থ হয়ে পড়লে ব্রিজমোহনের নাম ভাঙিয়ে বয়েদ (চিকিৎসক) ধরে নিয়ে আসে। বাপু রেগে গিয়ে মারতে এলে বা গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে চাইলেও তোতা-চাচা রাগ করে না—বেরিয়ে এসে হাসে।

...বাপুকে ছেড়ে চলে যাবার ঠিক দু'বছর পরে—তিতলির যখন সাড়ে তিন বছর বয়েস—মা বাসন্তীয়া একদিনের কয়েক ঘণ্টার জন্য এই ছুপা গাঁওয়ে বাপুর কাছে এসেছিল। তার আসার খবর ফুফু বা মৌসীও জানতো না। পরদিন জেনেছে।...এক সন্ধ্যার অন্ধকারে তিতলিকে নিয়ে এসেছিল।

তাকে বাবার কাছে রেখে যাবার জন্যই এসেছিল। মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই মা আর ওকে নিজের কাছে রাখতে চায়নি। ওকে রেখে রাতের অন্ধকারেই আবার চলে গেছে।...পরদিন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তিতে মেয়ের হাত ধরে বাপু মৌসীর কাছে হাজির। তখনই মৌসী আর ফুফু জেনেছে, মা এসেছিল, মেয়েকে রেখে আবার চলে গেছে।...না, সাড়ে তিন বছর বয়সের এ-সবের কোনো স্মৃতিই তিতলির কল্পনাতেও নেই। সে হয়তো তখন ঘুমোচ্ছিল। বাপু তখনকার মতো ওকে মৌসীর কাছে রেখে চলে গেছল।

...আট ন' বছর বয়সে তিতলি মৌসীর মুখে শুনেছিল, এর পনেরো বিশ দিন বাদে মায়ের মৃত্যুর খবর এসেছিল। মায়ের মারী (বসন্ত) রোগ হয়েছিল, তাইতে মারা গেছে।

...আর ষোল বছর বয়সে জেনেছে মৌসী সত্যি কথা বলেনি। আর জেনেছে মা ওকে নিয়ে যেখানে ছিল সেটা ওর মামা-বাড়ি নয়। যার কাছে এই দু'বছর ছিল সে-ও তার মামা নয়। আর জেনেছে, মায়ের মৃত্যুর খবর পনেরো বিশ দিন বাদে আসেনি, এসেছিল ওকে বাবার কাছে রেখে যাবার তিন দিনের মধ্যে।

...আর জেনেছে, তার মা বাসন্তীয়া মারী রোগে মারা যায়নি। মা আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার সংকল্প নিয়েই এখানে এসে ওকে বাপুর কাছে রেখে গেছে।

সব ফুফু বলেছে। তাকে আর মৌসীকে খবরটা জানিয়েই বাবা পাগলের মতো বেরিয়ে গেছল। তারপর মাস দেড় দুই তাকে আর কেউ ছুপা গাঁওয়ে দেখেনি। আবার যখন ফিরেছে তখন অনেক ঠাণ্ডা। এন্তার মদ খেত, কিন্তু নেশা চড়লে মাথায় আগুন জ্বলত না। গুম হয়ে থাকত। এখনো বেশিরভাগ সময় যেমন থাকে। মেয়ের কথা ভেবেই হয়ত কাজেকর্মে মন দিতে চেষ্টা করেছে। কিছুকালের জন্য পেরেওছে। এই সুযোগেই বাপুকে নিয়ে ফুফু নোটঙ্গী দল খুলেছিল। বেশ ভালোই করছিল। কিন্তু তারপর আবার বাপুর মাথা বিগড়তে শুরু করেছিল। সারাক্ষণই মদে ডুবে থাকে, থাকতে চায়। থাকেও। তিতলির দশ এগারো বছর বয়েসের মধ্যে এই দলও ভেঙে গেছে।

বাপুর ধারে কাছে এখন আর কেউ ঘেঁষে না। এক তোতারাম আর তিতলি ছাড়া। ফুফুও তাকে এড়িয়েই চলে। বলে, যাব কি, দেখলেই তো টাকা চাইবে। কিন্তু তিতলির ধারণা, যে কারণেই হোক বাপুকে ফুফু একটু ভয়ই করে। নোটঙ্গী দল চালিয়ে ফুফু কত টাকা জমিয়েছে কোনো ধারণা নেই। হয়তো ভালো টাকাই হবে। নইলে এখনো এত সচ্ছলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে কি করে? তার কাছে যে ক'টা মেয়ে নাচ-গানের তালিম নিতে আসে তারা বলতে গেলে গরিবেরই মেয়ে। কি আর দিতে পারে। এছাড়া ফুফুর অন্য পথে কিছু উপার্জন আছে। সুদে টাকা খাটায়। কিন্তু এই উপার্জনও বড় চালে থাকার মতো কিছু নয়। অথচ এই এলাকার মধ্যে ফুফুকেই লোকে কিছু পয়সার মানুষ ভাবে। লোকে কেন, বাপুও ভাবে। খেয়াল হলে হঠাৎ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। খুব কমই অবশ্য। কিন্তু ফুফু তখন তটস্থ হয়ে থাকে। বাপু সোজা মেয়ের ঘরেই চলে আসে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে কোথাও কিছুর ত্রুটি আছে কিনা। তারপর ওকে জিগ্যেস করে, ভালো খাওয়া-দাওয়া জামা-কাপড় সব পাচ্ছিস তো?

জাঁদরেল ফুফুর ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে তিতলির মজা লাগে আবার অবাকও হয়। ওর জবাবের ওপর যেন তার বাঁচা-মরা। তিতলি অবশ্য সব-সময়েই বলে ফুফু ওকে দারুণ ভালো রেখেছে। বাপু চলে যাবার পর ফুফু ঠেস দিতে ছাড়ে না, বলে রাজকন্যের হালে মেয়েকে রাখা হয়েছে, তবু যাচাই করা চাই, এত যখন দরদ নিজের কাছে নিয়ে রাখলেই তো পারো!

তিতলির মুখেও তখন সাফ কথা।— এরকম শোনার পরেও তুমি এই দায় ঘাড়ে নিয়ে আছ কেন, পাঠিয়ে দিলেই তো পারো?

ফুফুর তক্ষুনি নরম মুখ আর মাখন-গলানো কথা।—তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না জানে বলেই তো তোর বাপের এত লম্বা-লম্বা কথা—তুই রাগ করিস কেন, তুই আমার কতখানি জানিস না?

...তিতলি মোটামুটি জানে। আঁচ করতে পারে। পারে বলেই ফুফুর ওপর তার এতটুকু টান নেই, মায়া নেই।...যে মেয়েগুলো ফুফুর কাছে নাচ গান শিখতে আসে, তাদের ভবিষ্যতের বেসাতি কি হবে তিতলি তা খুব ভালো করেই অনুমান করতে পারে।...তিতলির খাওয়া-পরা সাজ-পোশাক গান-বাজনার দিকে ফুফুর প্রখর নজর। সে-দিক থেকে রাজকন্যার হালেই তাকে রাখা হয়েছে। তার জন্যে ফুফুর অনেক খরচ হয় সত্যি কথাই। কিন্তু সেই কবে কার নোটঙ্গী দলের জমানো টাকা থেকেই তার জন্য এত খরচ হচ্ছে তিতলি বিশ্বাস করে না।... কোথা থেকে টাকা আসে। কোথা থেকে আসে ইদানীং তিতলি তা-ও আঁচ করতে পারে।...ঠাকুর ব্রিজমোহনের প্রশংসায় ফুফু সর্বদা পঞ্চমুখ। তার মতো হিম্মত আর দিলের মানুষ দশখানা গাঁও ঢুঁড়লেও নাকি একজনকেও পাওয়া যাবে না। তোতাচাচা তার দয়ায় আর পিয়ারের মানুষ সে এ-কথা বলতে পারে—কিন্তু ফুফু বলে কেন? স্বার্থ না থাকলে এই ফুফু কি মুখের কথাও খরচ করতে চায়?

...ভাবনাটা আরো টেনে বাড়ালে তিতলির মাথা গরম হয়ে যায়। রক্তে আগুন জ্বলে।...বাপুই বা কোন্ জোরের ওপর ভরসা করে মেয়েকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা হয়েছে কিনা দেখতে আসে? তার নিজের তো এক-পয়সা রোজগার নেই, গান-বাঁধা আর সুর-বাঁধা সেই কবে থেকে বন্ধ। তাহলে তার নেশার টাকা কে যোগায়? কাঁচা শরাবের বোতল তিতলি খুব ভালো চেনে। অচ্ছুতপাড়ায় থাকে, চিনবে না কেন? তাছাড়া মাসির ঘরে ও-রকম দু'চারটে বোতল মজুত থাকে। থানাদার হাবালদার বা ফুফুর চোখে সে-রকম বিশিষ্ট কেউ এলে তাদের আপ্যায়নের জন্য ঘরে রাখতে হয়। কিন্তু বাপুর ওই ঘরে ঢুকলে দু'চারটে খালি দামী বিলায়েতী বোতল হামেশাই গড়াগড়ি খেতে দেখে। এ-দেশের তৈরি যে-সব দামী জিনিস বড়লোকেরা খায় তাকেই ওরা বিলায়েতী বলে। তোতাচাচার মুখেই শুনেছে এ-সব জিনিসের অনেক দাম।...এ-সব জিনিস ওর আধা-উন্মাদ বাপুকে কে পাঠায়, কেন পাঠায়?...বাপুর ওই দুটো ছাপরা ঘরের একটা ভেঙেচুরে এখন মাটির সঙ্গে মিশতে চলেছে। কিন্তু অন্যটা, যেটাতে বাপু থাকে, সেটা বরষাতের আগে প্রতি বছর মেরামত করা হয়, নতুন করে ছাওয়া হয়। এটা হয় তোতাচাচার তদারকিতে। তিতলি জিগ্যেস করলে বলে তোর ফুফু টাকা দেয়। কিন্তু ফুফু কত দেবার মেয়ে সেটা ওর থেকে ভালো আর কে জানে?

তাহলে কে দেয়?

কেন দেয়?

বাপু কোন্ জোরের ওপর দাঁড়িয়ে ফুফুর ওপর চোখ লাল করে মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খবর নিতে আসে?

তোতাচাচা এখনো বাপুর কাছে আসে কেন? কেবল গুরুভক্তি?

রাগে দুঃখে এক-এক সময় তিতলির বুকের ভিতরটা ফেটে যেতে চায়।... ঠাকুর ব্রিজমাহন বড় হিম্মত আর মস্ত দিলের মানুষই বটে। তোতারামের মাথা কিনেছে, ফুফুর মাথা কিনেছে, বাপুর মাথাও কিনেছে।

আবার হিহি করে নিজের মনে হেসেও ওঠে এক-এক সময়।... সক্কলের সব আশার

ফানুস আশমানেই চুপসে যাবে। কারো নাগালের মধ্যে আসবে না। ...ওর নাম তো তিতলি।...পরজাপতি। তিতলির পরমায়ু কতটুকু? ক'দিন বাঁচে?...না বাসন্তীয়া বড় দেরিতে বাঁচার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। ওর দেরি হবে না। সেই দিন আসুক। ও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত বলেই অনায়াসে এমন বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছে। এই মাটির দুনিয়ায় আর পরোয়া করে চলার মতো কে আছে?

...বাপুকে ঘৃণা করে, কিন্তু আশ্চর্য, মাঝে মাঝে এসে তাকে না দেখে গিয়েও পারে না।...গুণ তো ছিল। অনেক গুণই ছিল। সেই গুণে ওর মা-কেও বশ করেছিল। কিন্তু শরাবে মাথা খেয়ে দিয়েছে। মাথা গেলে আর থাকে কি? এই মাথার মানুষের সামনে শরাবের বোতল নাচালে সে পৃথিবী বিকিয়ে দিতে পারে।

ঘরের শেকল তোলা দেখে তিতলি ঢিমেতালে ফিরে চলল। ঘর বন্ধ মানে বাপু জঙ্গলে। পনেরো বিশ গজ এগোতেই পিছন থেকে হাঁক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—এ তিত্‌লিয়াঁ—রুখ্‌ যা।

তিতলি ঘুরে দাঁড়ালো। জঙ্গলের দিক থেকেই শ্লথ পায়ে বাপু আসছে। শুখা গাছের মতো এখনো মস্ত কাঠামোর মানুষ। এক হাতে লোহার ডাণ্ডা। তিতলির সন্ধিৎসু চোখ তার অন্য হাতের দিকে। ওর ধারণা, নেশার রসদে টান পড়লে বা বৈচিত্র্যের খোঁজে বাপু নেশার শেকড়-বাকড় বা গাছ-পাতার তল্লাসীতে যায়। জঙ্গলে তো কত কিছুই থাকে। কিন্তু তার অন্য হাত খালি।

সামনে এলো। দু'চোখ ভেজা-ভেজা রকমের টকটকে লাল।—তু কাঁহা চলথ?

তিতলি জানান দিল, এমনি এসেছিল, দরজা বন্ধ দেখে চলে যাচ্ছিল।

—তো আ যা...

তিতলি মাথা নাড়াল। এই বাপকে বেশিক্ষণ বরদাস্তও করতে পারে না।...সাঁন্‌ঝ ভৈলী, অব চলনু...

কি মনে পড়তে লাল চোখ আরো লাল। গলাও চড়ল।—তোতা লোহার গাঁওমে ঘুমকে আগাইল কি নহী?

—হম না জানলী...

বাপুর মেজাজ আরো তিরিক্ষি।—ওক্‌রাসে দেখনেসে কহ দিবি ও শ্বশুরকা মু হম্‌ না দেখবু!

ক্রুদ্ধ পায়ে নিজের ডেরার দিকে চলল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তিতলি উল্টো দিকে পা বাড়ালো। রসদে টান পড়েছে বলেই বাপুর এই ঝাঁঝ। রসদ কোথা থেকে আসে আর কেন আসে আঁচ করতে পারে বলেই তিতলির মুখ খানিকক্ষণের জন্য গনগনে লাল। তিতলির আয়ু কম, কিন্তু তার আগে ওই ব্রিজমোহনের পরমায়ু কিছুটা ছেঁটে দিয়ে যেতে পারলে মনে আর কোনো খেদ থাকত না।

ফুফুর ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসে তোতারাম আড্ডা দিচ্ছে। তিতলিকে দেখে খুশির উচ্ছ্বাসে দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, আ যা মেরে মুনিয়া, হম তোঁহারি লিয়ে বৈঠল রহল।

ঘরের মাঝামাঝি এসে তিতলি দু' হাত কোমরে তুলে চোখে চোখ রেখে জবাব দিল, ডাগুাসে ঠাণ্ডা করত্ বারে (করার জন্য) তুঁহারে খাতির বাপু আঙ্গনামে খারত্ বহল।

ছোট চোখজোড়া একটু বড় আর গোল করার চেষ্টা তোতারামের। জানতে চাইলো, ঘর তো বন্ধ ছিল, গুরুজীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল। রাস্তায় ফেরার পথে শুনে নিশ্চিন্ত। মন্তব্য করল, তব্ ঠিক হ্যায়।

তিতলি তক্ষুনি বুঝে নিল কেন সব ঠিক হ্যায়। যে রসদের টানে বাপুর ওই গরম মেজাজ, ঘরে গেলেই সে তা পেয়ে যাবে আর ঠাণ্ডা হবে। অর্থাৎ তার 'চীজ্' সে ঘরে রেখেই এখানে এসেছ। কিন্তু তোতারামের ওপর তিতলির বড় একটা রাগ হয় না, বরং ভালো লাগে, মজাও পায়। বেচারা তোতাচাচা, অন্যের মন যুগিয়ে চলার পরিশ্রানেই এমন মজাদার মানুষটার জীবন কেটে যাচ্ছে। গম্ভীর মুখে জিগ্যেস করল, লোহার গাঁওসে কব্ আইল?

—আজ দুফরমে।

হাসি গেলার চেষ্টায় তিতলির গম্ভীর মুখে লালচে আভা। তার পরের প্রশ্ন, লোহার গাঁও থেকে ফিরতে এত দেরি হল কেন, সেখানে দুলারীর সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা, আর দুলারীর আপনা আদমী সত্যি ঘরে ফিরেছে কিনা।

শুনে তোতারাম দু' চোখ গোল করে রোগা লম্বা দেহটা টান করে বসল। তিতলি কি বলছে ঠিক-ঠিক মগজে ঢুকছে না যেন।—দুলারী লোহার গাঁওমে!...কব গইলী?

—রখ্ সাবন্ধনকা দুফরে...

ফ্যাল ফ্যাল করে আরো খানিক ওর দিকে চেয়ে তোতারাম হীরা মল্লার দিকে ফিরল।— সাচ্ হীবা দিদি?

হাসি গোপন করার চেষ্টায় হীরা মল্লা গালে হাত দিয়ে আর একদিকে চেয়ে ঘরের কিছু দেখছে। মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ সেই রকমই শোনা যাচ্ছে।

এই ফাঁকে তিতলি আরো একটু গম্ভীর হতে পেরেছে। না থেমে গড়গড় করে সমাচার শুনিয়ে গেল।...লোহার গাঁওয়ের রহুয়া কুন্দন সিং-এর রাখীবন্ধনের ভেট নিয়ে যে লোকটা ব্রিজমোহনের কাছে এসেছিল, ফেরার সময় তার সঙ্গে দুলারীর ডগরে (পথে) দেখা হয়েছিল। সে বলেছে, খুব সম্ভব দুলারীর মরদ ঘরে ফিরেছে, তাদের কানে এই-রকম একটা কথা এসেছে, তবে একেবারে ঠিক-ঠিক জানে না। শুনে দুলারীর নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত তর সয়নি, বাপের কথায় কান না দিয়ে বয়েল গাড়ি ভাড়া করে আধে ঘন্টির মধ্যেই লোহার গাঁওয়ে রওনা হয়ে গেছে—এখনো ফেরেনি।...তবে তোতাচাচা সেখানে গিয়ে দুলারীর সঙ্গে দেখা করতে যায়নি ভালোই হয়েছে, দুলারীর সেই আধা-পাগল মরদ যদি সত্যি ঘরে ফিরে থাকে, সে হয়তো তোতাচাচার মাথা ফাটিয়ে দিত, আর সেটা খুব আফসোসের বাত্ হত।

তোতারামের লম্বা শরীরটা মাচিয়ায় দুলছে, সে যেন একটু শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। এই সমাচার শুনে তার দেহের খাঁচা থেকে প্রাণের আধখানাই বেরিয়ে গেছে বুঝি। গলা দিয়ে দুটো অস্ফুট শব্দ বেরুলো, দুলারী বেইমান...!

দুলারী এই গাঁয়ের প্রৌঢ় পাঠশালার মাস্টার চুনীলালের মেয়ে। ঘরে মা নেই, আর বাপ

পাঁচতালে থাকে বলে মেয়ের সময়ে বিয়ে হয়নি। চুনীলাল বি এ পাশ, লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিংয়ের পাঠশালার মাস্টারজী ছিল, কৌশল করে সেখান থেকে তাকে ছাড়িয়ে এনে ব্রিজমোহন বেশি মাইনে দিয়ে এখানকার পাঠশালায় ঢুকিয়েছে। সে-জন্য নাকি চুনীলালের ওপর কুন্দন সিংয়ের খুব রাগ। ভয়ে আর সে লোহার গাঁওয়ের পথ মাড়ায় না। দুলারীর তখন একুশ বছর বয়েস। বেশ কালো আর মোটা-সোটা, কিন্তু মুখখানা মিষ্টি। এখানে আসার পর তোতারামের দিক থেকে প্রায় বছরখানেকের চেষ্টায় দুলারীর সঙ্গে তার ভাব-সাব এবং বিয়ে পাকা। আরো দশ বছর আগের কথা, তোতারামের তখন বছর তিরিশ বয়েস। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন আগে তোতারাম এমন একখানা কাণ্ড করে বসল যে চুনীলাল মাস্টার ভাবী-জামাইকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়ালো, আর বিয়ে তো বন্ধ করলই।

দোষের মধ্যে তোতারামের অল্প বয়েস থেকেই ভাঙের নেশা। ভাঙের মৌজ এলে তার হাত দুটো ডানা হয়ে আকাশে ওড়ে। সেই সময়েই দিল্লীর বড়ে সরকার থেকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর নাস-বন্দীর হিড়িকের ঢেউ গ্রামে গ্রামেও ভেসে এসেছে। ওই সরকারী লোকদের ধরা-করার ফলে এ-ব্যাপারে ছুপা গাঁওয়ের হাল ধরেছে পাঠশালার মাস্টারজী চুনীলাল। শিক্ষিত, বি-এ পাশ, তার ওপর নিজের একটা মাত্র মেয়ে, নাস-বন্দীর সপক্ষে প্রচারে নামার যোগ্যতা গাঁয়ে আর কার আছে? এ নিয়ে চুনীলাল একটু বেশিই মেতে উঠেছিল। সংস্কারান্ধ গ্রামবাসীদের এটা খুব পছন্দ হয়নি। তারা বলত, মাস্টারের বউ নেই তাই এক মেয়ে, থাকলে আরো কত ছেলে-মেয়ের বাপ হত কে জানে। কানে এলে চুনীলালও ফুঁসে উঠত, তার বিবেচনা আছে বলেই এক বউ মরার পর অন্য বউ হয়নি, বিবেচনা না থাকলে অন্য বউ আসত আর গণ্ডায় গণ্ডায় বাল-বাচ্চা হত। এ-ব্যাপারে ভদ্রলোকের উৎসাহ একটু প্রবল হয়ে উঠেছিল সেটা সত্যি।

...ভাঙের নেশার ঝোঁকে আর নেশার বন্ধুদের উৎসাহে এই নাস-বন্দী নিয়ে তোতারাম একটা গান বেঁধে ফেলেছিল। না পারার কি আছে, সে হল গিয়ে বলদেও মল্লার শিষ্য। আর সেই নেশার মৌজেই দোস্তদের সঙ্গে বাজী ধরে সকলকে নিয়ে ঢোলক বাজিয়ে সেই ছড়ার গান বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবী শ্বশুরকে শুনিয়েছিল। তাইতে হৈ-চৈ পড়ে গেছল। আর তাইতেই ভাবী শ্বশুরের রাগে বিয়ে বরবাদ।

সেই গানের ছড়াটা হল ঃ

'বাপ্ তবাহে বেঝাসে
দেশ তবাহে নেতাসে
জমিন গা-ই চক্‌বন্দীসে
(আরে ভাই) শ্বশুরা গা-ই নাস-বন্দীসে।'

সাদা কথায়, বাপ নষ্ট হয় তার ছেলের জন্যে, দেশ নষ্ট হয় নেতার জন্যে, জমিন নষ্ট হয় মাপ-জোক আল বাঁধার জন্যে, আর শ্বশুর বে-ইজ্জত হয় নাস-বন্দীর ধুয়া ধরে।

...ভাঙের নেশায় ঢোল বাজিয়ে ভাবী শ্বশুরের ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে এই গান তোতারাম গেয়েছিল।

তারই ফলে ভাবী শ্বশুরের দুর্জয় ক্রোধে বিয়ে নাকচ।

...রাগে দুঃখে অভিমানে দুলারী ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল। ওই বয়সের মেয়ে ঘর ছাড়লে সমাজ তাকে আর ঘরে ফেরার ছাড়পত্র দেয় না। কিন্তু দুলারী চলে গেছল লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিংয়ের আশ্রয়ে। সে তাকে ছেলেবেলা থেকেই জানত। তোতারামের এ-দিকে দুঃখে আর অনুশোচনায় অর্ধমৃত দশা।

মাস দুইয়ের মধ্যে কুন্দন সিং চুনীলাল মাস্টারেরপাঠশালা ছেড়ে যাবার বদলা নিয়েছে। তার লোক এসে চুনীলালকে খবর দিয়েছে, রহুয়া কুন্দন সিং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক ছেলের সঙ্গেই দুলারীর বিয়ে দিয়েছে। তার সাহস থাকে তো লোহার গাঁওয়ে এসে এ নিয়ে হামলা করুক। শুনে চুনীলালের অবস্থা কাহিল। মা-মরা একমাত্র মেয়েকে সে প্রাণ দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু লোহার গাঁওয়ে যাওয়ার হিম্মত তার নেই। তার ওপর মেয়ে চিঠি লিখেছে, তার এখানে এসে কাজনেই, রহুয়া কুন্দন সিং পছন্দ করবে না তো বটেই, জামাইকে নিয়েও একটু ভাবনার ব্যাপার দেখা দিয়েছে—তার মতি-গতির ঠিক নেই।

আর মাস তিনেক না যেতে যে-খবর, চুনীলালের মাথায় হাত। কুন্দন সিং তার ওপর রাগ পুষে যে ছেলের সঙ্গে দুলারীর বিয়ে দিয়েছে, সে আধা-পাগল। বলা নেই, কওয়া নেই, ঘরবাড়ি ছেড়ে সে কোথায় চলে গেছে, কবে ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কি ফিরবে না কেউ জানে না। দুঃখে বাপের বুক ভাঙার দশা শুনে দুলারী ফিরে এসেছে। তার কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর, হাতে গলায় কিছু গয়না। চুনীলালমাস্টার মেয়েকে দেখে হাউ-মাউ করে কান্না। মেয়েই বরং শক্ত আর ঠাণ্ডা। বাপের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সে-ই বুঝিয়েছে, তার জামাইয়ের মাথায় একটু ছিট থাকলেও সে লোক খারাপ নয়, সে দু'দিন আগে হোক পরে হোক নিশ্চয় আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু দশ বছরের মধ্যেও আসেনি।

তার এখনো সধবার বেশ। এখনো বাপকে বলে জামাই ঠিক আসবে। বেশিরভাগ সময় সে এখানে বাপের কাছেই থাকে। মাঝে মাঝে দিন-কতকের জন্য নিজের ঘর আর সামান্য জমি-জমা যা আছে দেখতে যায়। আর এখানে বাপের কাছে যখন থাকে রহুয়া কুন্দন সিংয়ের একজন বিশ্বস্ত বুড়ো মানুষ তার বাড়ি ঘর আর ক্ষেতির তদারক করে।

...সেই পরস্ত্রী দুলারী এখনো তোতারামের প্রেয়সী। বাপের অনুপস্থিতিতে গোড়ায় গোড়ায় তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে দুলারী নাকি ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসত। বাপ তো বাড়িতে কমই থাকে, সরকারের সমাজসেবার বায়ু এখনো তার মাথায় চেপে আছে। বিনা পয়সায় কত রকমের কাজ করে, দু'চার দিন পাঠশালা ছুটি থাকলে কোথায় বক্তৃতা করতে আর সেবার কাজ দেখতে চলে যায়। বড় ছুটিতে তো পাটনায় গিয়েই বসে থাকে, সেবা-প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তাদের সেখানেই ঘাঁটি। সাচ্চা কর্মী হিসেবে তারা তাকে খাতির করে, তাকে নিয়ে সরকারী অফসারদের সঙ্গে দেখা করে নানা রকম সাহায্যের জন্য তদবির করে।

এদিকে তোতারামের ধৈর্যের শেষ নেই, আর দুলারী অনেক সময়েই একলা থাকে বলে সুযোগ সুবিধেরও অভাব নেই। দুলারী এখন ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে না, আর ভিতরে ভিতরে একটু নরমও হয়েছে। যা-ই হোক, লোকটাকে এক-সময়ে পছন্দ তো করত। কিন্তু সেটা কক্ষনো

বুঝতে দেয় না। দরকার পড়লে অনায়াসে তাকে চাকর বাকরের মতোই খাটায়। রেগে গেলে দূর-দূর করে তাড়ায়। কিন্তু তোতারাম কোনো কিছুই গায়ে মাখে না। দুলারীকে একটু চোখের দেখা দেখতে পেলে আর তার জন্য কিছু করতে পারলে মহা শান্তি। এ নিয়ে গাঁয়ে কথা যে কিছু ওঠে না এমন নয়, কিন্তু দুলারী কাকে পরোয়া করে। লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষ কুন্দন সিং তার পিছনে, তোতারাম ছেড়ে অনেককেই সে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসার হিম্মত রাখে। বাপের অনুপস্থিতিতে রাতেও নাকি তোতারামকে অনেক অনেক দিন চুনীলালের ডেরার সামনে ঘুরঘুর করতে দেখেছে। তোতারামকে জিগ্যেস করলে সে অস্বীকার করে না, বলে ভাঙের নেশায় কখন কোন্ দিকে বা কার ডেরার দিকে যায় দিনের বেলায় তা কি আর মনে থাকে? আর দুলারীকে কারো কিছু জিগ্যেস করার সাহসই নেই। সোয়ামীর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে বত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল এখন, তার মেজাজের ভয়ে পড়শীরা ছেড়ে বাপসুদ্ধু কাঁপে।... দুলারীর সঙ্গে জনার্দন পূজারীর মেয়ে সীতিয়ার গলায় গলায় ভাব—যদিও দুলারী ওর থেকে কয়েক বছরের বড়। দু'জনের উনিশ-বিশ একই অদৃষ্ট। তোতারামকে নিয়ে দু'জনের মধ্যে হাসি-মস্করাও হয়। দুলারী সীতিয়াকে প্রায়ই নাকি বলে, লোকটার জন্য দুঃখ হয়, ওর জন্যে যেমন হোক একটা মেয়ে যোগাড় করে দে না, সিঁদুর তুলে আমি তো ফের আর ওকে বিয়ে করতে পারি না—পিয়ার না হাতী, মেয়ে পেলে বিয়ে করার জন্য এখনো পাগল হয়ে আছে—পায় না বলেই এখানে ছোঁক-ছোঁক করে আসে।

দিদিয়ার মুখ থেকে লছমী শুনে হেসে গড়িয়ে তার সহেলি তিতলিকে এই গল্প করে।

...দুলারী সত্যিই লোহার গাঁওয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। কিন্তু তার নিপাত্তা পাগলা মরদ ফিরে এসেছে শোনার গল্পটা তিতলির এই মুহূর্তে বানানো।

তোতারাম ঢ্যাঙা শরীরটা মাচিয়া থেকে টেনে তুলল।—অব্ চলনু, নিদ আহ্লী...।

এই শোকার্ত মূর্তি দেখে তিতলি এখনো হাসি চেপে আছে। কৌতুকের ছলে এবার হীরা মল্লা বলল, এ সাঁঝৌয়ামে তোঁহার নিদ আইল। কা রহয়া কুন্দন সিং তোঁহার শোনে কা লিয়ে কুছ খাস বন্দোবস্ত না করল?

ঝিমুনো চোখ দুটো টান করে তোতারাম একবার তিতলিকে দেখে নিল। তারপর আধা-আধি হীরা মল্লার দিকে ফিরে ছোট জবাব দিল, কা কহি হীরা দিদি, ভোজরাজ ওইসন বিস্তরোঁমে কভু না শুত্লি—

হীরা মল্লা যথার্থ উৎসুক একটু।—কাহে তোতাজী?

এবার অল্প টানা গলায় বড়লোক কুন্দন সিংয়ের মোকানে রাজসিক শোয়ার কথা বলে গেল তোতারাম।—হামাকে শুতে খাতির খাইলম্‌মে (ঢেঁকিশালে) পুয়াল (খড়) বিছাল দিয়ল, গই-অ, হম ওইপর শুত গইনি...বাতমে হম্ দেখলি কি চাঁদকে চমক হামার তরফ আরহল বট্টে...উকরা সাথ্ ছম্‌ছম্ ছম্‌ছম্ করকে এক পরছাই (ছায়া) আইল্...ছুঁপকে সে হমরা বগলমে শুত্ গইলী...হম্ আপন্ হাত খুব ধীরসে ওকরা (ওর) দেহপর রখ্লী, তব্ উ ঝটক্‌সে উঠকে চল্ দিয়নস্। অব্ হম্ নজর উঠাকে দেখলী, ও শ্বশুরী একঠো বকরী রহে...।

তিতলি দু'চোখ বড় করে শুনছিল, শেষ হতে হাসির দমকে মাটিতে বসে পড়ার দাখিল,

পেটে হাত চেপে হাসতে হাসতে ফুফুর পালঙ্কে বসে পড়ল, হাসি আর থামেই না।

ঝিম-লাগা চোখ দুটো টান করে তোতারাম হাসির বন্যা দেখল, তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঢ্যাঙা শরীরটাকে বাইরে টেনে নিয়ে চলল।

হাসছিল খুব হীরা মল্লাও। নিজে না হেসে অমন রগড়ের কথা তোতারামই বলতে পারে।

হাসির চোটে তিতলির সত্যি পেটে ব্যথা ধরে গেছে। সোজা হয়ে বসে সে গায়ের ওড়না দিয়ে ভালো করে নিজের মুখ মুছে নিচ্ছিল। পরিতুষ্ট মুখে পালঙ্কের নিচে থেকে হীরা মল্লা একটা সুন্দর বড় ঝুড়ি টেনে বার করল।

ঝুড়ি বোঝাই নানা রকমের ফল, শুখা মিঠাইয়ের ঠোঙা, আর চমৎকার একখানা শাড়ি।

অবাক চোখে তিতলি পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়ালো। ঝুড়ির জিনিসগুলো দেখছে। ফুফু হাসি মুখে জানান দিল, ইয়ে সব তোতা পহুঁছা দে গইল।

কার জিনিস কে পৌঁছে দিয়ে গেল তিতলির বুঝতে বাকি নেই।... ব্রিজমোহনের ভেট। তোতারাম এখানে ছিল না বলেই আগে পাঠাতে পারেনি। খুব বিশ্বস্ত লোক ভিন্ন অচ্ছুত-ঘরে এরকম ভেট পাঠায় কি করে।

তিতলির দু'হাত কোমরে। হাসছে মিটিমিটি। একবার ফুফুকে দেখছে, একবার জিনিসগুলোকে। পরের মুহূর্তে হীরা মল্লা দিশেহারা।

তিতলির পায়ের আচমকা এক লাথিতে ফল আর জিনিসে বোঝাই অতবড় ঝুড়িটা দেড় হাত দূরে উল্টে পড়ল। ফলগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল, কিছু গড়িয়ে গেল। ঠোঙা থেকে কতগুলো মিটাই মাটিতে অমন-সুন্দর শাড়িটার ওপর।

দুমদাম পা ফেলে তিতলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৩

কিছুটা জ্ঞাতসারে কিছুটা বা নিজের অগোচরে রিজিওন্যাল অফিসার প্রকাশ দীক্ষিত শাওন ভার্মার সম্বন্ধে ব্রিজমোহনকে একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন। বলেছিলেন, খুব ভালো ছেলে আর কাজের ছেলে, কিন্তু অল্প বয়েস...আর একটু মুডি। যেমন দেখেছেন তেমনি বলেছেন। দায়িত্ব পড়লে ছেলেটা যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়, তখন নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না। কিন্তু অন্য সময় কি ভাবে, মনের কোন্ রাজ্যে তার বিচরণ, কেউ হদিস পায় না। প্রকাশ দীক্ষিত অনেক দিন ধরে তাকে দেখছেন, এমন নির্ভরযোগ্য ছেলে তার হাতে বেশি নেই। কিন্তু খামখেয়ালি। পাটনায় থাকতে হয়তো পরপর তিনদিন অফিসে এলো না। খোঁজ নিয়ে জানলেন, কেন আসেনি কেউ জানে না। দু'তিন দিনের ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত কাজে জয়েন করে দিলেও চলে। সেই দরখাস্ত আসতে দেখলেন,লেখা, ওই ক'টা দিন তার পক্ষে কাজে আসা সম্ভব হয়নি। কেন তার কোনো উল্লেখ নেই। ডেকে জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছিল, আসনি কেন?

বিড়ম্বিত মুখ।—ভালো লাগছিল না সার...

এ-রকম জবাব তিনি আগেও পেয়েছেন কিন্তু রাগ করতে পারেননি।

এবারেই তাঁর চেষ্টায় প্রমোশন পেয়ে শাওন সীনিয়র জিওলজিস্ট হয়ে ছুপায় ক্যাম্প-ইন-চার্জ হয়ে বসেছে। কিন্তু জুনিয়র জিওলজিস্ট ছিল যখন, দু'দুবার তাকে নিয়ে ভদ্রলোককে মুশকিলে পড়তে হয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই চাকরি রিজাইন করে বসেছে। কারণ? কারণ কাজে যতটা মন দেওয়া দরকার ততটা দিতে পারছে না, তাই নিজেকে এ-কাজের উপযুক্ত ভাবতে পারছে না। প্রথমবার তো ওই রকম রেজিগনেশন লেটার পেয়ে ছেলেটার মাথার ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হয়েছিল। দু'বারই বকে-ঝকে সামনেই তার চিঠি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে কাজে বসিয়ে দিয়েছেন, কাউকে জানতে না দিয়ে ধামাচাপা দিয়েছেন।

একটু নয়, ছেলে-বেলা থেকেই এই ছেলে কি-রকম মুডি তাঁরও ধারণা নেই।

...পাটনায় জন্ম, কিন্তু জ্ঞানবয়েস থেকেই সে কলকাতায় বাবা-মায়ের কাছে। আর বলতে গেলে প্রায় জ্ঞানবয়েস থেকেই নিজের মা-কে অসুস্থ দেখে এসেছে। শ্বাসকষ্টে আর অ্যানিমিয়ায় ভুগতে দেখেছে। শুনেছে মায়ের হার্টের কিসব ভাল্‌ব-টাল্‌ব খারাপ। বাবা হিন্দী দৈনিক কাগজের নিউজ এডিটার। দিন-রাত পরিশ্রমের চাকরি। যাও সময় পান নিজের লেখাটেখা নিয়ে থাকেন। বাড়িতে শাওনের সারাক্ষণের দোসর মা। বেশি কথা বলার অভ্যাস দু'জনের কারো না, কিন্তু তার মধ্যেই দু'জনের গাঢ় মিতালী। বাঙালির স্কুলে পড়ে, চারদিকে বাঙালির পরিবেশে মানুষ, তার হাবভাব স্বভাব খাওয়া-দাওয়া সবই বাঙালির মতো। কিন্তু কোথায় যেন সকলের থেকে সে একটু বিচ্ছিন্ন। একাত্ম হয়ে কারও সঙ্গে খুব একটা মিশতে পারেনি। আবার অন্য দিকে বিহারের বা পাটনার কাউকে সে চেনেই না, চরিত্রগতভাবে কারো সঙ্গে কোনো যোগই নেই।

...তেরো বছর বয়সে মা মারা গেছে। শ্বাসকষ্ট আর বাতাসের অভাব—সে যে কি ভীষণ কষ্ট, মায়ের সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে শাওন তা দেখেছে। মনে পড়লে বুকের হাড়পাঁজর দুমড়ে যায়। না, শাওনের বুকে কোনো দোষ নেই, বাবা ডাক্তারও দেখিয়েছেন। সব ভালো।...তবু মাঝে-মাঝে এ-রকম হয় কেন? নিঃশ্বাস নিতে-ফেলতে কষ্ট। মনে হয় যথেষ্ট বাতাস নেই। ফুসফুসে যতটা বাতাস টেনে নিতে পারলে শান্তি, ততো যেন কম পড়ছে, আর তাই ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে। আবার এ-ও জানে, মায়ের সেই কষ্টের বিভীষিকা ওর ভিতর থেকে মুছে যায়নি বলেই এই যন্ত্রণা।

বছর আঠারো যখন বয়েস, শাওন কলেজে পড়ে, তখন বাবা একবার ওর বিয়ে দেবার কথা ভেবেছিলেন। বাঙালির পরিবেশে বড় হলেও ওদের পরিবারে এ-বয়সে বিয়েটা অস্বাভাবিক কিছুই না। মনের দিক থেকে শাওন তখন এত নিঃসঙ্গ যে বাবার কথায় নিজেরও বিয়ে করার লোভ একটুও হয়নি এমন নয়। কিন্তু সেই লোভ বাতিল করেছে, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় প্রথম কুড়িজনের মধ্যে হয়ে স্কলারশিপ পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফ্রি পড়তে পাচ্ছে। জিওলজি অনার্স। এতে ওকে ভালো করতেই হবে। তাই বি-এস-সি পাশের আগে বিয়ে নয়। বাবাকে বলতে তিনিও জোর করেননি।

কিন্তু আরো একটা বছর যেতে বাবা নিজেই বিয়ে করলেন। একটি বয়স্কা স্বাস্থ্যবতী স্কুলের টিচার তার মা হয়ে এলো। ওরা ব্রাহ্মণ, এই মা-ও তাই। তাই সামাজিক বিধিনিষেধও কিছু ছিল না। এই মা-কে যতটুকু জেনেছে, ভালো ছাড়া খারাপ একটুও মনে হয়নি। আর বাবাকেও খুব দোষ দেয়নি শাওন, দীর্ঘকাল ধরে রুগ্ন স্ত্রী নিয়ে ঘর করেছেন, সে-ও চলে যাবার পরে এখানে সংসার বলে কিছু নেই। আগে থাকতেই একজন রাঁধুনী ছিল, তার হেপাজতে সব কিছু, তার মর্জিতে বাপ-ছেলের দিনযাপন।

কিন্তু আশ্চর্য, এই মা ঘরে আসার পর থেকেই শাওনের দম-বন্ধ-করা বাতাসের অভাব যেন বাড়তেই থাকল। এক-এক সময় এমন হয় যে ফুল স্পিডে পাখা চললেও মনে হয় ভিতরটা ঘামে ভিজে যাচ্ছে। দিনে-দিনে এই কষ্ট দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। নিজেই বুঝছে এ-ভাবে চলতে পারে না।

উপায় ঠিক করতে সময় লাগল না। কলেজে মাইনে লাগছে না, বইপত্র কিনতে হচ্ছে না, স্কলারশিপের টাকা প্রায় পুরোই জমছে। হিন্দু হস্টেলে সাদরেই ঠাঁই পেল—খাইখরচ শুধু দিতে হবে, রুমচার্জও লাগবে না। খাওয়ার খরচ দিয়ে স্কলারশিপের টাকার থেকে আর বিশেষ বাঁচবে না, হস্টেলে থাকলে হাতখরচও কিছু লাগবে, আর পরীক্ষার ফী-টিও লাগবে। তাই ঠিক করেছিল একটা টিউশনি করবে। হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট দেখে স্কুলের ক'টা ছেলে তো পড়ানোর জন্য ওকে ধরেছিল। টিউশনি একটা অনায়াসেই পাবে।

ব্যবস্থার কথা শুনে বাবা অনেকক্ষণ নির্বাক। ছেলে বলেছে, হস্টেলে থাকলে তার পড়াশুনা ভাল হবে, বাড়িতে মন বসছে না। যা-ই বুঝুন, তিনি বাধা দিলেন না। একটাই কেবল অনুরোধ করলেন, টিউশনির চেষ্টা যেন না করে, প্রতি মাসে তার হস্টেলের খাওয়ার খরচ তিনি নিজে গিয়ে দিয়ে আসবেন।

নতুন মায়ের বিষণ্ণ মুখ। কিন্তু শাওনও বাঁচতেই চায়।

বি-এস-সি পরীক্ষায় জিওলজিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেল। এম-এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তারপর জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে চাকরির পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতেও সে একেবারে প্রথম।

তেইশ বছর বয়েস থেকে চাকরি। চাকরির গোড়া থেকে তার প্রকাশ দীক্ষিতের সঙ্গে যোগাযোগ এটা ভাগ্য। তিনি ওর কেরিয়ার জানেন, কাজের নিষ্ঠাও দেখে আসছেন। তাঁর বিশেষ সুপারিশে আঠাশ বছর বয়সে সিনিয়র হিসেবে প্রমোশন, আর তারপর এক বছর ধরে ছুপার এই কপার ওর এক্সকাভেশনের সাইট-এ ক্যাম্প-ইন-চার্জ।

যেখানে লাইট পর্যন্ত আসেনি, সন্ধ্যার পর হ্যাজাক ভরসা, এমন গ্রামে কাজ নিয়ে একটা লোক কতক্ষণ কাটাতে পারে? সকাল দুপুর বিকেল কাজের মধ্যে এক-রকম কেটে যায়।...তারপর? গ্রামে এসে পড়েছে বলে শাওন আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে এমন নয়। নিঃসঙ্গতা তার জীবনের দোসর। এখানে বরং সঙ্গ দেবার নামে শহরের মতো বন্ধুবান্ধবের অবাঞ্ছিত হামলা নেই। তখনো পাকা ঘরের স্থায়ী ক্যাম্প হয়নি, মাঠের ত্রিপলের ক্যাম্পে খাওয়া-দাওয়া, রাত্রিবাস, সকালে আবার এই ক্যাম্পেই তার অফিস। অন্যদের তুলনায় তারটা

স্পেশাল ক্যাম্প, মস্ত বড়। মাঝামাঝি স্ক্রিন টানিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে। অন্য দিকটায় টেবিল চেয়ার পাতা অফিস ঘর, দরকারী ফাইলপত্র রাখার একটা গোদরেজের বড় আলমারিও আছে।

গোড়ায় গোড়ায় মন্দ লাগত না। সমস্ত দিনের কাজের পর মুখহাত ধুয়ে বাইরে ডেকচেয়ার পেতে খোলা আকাশের নিচে বসে থাকত। ঘরের হ্যাজাক নিভু-নিভু করে রাখত। চাঁদ দেখত, তারা-ভরা আকাশ দেখত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে এক-একটা উদ্ভট চিন্তা ভূতের মতো মাথায় চেপে বসত।...এই সব কাজ, খনি আবিষ্কার, সভ্য জগতের জন্য অসংখ্য রকমের সরঞ্জাম আবিষ্কার—এ-সব কোনো কিছুরই যদি তাগিদ না থাকত—তাহলে কি হত? এতবড় আকাশের নিচে ও একজন বসে আছে, যার নাম মানুষ, যার বেঁচে থাকাটাই যেন জীবনের সব থেকে বড় ব্যাপার আর দরকারী ব্যাপার। অন্যের কথা জানে না, কিন্তু শাওন নামে একজন যদি বেঁচে না থাকে তাহলে কি হয়? এতবড় পৃথিবীতে কার কতটুকু ক্ষতি হয়? উল্টে লাভের চিন্তাই একটু মাথায় আসে, মরে গেলে মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া কি সম্ভব? মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বুকে বাতাস কম। মায়ের সেই মৃত্যু মনে পড়লে আতঙ্ক। না, মরে যাওয়ার থেকে না জন্মানোই অনেক ভালো ছিল।

এরকম যেদিন হয়, এত পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম হয় না। সকালে মেজাজটা বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কাজে দ্বিগুণ মন দিতে চেষ্টা করে। অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘাটতি নেই। জমি খোঁড়া খুবলোনোর কাজ চলতে থাকে, ওর ভিতরেও তখন একটা খোঁড়া খুবলোনোর ব্যাপার চলতে থাকে।

তখন নিজের ওপর অসহিষ্ণু, সামনে যারা সকলের ওপর অসহিষ্ণু। আরো যন্ত্রণা, কারণ এই অসহিষ্ণুতার বাইরে কোনো প্রকাশ নেই।

এ ধরনের নিঃসঙ্গতা আর যন্ত্রণার মধ্যেই একজনের সঙ্গে যোগাযোগ। একটি মেয়ে।

এমন যোগাযোগ শাওন ভার্মার কাছে অন্তত বিস্ময়কর রকমের নতুন। কারণ একটি মেয়ে কোনো পুরুষের জীবনে কি বা কতটুকু তার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মনে হতে লাগল অনুভূতির স্বাদ বড় বিচিত্র। দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে, সামনে এলে ভাল লাগে, কথা শুনতে ভাল লাগে, কথা কইতে ভাল লাগে। আর কথা তো নয়, যেন ভোরের এক চঞ্চল সোনালি পাখির ছন্দে বাঁধা মিষ্টি কাকলি। এখানে এসে পর্যন্ত ভোজপুরী ভাষার কথা অনেক শুনে আসছে। শহর আর গঞ্জের কাছের গ্রাম বলে এই ভাষার মধ্যে কিছু হিন্দী উর্দুর গোঁজামিল মিশেছে, আর বাংলার সঙ্গে এই ভাষার মিলমিশ তো বেশ লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু এই চঞ্চল মেয়ের মুখে এ-ভাষা যেন বেপরোয়া গোছের উচ্ছল হয়ে ওঠে ঃ সে যে কি মিষ্টি নিজের কানে না শুনলে শাওন কল্পনা করতে পারত না।

গোড়ার দিকে শুধু ছুপার নয়, আশপাশের গাঁয়ের মেয়েপুরুষ দল বেঁধে দেখতে এসেছে, মাটির নিচে থেকে খনি বেরুনো ব্যাপারখানা কি। শুনেছে বেরোয়, চোখে কখনো দেখেনি। কিন্তু দেখতে এসে ক্রমে হতাশ হয়েছে। কতটা খুঁড়লে 'তাম্বুয়া' বেরুবে, কত দিন ধরে কত নিচ পর্যন্ত খুঁড়লে বেরুবে অথবা বেরুবেই কিনা—কাজ যারা করছে তারাও সঠিক করে বলতে পারছে না। যন্ত্রপাতি এনে কুলি মজুর এনে কেবল মাটি খোঁড়া দেখতে কতদিন ভালো লাগে, কতদিনই

বা উৎসাহ থাকে?

দেখার হিড়িক অনেকটা কমে যেতে দূর থেকে আরো কয়েকটি সঙ্গিনীর সঙ্গে মেয়েটা শাওনের চোখে পড়ল। পরণে হাঁটুর নিচ অবদি চুমকি বসানো রঙচঙে ঘাগরা, গায়ে কোমর পর্যন্ত টকটকে লাল আঁট জামা, দু'পায়ে রূপোর পায়েল গোছের কি—রোদে ঝিকমিক করছে। মাথার ঝাঁকড়া চুল পিঠের আধা-আধি ছড়ানো। এক হাতে অনেকগুলো সোনালি নক্সাকাটা কাচের চুড়ি। চোখে পড়লে চোখ আটকাবেই। মুখ, গলা, দুটো হাত আর হাঁটুর নিচে থেকে পা পর্যন্ত যেটুকু দেখা যাচ্ছে, যেন সোনালি আভা ঠিকরোচ্ছে এমনি রং।

এ-রকম কাউকে দেখলে দৃষ্টি সকলেরই প্রসন্ন হয়, শাওনেরও হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়।

পরে এক দেড় মাসের মধ্যে এই মেয়েকে এখানে আরো দিনতিনেক টহল দিতে দেখেছে। সঙ্গে একজন বা দুজন সমবয়সী মেয়ে। কিন্তু ওই একজনের পাশে আর কেউ চোখে পড়ার মতো নয়। শাওন কিছুটা কাছে থেকেও দেখেছে।...দেখার মতোই বটে মেয়েটা। কিন্তু আশপাশের কে দেখছে না দেখছে মেয়েটার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। যেখানে যেখানে কাজ হচ্ছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কোমরে দু'হাত তুলে নিবিষ্ট মনে দেখছে, এটা সেটা জিগ্যেসও করছে। শাওনের মজাই লেগেছিল, হাবভাব দেখলে মনে হবে সরকারই তাকে এই গোছের তদারকি দায়িত্ব দিয়েছে। কাজের লোকেরাও মেয়েটাকে বেশ চেনে মনে হল। কারণ যাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদেরই হাসি-হাসি খুশি-খুশি মুখ।

কিন্তু দু'দিন বাদে ওই মেয়েকে যে লোকের সঙ্গে টহল দিয়ে বেড়াতে দেখল, শাওনের ভিতরটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। তোতারাম। যার সঙ্গে শাওনের বাইরে অন্তত খুব ভাবসাব এখনো। প্রথম আলাপেই এসে তার ভাষায় বলেছিল, দুনিয়া ভর লোক আমাকে তোতারাম বলে ডাকে, কারণ আমি তোতার মতো বুলি কপচে বেড়াই, নিজের মগজ থেকে কোনো কথা বেরোয় না—নিজের মগজ বলে আমার কিছু নেই-ই। আধঘণ্টার মধ্যে লোকটাকে শাওনের বেশ ভাল লেগে গেছল, মজার লোকই মনে হয়েছিল তাকে। এখনো তার সম্পর্কে ধারণা খুব বদলায়নি, কিন্তু এই লোকের মারফতই ব্রিজমোহন জমি খালাস পাবার জন্য তার সামনে ঘুষের টোপ ফেলেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা নাকচ করার ফলে সে হেসে হেসে বলেছিল, ব্রিজমোহনের কথা এ-ভাবে ঝেড়ে ফেলার কথা নয় পরদেশীবাবু, তুমি আর একটু ভেবে দেখো।

...শেষে ব্রিজমোহন স্বয়ং সেই টোপ ধরানোর জন্য আসরে নেমেছিল। সব শুনে চতুর ওপরওয়ালা এই লোকের সঙ্গেও তাকে ভাবসাব রেখে চলতে বলেছিল বটে, চলছেও তাই, কিন্তু মন থেকে এই লোককে তারপর বরদাস্ত করা কতটুকু সম্ভব? তোতারাম সেই লোকের মোসায়েব আর মেয়েটা তার সঙ্গেই দিব্বি হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই বা ভাল লাগে কি করে?

এর পরের দিনটা অঝোরে বৃষ্টি গেছে। ফলে তার পরের দিন আকাশ পরিষ্কার হলেও এত বড় জমির বেশির ভাগ কাদায় প্যাচপেচে। শাওন সকালে যথাসময় কাজে এসেছে আর ব্যস্ত

থেকেছে। তার পায়ের হাঁটু-উঁচু গামবুট আর পরনের খাকি ট্রাউজার কাদায় মাখামাখি। গায়ের মোটা বিবর্ণ জামাটারও যত্রতত্র কাদা লেগেছে। দড়ির মই বেয়ে তাকে একটা গভীর খাদে নামতে উঠতে হয়েছে। এমনিতেও জামাপ্যান্ট ছেড়ে কয়েক পরত ধুলো-মাটির প্রলেপ পড়ে। আজ কাদামাটিতে মাখামাখি। জানা না থাকলে কে দক্ষ মজুর অথবা টেকনিসিয়ান আর কে বা ক্যাম্প-ইন-চার্জ অথবা উঁচু পর্যায়ের কর্মী হদিস পাওয়ার উপায় নেই। এর মধ্যে শাওনের মুখভরা দুদিনের না-কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

শ্লথ পায়ে আর এক দিকের তদারকিতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে সুরেলা গলায় বাধা পড়ল। শাওনকে ঘুরে দাঁড়িয়ে থমকাতে হল।

—এ ভাইসাব্, শুন্অ তো...

সেই মেয়ে। যে এলে চারদিকের এই হাঁ-করা জমিতে হাসির রং ধরে, বাতাসে বসন্তের দোলা লাগে। কাছে এসে কোমরে দু'হাত তুলে দাঁড়াল। এটা স্বভাবও হতে পারে, যৌবনসচেতন অভিব্যক্তিও হতে পারে।

—তুম্ এ খনিয়া সরকারকা আদমী ভৈল?

শাওন মাথা নাড়ল। সেই এই খনির কাজের সরকারী লোকই বটে।

—তো লোগন্কা বড়া সাহাব কাঁহা? হম্ ওক্‌রাকে (তাকে) খোঁজত...

যে-ভাবে বলল, বড় সাহেবের থেকেও উঁচু পর্যায়ের কেউ মনে হবে। এখানকার ভোজপুরী-ভাষীরা বলতে না পারলেও হিন্দীর মতো বাংলাও মোটামুটি বোঝে লক্ষ্য করেছে। জানতে চাইলো, বড়সাহেবকে কি দরকার?

সুন্দর মুখে বিরক্তির আভাস।—কা জরুরত্ ওকরাকে কহব—যা পুছত্ জবাব দিহ!

শাওনের মজাই লাগছে। গম্ভীর। জানান দিল, বড়সাহেব এখানেই কাজে ব্যস্ত, কি দরকার জানলে আমিও তার হয়ে কথা বলতে পারি।

আয়ত নিবিড় কালো দু' চোখ তার মুখের ওপর তুলে ঘটা করে গোল করল একটু। লালচে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চিকিয়ে উঠল। ও যে কোনো মরদের সামনে পড়লে একটু বিশিষ্ট হয়ে উঠতে চায়, আর কথার ছলে যতটা পারে আটকে রাখতে চায়, সেটা জেনে বেশ অভ্যস্ত তাই বুঝিয়ে দিল। তারপরেই গম্ভীর প্রশ্ন, তোহার বড়া সাহাবকা সাথ্ মিলনেকে অফিস-টাইম কহন তক্—এ কহব কি নহী?

শাওন জবাব দিল, দুপুর দেড়টা থেকে তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ক্যাম্প অফিসে দেখা হতে পারে। আঙুল তুলে দূরের সব থেকে বড় ক্যাম্পটা দেখিয়ে দিল।

একবার সে-দিকটা দেখে নিয়ে এই মেয়েও এবার বাংলা ফলাতে চেষ্টা করল। পলকা একটু কৃপাকটাক্ষে হেসে জিগ্যেস করল, বড়োসাবকা সাথ্ তুমার দেখা হব?

শাওন মাথা নেড়ে জবাব দিল, হব।

—রহুয়াকা কহ দিয়, এক লেডি দুফর তিনো বাজে মিলনে আহবা—সাহাবসে জরুরী বাতাবাতি রহলঅ।

শাওন বিনীত মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল, বড়সাহেবের ওপর কোনো সরকারী ফরমাস আছে?

এ প্রশ্নও বুঝল শুধু না, রসিকতা যে তা-ও বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুটি। দু'বার মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, হঁ—অছে। সমঝলঅ ?

দুপদাপ পা ফেলে এগোতেই বাধা পড়ল। পিছন থেকে শাওন জিগ্যেস করল, বড়সাহেবের কাছে লেডির পরিচয় কি দেব?

ঘুরে দাঁড়াল। দু'হাত কোমরে।—কহ, উহার কই এক মালকান আহল্‌বা—

ঝটিতি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ালো। মুখে চোখে হাসির ঝলক। সুডোল হাত নিজের মুখের কাছে তুলে দু'তিনবার নেড়ে কিছু নিষেধ করল। অর্থাৎ সত্যিই এ-সব কিছু বোলো না।

শাওন অন্য দিনের মতোই বেলা বারটা নাগাদ তার টেন্টে ফিরল। মেয়েটার মুখ থেকে থেকে চোখে ভাসছিল, আর তার কথাগুলো রিন্‌-রিন্‌ করে কানে বাজছিল। এ-রকম অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। এই বয়সের মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিন মিনিট কথা বলার সুযোগ হয়নি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেয়েটা এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না, চেয়ে-চেয়ে কেবল দেখতে ইচ্ছে করে।... এই মেয়ের হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা করার দরকার পড়ল কেন ভেবে পেল না। ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গেই অবশ্য নয়। এখানকার বড় সাহেবের সঙ্গে। এখানে ক্যাম্প-ইন-চার্জকেই বড় সাহেব বলে ওরা।...কারো বেচাল ব্যবহার নিয়ে নালিশটালিশ করবে? কিন্তু কেন যেন তা-ও মনে হল না শাওনের। কেন মনে হল না জানে না, কেবল মনে হল, এই মেয়ের মুখে কারো নামে পলকা নালিশ মানায় না। অথচ তাই হওয়া সম্ভব, নইলে তার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার, আর কি কারণ থাকতে পারে?

ক্যাম্পে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। পায়ের গাম বুটজোড়া আর কাদামাটিতে মাখামাখি খাকি প্যান্ট শার্ট দেখেই হয়তো মেয়েটা ওকে খনিয়া-সরকারের আদ্‌মী ভেবেছে, নইলে ধুলোকাদা আর দুদিনের না-কামানো মুখের যে অবস্থা, তাকে কুলি-মজুর শ্রেণীর কেউ ভাবারই কথা। ক্যাম্পে ফিরে রোজই বেশ করে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। আজ আগে দাড়িটা কামিয়ে নিল। দু'বার করে সাবান মেখে চান করল। কেউ আসবে বলে ঠিক নয়, নিজের পরিতৃপ্তির জন্যও দরকার ছিল। স্নানের পরের পোশাক ধপধপে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি। বিকেলেও এই বেশেই সাইটে বেরোয়, কারণ তখন কেবল তদারকির কাজ। খাওয়া-দাওয়ার পর ডেকচেয়ারে গা ছেড়ে আধঘণ্টার বিশ্রাম। দেড়টা নাগাদ পার্টিশনের ও-ধারে অর্থাৎ ক্যাম্প অফিসে বসে। অফিসে লোকজনের আনাগোনা বিশেষ নেই। এ-সময় ফাইলের কাজ সারতে হয়, ডেলি রিপোর্ট লিখতে হয়, কোন পর্যায়ের কত ছুট্‌ শ্রমিক কাজে লাগল, তার হিসেব দেখতে হয়, ইত্যাদি।

অফিস ক্যাম্পে এসে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে হাতঘড়ি দেখছিল। আড়াইটের পরে হঠাৎ কি মনে হতে ফাইল বন্ধ করল। আর একটা সম্ভাবনা মাথায় আচমকা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। এত রূপ আর এমন যৌবনোচ্ছল মেয়ে কমই দেখা যায়। শাওন অন্তত আর দেখেনি।... দু'দিন আগে এই মেয়েকেই ওই সাইটে অন্তরঙ্গ খুশি মুখে যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল সে

তোতারাম—যার মারফৎ ব্রিজমোহন প্রথম ঘুষের টোপ ফেলেছিল। পরে ওই চেষ্টা করে সে নিজেও ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে কি টাকার থেকেও অমোঘ টোপ হিসেবে তারাই ওই মেয়েকে তার কাছে পাঠাচ্ছে? তা না হলে চেনা নেই জানা নেই, ওই মেয়ের এখানকার বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কি দরকার পড়ল? ভাবতে পারছে না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। তবু অস্বস্তি। বিধাতার অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এমন অপচয়ও সম্ভব!

তিনটে বাজার পাঁচ-সাত মিনিট আগে রতন বেয়ারা একটু উৎসুক মুখে ভিতরে এলো। রতন বাঙালি, বছর তিরিশ বয়েস। বিশ্বাসী আর চালাকচতুর। কলকাতায় অনেক বছর ধরে ওদের বাড়িতে চাকরের কাজ করেছে। পরে শাওন প্রকাশ দীক্ষিতকেই ধরে ওকে সরকারী বেয়ারার চাকরিতে ঢুকিয়ে পাটনায় এনেছিল। সেখান থেকে এখানে। সে একধারে বেয়ারা আর কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড।

জানান দিল, খুব সুন্দর একটা মেয়ে...যাকে কয়েকদিন এই মাঠে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়, বলছে তার আসার কথা ছিল।

—নিয়ে এসো।

শাওন এখন সতর্ক । তাই গম্ভীরও। কিন্তু ওই মেয়ে ভিতরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল নীরস ক্যাম্পের শ্রী ফিরে গেল। চেয়ার ছেড়ে শাওন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।—আইয়ে মালকান...।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে গেছে। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না এমনি অবাক। পরের কয়েক মুহূর্ত নির্বাক, বিমূঢ়। কোনো দিব্যাঙ্গনার মুখে বিস্ময়ের এমন কারুকার্যও কি শাওন আর দেখেছে ?

—হায় রাম! এটুকুও মিষ্টি অথচ প্রায় আর্তনাদের মতো শোনালো।—খনিয়াকা বড়া সাহাব তুম হইলন!

শাওনের মুখে এবারো হিন্দি বুলি।—জী মালকান্, আইয়ে, বইঠিয়ে, ফরমান জারি কিজিয়ে—

চেয়ে আছে। হঠাৎ অসহিষ্ণু একটু। মাথা ঝাঁকালো।—হাম চলথ, তোহারকে বহুত্ সেয়ানা লাগলঅ, দুফরমে তুম্ এইসন্ ধোকাবাজী করলঅ!

হিন্দি ছেড়ে শাওন এবার বাংলা ধরল, কারণ তার হিন্দির দৌড় বেশি নয়। মৃদুগম্ভীর গলায় জবাব দিল, আমি তো বলেছিলাম, কি দরকার আমাকে বলা যেতে পারে।

প্রায় ঝাঁঝিয়েই উঠল মেয়েটা, হাঁ হাঁ তুম কহলে, লেকিন এ না কহলঅ তুম হো বড়া সাবাহ!

শাওনের তখনো এই মেয়ের সম্পর্কে সংশয় যায়নি। তাই রসের ছোঁয়াটুকু এখনো গম্ভীর—না বলে ভালই করেছি, ক্যাম্পে ফিরে আরশীতে নিজের সুরত দেখে নিজেকে বড় সাহেব মনে হচ্ছিল না।... যাক, আপনি বসুন, কি জরুরী কথা আছে বলুন—

এ-কথা শোনার পর মেয়েটার অসহিষ্ণু মুখে কৌতুকের ফাটল ধরল। আয়ত চোখে বিস্ময়ের ঘটা।—আপ! নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বলে উঠল, তুম হামে আপ কহলঅ!

...কা বাবু, হমারাকে তোহার নজর মে দারগাজী লাগলী যে 'আপ' কহলঅ? জিন্দেগী মে পহলিবার 'আপ' শুনলী! শুনকে এইসন লাগলঅ যেইসন মেডক্ (ব্যাং) তাজ (মকুট) পহিলনে! নহীঁ বাবু নহঈঁ—ম্যায় তি-ই-ই-ত্ লি-ইঁ—হামে তু-তু-তু কহো। বলার পরেই হাসির ঝর্ণা।

শাওনের দু'কান ভরে যাচ্ছে, দু'চোখ ভরে যাচ্ছে। কিন্তু মনের তলায় খটকা। তিতলি মানে প্রজাপতি সে জানে। তিতলি...তিতলি...তিতলি—নামের সঙ্গে কোনো মেয়ের এমন মিল আর কি হয়। একটু নরম অথচ গম্ভীর মুখেই বলল, ঠিক আছে, তিতলিই বলব...বোসো—কি দরকার বলো।

তার মুখের ওপর তিতলির কৌতূহল-ছোঁয়া সদয় চাউনি। সামনের চেয়ারটার দিকে এগিয়েও থমকালো একটু।—এ বাবু, হাম অছুত্ ঠেরে.,.

শাওনের সংশয় ফিকে হয়ে আসছে কেন জানে না। গম্ভীর সুরেই ফিরে রসিকতা করল, এই চেয়ারে বসলে তোমার জাত যাবে?

থতমত খেতে দেখল একটু। এটুকুও চোখ ফেরানো যায় না এমনি সুন্দর। এক ঝলক হেসে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল। বসার ধরন দেখে শাওনের মনে হল না অছুত বলে এই মেয়ে নিজেকে ছোট মনে করে। কর্তব্যবোধেই জানান দিয়েছে মনে হয়।

—তোতাচাচা ঠিক কহলঅ তুম আচ্ছা আদমী ভৈল।

ওই নাম আর মন্তব্য শুনে শাওন সতর্ক একটু।—তোতারাম তোমার চাচা লাগে?

হেসে উঠল। এই হাসির মধ্যে জটিলতা আছে ভাবা যায় না।—চাচা লাগি, লেকিন ওকরা তোহার মাফিক উঁচা জাত—আব্ সমঝ লো ও কইসন চাচা লাগি। আবার হেসে উঠল।—অগর্ চাচা ও ঠাকুর ব্রিজমোহনোয়াকা চাম্চোয়া না হ'—ত, ওকরা (ওই লোক) কসিস রহত (বুঝতে চেষ্টা করত) অছুত্ ভাইয়াকা এ বেটী (আঙুল দিয়ে নিজের বুক দেখিয়ে) কস্মকস্ যবনোয়া (জীবনখানা কেমন)।

শাওনেরই কান লাল হবার উপক্রম। এই মেয়ে না হলে এটুকু আলাপের মধ্যে নিজেকে নিয়ে এ-রকম রসিকতা নোংরা মনে হত। এখন তা আদৌ মনে হচ্ছে না।...তোতারামকে ব্রিজমোহনের চামচে বলল, কিন্তু এই মেয়ে নিজে কি তা এখনো বুঝতে বাকি। একটু গম্ভীর মুখেই প্রসঙ্গ বদলালো।—এবারে কি দরকারে এসেছ বলে ফেলো।

জবাবে হালকা গলায় তিতলি তার দেশোয়ালি ভাষায় হড়বড় করে যা বলে গেল, কান খাড়া করে শুনে শাওন যেটুকু বুঝল, বেশ অবাক হবার মতোই। তার বক্তব্য, আমি নিজের কোনো দরকারে তোমার কাছে আসিনি পরদেশীবাবু, তোতাচাচার মুখে সেদিন যা শুনলাম তাতে তোমার জন্য একটু চিন্তা হয়েছিল, তাই চুপিচুপি তোমাকে একটু সাবধান করে দিতে এসেছি। তোতারাম বলছিল পরদেশীবাবুর অল্প বয়েস, সাচ্চা আদমী, তাই কোনরকম বিপদের কথা না ভেবেই ব্রিজমোহনের জমিন ফিরে পাবার আশা বরবাদ করে দিয়েছে, আর নিজের লাভের কথাও ভাবতে রাজি হয়নি...এই বড়াসাহেবের কপালে শেষ পর্যন্ত কি আছে শিউজী জানে। ব্রিজমোহনের এই পিয়ারের জমিন সরকার কেড়ে নিয়েছে বলে ছুপার অচ্ছুত আর

গরিবরা কে না খুশি, ওই লোককে জব্দ দেখলে ওদের সকলেই খুশি হয়, তাই তোতাচাচার মুখে একথা শুনে পরদেশীবাবুর জন্য ওদের একটু ভাবনা হচ্ছে, আর এইজন্যেই তিতলির তাকে একটু হুঁশিয়ার করে দিতে আসা।

মুখের দিকে তাকিয়ে শুনলে একটি কথাও অবিশ্বাস করার মতো নয়। মুখের দিকে তাকিয়েই শুনল শাওন। তবু ভিতরটা সন্ধিৎসু। পরোক্ষে এই মেয়েও কি ব্রিজমোহনের হয়ে তাকে হুমকি দিতেই এলো? জিগ্যেস করল, ব্রিজমোহনের দালাল হয়েও তোতারাম তোমাকে এ-কথা বলতে গেল কেন?

জবাবে আবার সেই সরল তরল হাসি। জবাবের মর্মও রসালো।—বড়সাহাব হলেও তোমার বুদ্ধি দেখছি বাচ্চার মতো পরদেশীবাবু—এখানকার মরদরা আমাকে কাছে পাওয়ার মওকা পেলে ছাড়ে না, দিলখুশ বাতাবাতি করে আটকে রাখতে চায়। ব্রিজমোহনকে আমি কত ঘৃণা করি সে জানে, খুশ্-মনে আমাকে এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সে এ-সব মন-ভরি কথা শোনাবে না তো কাকে শোনাবে? সে কি ভেবেছে, ওই শুনে আমি সোজা তোমার কাছে চলে এসে হুঁশিয়ার করে দেব!

সংশয়ের ছায়া সরছে। তবু সতর্ক। পদ-মর্যাদার গাম্ভীর্যটুকু ধরে আছে। শাওন বলল, ব্রিজমোহন জানে আমার ক্ষতি করলে বা আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারলেও এটা সরকারের কাজ—দু'দিন না যেতে আমার জায়গায় আর একজন এসে বসবে—আবার দেখা হলে তোতারামকে তুমি এ-কথা বলে দিতে পারো—

পর্দা ফাঁক করে রতন গলা বাড়াল। সাহেব ঠিক সাড়ে তিনটেয় চা খায়। চা রেডি। কিন্তু এক পেয়ালা আনবে কি দু'পেয়ালা ঠিক বুঝতে পারছে না। সাহেবের কাছে আর কেউ থাকলে তাকেও চা দেবার রীতি। কিন্তু এখন যে বসে সে মেয়েছেলে, তাই সাহেবের নির্দেশের আশায় পর্দা সরিয়েছে। তিতলি এ-দিক ফিরে বসে, সে ওকে দেখতে পেল না। সাহেব সামান্য মাথা নাড়তে রতন যা বোঝার বুঝে নিল।

শাওন আবার সোজা তাকাল। পাল্লায় ভাল লাগার দিকটা নিচে নামছে। একটু হেসে বলল, সরকারী কাজে বড় সাহেবের অভাব কখনো হবে না, খনির কাজও থেমে থাকবে না—তোমার তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই তো?

কাজল-টানা ভ্রমর-কালো দুই চপল চোখ তার মুখের ওপর নিশ্চল একটু। যে-রকম চাউনি চোখের ভিতর দিয়ে মুখের ভিতর দিয়ে অনেকটাই চলে যায়। তারপরেই হেসে উঠল। সেতারের গোটা দুই মিষ্টি ছাড়া-ছাড়া ঝঙ্কারের মতো। জবাব দিল, উঁহু, চিন্ত জরা বাড়হলঅ, আগে বড়া সাহাবকা বারে (জন্য) চিন্তা করত্ রহলী, আব্ তোঁহার খাতির (জন্য) গভীর চিন্তিত হই।

—কেন?

—তোঁহারকে সাচ্চা আদমী লাগল, লেকিন। (দু'আঙুল টিপে দেখিয়ে) জরাসে কাচ্চাভি...

পর্দা ঠেলে রতন ভিতরে এলো। হাতের ট্রে-তে দু' পেয়ালা চা, আর একটা ডিশে খানকয়েক বিস্কুট। পেয়ালা দুটো দু'জনার সামনে আর বিস্কুটের ডিশ মাঝখানে রাখতে তিতলি

হাঁ করে প্রথমে রতনের দিকে চেয়ে রইল। সে চলে যেতে শাওনের দিকে।—পিয়ালিমে চায়ে হমারি খাতির (জন্য)?

নিজের পেয়ালা কাছে টেনে নিয়ে মাথা নেড়ে শাওন বলল, কেন, চা খাও না?

একটু মাথা হেলালো। অর্থাৎ খায়। কিন্তু কাজল-টানা চোখে বিস্ময় উপচে পড়ছে যে কারণে সেটা তার পরের কথায় বোঝা গেল।—এ বাবু, হম শুনলী তুম্ ব্রাঁভন্?

—তাতে কি?

চোখের বিস্ময় এবারে গলা দিয়ে ভেঙে পড়ল, তুম ব্রাঁভন আর হম্ অছুত হই, মন্ওয়ামে না আইলঅ তোঁহার পেয়ালামে চা পিয়ব, পিরিচমে বিস্কুট খাইবু।

মেয়েটাকে ভারী সুন্দর একটা তাজা বুনো ফুলের মতো লাগছে শাওনের, যাকে নিঃসঙ্কোচ চোখ তাকিয়ে দেখা যায়! দেহতট উপচে পড়া যৌবনটুকুই শুধু বড় আকর্ষণ হলে শাওন তা পারত না। তার অন্তর্মুখী স্বভাব। রসবোধও তাই। কিন্তু মেয়েটার এ-কথার পর অনায়াসে সেটুকু মুখর হয়ে উঠতে চাইল। হতে পারল। ছদ্ম-গম্ভীর চাউনি তার মাথা থেকে প্রায় কোমর অর্থাৎ টেবিল পর্যন্ত নেমে আবার মুখের ওপর উঠে এলো। একটু সামনে ঝুঁকল।—তোমার হাত দেখি?

কিছু না বুঝে অবাক হয়ে তিতলি দুটো হাতই তার দিকে মেলে ধরল। লালচে হাত আর চম্পাকলির মতো আঙুলগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে নিয়ে শাওন আবার সোজা হল।

সবই তো দেখি ঝকঝকে পরিষ্কার—অছুত কোথায়?

আঁচ করতে পারছে, কিন্তু এই বাংলা তিতলির মাথায় একেবারে ঠিক-ঠিক ঢুকল না।

—ঝক্‌মক্ কা কহল্অ?

বললাম, ঝকমক—

—আওর পরষ্কার?

—পরষ্কার না, পরিষ্কার—সাফাই—মতলব, বিলকুল ঝকমক সাফাই আওর সফেদ—অছুত কাঁহা?

তিতলি চেয়ে আছে। মানুষটার মধ্যে যেন ভাল করে দেখে নেবার মতো কিছু আছে।

বিস্কুটের ডিশ হাতে তুলে নিয়ে শাওন তার সামনে ধরল।—তুলে নাও, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তিতলি একটা বিস্কুট তুলে নিল। ডিশটা রেখে নিজে একটা বিস্কুট নিয়ে শাওন চিবুতে চিবুতে চায়ে চুমুক দিল। তিতলি দাঁতে করে বিস্কুট কাটছে, সাদা দাঁতের সারির কয়েকটা চিকচিক করছে, সামনের লোককেই দেখছে।

ক্যাম্প-ইন-চার্জকে এরা বড় সাহেব বলে। এ-জন্যে শাওনের কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ নেই। অল্প বয়সে সিনিয়র জিওলজিস্ট হতে পেরেছে এটুকু ভাগ্য। আসল বড় সাহেবের সঙ্গে অনেক ফারাক। কিন্তু স্বভাব গম্ভীর বলেই সমপর্যায়ের সতীর্থরাও তাকে একটু অন্য চোখে দেখে। আর এখানকার শ্রমিক কর্মচারীরাও একটু বাড়তি মর্যাদা দেয়। কিন্তু আসলে ভিতরের মানুষটা একটা নীরস বাষ্পের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। সেই বাষ্পের আবরণ ক্রমে নিরেট হয়ে আসছে।

তার মধ্যে এই ভালো লাগার অনুভূতিটুকু আশ্চর্যরকমের ব্যতিক্রম। একটা মেয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবই সুন্দর, হাঁটা চলন-বলনের ঠমক সুন্দর, দুধ-সাদা ঝিকি-মিকি দাঁতের সারি সুন্দর, হাসি সুন্দর কটাক্ষ সুন্দর, আর এই যে অপলক চেয়ে আছে তাও যেন ভিতরের নিরেট বাষ্পের আবরণটা তরল করে দেবার মতো সুন্দর। ভিতরের এই অনুভূতি গোপন করারই চেষ্টা শাওনের। মনে হল মেয়েটা ওকে খুব মহৎ গোছের লোক ভাবছে। সহজ হবার তাগিদে একটু প্রশংসার সুরে বলল. কিছু কিছু কথার মানে না জানলেও তুমি কিন্তু এখানকার অনেক লোকের থেকেই বাংলা ঢের ভালো বোঝো।

দেখার তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। মিষ্টি ঝংকার তুলে হঠাৎ একটু জোরেই হেসে উঠল। হাসির কারণ বুঝল না, কিন্তু ভেতরের নিরেট বাষ্পের আবরণ ভেদ করে একঝলক দক্ষিণের বাতাস ঢুকে গেল যেন। কচমচ করে বিস্কুটটা চিবিয়ে দু'তিন বার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। আর একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে হাসি মুখে কথার মধ্যে বাংলা বুলি মেশাতে চেষ্টা করল।—তোঁহারা বিস্কুট খুব বালো—

শাওনের মনে হল চোখের ভাষায় এই মন্তব্যের কিছু একটু তাৎপর্য আছে। তিতলি এক চুমুকে পেয়ালার বাকি চা-টুকু খেয়ে নিল। তারপর খুব হালকা সুরে বাংলা বুঝতে পারার তারিফের কারণ বিস্তার করল।—বাংলা কেবল বুঝতে পারা কেন, বাংলায় অনেক কথা বলতেও পারত। চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে ফুফু (পিসি) আর বাবার নৌটঙ্কী দলের সঙ্গে কলকাত্তা গেছল, দু'বারই 'খিদিরপুর ভূ-কৈলাস কৈলাস শিউজী' মন্দিরের সামনের চত্বরে রামলীলা আর লায়লা-মজনুর জমাটি যাত্রা হয়েছিল। রামলীলায় লবকুশের লব আর লায়লা-মজনুতে বাচ্চা লায়লার পার্ট করে ও আসর মাত করেছিল। বংগালের পাহাড়ী জায়গাগুলোতেও ওদের নৌটঙ্কী দলের খুব খাতির কদর হয়েছিল। কিন্তু ফুফুর বয়স হতে আর ওর বাবারও দারু খেয়ে খেয়ে মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যেতে ওদের এতবড় নৌটঙ্কী দল ভেঙে গেল, তাছাড়া দল ভাঙার আরো কারণ, বয়েস বাড়তে তিতলিকে যাত্রার আসরে নামতে দিতে ওর বাবার ভীষণ আপত্তি —এই নিয়ে ফুফুর সঙ্গে বাবার দারুণ ঝগড়া হত—ফুফুর টাকার লালচ খুব, কিন্তু বাবাকে তখন ভীষণ ভয় করত, দারু খেলে বাবার তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, রাগের মাথায় তখন যে-কেউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে।—এখন অবশ্য বাবার মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, দারু খেয়ে দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় বেহুঁশ থাকে। আবার এক-ঝলক হাসি আর তির্যক চাউনি।—এখন সে-ই নৌটঙ্কী দলের ব্যবসা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পারে, ইচ্ছেও খুব করে, কিন্তু হুঁশ ফিরলে বাবা কখন আবার ফুফুর ঘাড় মটকাতে আসে এই ভয়ে সে আর দল গড়তে চায় না। ছোট আর গরিব ঘরের ভালো দেখতে মেয়েদের নাচ-গান শেখায়... আর তিতলিকেও সব থেকে বেশি তালিম দেয়। আবার খিলখিল হাসি।—ফুফুর আসলে আমাকে দিয়ে ঢের বড় দাঁও মারার ইচ্ছে—

প্রতিটি কথা বোঝার জন্য শাওন দু'কান খাড়া করে শুনছে। রতন এসে কোন ফাঁকে পেয়ালা প্লেট তুলে নিয়ে গেছে তা-ও খেয়াল নেই। মেয়েটার সম্পর্কে আরো অনেক শুনতে অনেক জানতে ইচ্ছে করছিল শাওনের। যাত্রাগানের দলে ছিল, এখনো পিসি ওকে সব থেকে

বেশি তালিম দেয় শুনে তার ভিতরেও কি গান শোনার লোভ উঁকিঝুঁকি দেয়নি? সেটা কখনো সম্ভব হবে না জানে, কিন্তু যার কথা, এমন হাসি এমন গলার স্বর আর সুর এমন নিটোল মিষ্টি, তার গানও দু'কান ভরে শোনার মতোই হবে বলে ধারণা। মদ্যপ আর উন্মাদ বাবার কথা বলল, লোভী পিসির কথা বলল, কিন্তু মায়ের কথা কিছু বলল না, তাইতে মনে হল মেয়েটার মা নেই। লজ্জা-টজ্জার ধার ধারে না, কোন্ জোরে ও-ই এখন নোটঙ্গী দলের ব্যবসা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পারে সে-ইঙ্গিত একটুও অস্পষ্ট নয়। আর অনায়াসে বলল, ফুফুর ওকে দিয়ে ঢের বড় দাঁও মারার ইচ্ছে—তবু কি বাজে গোছের বেশরম মনে হয়েছে মেয়েটাকে? একটুও না। পিসির বড় দাঁও মারার ইচ্ছে বলতে বুঝেছে, গান-টান শিখিয়ে রূপসী গুণবতী মেয়েকে মোটা টাকার বিনিময়ে কোনো বড়লোক ছেলের হাতে গছাবে। অছুতদের মধ্যেও অঢেল পয়সাঅলা লোক কি কোথাও নেই—ওদের সমাজে হয়ত কন্যাপক্ষই টাকা হাঁকে। শাওনের আরো মনে হল বছর কুড়ি হবে মেয়েটার বয়েস, ওদের জাতের কেন, কোনো ঘরেরই এমন নিটোল যৌবনের রূপসী মেয়ে এ বয়স পর্যন্ত সচরাচর অবিবাহিত থাকে না, ওর পিসি সে-রকম দাঁও মারার মতো বড়লোকের ছেলের সন্ধান এখনো পায়নি বলেই হয়তো এখনো বিয়ে হয়নি।

—রাম রাম সাব, গুড আফটারনুন—

ডাক পিওন চলতরাম। কাঁধে থলে, হাতে চিঠির পাঁজা। ভিতরে ঢুকে পড়ে সাহেবের সামনে চেয়ারে যে বসে তাকে দেখে তাজ্জব বনে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য হাঁ একেবারে। তারপর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, ও ছৌঁড়ী, তু হিঁয়া সাহাবকা সাথ কুরসিয়ামে বৈটল রহি!

হাসি চেপে তিতলি ওর দিকে ফিরে কড়া করে চোখ পাকালো—এ ডাক-বাবু, তব ভি তু হমারি সম্মানোঁয়া না সমঝল? রাস্তে মে দেখনেসে তু হামে গোরী কহত, আর আব হিঁয়া ছৌঁড়ী কহল্অ। এ বড়া-সাহাবকে সাখ্‌সী (সাক্ষী) মানত্ করকে হম নালিশ করে তো তোহার নকরি থাকবু?

চলতরামের গোল চোখ, ভেবাচাকা খাওয়া মুখ। সামলে নিয়ে শশব্যস্তে ডাকের চিঠিগুলো সাহেবের সামনে টেবিলে রেখে সেলাম করল। তারপর যাবার জন্য ঘুরে এক পা বাড়িয়ে তিতলিকেও একটা সেলাম ঠুকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

তিতলির চোখে মুখে সর্ব অঙ্গে হাসির জোয়ার নামল। হাসি আর থামেই না। অত হাসির ফাঁকে ফাঁকে আরো যা উপচে উঠছে, স্থান-কাল ভুলে শাওন তা-ও দেখছে। চোখে চোখ পড়তে তিতলি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। হাসি থামলেও মুখে খুশির আভা ছড়িয়ে আছে। ছড়ার মতো করে টেনে-টেনে বলল, ও চলতরাম চলত-চলত ছাড়ল্অ বাত—আব সারা গাঁওকা খুলাবে আঁখ। হম ভাগ যা-ই—

হালকা দ্রুত পায়ে ক্যাম্প-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মুখে কি মনে পড়তে আবার ঘুরে দাঁড়ালো। হাসির বদলে মুখে ঈষৎ উদ্‌বেগের ছায়া। সেখানে দাঁড়িয়েই আর এক দফা সতর্ক করল।—ও ব্রিজমোহন পর্ কভু বিসোয়াস না রাখত্ বাবু, ও কইসন আদমী বটে তুম না জানল—উহার সিনেমে পাত্থল (পাথরের বুক) আউর মায়া-মমতা? ফুঃ...!

তিতলি চলে গেল। রঙিন প্রজাপতি উড়ে গেল। এই নীরস ক্যাম্প-ঘরে রং ছড়িয়ে রেখে গেল।

শাওন কখনো নিজের ওপর বিরক্ত হয়, কখনো আবার নিজের ভিতরে চোখ চালিয়ে একটু মজাও পায়। সকালে সাইটের কাজে বা তদারকে নামলে তার তন্ময়তায় সচরাচর ছেদ পড়ে না। জমিতে কাজের পরিধি বাড়ছেই। কোনো খুঁটিনাটি চোখের আড়াল হয় না, ঘুরেফিরে সর্বত্র টহল দেয়, যেখানে দরকার নিজে হাত লাগায়, কিছু যাচাই করার কথা মনে হলে শ্রমিক বা কারিগরদের হুকুম না করে নিজেই খানা-ডোবা বা গর্তে নেমে পড়ে। ভ্রামম্যান পাম্প-ম্যান ওয়েলডার মিকানিকবাও জানে সাহেব কাজ বোঝে, কাজ ভালবাসে। তাই যাদের কাছেই গিয়ে দাঁড়ায়, তাদের উৎসাহ বাড়ে। এই করে কখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হয় শাওনের হুঁশ থাকে না। বেলা গড়াতে দেখলে অনেক সময় রতন সাইটে এসে তার সাহেবকে ধরে নিয়ে যায়, গজগজ করে, বেলা একটা বেজে গেল, কখন আর চান-খাওয়া হবে!

শাওনের ইদানীং মাঝে মাঝে নিজের ওপর বিরক্তির কারণ, এই তন্ময়তায় ব্যাঘাত ঘটছে। কাজের মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ থেমে যায়, চারদিকে তাকিয়ে দেখে। একদিক থেকে আর একদিকে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে যায়, দু'চোখ সাইটের চার দিকে ঘুরে আসে। যে মেয়ের খেয়াল-খুশির পদক্ষেপে এখানকার নীরস বাতাস সরস হয়ে ওঠে, খোঁড়া-খুবলনো মাটিতে রং ধরে, কখনো জ্ঞাতসারে কখনো বা অগোচরে তাকেই খোঁজে। বিরক্তির কারণ, কাজের মনোযোগে ঘাটতি পড়ে বলে। কাজের ক্ষতি অবশ্যই হয় না, কিন্তু মন সর্বদা নিজের দখলে থাকবেই না কেন? আবার নিজের ভিতরে চোখ চালিয়ে মজা পায় এই কারণে যে, ব্যাপারখানা কি? মেয়েটাকে হাল্‌কা প্রজাপতির মতো এই মাটিতে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখলে, বা কাছে এলে এত ভালো লাগে কেন? এ-রকম ভালো লাগার অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় আগে কখনো ছিল না। কিন্তু কেন লাগে? তার রূপ? তার যৌবন? নিজের ভিতরে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছে শাওন ভার্মা। না, এই রূপ-যৌবনকে নিয়ে কোনো ব্যভিচারী বাসনার অস্তিত্ব মনের কোথাও নেই। থাকলে নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারত না, এই মেয়েকেও বিষ-ফুলের মতোই ছেঁটে ফেলত, এমন কি তার এখানে আসাও বন্ধ করে দিত হয়তো। কিন্তু তা নয়, এ এক বিচিত্র রকমের ভালো লাগা? ভিতরটাকে সরস করে, স্নিগ্ধ করে, মন-মাতানো ফুলের বাস ছড়ায়।

...ক্যাম্পে আসার পরদিনই ওই মেয়ে একটু বেলায় মাঠে এসে সোজা তার কাছে হাজির। আধা হুকুমের সুরে যা বলেছে তার অর্থ, আমাকে এখানকার যন্ত্রপাতি আর কাজকর্মগুলো একটু বোঝাও দেখি!

যেন এখানকার বাসিন্দা হিসেবে জানার বা বোঝার তার কিছু অধিকার আছে। শাওন হেসে জবাব দিয়েছে, এতদিন দেখছ, এত লোকের সঙ্গে কথা কইছ, এখনো জানতে বুঝতে কিছু বাকি আছে?

ঠোঁট উল্টে দিয়েছে।—হুঁঃ, তোমার কাজের লোকদের আমার মতোই জ্ঞান-গম্যি—তামুয়া (তামা) কত নিচে আছে জানে না, কবে কতদিনে বেরুবে জানে না, যন্ত্রের নামও এখানকার গাঁইয়া ভাষায় বলে—হাত তুলে অদূরের টুকরো টুকরো লোহার ফ্রেমে আটকানো পাঁচ-ছ'তলা উঁচু কাঠামোটাকে দেখিয়ে বলল, ওটার নাম এরা বলে 'গাছুয়া'—বিলায়েতি জিনিসের নাম এ-রকম কখনো হয়? তারপরেই লালচে ঠোঁটে হাসির ঝিলিক।—তাছাড়া বড়া-সাহাবের মুখ

থেকে সব জেনেছি বুঝেছি শুনলে সহেলিদের কাছে আমার কদর বেড়ে যাবে না?

শাওনা খুশি মুখে তার যুক্তি মেনে নেবার পর অনেকক্ষণ ধরে তিতলি স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে সঙ্গে সাইটে ঘুরেছে। কোন্‌টা কি আর তার কি কাজ শাওন বলেছে, ও খুব মন দিয়ে শুনেছে। ...পাঁচ-ছ'তলা উঁচু ওই লোহার ফ্রেমের নাম 'রিগ', তার সঙ্গে লোহার দড়ি দিয়ে ঝোলানো যে ঢাউস জিনিসটা—ওটার নাম হম্বর। তার খানিক নিচেই মস্ত পাইপের তলার দিকের খানিকটা মাটিতে ঢুকে আছে, বিশাল ওজনের ওই মস্ত হম্বর দিয়ে পাইপের মাথায় ঘা দিতে দিতে অতবড় পাইপের সবটা মাটির নিচে চলে যাবে।

তিতলি দড়িতে ঝোলানো অমন বিশাল লোহার খণ্ড পাইপের ওপর উঠতে আর পড়তে দেখেছে, সেই দিনও দেখেছিল। কিন্তু এমন কাণ্ড কি করে হয় মাথায় ঢোকেনি। এটুকু বুঝেছে আশপাশের যন্ত্রগুলোর সাহায্যে এমন আসুরিক ব্যাপারটা ঘটছে। পাশেই যে মেসিনটা চলছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আর শব্দ অনুকরণ করে তিতলির পরের প্রশ্ন, ঝিম্‌ঝিম্‌-ঝিঃ ঝিম্‌ঝিম্‌-ঝিঃ করে চলেছে ওটা কি জিনিস?

শব্দের অনুকরণ গলা দিয়ে ঠিকই বার করেছে। শাওন বুঝিয়েছে, ওটার নাম ড্রাম-মেসিন, ওটা দিয়েই লোহার দড়িতে বাঁধা ওই রোলার ওঠানো আর মাথায় ফেলা হয়, অত মোটা পাইপও ওঠানো নামানো যায়।

পরের চালু যন্ত্রটার দিকে আঙুল।—গোঁওঁওঁ ...গোঁওঁওঁ আওয়াজ করে চলেছে ওটা কি?

—ওটার নাম মোটর, ওটার জোরেই ড্রাম মেসিনটা চলছে।

—সমজদারের মতো মাথা নেড়ে বুঝে নিয়ে তিতলি তার সঙ্গে আবার এগিয়েছে। কয়েক পা এগিয়েই আবার একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। রাতেও ওটা দেখেছে, তখন ওই যন্ত্রটা চললে চোখ ঝলসে দেবার মতো নীল আলো ঠিকরোয়, সেই নীল আলো মাঠের অনেকটা জায়গার অন্ধকার যেন থেমে থেমে গিলে খেতে থাকে। ওই যন্ত্র এখন চলছে না, কিন্তু শব্দটা ঠিক মনে আছে তিতলির। আঙুল তুলে ওটা দেখিয়ে গলা দিয়ে সেই শব্দটাই বার করতে চেষ্টা করল।—ফস্‌...স্‌...ফট—ফস্‌...স্‌ স্‌ ফট্‌!

শাওন হেসেই চলেছিল।—ওটার নাম ওয়েলডিং মেসিন, ইলেকট্রিকে ঝালাই হয়—ওই মেসিন দিয়ে মস্ত মোটা পাইপ জুড়ে ফেলা যায়।

তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পাওয়ার জেনারেটার দেখল আর ব্যাপারটা বুঝে নিল। বড়সড় ডোবা তৈরি করে তাতে তোড়ে জল ফলা হচ্ছে যে জিনিসটা দিয়ে তার নাম নাকি ওয়াটার পাম্প। এই নামটা মনে রাখতে তিতলির অসুবিধে নেই, ওয়াটার জল জানাই আছে, আর পাম্পকে তো ওরা পাম্পু বলে। কিন্তু মনে রাখার ব্যাপারে একটু ফ্যাসাদ হল অন্যরকমের পাম্পুর নামটা নিয়ে—কম্‌প্রেসার পাম্প্‌—পাইপের ভিতর দিয়ে জল, কাদা, মাটি তুলে অন্য ডোবায় ফেলার কাজ ওটা দিয়ে হয়। তিতলি বার কয়েক নামটা আওড়ে নিয়েছে—ঠিক মনে থাকবে।

কাজে বা মনোযোগে ছেদ পড়েনি শাওন ভার্মার, কিন্তু সকালের সময়টুকু অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি আনন্দের মধ্যে কেটে গেছে।

বিকেলের দিকে নিজে কাজে হাত লাগায় না, আর কাজ দেখার মধ্যেও হাল্‌কা মেজাজে ঘুরে বেড়ায় এ তিতলিও জেনে গেছে। একটা দিন বাদ দিয়ে তার পরদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ চারজনের একটা দল নিয়ে ওই মেয়ে মাঠে হাজির। তখনো বিকেলে সকালের মতো পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে যায়নি। প্রায় বিকেলেই ছুট শ্রমিক-মজুরদের দরকার হয় না তখন পর্যন্ত। তবে যে প্ল্যানে এগনো হচ্ছে, তাতে বিকেলের কাজের চাপও শিগগীরই বেড়ে যাবে। শাওন ভার্মা তার একজন খুব অনুগত আর বিশ্বস্ত মেকানিকের সঙ্গে এ-দিক ও-দিক ঘুরছিল, আর মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়ে কাজ নিয়ে আলোচনা করছিল। কখনো-সখনো অন্য কথাও হচ্ছিল।

সঙ্গিনীদের নিয়ে তিতলি সোজা তাদের সামনে।—গুডি-ভ-নি-ং বড়াসাহাব—

শাওন হেসে মাথা নাড়ল। সঙ্গিনী চারজন ঈষৎ আড়ষ্ট। ইংরেজি অভিবাদনের ঘটায় মেকানিকটিও হেসে ফেলল। সাইটে এই মেয়ের মুখ এতদিনে কে আর না চেনে। দু'জনকেই হাসতে দেখে তিতলির পাতলা দুই ভুরুর মাঝে সংশয়ের ঘন ভাঁজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত কোমরে। —কাহে হাঁসথে? নিজের লালচে বাঁ-হাত তাদের সামনে পেতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে কড়ে আঙুলের কড়া গুনে গুনে পলকা গম্ভীর ঝাঁঝের সুরে বলল, হামে চলতরাম শিখালী ভোরোয়াসে বারা বাজতক্ 'গুড্‌মর্নিং', দুফরসে চার বাজতক 'গুডাফ্‌টিনুন', ওকরা বাদ সাঁঝোয়াতক গুডি-ভ-নিং—তো ভুল কাঁহা?

শাওন বিশ্বাসযোগ্যভাবেই মাথা নাড়ল, বলল ভুল কিছু হয়নি, তোমার মুখে অমন সুন্দর ইংরেজি শুনে আমরা খুশি হয়ে হেসেছি।

মেয়ে বোকা একটুও নয়, গোল কিছু হয়েছে বুঝেইছে। তবু একটু মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর সুরে বলল, থ্যাংকু! তারপর চটপট প্রসঙ্গ বদলে জানান দিল, এই চারজন তার সহেলি। প্রথম যে দুটি শাড়ি-পরা সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করালো, তাদের একজনের বয়স সাতাশ-আঠাশ নাম শুনল সীতিয়া (সীতা), পরের শাড়ি-পরা সুশ্রী মেয়েটি তিতলির থেকেও বয়সে বেশ ছোটই হবে—সীতিয়ার ছোটি বহেন্ লছমী। মিষ্টি গলা এরপরেই একটু ভারিক্কি করে তোলার চেষ্টা তিতলির, চোখে মুখে আত্মপ্রসাদের ভাব। সমঝে দিল, সে অছুত বলে বাবুসাহেব যেন তার সহেলিদেরও সকলকে অছুত না ভাবে, সীতিয়া আর লছমী হল পঞ্চ-এর মুরুব্বি জনার্দন পূজারীর বেটী!

শুনে শাওনের ভালো লাগল, আবার একটু অবাকও। এত দিনে সে গাঁয়ের মাতব্বরদের নাম-ধাম বা কে কেমন মানুষ মোটামুটি জানে। মহাবীরজীর মন্দিরের প্রধান সেবক আর এখানকার জাত-পাতের গুরুঠাকুর জনার্দন পূজারীর সঙ্গে ঠাকুর ব্রিজমোহন একদিন আলাপও করিয়ে দিয়েছিল। সেই আলাপের বৈঠকে পঞ্চ-এর অন্য তিন মাতব্বর মহাবীর প্রসাদ জগদেও মিশির আর গণপত লালাও উপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে কাজের খাতিরে ইঁট সিমেন্ট চুন সুরকি আর লোহা-লক্কড়ের শাঁসালো কারবারী গণপত লালার সঙ্গেই কেবল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ শাওনের। কথায় কথায় ওই গণপতের মুখেই একদিন শুনেছিল, জনার্দন পূজারী জাত-পাতের কড়া ঠিকাদার। গাঁয়ের এমন জাত-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের দুই মেয়ের সঙ্গে এক অছুত মেয়ের এমন

ভাব-সাব দেখলে একটু অবাক হবারই কথা।

দুই মেয়েই হাত জোড় করে নমস্কার জানালো। বয়স্কা মেয়েটি অর্থাৎ সীতার কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন চোখে পড়ল না। বিধবাও মনে হল না, কারণ পরনে পাড়-অলা রঙিন শাড়ি। আবার সাতাশ আঠাশ বছরের সুশ্রী গাঁয়ের মেয়ের অবিবাহিতও থাকার কথা নয়। লছমীকে অবশ্য আঁচ করা যায় তার বিয়ে হয়নি।

বাকি দুটো শ্যামবর্ণা মেয়ের পরণে রঙিন ঘাঘরা আর জামা। তিতলির মতো অত চকচকে বা দামী নয় অবশ্য। ওদের একজনের নাম মায়া অন্যজনের বিজ্‌লী। কালো হলেও কুৎসিত নয়, আর হাসিখুশি। ওদের সম্পর্কে আর কিছু না বলাতে বোঝা গেল ওরা স্বজাতের। তিতলির সমবয়সী, দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে।

পরিচয়পর্বের পর তিতলি এ-সময়ে এখানে হানা দেবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। কিন্তু এটুকুর মধ্যেও রসালো কৌতুকের মিশেল।...ঠাকুর ব্রিজমোহনকে তো সবাই খুব পছন্দ আর মান্যিগণ্যি করে, তাই সরকার তার জমি দখল করে এত সব যন্ত্রপাতি বসিয়ে এখানে কি করছে সহেলিদেরও জানার আর বোঝার ইচ্ছে—এ-জন্যেই তিতলিকে ধরে ওদের আসা।

শাওন হাসি মুখেই অনুমতি দিল, বলল, তুমি তো সবই জেনে বুঝে গেছ, তুমিই ওদের দেখাও শোনাও—

জবাবে দু'চোখ একটু বড় করে যা বলল, তা কেবল এই মেয়ের মুখেই মানায়।—আমিই দেখাব শোনাব না তো কি তোমার ভরসায় ওদের এনেছি ?... তবে তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছ দেখছি, ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারো—

অনুমতি পেয়ে শাওন বর্তে যাওয়ার ভাব দেখালো। হাসি চেপে সবিনয়ে বলল, আচ্ছা তোমরা এগোও, আমরা আসছি।

নিজেদের কথা আর বিশেষ এগলো না। ওই হালকা দিনে ওদের সঙ্গ নিতে ইচ্ছে করছে এটা কোন্ ধরনের দুর্বলতা শাওন তা-ও ঠাওর করে উঠতে পারছে না। ভিতর থেকেই প্রশ্ন উঠল, ওদের না বিশেষ করে একজনের ? না, শাওন এই বিশ্লেষণের মধ্যে মাথা গলাবে না। সে বরাবর একলার জগতের মানুষ। তার মধ্যে এই বৈচিত্র্য ভালো লাগে, ভালো লাগছে, তাতে কার কি ক্ষতি ?

চলতে চলতে হাসি মুখে তিতলিকে দেখিয়ে মেকানিকটা বলল, এখানে এসে পর্যন্ত ওই মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক রকমের কথা শুনেছি—

মেয়ের দল গজ দশেক আগে আগে চলছে, আর তিতলি সব-জান্তার মতো এটা-সেটা দেখাচ্ছে, আর তার মুখ চলছে। কি বলছে তা অবশ্য শুনতে পাচ্ছে না। মেকানিকের কথা শুনে শাওন উৎসুক।—খারাপ কিছু ?

—না না, বরং খুব ভালো। মেয়েটা নাকি এই গাঁয়ের মুরুব্বিদেরও কাউকে কেয়ার করে না, কারো অন্যায় দেখলে এসে রুখে দাঁড়ায়, কৈফিয়ৎ চায়।...তোতারাম একদিন গল্প করেছিল, ওই সীতা মেয়েটার তার বাপ জনার্দন পূজারীর ওপর ভীষণ রাগ। টাকা খেয়ে ভিন গাঁয়ের এক বড়লোক আধ-বুড়োর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। এই স্বামীর ঘরে আরো দুই সতীন আছে তা

পর্যন্ত কাউকে জানতে দেয়নি। আর ওই বড়লোক আধবুড়ো যখন দেখতে আসে সীতার তখনো ধারণা ওই লোক তার শ্বশুর হবে। বাপের ওপর আক্রোশ আর দুই সতীনের অত্যাচারে বিয়ের তিন মাসের মধ্যে সীতা স্বামীর ভিটা ছেড়ে চলে এসেছে। জনার্দন পূজারী চেষ্টা করেও এই দশ বছরের মধ্যে আর তাকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে পারেনি। মেয়ে যেমন জেদী তেমনি তেজী। তাছাড়া মেয়ের এই অদৃষ্ট দেখে তার মা-ও সোয়ামীর ওপর ক্ষিপ্ত। মা-মেয়ের দাপটে ঘরে জনার্দন পূজারীর চুহার দশা। বাপের ওপর আক্রোশেই সীতা জাত-পাতের ধার ধারে না, অচ্ছুত পাড়ায় গিয়েও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে। আর ওর জন্যেই ছোট মেয়ে লছমীটাও বিগড়ে যাচ্ছে, তিতলির সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব। সীতাও এমন ভাব দেখায় যেন লছমীর মতো তিতলি ওর আর একটা ছোট বোন। জাত-পাতের মাথা হয়ে জনার্দন পূজারী এতটা বরদাস্ত করে কী করে? তাছাড়া দেখতে ছোট-খাট হলেও লছমীর বয়েস তো আঠেরো গড়িয়ে যাচ্ছে, বিয়ে দিতে হবে না? জনার্দন পূজারীর মেয়ে বলেই ছোট জাতের ওই মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা দেখেও গাঁয়ের লোক মুখ বুঁজে মজা দেখছে, কিন্তু বিপাকে ফেলার মওকা পেলে তারা কি আর চুপ করে থাকবে?...এই সব ভেবেই নাকি পঞ্চ-এর অন্য মুরুব্বিদের সঙ্গে পরামর্শ করে জনার্দন পূজারী একটা ছোট বৈঠক ডেকেছিল। উদ্দেশ্য পঞ্চ-এর বন্ধুরা সীতা আর লছমীকে আপনার জনের মতো একটু সমঝে দেবে আর তিতলিকেও একটু সতর্ক করে দেবে।... কিন্তু সেই ঘরোয়া সভায় এসে তিতলি জনার্দন পূজারীকে একেবারে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল। খুব মিঠা করে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, অযোধ্যার রামজী, মহাভারতের ব্যাস মুনির মাতাজী সত্যবতী বা ভীম, আর দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম শুনেছে কি না। রূপের জোরে হোক বা যে জন্যেই হোক গাঁয়ের সকলের মতো এই মরুব্বিরাও মেয়েটাকে একটু ভিন্ন চোখে দেখে—তাছাড়া এটা বিচার-বৈঠক তো আর নয়। প্রশ্ন শুনে সকলে হেসে উঠেছিল, জনার্দন পূজারীও। কিন্তু তার পরের প্রশ্ন শুনে থ। তিতলি জানতে চেয়েছে, রামজী গুহক চণ্ডালকে বুকে টেনে নিয়েছিল বলে তার জাতে দাগ পড়েছে কি না, ব্যাস-মাতা সত্যবতী মাছুয়ার ঘরে বড় হয়েছিল বলে তার জাতে কলঙ্ক লেগেছে কিনা, হিড়িম্বা-রাক্ষসীকে বিয়ে করেছিল বলে ভীমের জাত খোয়া গেছে কি না, আর রাজা হরিশ্চন্দ্র ডোমদের সঙ্গে থেকেছিল, তাদের সঙ্গে খানাপিনা করেছিল আর মুর্দা পুড়িয়েছিল বলে সে অচ্ছুত হয়ে গেছে কি না?

বোঝানো বা সমঝানো মাথায় উঠেছিল নাকি। মুরুব্বিদের সামনেই সীতা তিতলিকে জড়িয়ে ধরে লছমীকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিল।...মুরুব্বিদের মধ্যে সব থেকে যার মাথা উঁচু সেই ব্রিজমোহনই যখন হা-হা করে হেসে উঠে মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিল, জনার্দন পূজারী কি আর করে? পরে ব্রিজমোহন নাকি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, মেয়েটা আর খুব বেশিদিন গাঁয়ের লোকেদের জ্বালাবে না— আর সে থাকতে তার মেয়েদেরও কেউ ক্ষতি করবে না, পূজারীজি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

সামনের দিকে চোখ রেখে শাওন সাগ্রহে শুনছিল, আর মজাও পাচ্ছিল। মেকানিকের শেষের কথা আর তেমন কানে ঢোকেনি। ভাবছিল জ্ঞান বুদ্ধি শুধু নয়, বুকের পাটা আছে বটে মেয়েটার।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়ে তিতলি তার সহেলিদের কাছে নিজের জ্ঞান ফলাচ্ছে।—ওটার নাম মোটর, ওটা দিয়ে এই কাজ হয়, ওটা হল ডরাম মিসিন—ওটার এই এই কাজ, ওই যে তোড়ে জল ফেলা হচ্ছে তার নাম কমপ্রসুয়া পাম্পু, আর পাইপের ভিতর দিয়ে জল কাদা তুলে ডোবায় ফেলা হচ্ছে যেটা দিয়েসেটা হল ওটার পাম্পু।শাওন আর মেকানিক ওদের পাঁচ সাত হাত পিছনে দাঁড়িয়ে। শাওন বাধা দেবার ফুরসত পেল না, যন্ত্রের পরিচয় বিস্তার শুনে মেকানিক একটু জোরেই হেসে ফেলল। তক্ষুনি সামনের চার-জোড়া রমণী চক্ষু ওদের দিকে ঘুরল।শাওনের ধারণা, হাসতে দেখা মাত্র তিতলি বুঝেছে যন্ত্র বোঝানোর ব্যাপারে কিছু গড়বড় হয়ে গেছে। কোমরে দু'হাত তোলা আর ভুরু কোঁচকানো যেন রূপসী মেয়ের মুদ্রাদোষ।

—কাহে হাসত, হম্ কা ভুল কহলী?

হাসি চাপতে চেষ্টা করে শাওন বলল, বেশি না, সামান্য একটু...সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝাঁলো চ্যালেঞ্জ। মেয়েটা সত্যিই রেগে গেছ মনে হল। কা ভুল কহ দিহ?

ওকে আশ্বস্ত করার মতো করেই নরম গলায় শাওন জবাব দিল, বললাম তো বেশি কিছু না, সহেলিদের তুমি কেবল দিনকে রাত আর রাতকে দিন বুঝিয়েছ—মোটরকে ড্রাম-মেশিন আর ড্রাম-মেশিনকেমোটর বলছ...ওয়াটার পাম্প আর কম্প্রেসার পাম্পের নাম দুটোও উল্টে নিলেই একেবারে ঠিক হত।...

মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না, বিপাকে পড়েও তার বেপরোয়া আক্রমণ দেখতে যেমন শুনতেও তেমনি। আমি উল্টো-পাল্টা বললেও তোমার যন্ত্রের কাজগুলো সব উল্টে-পাল্টে যাবে? সহেলিদের আমি কি বোঝাচ্ছি না বোঝাচ্ছি পিছনে দাঁড়িয়ে তোমাদের কে শুনতে বলেছে?

ওদের গ্রাম্য ভাষায় রাগ আর তেজের এতগুলো কথার যেটুকু মাথায় ঢুকল, মেকানিকটির তাতেই ভেবাচাকা খাওয়া মুখ।এ-ভাবে আক্রান্ত হয়ে শাওনও ফাঁপরেই পড়ল একটু।প্রতিটি কথা কানে লেগে আছে, তবু আত্মরক্ষার চেষ্টায় অনেকটাই না বোঝার ভান করে সঙ্গিনীদের দিকে তাকালো। ওদের চোখে মুখে হাসি উপচে পড়তে চাইছে। তিতলির কানের কাছে মুখ এনে সীতা চাপা শাসনের সুরে বলল, কি বলছিস বুঝতে পারলে সাহেব এখান থেকে আমাদের সুদ্ধু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে!

তিতলির দু'হাত তখনো কোমর থেকে নামেনি, আর চোখ দুটোও শাওনের চোখ থেকে নড়েনি। কনুইয়ের ধাক্কায় সীতাকে একটু ঠেলে দিয়ে বেশ গলা চড়িয়েই জবাব দিল, সাহেব সেয়ানা কত আমার জানা আছে, যা বলেছি সবই বুঝেছে।

শাওন ভার্মার নিঃসঙ্গ একলার জীবনে এই বৈচিত্র্যটুকু বড় সুন্দর, বড় লোভনীয়। বুদ্ধিমানের মতো এবারে সে আত্মসমর্পণ করে ফেলল। হেসে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে তিন সঙ্গিনীরও খিল খিল হাসি। বিজ্‌লী নামে মেয়েটা ছড়া কাটার সুরে বলে উঠল, তিত্‌লিয়া তিত্‌লিয়া, তুঁহারি ঝুঁটি নিক্‌লিয়া—ছুঁ মন্তর ছুঁ...ঃ। তোর বাকতল্লা বোঝা গেছে, রাগ দেখিয়ে কত আর ধামাচাপা দিবি?

তিতলির চোখে হাসি, দুই ঠোঁটের কোণে হাসির আঁচড়, মুখেও হাসির আভা ঠিকরোচ্ছে,

কিন্তু এর পরেও মেজাজ নরম করতে নারাজ। শাওনের মুখের ওপর দুচোখ তেমনি অপলক।—এ বাবু সাহাব, সহেলিকে আগে (সামনে) তুম হমারকে বেইজত্ কৈলা, হাম এ জমিন্‌পর কভু না আইবু।

এই বয়সের আর এমন রূপের মেয়েকে বেইজ্জত করা হয়েছে শুনলে কান গরম হবার কথা। কিন্তু কথাগুলো বনের পাখির কাকলির মতো সরল মনে হল শাওনের। আর যে-মুখ করে শাসালো, মনে হবে ও আর না এলে এখানকার সব কাজ-কর্মই পণ্ড।

ঘাবড়ে যাওয়ার ভান করার ফলে শাওনের গলার স্বর আরো নরম।—তাহলে তো খুব বিপদ, আমার কসুর হয়ে গেছে, মাপ করে দাও।

চোখে মুখে ঠোঁটে হাসি আরো উপচে পড়ার দাখিল, কিন্তু তিতলি এখানো রাগের ঠমক আঁকড়ে ধরে আছে। ঝাঁঝালো গলায় বলল, দুবলা লোক মাফি মাঙে, মরদ আদমী কখনো মাপ চায় না, তারা হিম্মত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ করে।

—কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বলে দাও।

সঙ্গিনীদের চোখে মুখে কৌতুক উপচে উঠছে।...ভাবছে তিতলি মিথ্যে বলেনি, ওরা যে-যার ভাষায় কথা বলছে, কিন্তু সাহেবের বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না, দিব্বি বুঝছে আর কথার জবাব দিচ্ছে।

সম্ভব হলে শাওন তিতলির এই মুখখানা ক্যামেরায় ধরে রাখত। ওপরের কয়েকটা দাঁতে করে নিচের ঠোঁটের কোণটা বারকয়েক ঘষ্টে নিল। কি প্রায়শ্চিত্তের কথা বলবে চটপট ভেবে নিচ্ছে। আড়চোখে একবার বিজলী আর একবার মায়ার দিকে তাকিয়ে নিল।—তোমার এখানে কিছু অছুত মরদও কাজ করছে দেখছি। কিন্তু তারা সবাই ব্রিজমোহন বা তার স্যাঙাতদের তাঁবের লোক—এই তো বিজলী আর মায়ার দুটো জোয়ান ভাইয়া ঘরে বসে আছে, কাজ পাচ্ছে না, এমন আরো কত আছে—তুমি তাদের কাজে নিচ্ছ না কেন?

শাওন সবিনয়ে ফিরে প্রশ্ন করল, তারা কি আমার কাছে কাজের জন্য এসেছিল?

—তোমার কাছে তারা আসবে কি করে? কাজের খোঁজে এলে ওই মরুব্বিদের সর্দাররা তাদের দূর করে তাড়িয়ে দেয়!

—আচ্ছা, কালই তুমি ওদের আমার নাম করে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।

হাসি ঝিলিক দিচ্ছে, তিতলি তবু সামলাতেই চেষ্টা করছে।—কতজনকে পাঠাবো?

কতজনকে পাঠাবে ঠিক করতে না পেরে শাওন মেকানিকের দিকে তাকালো। সে খাটো গলায় জানান দিল, আপাতত জনা পাঁচেককে পাঠাতে বলুন, পরে বিকেলের দিকে কাজ বাড়লে আরো অনেক লোকই লাগবে।

শাওন তাই বলে দিল।

এতক্ষণে তিতলির চোখে মুখে শুধু নয়, সর্ব অঙ্গ দিয়ে যেন খুশি ভেঙে পড়ল। সাদা কমলের মতো দু'হাত জুড়ে বুকে ঠেকিয়ে আধখানা ঝুঁকে প্রণতি জানালো। বলল, এ বাবু, এ ভবে গাঁওমে তোঁহার মাফিক এককো দিলদার আদমী না দেখলী—সাচই তুম বড়া সাহাব ভৈল।

পরদিন সকালে তিতলির কাছ থেকে পাঁচের বদলে ছয় জোয়ান এসে হাজির। ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে রেখে একজনকে বিদায় করা হয় কিনা মেয়েটা হয়তো সকৌতুকে তাই পরখ করতে চায়। সাপ্তাহিক হারে শাওন ভার্মা ছ'জনকেই নিয়ে নেবার হুকম দিল।

ভদ্র সমাজের ভব্যতার রীতি অনুযায়ী এরপর তিতলির এসে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর কথা। কিন্তু পরের দু'তিনদিন তাকে আর এই জমির ত্রি-সীমানায় দেখা গেল না। তৃতীয় দিনের দুপুরে ক্যাম্পের অফিস ঘরে এসে হাজির তোতারাম।—নমস্তে ভার্মা সাব, বাতাবাতি খাতির আইল বাড়ে (গল্প করতে এলাম)...মগর দেখত, রহুয়া কাম কা চিন্তামে ডুবত রহল্‌অ...

খুশি না হলেও বাইরে এই লোকের সঙ্গে দোস্তির সম্পর্ক। তাছাড়া এই ভরদুপুরে কেবল গল্প করার জন্যেই এসেছে মনে হল না। একটু হেসেই আহ্বান জানালো, খুব না, এসো—

সে এসে বসার ফাঁকে শাওনের আরো কিছু মনে পড়ে গেল। ব্রিজমোহনের মোসায়েব জানা সত্ত্বেও বছর চল্লিশের এই রোগা ঢ্যাঙা লোকটাকে শাওনের খুব খারাপ লাগত না। ভাবত পেটের দায়ে মোসায়েবি করে, নইলে দিব্বি রসে টইটম্বুর মজার মানুষ। কিন্তু তিতলি সেদিন এই ক্যাম্পের অফিসে এসে রসের বিকৃত দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।...তিতলির মুখে তোতাচাচা শুনে শাওন স্বাভাবিক কৌতূহলেই জনতে চেয়েছিল তোতারাম তার কাকা হয় কিনা। জবাবে তিতলি হেসে উঠে বলেছিল, কাকা হয়, কিন্তু সে তোমার মতো উঁচু জাতের লোক, তাহলে বোঝো কিরকম কাকা। আবার হেসে উঠে তিতলি আরো বলেছিল, ওই কাকাটি ঠাকুর ব্রিজমোহনের চামচা না হলে এই অছুত ভাইঝির যৌবনখানা কেমন বুঝতে চেষ্টা করতে ছাড়ত না।

শুনে শাওনের দু'কান লাল হয়ে উঠেছিল।

—কা শোচত দোস্ত?

বিতৃষ্ণা তল করে শাওন বলল, না, তোমাদের খবর কি বলো—

নির্লিপ্ত মুখ করে তোতারাম জানান দিল, খবর কিছু থাকলে ছুপা গাঁওয়ের সকলেই তা জানতে পারে, সে রকম খবর কিছু নেই, তবে কাল রাতেও ঠাকুর সাহেব তোমার কথা বলে দুঃখ করছিল, বলছিল, অনেকদিন তুমি তার ওখানে যাও না—আবার তিতলির পাঠানো ছ'জন অছুত জোয়ানকে তুমি এখানে কাজ দিয়েছ শুনে তাকে খুব খুশিও দেখলাম।

খবর থাকলে ছুপা গাঁওয়ের সকলেই জানতে পারে কথাটার তাৎপর্য বোঝা গেল। অর্থাৎ তিতলির পাঠানো ছজন লোককে নেওয়া হয়েছে এটা একটা খবর এবং কারো তা জানতে বাকি নেই। মাথায় হঠাৎ কোনো গোঁ না চাপলে শাওন ভার্মা ঠাণ্ডা মানুষ, আর খুব দুঃসাহসীও নয়। তেতে উঠতে গিয়েও ওপরঅলা প্রকাশ দীক্ষিতের উপদেশ মনে পড়েছে। এদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সদ্ভাব রেখে চলতে বলেছিলেন। হাসতে চেষ্টা করে জবাব দিল, সরকারি কাজে আর ছুত-অছুত নিয়ে কি কথা, লোক দরকার হয়েছে নিয়েছি...ঠাকুর ব্রিজমোহনের সুপারিশেরও অনেক লোক তো এখানে কাজ করছে—তাদের মধ্যে অছুতও আছে।

তোতারামের প্রথমে হাঁ মুখ। এ-কথা কেন বলল তা যেন বুঝতেই পারছে না। সেই

বিস্ময়ই গলা দিয়ে বেরুলো।—খুঁশিয়াকা বাতচিতোয়া সেএ তুম কা কহলঅ! তুমি লিখি-পড়ি জানা লোক, বড়িয়া সরকারী অফ্‌সার, নীচু জাতকে ছোট ভাব না, আমার মালেক তো এই জন্যেই খুশি!...তিতলি সেদিন তোমার এই ক্যাম্প অফিসে এসেছিল, সম্মান দেখিয়ে তুমি চেয়ারে বসতে দিয়েছ, তার সঙ্গে কথা বলেছ, পেয়ালা পিরিচে চা-বিস্কুট খাইয়েছ—ডাক-পিওন চলত্‌রামের মুখে এ-কথা শুনেও তো ঠাকুরসাহেব তার দোস্তদের কাছে তোমার প্রশংসা করছিল-—

শাওনের এই দ্বিতীয় দফা বুঝতে হল ছুপার খবর চাপা থাকে না...তিতলির এই ক্যাম্প অফিসে আসা, চেয়ারে বসা, আর কাপ-ডিশে চা খাওয়াটা এদের কাছে হয়তো আরো বড় খবর। কিন্তু শাওনের স্পষ্ট মনে আছে চলত্‌রাম সেদিন ডাক বিলি করতে আসার আগেই রতন দুজনেরই খালি পেয়ালা প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেছল, মেয়েটাকে তার সামনে চেয়ারে বসে থাকতে দেখেই ওই ডাক-পিওন হাঁ হয়ে গেছল। চা-বিস্কুট খাওয়ার কথা সে জানলো কি করে! তার পরেই অবশ্য মনে হল, তিতলি নিজেই পাঁচজনের কাছে এ-গল্প করে থাকতে পারে, কারণ ওদের সমাজে এমন উদার আপ্যায়ন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। তিতলি নিজেও সেদিন কম অবাক হয়নি। চলত্‌রাম আর কারো মুখে এমন কি পরে তিতলির নিজের মুখ থেকেও শুনে থাকতে পারে। আর মেয়েটা তো সেদিন বলেই গেছল, চলত্‌রাম এরপর চলতে চলতে মুখ খুলবে, আর গাঁওয়ের লোকের চোখ খুলবে।

...গাঁয়ের লোকের চোখ কতটা খুলেছে জানে না, কিন্তু মুরুব্বিদের চোখ বেশ খোলা হয়েছে বুঝতে পারছে। ঠাকুর ব্রিজমোহনের প্রশংসার কথা শোনাতেই এই লোক এ-সময়ে আসেনি এটা খুব স্পষ্ট।

কি মনে হতে শাওন কব্জির ঘড়িতে সময় দেখল। আর মিনিট পনেরর মধ্যে রতন চা নিয়ে আসবে। তবু ভদ্রতার সুরে বলল, একটু চা দিতে বলি? ও-হো! না থাক্...

এই ক্যাম্প অফিসে এসে তোতারাম আরো একাধিক দিন চা খেয়ে গেছে। অতএব শাওন যা আশা করেছিল তাই। বেশ অবাক হয়েই চেয়ে রইলো। তা সত্ত্বেও সামনের মানুষকে চুপ দেখে জিগ্যেস করল, কেন, তোমার চা ফুরিয়ে গেছে?

—না, চা অনেক আছে...কিন্তু তুমি আমার এখানে আর চা খাবে কি করে...ওই অছুত মেয়ের চা-খাওয়া পেয়ালা ফেলেও দেওয়া হয়নি, আলাদা করে সরিয়ে রাখাও হয়নি, অন্য পেয়ালার সঙ্গে মিশে গেছে, তিতলির খাওয়া পেয়ালাই তোমার ভাগ্যে পড়বে কিনা কে জানে, ঠাকুর সাহেব আমার প্রশংসা করলেও তুমি এখানে চা খেয়ে গেছ শুনলে তোমার তো আর প্রশংসা করবেন না, তুমিও হলপ করে বলতে পারবে না অন্য পেয়ালায় চা খেয়েছ...

তোতারামের খুদে আর বোকা বোকা দু'চোখ গোল হয়ে তার মুখের ওপর আটকে রইলো খানিক। কিন্তু একটু কৌতুকও উঁকিঝুঁকি দিল কিনা ঠিক ঠাওর করা গেল না। জিগ্যেস করল, ঠাকুর সাহাবকা কেইসে পতা লাগ্‌ব?

—চলত্‌রাম যে-কোনো সময় ডাক বিলি করতে এসে যেতে পারে—

জবাব দেবার আগে বোকা হাসিতে এবার মুখখানা ভরাট করে নিল তোতারাম। প্রথমে

বলল, চায়ের কথা শুনেই তার তেষ্টা পেয়ে গেছে, রতনকে আগে চা আনতে বলা হোক।

বেল টিপতে রতন গলা বাড়ালো আর সাহেবের ইশারা বুঝে নিয়ে চলে গেল। তোতারাম এখনো তার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। টিপেটিপে যেটুকু ব্যক্ত করল, শাওন ভার্মা সেটুকু শুনেই উৎসুক। ঠাকুর ব্রিজমোহনের কাছে গিয়ে সে যদি হলপ করে বলতে পারত তিতলির খাওয়া পেয়ালাতেই সে চা খেয়ে এসেছে তাহলে তার খাতির বরং বেড়ে যেত। সে যদি ঠাকুর সাহেবের শত্রু হত তাহলে অবশ্য ভয়ের কথা ছিল, এই অপরাধে হয়তো পঞ্চ-এর বৈঠক ডেকে তাকে এক-ঘরেই করা হত—কিন্তু সে তো আর শত্রু নয়, ঠাকুর সাহেবের সব থেকে বিশ্বাসী লোক। ...ঠাকুর ব্রিজমোহন ওই অছুত্ মেয়েটাকে কত যে স্নেহ করে এ তার থেকে বেশি আর কে জানে?...ওই বেপরোয়া মেয়ে যে ভয়ংকর লোকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বসেছিল, ঠাকুর সাহেবের স্নেহের ছায়ায় না থাকলে সেই দাপটের ছেলে দুবছর আগেই ওই মেয়েকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেত তারপর বন্ধুদের দিয়ে খাওয়াতো—তাই করবে বলে প্রতিজ্ঞাও করেছিল। ঠাকুর সাহেব সহায় না থাকলে ওই মেয়ে মান ইজ্জত খুইয়ে দিওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াতো, নয়তো পুনপুর জলে ডুবে আত্মহত্যা করত।

তিতলির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল বলে এটুকু শুনেই শাওন ভার্মার আতঙ্ক। কেন, তিতলি কার সঙ্গে লাগতে গেছল?

—তিতলি না, লাগতে গেছল সেই ভীষণ ছেলেই, অন্য যে-কোনো মেয়ে হলে ভয়ে পালাবার পথ খুঁজত—কিন্তু তিতলি ওই দাপটের ছেলের সাগরেদদের সামনেই তার মুখ ভোঁতা করে দিয়েছিল। এটুকু জানান দিয়ে একটা হাত তুলে আয়েসী গলায় তোতারাম সবুর করতে বলল।—রোসো আগে চা-বিস্কুট খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিই।

ট্রে হাতে রতন প্রায় তক্ষুনি হাজির। দুজনের দু'পেয়ালা চা আর মাঝখানে বিস্কুটের ডিশ রেখে সে প্রস্থান করার আগেই একসঙ্গে দুটো বিস্কুট তুলে তোতারাম নিজের পেয়ালার চায়ে ডুবিয়ে মুখে দিল।—ফাস্টো কেলাস, তিতলিকেও সেদিন এই বিস্কুটই খাইয়েছিলে বুঝি?

বিরক্তি চেপে শাওন জবাব দিল, আমি বলতে পারব না, যাবার আগে রতনকে জিগ্যেস করে যেও।

ক্যাম্প-ইন-চার্জ এখন কোন্ কথা শোনার জন্য উদগ্রীব তোতারাম ভালোই জানে। কিন্তু তার দিকে থেকে কি-বা তাড়া। আয়েস করে আরো দুখানা বিস্কুট চিবিয়ে আর হুস-হুস শব্দে আধ-পেয়ালা চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে প্রসঙ্গে ফিরল। মাত্রা-ছাড়ানো ভাঙের নেশার ফলে তোতারামের কথা বলার ধরন টানা-টানা আর একটু জড়ানো, তার মুখের ভোজপুরী বোঝার জন্যই শাওন ভার্মার দু'কান খাড়া এখন।

—তুমি বাবুয়াকে চেনো?

একটু ভাবতে শাওনের মনে পড়ল।—আলাপ নেই তবে নাম শুনেছি...ব্রিজমোহনের ভাতিজা তো?

—হাঁ, বহুত পেয়ারের ভাতিজা। এটা তার বড় পরিচয় বটে, কিন্তু তার ভীষণ পরিচয় হল, সে ব্রিজমোহন আর তার খাতিরের জোতদারদের ভূমি-সেনা দলের একনম্বর সর্দার।...লোহার

গাঁওয়ের কুন্দন সিং ছাড়া এতবড় ভূমি-সেনার দল আর কারো নেই। নানা কারণে একটু চাপের মধ্যে পড়ে বাবুয়া আর তার দল এখন চুপচাপ আছে, কিন্তু তাদের দাপট তুমি ভাবতে পারবে না। আর সাত-আট মাস আগে হলেও তোমাকে এখানকার মাটি খুঁড়ে খনি বার করার চেষ্টা করতে হত না। ওই বাবুয়াই তোমাকে মাটির নিচে জিন্দা পুঁতে রেখে দিত—তিতলিকে সেদিন বলছিলাম তোমার জীবন এখনো আমি—

থমকে থেমে গেল। হেসে শেষের প্রসঙ্গটুকু তরল করে দিতে চাইলো। —কি বলতে গিয়ে কি বলছি ঠিক নেই, এই জন্যেই আমি নিজের মগজ থেকে কোনো কথা বার করি না—

ডিশ থেকে শেষ দুটো বিস্কুট তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল। যেটুকু বলেছে তাইতেই পরোক্ষে মালিকের বেশ নিন্দে করা হয়ে গেছে বলে লোকটা কথার মাঝে থেমে গেছে। কিন্তু এই থেমে যাওয়াটা কেন যেন অকৃত্রিম মনে হল না শাওনের। নুন খেয়ে সর্বদা যারা কেবল মনিবের গুণ গেয়েই অভ্যস্ত, তাদের মুখ দিয়ে এ-রকম বেসামাল কথা বেরিয়ে যায় কিনা ভেবে খটকা লাগছে। তোতারামকে আর যা-ই হোক মগজশূন্য মানুষ বলে মনে হয়নি শাওনের।

পেয়ালার চা নিঃশেষ করে ধীরে সুস্থে সে আবার প্রসঙ্গ বিস্তারের দিকে এগলো।...ঘটনাটা আরো দু'বছর আগের। তিতলির বয়েস তখন আঠারো। মোটামুটি এখনকার মতোই না-ফোটা নিটোল গোলাপ ফুলটি। এরও ঢের আগে থেকে শতেক জোয়ান মরদের গাঁয়ের এই সেরা রূপের মেয়ের দিকে চোখ, তার মধ্যে বাবুয়ারও চোখ পড়বে না এ কখনো হয়? কিন্তু ভূমি-সেনার দল নিয়ে সে তখন এত ব্যস্ত যে মাসের মধ্যে বিশ-বাইশ দিন তাকে গাঁয়ের বাইরে থাকতে হয়, দল জোরদার করতে হয়, কাকার আদেশ-মতো অন্য জোতদারদের ভূমি-সেনাদের সঙ্গে গাঁট ছড়া বাঁধার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। বাবুয়ার তাড়া কিছু নেই। গোলাপ কুঁড়ি আরো নিটোল আরো তরতাজা হোক, তার হাত ছাড়িয়ে যাবে কোথায়।

...তারপর আরো দুটো বছর যেতে, তিতলির বয়েস যখন আঠারো, তখন দিনে দুপুরে সকলের চোখের ওপর সেই কাণ্ড। তার আগে টানা আট ন'মাস বেশির ভাগ সময় ছুপার বাইরে থাকতে হয়েছিল তাকে। এখন চাচার আশ্রয়ে তার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, আনন্দের বিশ্রাম। ইয়ারবকশীদের সঙ্গে বাবুয়া কখন কোথায় কোনদিকে আছে জানতে পারলে গরিব গৃহস্থঘরের কাঁচা জোয়ানীর মেয়ে বউরা খুব দরকার থাকলেও সেদিকের ছায়া মাড়ায় না।

এমনি এক দিনে দুই সহেলি এবং তিতলি বাবুয়া আর তার বয়স্যদের একেবারে মুখোমুখি। বেলা তখন এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে। পুনপু থেকে জল নিয়ে ফিরছিল। তিতলির ফুফু খুব সেয়ানা আর হিসেবী মেয়েছেল। গাঁয়ের অন্য মেয়েদের মতো তিতলির নদী থেকে জল আনতে যাওয়া মোটে পছন্দ করে না। তার দরকারও পড়ে না। অছুত্ হলেও তার সচ্ছল অবস্থা। তার বুড়ী ছুঁড়ী দু'দুটো কাজের মেয়ে আছে। কিন্তু কাঁচা বয়সের মেয়ে বউরা কেবল জলের দরকারেই নদী থেকে জল আনতে যায় না। এই জল আনতে যাওয়ার মধ্যে অনেক রঙ্গরসের আকর্ষণ আছে। চোখ লাল করে ঘরে আটকে রাখা যাবে তিতলি এমন মেয়ে নয়।

...সামনে বাবুয়া আর তার ইয়ারদের দেখে তিতলির দুই সহচরীর বুকের তলায় কাঁপুনি।

তাদের ছোট একটা ধমক দিয়ে তিতলি সদর্পে এগিয়ে আসছে। কে বা কারা দাঁড়িয়ে আছে পরোয়া নেই।

বাবুয়া দাঁড়িয়ে গেছে। তার সাগরেদরাও। আট-ন'মাসের অদর্শনের ফাঁকে তিতলি এমন লোভনীয় রকমের রূপসী হয়ে উঠবে এ-যেন বাবুয়ার হিসেবের মধ্যে ছিল না। হিসেবের ঢের বেশি হাতের মুঠোয় এলে কার না উল্লাস হয়।...মাথায় গাগরী, সদর্পে এগিয়ে আসার ঠমকে সর্ব অঙ্গে জোয়ানির ঢেউ ওঠা নামা করছে, উছলে পড়তে চাইছে।

বাবুয়ার হাঙরের চোখ। তিতলি আরো এগিয়ে আসতে আনন্দে আর উল্লাসে তার ভিতরে কাব্য-রসও উথলে উঠল একটু। এক কালে সে শস্তার হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের মহড়াও দিত। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আকুতির সুরে বলে উঠল,

'এ গোরী তু ভর কটোরী, কর গঙ্গা স্নান,
তেরে ছাতিমে দো ডালিম বসত হ্যায়
কর্ এ ছত্রীকা দান।'

তিতলি তার তিন হাতের মধ্যে মুখোমুখি সোজা দাঁড়িয়ে। মাথায় গাগরী, দু'হাত কোমরে। চোখে চোখ। চাউনি কোমল হয়ে আসতে লাগল। জিভ আর তালুর সংযোগে চ্য-চ্য করে আক্ষেপের শব্দ বেরুলো একটু। তারপরে জবাব ঃ

'সাচ কহল্ মেরি বাচুয়া (খোকা) ছতীয়া, সাচ কহল্অ
এক-কে খায়ে দুসরে কো খোঁটে
লোরি শুনাউ যব-তক নিদ না টুটে'—আহ
মেরি বাচুয়া আ-হ—'

এটুকু শুনে শাওন ভার্মার কান মুখ লাল, আবার ঠিক ঠিক অর্থ করলে কি নিষ্কলুষ সুন্দর। লুব্ধ বাবুয়ার আবেদন, গঙ্গা স্নানান্তে সুন্দরী যুবতী তুমি ভরা গাগরী নিয়ে ফিরছ, তোমার বুকের ওই পরিপুষ্ট ডালিম দুটো এই ছত্রীকে দান করো। জবাবে গলা দিয়ে আক্ষেপের শব্দ বার করে নিজেকে একেবারে মায়ের পর্যায়ে তুলে এনে তিতলি তাকে সদয় আহ্বান জানিয়েছে, বলেছে, আ-হা-রে আমার বাচ্চু ছতীয়া (ছত্রী), তুম ঠিক বলেছ, দুটো ডালিমের একটা তুমি খাবে অন্যটা খুঁটবে—তোমার গাঢ় ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত আমি তোমাকে ঘুম-পাড়ানী গান শোনাবো—এসো আমার আদরের খোকা এসো—

ঝটকা মেরে চলে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখা গেছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবুয়া পাথরের মতো মুখ করে তাকে দেখেছে। তারপর সাগরেদদের কাছে ঘোষণা করেছে, সাত রোজের মধ্যে ওই মেয়ে তার ভোগের বিস্তোরায় আসবে...শুধু তার নয়, যে সঙ্গীদের সামনে এ-রকম দিমাগ দেখিয়ে অপমান করে গেল ওকে তাদেরও ভোগে আসতে হবে।

সাগরেদরা খুব ভাল করে জানে তাদের মাতব্বর কখনো ফাঁকা আওয়াজ করে না।

তারপর কি হল জানার জন্য শাওন ভার্মা নিজের অগোচরে সামনে ঝুঁকে আছে। টানা

গলায় তোতারাম জানালো, এই ব্যাপারখানা যে-ভাবেই হোক ব্রিজমোহনের কানে উঠেছে। তিতলির সঙ্গে যে মেয়ে দুটো ছিল তারা তো ঘরে ফিরে আর মুখ বুঁজে বসে থাকেনি। এরপর কি ঘটতে পারে সেই দুশ্চিন্তায় ওদের এলাকায় সাড়া পড়ে যাওয়ারই কথা। তোতারামের ধারণা, ভয়ে সিঁটিয়ে তিতলির ফুফু হীরা মল্লাই ব্রিজমোহকে জানিয়েছে—ওই ভয়ংকর ছেলেকে হীরা মল্লা ব্রিজমোহনের থেকে তিন গুণ বেশি ভয় করে।

...এরপরে যেটুকু নাটক তা তোতারামের সামনেই। ব্রিজমোহন ভাতিজাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ডেকে পাঠাবার কারণ বাবুয়ার কল্পনার মধ্যেও নেই। আদরের ভাতিজার নিজস্ব স্বাধীনতায় বা আমোদ ফুর্তিতে চাচা কখনো নাক গলায় না। কিন্তু প্রশ্ন শুনেই প্রথমে তাজ্জব —তারপর পাংশু মুখ।

—তিতলিকো তু কা কহল?

বাবুয়া হকচকিয়ে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছে। প্রশ্নটা সঠিক মাথায়ই এলো না যেন। চেয়ে আছে।

আবারও খুব চাপা আর খুব মোলায়েম গলা।—গয়ি কাল দুফরমে তিতলি যব নদীয়াঁসে গাগর-ভরি লেইকে আহতারে, উনে কে তু কা কহা?

চাচার গলার এই স্বর আর এই চাউনি বাবুয়ার থেকে ভালো আর কেউ জানে না। বড় বড় দু'চোখ দিয়ে এক ধরনের নীলচে আগুন ঠিকরোয়, আর এমন মোলায়েম কথাগুলো কানে গলানো-সিসের মতো ঢোকে। পৃথিবীতে ভয়ও বাবুয়া মাত্র একজনকেই করে—এই চাচাকে। বাবুয়ার মুখথেকে রক্ত সরে যাচ্ছে, কাকার চোখ থেকে চোখ সরাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তাও পারছে না।

ব্রিজমোহনের গলা একটুও চড়ল না, বরং আরো ধীর মোলায়েম।—এইসন বাত কভু না শুনত চাহি...তু এইসন শোচো ও ছৌড়ী তোঁহার মা লাগি—সমঝল?

বাবুয়া কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল।

—কা সমঝল?

—মা লাগি...

—যা নিকাল হিয়াঁসে!

শাওনেরই যেন ফাঁড়া কাটল একটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল। বদমাশ আর ভয়ংকর ছেলেটার লুব্ধ রসিকতার জবাবে তিতলি তেমনি ছড়ার ঢঙেই যা বলেছিল মনে পড়তে কান লাল আবার। সাদা অর্থে নোংরা পাঁকের মতো, কিন্তু তার মধ্যে পদ্ম-কমল। কিন্তু ঘোরপ্যাঁচের ব্যাপার শাওনের মাথায় খুব ঢোকে না। গাঁয়ের যে প্রধান মাতব্বর মানুষটা ওই মেয়েকে এত স্নেহ করে, অছুত বলে ঘৃণা করে না, লম্পট ভাইপোর হাত থেকে মেয়েটাকে এ-ভাবে রক্ষা করেছে, তাকে মা বলিয়ে ছেড়েছে—সেই লোকের ওপর তিতলির এত রাগ কেন? তাকে এত অবিশ্বাস কেন ?

রতন কাপ-ডিশ তুলে নিয়ে গেছে খেয়াল করেনি। ঢ্যাঙা শরীরটা একটু বেঁকিয়ে সামানের লোক ছোট চোখের কোণ দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে তা-ও না। তার কথা শুনে শাওন

যেন এখান থেকে এখানেই ফিরল।

—আচ্ছা, দোস্ত, তিতলি তোমার কাছে এই ক্যাম্প অফিসে কেন এসেছিল...তার লোক নেবার জন্য?

লোকটার প্রশ্নটা খুব সরল মনে হল না কেন যেন। সত্যি জবাবই ছিল।—না, সেটা পরের ব্যাপার...এসেছিল ঠাকুর ব্রিজমোহনের সম্পর্কে আমাকে সাবধান করতে।

শুনেই তোতারামের ছোট চোখ-জোড়া কপালে।—আমার সম্পর্কেও তোমাকে কিছু বলেনি তো?

এই লোকের টানা-টানা দেশোয়ালি কথা বুঝতে শাওনের একটু বেশি মনোযোগ দিতে হয়। মনে কি আছে তা বুঝতেও। শাওন এবারেও গোপন করল না, কারণ ওই মেয়ে কোনো গোপনতার ধার ধারে না বলে দিনে-দুপুরে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। জবাব দিল, তোমার কথা বলেই তো আমাকে সাবধান করেছে, তুমি নাকি আমার জন্যে ঘাবড়ে গিয়ে তাকে বলেছ, পরদেশী বাবু সাচ্চা আদমী, তাই নিজের লাভের কথা না ভেবে ব্রিজমোহনের জমিন ফিরে পাবার আশা বরবাদ করে দিয়েছি...তার ফলে আমার কপালে কি আছে শিউজী জানে।

কথাগুলো বলার ফাঁকে লোকটার মুখ শাওন ভালো করেই নিরীক্ষণ করছিল। তার চোখে মুখে যে ভয়ের ভাব ফুটে উঠল তা কৃত্রিম কি স্বাভাবিক ঠিক বুঝে উঠল না। এক হাত কপালে, টানা-কথার সুরে ত্রাস।—হায় রাম! ও ছৌঁড়ী আমাকে ভাতেও মারবে জানেও মারবে। লম্বা দু'হাত জোড় করে তার সামনে টেবিলের ওপর রাখল।—এ দোস্ত, ই বাতিয়া ঠাকুর ব্রিজমোহনে তুম না কহি!

শাওন চেয়েই আছে।—সত্যি ভয়ের কিছু না থাকলে তুমি তিতলিকে ও-রকম বলতে গেলে কেন?

—ই তোতারামকা তোতাবুলি, ঠাকুর সাহাব নিমন আদমী বানি (ভালো লোক)—অব্ হম চলথ—

চেয়ার ঠেলে উঠে চলে গেল। শাওনের খটকাই লাগল একটু। লোকটা যত ভয় পাওয়ার আর ঘাবড়ে যাওয়ার ভাব দেখিয়ে গেল, শাওনের কেন যেন মনে হল না অতটাই ভয় পেয়েছে বা ঘাবড়েছে।

৪

প্রায় একটা বছর ঘুরে এলো। এখানকার কাজ বেড়েছে খাটুনি বেড়েছে দায়িত্ব বেড়েছে। এতকাল শাওন ভার্মা নামে একটা ছেলে নীরস কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই অভ্যস্ত ছিল। তার মধ্যে আলো বাতাস রঙের খোঁজ কখনো পড়েনি। সেই একই কাজ এখন দ্বিগুণ হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, পরিশ্রম দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এমন রঙ আর রসের ছোঁয়া পেল কি করে, শাওন ভার্মা তা ভাবতে রাজি নয়। রাজি নয়, কারণ তার একটা মন জানে, কেন। এই জানাটাকে বিশ্লেষণের আওতায় ফেললে সেটা একটা সুডৌল গোলাপকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখার মতো হয়। তাতে

কেবল দেখাই হয়, সেই দেখার মধ্যে রূপ রস গন্ধ বিচ্ছিরিভাবে মার খায়।

...এই উনত্রিশ বছর বয়সে শাওন ভার্মা এক আলোবাতাস-শূন্য নিঃসঙ্গ একলার জীবনের গহ্বর থেকে উঠেছে। সেখানে এখন এত আলো এত বাতাস এত রূপ এত রং যে শাওন ভার্মা নামে ছেলেটা একটা বছরের মধ্যে একেবারে ভিন্ন মানুষ। কাজের ভারী চাপও হালকা পলকা শরতের মেঘের মতো মনে হয়। ওই চাপ সরে যেতে সময় লাগে না। তার পরেই ঝকঝকে নীল আকাশ।

...একটা বছরের টুকরো টুকরো স্মৃতি সাজিয়ে শাওন ভার্মা বড় লোভনীয় একখানা মালা গাঁথতে পারে। না, সে-চেষ্টা করে না। তবু সেই স্মৃতিগুলো আপনা থেকে একটা মালার আকার নিচ্ছে। শাওনের ওটা সম্পূর্ণ করার কোনো তাগিদ নেই। শাওনের বাস্তব মন জানে ওটা শেষ হবার নয়।...সে এম এ পাশ উঁচু বর্ণের সন্তান। ভালো চাকরি করে। কালে দিনে আরো অনেক বড় হবে, অনেক মর্যাদা বাড়বে।...এই জীবনে একটি অছুত মেয়ে এসেছে। এসেছে কি? শাওনের ভাবতে ভালো লাগছে— এসেছে। এসে তাকে এক দম-বন্ধ একলার কবর থেকে টেনে তুলেছে। এ-জগতের রূপ রস আলো রঙের সন্ধান দিয়েছে। অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে তুলে তাকে আলোর হদিস দিয়েছে। সুন্দরের ঠিকানা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু আর পাঁচ জনের বাস্তব চোখ কি দেখবে? শুধুই রূপ দেখবে, শুধুই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মোহ ভাববে। ...নিচু শ্রেণীর অবহেলিত মানুষদের জন্য ওই মেয়ের বুক-ভরা দরদের খবর কে জানবে। অছুত গরিব মেয়েদের প্রতি জাতের মানুষদের নির্লজ্জ আচরণে ওর বুকের ভেতরটা কতখানি পোড়ে তা কে বুঝবে? শুধু অছুত নয়, মানুষের জন্য এই মেয়ের কত দরদ, শাওন ভার্মা সেই নজিরও দেখেছে।

...ওই মেয়ের হাসি-খুশির আর এই সুরের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো শাওন মন থেকে ঠেলে সরাতে পারে না। সরাতে চায়ও না। ওগুলো থেকে-থেকে মনে আসে। কখনো বা একসঙ্গে ভিড় করে আসে।

...এখানকার কাজের চাপ যেমন বাড়ছে, তেমনি লোকও নেওয়া হচ্ছে এটা এই মেয়ে ঠিক লক্ষ্য করেছে আর করছে। নিজের গোষ্ঠীর লোক ঢোকাবার ব্যাপারে তার কোনো চক্ষু-লজ্জা নেই। এই আর্জি নিয়ে সোজা ক্যাম্প অফিসে এসে হাজির হয়। সাদা-সাপটা কথা, ওরা না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও ওদের জন্য বলার কেউ নেই, সরকারের কাজ, সরকার টাকা দিচ্ছে, ওরা কাজ পাবে না কেন?

দু'জন দু'জন করে শাওন ওর আরো চারজন লোক নিয়েছে। কিন্তু তিতলি চাপ রাখতে ছাড়ে না। লোক নেওয়া হবে সে-খবর ঠিক আগে থেকে জেনে নিয়েই এসে চড়াও হয়। ওর সঙ্গে সাইটের কার আর ভাব নেই এখন। খবর ঠিক যোগাড় করে।...সেদিনও আবার এই আর্জি নিয়ে হাজির হতে শাওন তক্ষুনি রাজি হয়নি। বেশি লোক নেওয়া হলে ওর দু'একজন নিতে অসুবিধে নেই, কিন্তু তা না হলে কথা উঠতে পারে সেই জ্ঞান শাওনের আছে। বলেছে, কি ব্যাপার কতজন লোক নেওয়া হবে আমি আগে খোঁজ নিয়ে দেখি।

তিতলির সঙ্গে সঙ্গে জবাব, বিকেলের জন্য কম করে দশ বারো জন লোক নেওয়া হবে

আমি জানি, সকালের লোকদের অনেকে বিকেলেও কাজ করতে চাইছে—তা হবে কেন?

ঠিক সেই সময় রতন এসে দু'জনের চা আর বিস্কুটের প্লেট রেখে গেছে। তাই দেখে তিতলি সঙ্গে সঙ্গে হাত গুটিয়ে ঘোষণা করেছে, আমি কি চা-বিস্কুট খেতে আসি তোমার কাছে? ওই গরিব জোয়ানদের না নিলে আমি কিচ্ছু খাব না। তুমি তো আর ব্রিজমোহন মহাদেও প্রসাদ বা জগদেও মিশিরের তাঁবের লোক নও—তোমার নিতে আপত্তি কি? ওরা কাজ করবে মজুরী নেবে, কাজ পছন্দ না হলে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে, ব্যস—

শাওনের গম্ভীর-গম্ভীর মুখ।—এবারে ক'জন তোমার?

ভয় মেশানো গলায় জবাব এলো, চারজন...

শাওন হেসে ফেলেছিল, ঠিক আছে, চা খাও তোমার খবর ঠিক হলে চারজনই নেব—কিন্তু একজনও বেশি পাঠালে সক্কলে বাতিল হয়ে যাবে।

তিতলি তক্ষুনি হেসে ফেলে দু'হাত জোড় করে নিজের গালে ঠেকিয়েছে। মুখে নিখাদ স্তুতি, সাচ রহুয়া সাচ, তুম্ বহুত্ বড়া দিল্‌কা আদমী ভৈল।

এরপর যে যার ভাষায় কথা বলা নিয়েও সেদিন মন্দ ব্যাপার হয়নি। স্তুতির জবাবে শাওন, গম্ভীর মুখে ওদের ভাষা নকল করতে চেষ্টা করে বলেছিল, ইসিকে বাদ রহুয়াকা দিল অ্যায়সা খুশমদ্ করল্অ তো ফিন্ বড়া না হইল্।

যত ভুলই হোক, চালাক মেয়ে ও কি বলতে চায় ঠিক বুঝেছে। আর তক্ষুনি বাংলা চালাতে চেষ্টা করেছে।—কিনো বড়া না হব, বড়া দিল কুখনো ছোটা না হোয়—

শাওন হেসে হার স্বীকার করেছে, বলেছে, থাক আমিও আর তোমার ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করব না, তুমিও আর কোরো না—শুনেছি তুমি খুব ভালো গান করো, তুমি নিজেই বলেছিলে তোমার ফুফু তোমাকে খুব যত্ন করে তালিম দেয়, কিন্তু তোমার গান শোনা তো আমার বরাতে নেই —তোমার ভাষায় তোমার কথাই আমার গানের মতো মিঠা লাগে।

এ-মেয়ে চালাক যেমন দুষ্টুও তেমনি। দু'চোখের হাসি ছোঁয়া কালো তারা তার মুখের ওপর, ঠোঁটেও টিপটিপ হাসি। নিজের ভাষায় ফিরে গিয়ে সবিনয়ে বলল, রহুয়া ফরমাশ করলে এক্ষুনি একটা গান শুনিয়ে দিতে পারি...শোনাবো ?

দুপুর সাড়ে তিনটেয় টেন্ট অফিসে বসে গান শোনানোর প্রস্তাব। শাওন হেসে ফেলেছিল।

গম্ভীর থাকতে চেষ্টা করে তিতলি আবার বলেছে, তাহলে তোমার গান শোনার বরাত আমি ভালো করি কি করে...এখন গান করলে আর অন্য লোকের তা কানে গেলে সুনামের চোটে বড়-সাহেবের নোকরি ছেড়ে পালাতে হবে, রহুয়ার এই ভয়টাই বড় হয়ে গেল।

ঠাট্টার সুরে শাওন বলেছিল, অফিস-টেন্টে বসে তো আর গান হয় না, নেমন্তন্ন করলে তোমার ডেরায় গিয়ে গান শুনতে পারি...

তিতলির দু'চোখ বড় বড়।—নেওতা দিলে তুমি আমাদের ডেরায় যাবে?

—কেন যাব না...ঠাকুর ব্রিজমোহন নেমন্তন্ন করলে তো যাই...।

আবারও খানিক চেয়ে থেকে তিতলি হঠাৎ জিগ্যেস করল, তুমি হীরা মল্লার নাম শুনেছ?

ইতিমধ্যে তোতারামের তোতা-বুলিতে কান পেতে শাওন এই মেয়ের সম্পর্কে টুকটাক

কিছু জেনেছে। আর এও লক্ষ্য করেছে, দু'দশ কথার পরেই তোতারাম এক আধবার তিতলির প্রসঙ্গ টেনে আনে। ওর গান বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করে, ওর বাবার কথাও কিছু শুনেছে, ওর মায়ের যেমন রূপ ছিল তেমন গানও করত শুনেছে, তিন সাড়ে তিন বছর বয়সে ওর সেই রূপ গুণের মা মারা যায় শুনে শাওনের একটু দুঃখই হয়েছিল। আর এখন কোথায় কি ভাবে থাকে তা-ও মোটামুটি জেনেছে।

—তোমার ফুফু তো...?

—হ্যাঁ। মাথা ঝাঁকিয়ে এক ঝলক হাসি। আমার গান শোনার নেওতা পেতে হলে আগে টাকা ঢেলে তোমাকে ওই ফুফুর প্রেমে পড়তে হবে—নাঃ, তা-ও পেরে উঠবে না—তোমার থেকে অনেক জোরদার লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসতে হাসতে চেয়ার ঠেলে উঠেছে, হাসতে হাসতেই চলে গেছে। কথাগুলো কেন যেন শাওনের খুব ভালো লাগেনি।...হয়তো ওর ফুফু কোনো বড়লোকের ছেলেকে টাকার লোভে এই মেয়ের কাছাকাছি আনতে পেরেছে—আর এমন মেয়ের জন্য সেটা খুব শক্তও ভাবে না। কিন্তু গান শোনানোর নেমন্তন্নের জবাবে এ-ধরনের তরল রসিকতা কানে কি-রকম যেন লেগেছে।

...আর একটা দিনের স্মৃতি শাওনের মনে গেঁথে আছে। তার ক্রোধ, মান-ইজ্জত বোধ আর একই সঙ্গে তার আকৃতি দেখে শাওন ভার্মা একটু বিহ্বলই হয়ে গেছল। দুপুরের চায়ের পর্ব খানিক আগেই শেষ হয়েছে, আর খানিক বাদেই সাইটে বেরুবে।

—হুম্ আয়ি পরদেশী বাবু।

ভিতরে আসার পর্দা একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে তিতলি। সুন্দর—মুখখানা শুধু নয়, গলার স্বরও একটু গম্ভীর মনে হল।

তবু খুশি হয়েই শাওন এক পা এগিয়ে এসে বলল, সাইটে যাব ভাবছিলাম, চলো যাওয়া যাক—

—তোমার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে বাবুসাব, সাইটে ও-সব কথা হবে না, আমাদের একটু সময় দাও।

একটু অবাক হয়েই শাওন পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকালো। তিতলির পিছনে আর একটি অল্পবয়সী বউ। তিতলির দিকে একটু থমকে তাকিয়ে ডাকল, আচ্ছা এসো—

তিতলি ঘুরে দাঁড়ালো।—আহ মাধ্‌বী—

জড়সড় বউটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। শাওন নিজের চেয়ার নিয়ে ওদের বলল, বোসো—

তিতলি টেবিলের উল্টো দিকে একটা চেয়ারে বসে সঙ্গিনীকে হুকুম করল, তু না বইঠল, জরাসে ঠায়ের যা—

গনগনে মুখে শাওনের দিকে ফিরল, ওর নাম মাধ্‌বী, আমার পড়শীন, ওকে তুমি একবার ভালো করে দেখে নাও পরদেশী বাবু—

দেখতে গিয়ে শাওনের দু'চোখ একটু হোঁচট খেল।...

মাথায় খাটো ঘোমটা, পরনে খাটো শাড়ি, গায়ের আঁট পেওনা আর ওই অপরিমিত বসন

না-কালো না-ফর্সা বউটার পরিপুষ্ট যৌবন ধরে রাখতে পারছে না।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি শাওন তিতলির দিকে ফেরালো।

—দিনের বেলায় দশজন মরদের সামনে কেউ যদি দু'বালতি জল ঢেলে ওকে চান করিয়ে দেয় তাহলে ওর অবস্থাখানা কি রকম হয়?

দৃশ্যটা ভাবতে গিয়েও শাওনের কান গরম। জিগ্যেস করল, কি হয়েছে?

জবাব দেবার আগে পাশের চেয়ার দেখিয়ে বউটাকে বলল, অগর বইঠ্ মাধ্বী।

সে সসংকোচে চেয়ারে বসতে তিতলি শাওনের দিকে ফিরল।—কাল রাতে আমাদের এলাকার মরদদের নিয়ে একটা 'মিটিন্' হয়ে গেছে, মরদদের মধ্যে যারা তোমার খনিয়ার কাজ করে 'মিটিনে' তারাও ছিল—ঠিক হয়েছে আমি তোমার কাছে আরজি নিয়ে আসব—এখানে উঁচা জাতের নেক নজরের লোকের হাতে আমাদের ছৌঁড়ী আর বহুরা আগেও এ-রকম বে-ইজ্জত হয়েছে...কিন্তু এর বিহিত করার মতো দিলের লোক আগে এ গাঁওয়ে ছিল না, আমরা তোমার কাছে ভিখ মাঙতে এসেছি—

এটুকু শুনেই শাওন নার্ভাস একটু। তার ওপরঅলা প্রকাশ দীক্ষিত গ্রামীণ গোলযোগে মাথা গলাতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু এই মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কাপুরুষ হতেও লজ্জা করে।—কি হয়েছে তাই বলো...।

শুনল কি হয়েছে। এখানকার উঁচু জাতের দাক্ষিণ্যে গাঁয়ের অছুতদের খাওয়ার জল পাওয়ার যে ব্যবস্থা, সেখান থেকে এই মাধবী ঘড়া নিয়ে জল আনতে গেছল। বাঁধানো ভালো 'কুঁয়া' থেকেই ওদের জল দেওয়া হয়, আর ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে 'কুঁয়া' থেকে সেই জল তুলে ঢেলে দেয় ওই উঁচা জাতের পেটোয়া লোকেরা। অন্য দিনের মতো গত কালও এই মাধবী বয়স্কা মেয়ে বউদের সঙ্গে জল আনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্র ঘরের কিছু মরদ ছেলে সেখানে তখন জটলা করবেই। ওদের ইশারায় জল দেওয়ার পেটোয়া লোক অনেক রকমের অসভ্যতা করে। জল দেবার আগে অল্পবয়সী মেয়েদের মুখে বুকে গায়ে জল ছিটিয়ে তাদের শুদ্ধ করে নেয়। কাল সেই লোক ওই অসভ্য জোয়ান ক'টার ইশারায় দু'বালতি জল তুলে মাধবীর মাথায় ঢেলে দিয়ে ওকে শুদ্ধ করে নিয়ে তারপর ঘড়ায় জল দিল। আর চোখ দিয়ে গিলে গিলে ওই ইতর ছেলেগুলো আনন্দ করতে লাগল। মাধবী কাল কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরেছে।

হঠাৎ রাগ হলে বা গোঁ চাপলে শাওন ভার্মা অন্য প্রকৃতির মানুষ। সে তখন অনেক কিছুই করতে পারে। এই অত্যাচারের কথা শুনে সেই মেজাজ। কিন্তু এ ব্যাপারে সে কি করতে পারে, তার কি করার আছে?

কি করতে পারে সেটা এরপর তিতলিই ব্যক্ত করল। জানালো পরদেশী বাবু চাইলে তাদের এ-রকম অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, তাদের জানেও বাঁচাতে পারে। তার হাতে মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম, ইঁট সিমেন্ট চুন সুরকি লোহালক্কড়ের কারবারী গণপত লালা নিজের স্বার্থেই এখন পরদেশী বাবুর হাতের লোক—সরকারের খনির কাজে সে-ই সব সাপ্লাই দিচ্ছে আর এখানকার যে অছুতরা খনির কাজে লেগেছে তারা বিনা মজুরীতে রাতভোর

খেটে দিতেও রাজি আছে—এখন পরদেশী বাবু যদি ওদের এলাকায় খুব গভীর একটা পাকা বাঁধানো 'কুঁয়া' করে দেয় তাহলে এ-রকম বে-ইজ্জতির হাত থেকে তারা বাঁচে।... গহেরা (গভীর) টিপকল করতে অনেক খরচ তারা জানে, কিন্তু ভালো বাঁধানো একটা গহেরা কুঁয়া করে দেওয়া পরদেশী বাবুর পক্ষে কঠিন কাজ কিছু না। তাদের এলাকার অছুতরা সকলেই গরিব, তবু আট আনা এক-টাকা দু'টাকা তুলে পরদেশী বাবুর হাতে দেবে, তাদের যে মজদুর খনিয়ার করছে, তাদের মজুরী থেকে টাকা বাঁচিয়ে গণপত লালার ইট সিমেন্ট বালির দামও আস্তে আস্তে শোধ করে দেবে।...তার কাছ থেকেই মাল নিয়ে সরকারের টাকায় তাদের এলাকায় দুটো টিপকল আর দুটো কুঁয়া করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চের মাতব্বরেরা যেমন চেয়েছে তেমনি হয়েছিল, সরকারের দেওয়া অর্ধেকের বেশি টাকা তাদের পকেটে গেছে, তিন মাস না যেতে টিপকল খারাপ হয়ে গেছে, জল যা উঠত তাও যেমন ঘোলা তেমনি নোঙরা। আর কুয়ো দুটোও ছ'মাস না যেতে শুকিয়ে কাট। এই রকম করেই গাঁয়ের জাতের মাতব্বরেরা অছুত গরিবদের পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখে—একটু জলের জন্যেও তাদের কাছে গিয়ে ধন্না দিতেই হয়।

শাওন শুনছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।...অনেক ধারা আছে রাগ সংগীতের। বিন্যাস রাগ অভিমান আকুতি সবই আছে। ওর ভাষার এতগুলো কথা আর বিস্তারের মধ্যেও যেন সেই রস—রাগ অভিমান আকুতি। শোনার পর স্বস্তি বোধ করছে একটু।...মেশিন যন্ত্রপাতি সবই আছে, ওদের মরদেরা রাতের অবসরে বেগার খেটে দিলে ওর পক্ষে ভালো একটা কুয়ো করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ না, বড়-রকমের একটা খরচের ব্যাপারও না। হাজার এগারোশ' টাকার মধ্যেই হয়ে যেতে পারে। ওই মেহনতী মানুষদের কাছে তা-ও অবশ্য নাগালের বাইরে বড় অঙ্কের টাকা। শাওন মনে মনে একটু হিসেব করে নিচ্ছিল।

তিতলির মুখখানা আস্তে আস্তে যেন বিষাদে ছেয়ে গেল। বলল, পরদেশী বাবু, ভালো একটা 'কুঁয়া' হলে আমাদের এলাকার মেয়েদের ইজ্জত শুধু বাঁচবে না, আমাদের অনেক বিপদও কেটে যাবে।...সমাজের বড়মানুষদের হুজ্জোতির জন্য আমাদের অনেকে ডোবা থেকে আর পুনপু থেকে জল আনে আর সেই জল খায়ও। সরকারের আদমীরা ফি বার ঢ্যাঁড়া দিয়ে যায়, পুকুর আর পুনপুর জলে সব কাজ কোরো কিন্তু খেয়ো না—খরুয়া আর বরষাত্ন পুনপুর জল খারাপ হয়ে যায়, তবু অনেকে বাধ্য হয়ে তাই খায়...এই জল খেয়ে কলেরায় অসময়ে আমার মৌসী মারা গেছে, সেই মৌসী আমাকে কত ভালবাসত তুমি জানো না পরদেশী বাবু, সে থাকলে আমার জিন্দিগি অন্যরকম হয়ে যেত...

সমাজের উঁচু মানুষদের ওপর এদের অভিযোগ। সেই অভিযোগের চাবুক শাওন ভার্মার মুখেও এসে লাগছে। বলল, আচ্ছা তোমরা যাও, দেখি আমি কি করতে পারি...

আশায় মেয়ে-বউ দু'জনেরই মুখের রং বদলাচ্ছে। তিতলি জিগ্যেস করল, আমি চান্দাঁ তুলতে লেগে যাব ?

—তোমাকে এখন কিচ্ছু করতে হবে না, তুমি কেবল তোমাদের মরদদের কাজে নামার জন্য তৈরি থাকতে বোলো।

এর কিছুদিনের মধ্যে অছুতপাড়ায় উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। সারভেয়ার এনে আর ওদের সুবিধে অসুবিধে বুঝে কুয়োর জায়গা ঠিক হয়েছে।...পাড়ার মধ্যে গভীর বাঁধানো 'কুঁয়া' হবে, ছেলে বুড়ো জোয়ান সকলেরই উৎসাহ। রাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু হয়েছে। সাইটের ট্রাকে সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি এসেছে। সকালের দিন-মজুর আর অন্য জোয়ানেরা মাঝরাত্রি পর্যন্ত কাজ করে। অনেক রাত পর্যন্ত শাওন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করে, তার মেকানিকরাও সাহায্য করে। এরপর গণপত লালার গুদাম থেকে ইঁট বালি সুরকি সিমেন্ট আর শেষে কাঠ এসেছে।...তারপর দেখতে দেখতে এত গভীর আর এত সুন্দর করে বাঁধানো এ-কুঁয়া কেবল তাদেরই, কেবল তাদের জন্যেই এ যেন দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না।

সকলের থেকে আনন্দে আটখানা তিতলি। শাওনের মনে হয়েছে আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় এ-মেয়ের চোখে না জল এসে যায়। সেদিন সাইটে এসে বলছিল, বাবুসাহেব, ওরা সাহস পায় না, কিন্তু মনে মনে সকলে তোমার পা ছুঁয়ে গড় করছে। শাওন ঠাট্টার লোভ সামলাতে পারল না। হেসে জিগ্যেস করল, আর তুমি মনে মনে কি করছ?

ঠোঁটে মিষ্টি হাসি, চোখে দুষ্টু হাসি।—আমি মনে মনে ভাবছি তোমার বহুর দেখা পেলে তার পা জড়িয়ে ধরে বলতাম আমাকে তার বাঁদী করে রাখতে।

এরপর যে রসিকতা মনে এসেছিল শাওন মুখে আর তা প্রকাশ করতে পারছিল না। বলতে ইচ্ছে করছিল, তাঁর মতো বাঁদী রাখাটা বউ কি নিরাপদ ভাবত?

এর পরেই কি মনে হতে তিতলির চোখে মুখে একটু আশংকার ছায়া।—তুমি সরকারের টাকায় এমন 'কুঁয়া' করে দিলে, তোমার বদনাম হবে না তো বাবু সাহেব?

শাওন হেসেই ফিরে প্রশ্ন করল, সরকারের টাকায় কুয়ো হল এ তোমাকে কে বলল?

তিতলির দু'চোখ বড়বড়—তাহলে কার টাকায় হল?...এতো টাকা তুমি নিজে খরচ করলে?

শাওনের বিড়ম্বনা সামলে ওঠার চেষ্টা।—তোমাদের লোকেরা বিনে পয়সায় খেটেছে, তাছাড়া সরকারের ব্যবস্থার জোর পিছনে যে-ভাবে হোক ছিলই...খুব বেশি কিছু খরচ হয়নি—সব-কিছু সরকারি রেট্-এই পাওয়া গেছে।

তার পরেও তিতলি যে-রকম করে চেয়েছিল, ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে শাওন সাইটের অন্য দিকে চলে গেছে। ভিতরটা তারও খুশিতে ভরপুর।

স্মৃতির সঞ্চয়ে আরো কিছু জমা আছে। শাওন ভার্মা মালা না গাঁথুক, মনের সেতুপথে তার সৌরভ ছড়িয়েই আছে। এমন যোগাযোগের পিছনে অদৃশ্য কারো নিপুণ হাত আছে কিনা জানে না।

...শাওন ভার্মা দিন দুই একটু ব্যস্ত ছিল। সাইটের কোন্ কাজ কতটা এগুলো নিজে ঘুরে ঘুরে ফাইলের নোটের সঙ্গে মেলাচ্ছিল। আগামী কাল সকালে এই ফাইল আর নোট নিয়ে জিপে করে পাটনা যেতে হবে। রিজিওন্যাল অফিসার প্রকাশ দীক্ষিত চিঠি পাঠিয়েছেন, এবারে

তিনি ইনসপেকশনে আসতে পারছেন না, কলকাতার হেড-অফিস থেকে লোক এসেছে (ইর্স্টার্ন জোনের হেড অফিস্ কলকাতায়)। ছুপার খনির কাজের কতটা কি হয়েছে তার লেটেস্ট রিপোর্ট তাদের জানাতে হবে। অতএব শাওনই যেন সে-সব নিয়ে যত শিগগীর সম্ভব পাটনায় চলে আসে।

ফাইল আর রিপোর্টের কাজ মোটামুটি শেষ। শাওন ঠিক করেছে আগামী কাল সকালে জিপ নিয়ে পাটনা চলে যাবে, তাহলে সন্ধ্যা বা রাতের মধ্যে হয়তো ফেরা সম্ভব হবে।

হঠাৎ দেখে তিতলি প্রায় ছুটেই তার দিকে আসছে। তার পিছনে আর একটি মেয়ে। আরো কাছে আসতে তাকেও চিনল। জনার্দন পূজারীর বড়মেয়ে সীতা—সীতিয়া। হনহন করে হেঁটেও সে তিতলির থেকে পনেরো বিশ গজ পিছিয়ে আছে। আরো এগোতে মনে হল কিছু একটা বিপদ ঘটেছে, দু'জনেরই চোখে মুখে উদ্‌বেগের ছায়া।

এসেই বড় একটা দম নিয়ে তিতলি বলল, পরদেশী বাবু, কিরপা করে তোমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে, নইলে আমার সহেলী সীতিয়ার বহন লছমী বোধহয়—মরেই যাবে, যন্ত্রণায় সে পাগলের মতো ছটফট করছে—

এটুকু বলার ফাঁকে তার পাশে সীতা এসে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে বিবর্ণ মুখ, কিছু বলতে না পেরে ভিক্ষে চাওয়ার মতো করে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ালো।

শাওনও উতলা।—কেন, লছমীর কি হয়েছে?

—পিন্‌ডিসিটস—ডগদার পবন্ শ্রীবাস্তব এসে দেখে বলেছে খুব শিগগীব বড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপ্‌রশন্ না করলে বহুত—বহুত বিপদ হবে—'পিন্‌ডিসিটস ফাট যাইব'।

শাওন প্রথমে কিছু বুঝলই না লছমীর কি হয়েছে। চার-পাঁচটা গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র মেডিক্যাল স্কুল-পাস অল্পবয়সী ডাক্তার পবন শ্রীবাস্তবের নাম শাওন শুনেছে। সাইকেলে গ্রামের পর গ্রাম চষে সে চিকিৎসা করে।

—কি হয়েছে ডাক্তার কিছু লিখে দেয়নি?

তিতলি সীতার দিকে তাকালো।—ও কাগজ কাঁহা?

সীতার দুই ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। তখনো হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল। শশব্যস্তে কোমরে গোঁজা একটা দুমড়োনো কাগজ বার করল।

শাওন ভাঁজ খুলে পড়ে দেখল, ইংরেজিতে লেখা, অ্যাকিউট অ্যাপেনডিসাইটিস সন্দেহ। সত্বর বড় হাসপাতেলে নিয়ে যাওয়া দরকার।

বড় হাসপাতালে বলতে পাটনা। জিপে বা মোটরে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ।

—ডাক্তার ব্যথা কমার কোনো ওষুধ দিয়ে যায়নি?

তিতলি জানালো, একটা বড়ি গুঁড়ো করে খাইয়ে দিয়ে গেছে, আর একটা বড়ি রেখে গেছে, ফিন্ দর্দ উঠলে ওটাও খাওয়াতে হবে, আর বলেছে বড়া হাসপাতালে না নিয়ে গেলে সে আর কিছু করতে পারবে না।

—লছমীর বাবা কি করছে?

তিতলির রাগত জবাব, মহাবীরজীকা চন্নামিত্ খিলাইকে জনয়ু (পৈতে) জপ্ করতারে— বাবু সাব, তুমি জলদি বড় হাসপাতালে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করো, মেয়েটা যে মরে যাচ্ছে।

শাওন ভেবে নিল একটু। বলল, বড় হাসপাতাল তো পাটনায়, সেখানে তোমাদের জানা-শোনা কেউ আছে?

এবারে সীতা জানালো, সেখানে তার এক কাকা আছে, তার পতাও বাপুর কাছে লেখা আছে।

শাওন মনস্থির করে ফেলল। সকাল তখন ন'টা, না গেলেই নয় যখন, কাল না গিয়ে আজই যাবে।... জনার্দন পূজারীর ডেরা ঠিক চেনা না থাকলেও কোথায় তা জানে। বলল, ঠিক আছে, তোমরা রেডি হও, আমি একঘণ্টার মধ্যে জিপ্ নিয়ে যাচ্ছি।

সীতার মুখে কৃতজ্ঞতা উছলে উঠল। ওরা দু'জনে আবার ছুটল।

...এক ঘণ্টারও আগে শাওন ভার্মা জনার্দন পূজারীর ডেরায় এসে বেশ একটা দৃশ্য দেখল। মা আর মেয়ের সঙ্গে জনার্দন পূজারীর তর্ক চলছে, জনার্দন পূজারী তাদের বোঝাতে চাইছে মহাবীরজিউ আর শিউজীর কির্পা থাকলে লছমী চরণামৃত খেয়েই ভালো হয়ে যাবে, কিরপা না থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না। ক্রুদ্ধ সীতা চিৎকার করে বলছে, মহাবীরজিউ আর শিউজীর কিরপার জন্যে বসে না থেকে সে তাহলে লছমীকে মশানে নিয়ে যাবার ভালো টিকটির (খাটিয়ার) ব্যবস্থা করুক। সীতা চিৎকার করে বলছে, লছমীর কিছু হয়ে গেলে সে মহাবীরজীর মন্দিরে আগ্ লাগিয়ে ছাড়বে। আর দাওয়ার এক-ধারে দাঁড়িয়ে তিতলি রক্তবর্ণ মুখ করে এক-একবার জনার্দন পূজারীকে ভেঙ্চি কাটছে আর চিৎকার করে বলছে, সময় নষ্ট না করে তোমরা তৈরি হও, পরদেশী বাবুর জিপ্ আসা মাত্র আমরা লছমীকে নিয়ে রওনা হব।

ফিরে তাকিয়ে শাওনকে দেখা মাত্র ফুঁসে ওঠার মতো করে তিতলি বলল, লছমী জীপমে উঠাওয়া!

শাওন জুতো পায়েই সোজা দাওয়ায় উঠে ঘরের সামনে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে সীতাকে বলল, ডাক্তারের কাগজটা দাও। সেটা হাতে নিয়ে জনার্দন পূজারীকে বলল, ডাক্তার লিখেছে, বড় হাসপাতালে না নিয়ে গেলে লছমী যে-কোনো মুহূর্তে অ্যাপেনডিক্স বারস্ট্ করে মারা যেতে পারে, হাসপাতালে নিয়ে না যেতে দিলে যদি এই দুর্ঘটনা হয় তাহলে শাওন ভার্মা নিজেই জনার্দন পূজারীর বিরুদ্ধে মেয়েকে খুন করার মামলা আনবে।

এরপর আধঘণ্টার মধ্যে লছমীকে জিপের পিছনের মেঝেতে শুইয়ে জনার্দন পূজারীর বউ ভাবনা মেয়ে সীতা আর তিতলিকে নিয়ে শাওন বেরুতে পেরেছে।

...লছমীর অবস্থা দেখে তক্ষুনি তাকে ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন হয়ে গেছে। সার্জন জানিয়েছে, আরো দু'ঘণ্টা দেরি হলে লাম্প্ বারস্ট্ করত, আর পেশেন্টকে বাঁচানো যেত না। এখন নিশ্চিন্ত, আর কোনো ভয় নেই।

কিন্তু অন্য দিক থেকে একটা সমস্যা দেখা দিল যার জন্য শাওন নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। বিকেলের দিকে সকলকে নিয়ে সে সীতার কাকার বাড়িতে রেখে আসতে চাইলো। কিন্তু বিড়ম্বনার মধ্যে পরে মা-মেয়ে দু'জনেই বলল, আজকের রাতটা তারা তিনজনে হাসপাতালে

কোথাও পড়ে থাকবে, আর দোকান থেকে যা-হোক কিছু খেয়ে নেবে।

কিন্তু তিতলি মাথা ঝাঁকিয়ে জোরালো আপত্তি জানালো। সে বলল, এই রাতটা সে একলাই হাসপাতালে কোথাও কাটিয়ে দিতে পারবে, লছমী ভালো থাকলে কাল সে ছুপায় ফিরে যাবে, তারা মা-মেয়ে পরদেশী বাবুর জিপে সীতার চাচার বাড়ি চলে যাক—

শাওন এবারে ওদের সমস্যাটা বুঝল। তিতলি অছুত, আর ওই চাচা হল গিয়ে জনার্দন পূজারীর ভাই, সেখানে অছুত মেয়ের জায়গা হয় কি করে? শাওন সত্যিই চিন্তায় পড়ল। এ-বয়সের আর এই রূপের একটা মেয়ে একলা হাসপাতালে পড়ে থাকবে তা হতেই পারে না। তিতলির চোখে চোখ পড়তে মনে হল সে যেন একটা সহজ ফয়েসলার আশাতেই তার দিকে চেয়ে আছে।

শাওন সীতা আর তার মায়ের কথায় সায় দিল। তিতলির এখানে একলা থাকা চলে না। ওদের অপেক্ষা করতে বলে সে আবার বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে তাদের ওই ওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট ওয়েটিংরুমে নিয়ে এলো। সেখানে সারি সারি চওড়া বেঞ্চ পাতা। জানালো, এই রাতটা তারা তিনজনেই এখানে থাকবে, পরদিন বিকেলের মধ্যে শাওন এসে মা-মেয়েকে ওই চাচার বাড়ি রেখে তিতলিকে নিয়ে ছুপায় ফিরে যাবে। লছমীর ছাড়া পেতে আরো সাত আট দিন। ওদের তিনজনের এই রাতটা এখানে থাকার ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে।

এর থেকে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে। সীতা আর তার মা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তিতলি ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, ওদের দু'জনের এখানে থাকার দরকার নেই, রাতে আমি একলাই এ-ঘরে থাকতে পারব!

বাকি তিনজনের কেউ ওর আপত্তি বা রাগের কারণ বুঝল না। সীতার বোনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা গেছে, অনুচ্চ ধমকের সুরে তিতলিকে বলল, তোকে একলা দেখে আর কেউ এসে জুটলে তখন কি করবি?

তিতলি অবুঝ মেয়ের মতোই তেমনি ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, জুটবে জুটবে—পরদেশী বাবুর তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন?

হঠাৎ এই মেয়ের এমন মেজাজ কেন না বুঝলেও তার কথায় কেউ কান দিল না। সমস্ত দিন ওদের খাওয়া হয়নি। দোকানে নিয়ে গিয়ে শাওন ওদের ভালো করে খাওয়ালে। রাতের খাবারও সঙ্গে নিয়ে সকলকে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে রেখে গেল। সীতা আর তার মায়ের পরদেশী বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই। তিতলি শুধু গম্ভীর। শাওন লক্ষ্য করেছে, ও ভালো করে খায়ও নি। ওদের জানিয়ে গেল, পরদিন বিকেলের আগে সে আর আসতে পারছে না—সকাল বা দুপুরে বেরিয়ে তারা নিজেরাই যেন খেয়ে নেয়।

বেলা আড়াইটে তিনটের মধ্যে শাওনের অফিসের কাজ শেষ। একদিন আগে কেন তাকে পাটনায় আসতে হয়েছে ওপরওলা প্রকাশ দীক্ষিতকে বলেছে। বলার কারণ হঠাৎ যদি দরকার পড়ে যায় সীতা আর তার মা সারকে এসে খবর দেবে তবে সে-রকম দরকার কিছু হবার কথা নয়।

সাড়ে তিনটের পর শাওন হাসপাতালে এলো। শুনল লছমী বেশ ভালোই আছে। তাদের সঙ্গে কথাও বলেছে। শাওন তবু সীতার হাতে প্রকাশ দীক্ষিতের ঠিকানা আর ফোন নম্বর রেখে যা বলার বলে রাখল। ফোন কাকে বলে এদের কারো ধারণা নেই, কিন্তু তেমন প্রয়োজনে হাসপাতালের কাউকে বললে তারাই খবর দেবার ব্যবস্থা করবে। তিতলি গম্ভীর মুখে টিপ্পনী কাটল, দেখ, আপন জাঁতোকা ছৌড়ীকে লিয়ে পরদেশী বাবুকা কইথন চিন্তা হইলন।

কাল থেকেই এই মেয়ের মেজাজ অন্য রকম কেন শাওন বুঝল না। ওদের তিনজনকে জিপে তুলে সীতার চাচার বাড়ির দিকে চলল। শাওন সামনে ড্রাইভারের পাশে, ওরা পিছনে।

একটু খোঁজাখুঁজির পর চাচার ডেরার হদিস মিলল। চাচা ঘরে নেই, চাচী নাকি বাতে অথর্ব। একটু বাদে মা মেয়ে ওদের বিদায় দেবার জন্য ফিরে এলো। এখনো ওদের চোখে কৃতজ্ঞতা উপচে উঠেছে, মুখে ভাষা নেই।

শাওন এবারে সামনে ড্রাইভারের পাশে না গিয়ে পিছনে উঠে তিতলির মুখোমুখি বসল। জিপ ছাড়ার এক মিনিটের মধ্যে তিতলি বলল, সামনের গদিতে না বসে কষ্ট করে আবার পিছনে আসা হল কেন...

শাওন হেসেই জিগ্যেস করল, তোমার অসুবিধে হল?

—নিদকে খাতির কহলী। একটু থেমে বক্রসুরে জানান দিল, রাতে ঘুম হয়নি, ভাবছিলাম একটু ঘুমুব...।

যে কারণেই হোক, ভাবনাটা আদৌ যথার্থ মনে হল না শাওনের। চলতি জিপেই সামনে যাবার জন্য একটু উঠে ড্রাইভারের দিকের ক্যমবিসের পর্দা সরালো।

—কা করত?

—তুমি ঘুমোও, আমি সামনে চলে যাই।

তিতলির মুখ রাগে লাল, আমার সামনে বসে যাবার লোভে এখানে উঠে বসেছ, এখন আর যাবে কেন?

আর কেউ এমন কথা বললে শাওনের কান গরম হত। আর যা বলেছে তা একেবারে মিথ্যে নয় বলেই মনে মনে নিজেকে চাবকে উঠে সামনে চলে যেত। কিন্তু তিতলি বলেই পারা গেল না, মনে হল এ-রকম মেজাজ খারাপ করার কিছু কারণ আছে। একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করল, লছমী প্রাণে বেঁচে গেল, তার এত ভালো অপারেশন হল, কিন্তু তারপর থেকে হঠাৎ তোমার কি হল বলো তো? কথায় কথায় রেগে যাচ্ছ...কি ব্যাপার?

তেমনি ঝাঁঝালো জবাব, আমি রেগে গেলে তোমার কি? আমার রাগ পছন্দ না হলে জিপ থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দাও।

শাওন আরো অবাক। তবু হালকা সুরেই বলল, এত রেগে আছ যে সত্তর কিলোমিটার পথ হেঁটে যাবে?

—যে-করে হোক যাব, তার আগে তোমার এখানকার ডেরা খুঁজে বার করে তোমার বহুকে বলে যাব, ছুপায়ে তুমি এই অছুত মেয়েকে তাঁবুয়ার ঘরের চেয়ারে বসতে দাও, তোমার কাপ-ডিশে চা খেতে দাও—কিন্তু এখানে বহুর কাছে এলে তুমি সাচ্চা উঁচা জাতের মানুষ!

শাওন হাঁ হয়ে গিয়ে তপ্ত কথাগুলো শুনল। ওর রাগের কারণটা এবারে যেন স্পষ্ট হয়ে আসছে।...গহেরা কুয়ো করে দেবার পর এই মেয়ে হেসে বলেছিল, তোমার বহুর দেখা পেলে পা জড়িয়ে ধরে বলতাম আমাকে তাঁর বাঁদী করে রাখতে। এখন বুঝছে ও ধরে নিয়েছে তার বউ এই পাটনাতে। ধরে নিয়েছে ওকে নিয়ে সীতা বা তার মায়ের যে সমস্যা তার সঙ্গে পরদেশী বাবুর সমস্যার কোনো তফাৎ নেই।...অছুত বলে সীতার চাচার বাড়িতে একটা রাতের জন্য ওর ঠাঁই হল না, আর অছুত বলেই পরদেশী বাবু ওকে বহুর কাছে নিয়ে যেতে পারল না, একটা রাতের জন্য ডেরাতেও ওর ঠাঁই হল না, আর ছুপায় এসে সে কিনা জাত-পাত মানে না বলে উদারতা দেখায়!

...হ্যাঁ, এ-ছাড়া এমন রাগের আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। শাওন গম্ভীর মুখে প্রস্তাব দিল, গহলে ড্রাইভারকে জিপটা ঘোরাতে বলি, আমার এখানকার ডেরা তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাক?

—কাহে?

—কারা থাকে, তুমি নিজের চোখে দেখে যাও—কাল রাতে তোমার সেখানে থাকার ব্যবস্থা করলে তারা অবশ্য খুশিই হত।

তিতলি হকচকিয়ে গেল একটু। প্রশ্ন, কারা থাকে?

—চারজন জোয়ান মরদ এখানকার অফিসের দোস্ত।

তিলির চোখে নিখাদ বিস্ময়।—পাটনায় তোমায় ঘর শুনেছিলাম, তোমার বহু এখানে থাকে না?

শাওন তেমনি গম্ভীর। মাথা লাড়ল। থাকে না।

—তাহলে কোথায় থাকে...কলকত্তা?

আবার মাথা নাড়ল। কলকাতায় ও থাকে না। ·

তিতলির এবার অসহিষ্ণু প্রশ্ন—তাহলে তোমার বহু কোথায় থাকে বলছ না কেন?

—কোথায় থাকে বা কোথাও আছে কিনা না জানলে কি করে বলব?

সুন্দর মুখে বিস্ময়ের এই কারুকার্য উপভোগ করার মতোই। বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। দু'চোখে ভেতর দেখার চেষ্টা।—এ পরদেশীবাবু, তুম ঝুঁট না কহ!

শাওন এবার হেসেই জবাব দিল, তোমার কি পরোয়া করি যে ঝুট্ বলতে যাব?

তিতলি হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপরেই রাগ।—হাম বহুত—বহুত খারাব ছৌড়ী। তোমার ওপর রাগ করে কাল ভালো করে খেলাম না, ঘুমোলামও না!

শাওন দু'চোখ ভরে এই খারাপ মেয়েকে দেখছে আর হাসছে।

এত লিখি-পড়ি জানা লোক, এমন বড় চাকরি করে, সে এই বয়সেও বিয়ে করেনি এ-ও যেন এই মেয়ের চোখে আর এক বিস্ময়। কেন বিয়ে করেনি জিগ্যেস করেই বসল।

শাওন একটু মজার রাস্তায় এগোলো। জবাব দিল, কলেজে পড়তে মা মারা যাবার পর বাবা বিয়ে দিতে চেয়েছিল, আমারও তখন বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছিল...ভাবলাম কলেজের পড়া শেষ করে বিয়ে করব।...কিন্তু বাবা তার আগে নিজেই বিয়ে করে বসল, তখন আমারও

বিয়ে করার ইচ্ছেটা চলে গেল।

যে-ভাবে বলল, তিতলি হেসে ফেলেছিল। কিন্তু শুনে এই লোকের জন্য মনে মনে একটু দুঃখই হল। জিগ্যেস করল, তোমার মায়েরও কি ছোট বেলায় দেহান্ত হয়েছে?

—খুব ছোট বেলায় নয়, আমার তেরো বছর বয়সে। সমবেদনার সুরে বলল, আমি তো তবু আমার মাকে অনেক দিন পেয়েছি—তোমার তো সাড়ে তিন বছর বয়সে মা মারা গেছেন শুনেছি।

তিতলি উৎসুক একটু।—কোথায় শুনলে?

—তোতারাম বলছিল।...তোমার মা দেখতে যেমন সুন্দর ছিলেন, তেমনি ভালো গাইতেন...তুমি তোমার মায়ের রূপ-গুণ পেয়েছ—এমন মা এত অল্প বয়সে মারা গেলেন খুব দুঃখের কথা...খুব কঠিন কিছু অসুখ করেছিল বুঝি?

তিতলির মিষ্টি মুখ হঠাৎ কি-রকম খরখরে হয়ে উঠল।—তোতা চাচা সাচ বলেনি, আমার সাড়ে তিন বরষমে মা এমনি মরেনি—ছুসাইড (সুইসাইড) করে মরেছে—

শাওন একটু ঝাঁকুনিই খেয়ে উঠল। তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, সে কি...!

—হাঁ। আমার বাপু শরাবী, শরাব খেয়ে মায়ের উপর খুব অত্যাচার করত, দেড় বছর বয়সে আমাকে নিয়ে মা অন্য লোকের কাছে চলে যায়, সাড়ে তিন বছর বয়সে আমাকে বাপুর জিম্মায় রেখে ফির গিয়ে খুদখুশি (আত্মহত্যা) করে।

শুনে শাওন স্তব্ধ।

তিতলি খর-চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।—শুনে আমার ওপর তোমার খুব ঘেন্না হচ্ছে, না?

শাওন মাথা নাড়ল। বলল, না, খুব দুঃখ হচ্ছে।

তিতলির গনগনে মুখ, কিন্তু হাসছে। আমার জন্য তোমাকে আর খুব বেশি দিন দুঃখ করতে হবে না বোধহয় পরদেশীবাবু...আমার নাম তিতলি...পরজাপতি...তিতলির আয়ু আর কতটুকু বলো?

মুখখানা এবার কৌতুকোচ্ছল দেখালেও শাওন ধাক্কাই খেল একটু। বলল, মানুষ তিতলির আয়ু কম হতে যাবে কেন?

তিতলি হাসতেই লাগল। তারপর হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলল, তোতাচাচা আমার কথা তোমাকে বলতে যায় কেন—তুমি জানতে চাও বুঝি?

শাওন হেসেই জবাব দিল, আমি মনে মনে জানতে চাই বুঝে তোতারাম নিজে থেকেই বলে।

রাগ দেখাতে গিয়ে তিতলি হেসে ফেলল, ওটা এক-নম্বরের পাজি, কিন্তু আমার ওকে ভালো লাগে। পরের মুহূর্তে সিরিয়াস মুখ। আচ্ছা তোমার খোঁজে তিরিশ বত্রিশ বছর বয়েস অথচ বিয়ে হয়নি এমন কোনো ব্রাভন মেয়ে আছে?

শাওন গম্ভীর।—আরো খানিকটা মাটি খোঁড়া হোক, দেখি মেলে কি না...কার জন্য?

জবাব শুনে তিতলি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, ব্রিজমোহনের জমিন খুঁড়ে মরা

মেয়ে দুই একটা পেতেও পারো—জিন্দা মেয়ে পাবে কোথায়? তোতাচাচার জন্য একটা জিন্দা মেয়ে না পেলেই নয়, এরপর সত্যিই না দুলারী বহিনের স্বভাবচরিত্র খারাপ হয়ে যায়।

এর পরের স্বাভাবিক প্রশ্নে তিতলি চুনীলাল মাস্টারের মেয়ে দুলারীর সঙ্গে তোতারামের বিয়ে নাকচের প্রসঙ্গ আর তার পরের ফলাফল সবিস্তারে গল্প করল। ওর মায়ের কথা শুনে শাওনের মনটা ভরাক্রান্ত হয়ে ছিল, এই গল্প শুনে সে হেসে সারা।

তিতলিকে তার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে শাওন সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পে ফিরল। আগের সেই তাঁবু ক্যাম্প নয়, এখন পাকা দালানে পাকা ক্যাম্প। দু'টো ঘর। একটা শোবার, একটা বসার। সেখানে তোতারাম বসে মনের আনন্দে চা-বিস্কুট খাচ্ছে। ওকে দেখে বলল, তুমি এসে গেছ দোস্ত, আমি ভাবছিলাম আজ ফিরবে কি ফিরবে না।

শাওন খোশ মেজাজে ছিল। এ-সময় তাকে দেখে ভালো লাগল না। আবার তিতলি যা বলেছিল সেই রকমই মনে হল। লোকটা ঘোড়েল বটে, কিন্তু খারাপ লাগে না। বলল, তুমি এ-সময়ে যে?

—আমি হুকুমের নোকর, ঠাকুর ব্রিজমোহন পাঠালো—এলাম।...লছমী কি-রকম আছে?

তিতলিকে শাওন জিগ্যেস করেছিল জনার্দন পূজারীকে একটা খবর দিয়ে ক্যাম্পে ফিরবে কিনা। তিতলি মাথা ঝাঁগিয়ে বলেছিল, কক্ষনো না—তার চিন্তা থাকে তো সে তোমার কাছে এসে খোঁজ নিয়ে যাক।

শাওন জানান দিল, ভালো আছে, আর দু'ঘণ্টা দেরি হলে অ্যাপেনডিক্স বার্স্ট করে মারা যেত।

গলা দিয়ে একটা উদ্‌বেগের শব্দ বার করল তোতারাম। তারপর বলল, তুমি এখানকার গরিব অছুতদের জন্য যা করছ, ঠাকুর ব্রিজমোহন তোমার কত প্রশংসা করছিল।...তাদের কত লোককে খনিয়ার কাজে লাগিয়েছ, তাদের জন্য গহেরা কুঁয়া করে দিয়েছ, এখন আবার একটা ছৌড়ীকে সরকারী জিপে করে নিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলে—গাঁয়ের লোক এরপর তোমাকে মাথায় করে রাখবে।

এরকম কথা আগেও একদিন বলেছিল তোতারাম। সে কি করছে না করছে সব ওদের হিসেবের মধ্যে। বলার ধরনটা আদৌ নিখাদ প্রশংসার মনে হল না শাওনের। বলল, লছমী অছুত নয়, পঞ্চ-এর মুরুব্বির মেয়ে...।

—ও তো সচে বাত্, কিন্তু তিতলি এসে ধরেছিল বলেই না সকলকে নিয়ে তুমি সরকারি জিপে করে পাটনায় ছুটেছ— রহুয়া ব্রিজমোহন তো এই জন্যেই তোমার আরো বেশি প্রশংসা করছিল, আমাকে বলল, যাও খবর নিয়ে এসো, আর যদি পারো ইন-চার্জ বাবুকে ধরে নিয়ে এসো।

সরকারি জিপে করে নিয়ে যাওয়াটা দু'দু'বার কানে লেগেছে শাওনের। রাগ হলেও এখনো সে ওপরওলা প্রকাশ দীক্ষিতের উপদেশ মেনে চলছে। ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, এখন আমি খুব ক্লান্ত, গিয়ে বলো, পরে একসময় তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

—বহুত খুব। তোতারাম চা বিস্কুটের পেয়ালা প্লেট এক ধারে সরিয়ে রেখে হাতে করে

ভেজা ঠোঁট মুছে নিল। তারপর হঠাৎই কিছু যেন মনে পড়ল।—আচ্ছা দোস্ত, জনার্দন পূজারী ঠাকুর সাহেবকে বলছিল, সীতিয়া আর তার মা পূজারীর ভাইয়ের বাড়িতে থাকবে—কিন্তু এই একটা রাত তিতলি কোথায় থাকল...সীতিয়ার চাচা তো কোনো অছুত ছৌড়ীকে আঙনায় ঢুকতে দেবার লোক নয়?

শাওনের মুখ লাল। রাগ হলে চাপতে জানে না।—এটাও কি তুমি জানতে চাও, না তোমার ঠাকুর ব্রিজমোহন?

তোতারাম ভেবাচাকা খেল একপ্রস্থ। তারপর টেনে-টেনে হাসতে লাগল।—আরে দোস্ত, আমার নিজের কি চাওয়া না চাওয়ার কিছু আছে, তোমাকে তো বলেছি আমি অন্যের মগজের বুলি আওড়াই...ঠাকুর সাহেবের কথাই আমার কথা, ঠাকুর সাহেবের খুব চিন্তা, রাতে কোথায় থাকল, মেয়েটার কষ্ট হল কিনা, জনার্দন পূজারীকেও বলছিল, মেয়েটার রাতে থাকার কোনো ব্যবস্থা না করে এ-ভাবে যেতে দিলে কেন?

শাওন মনে মনে লজ্জিত হল।...নিজের নেকড়ে-মার্কা ভাইপোর হাত থেকে মেয়েটাকে বাঁচিয়েছিল...জাত-পাতের ব্যাপারে জানে, মেয়েটাকে স্নেহ করে বলেই হয়তো ব্রিজমোহনের চিন্তা হয়েছে কোথায় থাকল না থাকল।

হালকা মেজাজে ফেরার মতো করে শাওন বলল, কাল রাতে সীতা ওরা কেউই তার চাচার বাড়ি যায়নি, সকলে মিলে রাতে ওয়ার্ডের ওয়েটিং রুমে ছিল। তারপরেই আলতো করে জিগ্যেস করল, দুলারীর খবর কি?

সঙ্গে সঙ্গে তোতারামের ঢুলুঢুলু চোখ বড় বড়। অ্যাঁ! তুমিও? ওই তিতলিই আমাকে ফাঁসাবে দেখছি, দুলারীর কথা সে-ই নিশ্চয় তোমাকে বলেছে? থাক, আমি চলি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে ঠাকুর সাহেব ও-দিকে অপেক্ষা করছে—

হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। শাওন হাসতে লাগল।

৫

বিকেলে সাইটে এসে শাওনের উৎসুক দু'চোখ একবার চার দিকে ঘুরে এলো। গরম পড়ছে, ওই মেয়ে এখন সকালে আসা ছেড়েছে। বিকেলেও রোজ আসে এমন নয়। এলে তাকে দেখা মাত্র শাওনের ভিতরটা খুশিতে ভরে ওঠে। না এলে ভিতরের একটা তাগিদ পা দুটোকে পুনপুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। সহেলীদের সঙ্গে তিতলি নদীর দিকে বেড়াতে যায়। পুনপু এখান থেকে কম করে আড়াই তিন মাইলের পথ। কিন্তু বিকেলে বেড়ানোর পক্ষে এমন কিছু দূরে নয়।

...ওই মেয়ে সাইটে আসেনি যখন পুনপুর দিকেই হয়তো গেছে। দুর থেকে শাওনকে দেখলেই তিতলির সহেলীদের চোখে মুখে উচ্ছল হাসি। তাকে নিয়েই নিজেদের মধ্যে রসিকতা শুরু হয়, না বোঝার কি আছে।...আর তিতলি দু'হাত কোমরে তুলে ঠোঁটের কোণ দাঁতে কাটতে কাটতে তার দিকেই চেয়ে থাকে। চোখে মুখে হাসি উছলে পড়ে কিন্তু হাসে না।

...আজ আর আড়াই তিন মাইল পথ পা দুটো টানতে ইচ্ছে করছে না শাওনের। সমস্ত গায়ে বেশ ব্যথা, মাথাটা ভার-ভার। জ্বর মনে হচ্ছে না, কিন্তু একটু জ্বর-জ্বর ভাব। তবু কাজ দেখাশুনার পর পুনপুর দিকেই চলল। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় খানিকক্ষণ বসলে মাথাটা হালকা হবে। কিন্তু আজ হাঁটতে বেশ কষ্টই হচ্ছে।...তিতলি সাইটে না এলেই যে নদীর ধারে যায় এমন নয়। ওর কোথাও যাওয়া না যাওয়া নিজের খেয়াল-খুশির ওপর। তবু চলল।

কাছাকাছি এসে আরো ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু দূর থেকে ওই মেয়ের দঙ্গলের দিকে চোখ পড়তে সেটুকু গেল। তাকে দেখেই ওরা খুশির চোটে তিতলিকে ঠেলা-ঠেলি করছে।

শাওন তক্ষুনি মতলব ঠিক করে নিল। গম্ভীর মুখে অন্যদিকে যাওয়াটা বোকামি হবে। ওদের দিকে চেয়ে অন্তরঙ্গ হাসি মুখে বার দুই মাথা নেড়ে আর একটা হাত তুলে ওদের উপস্থিতির জন্য আনন্দ প্রকাশ করল। তারপর অনেকটা যেন নিজের মনেই নদীর নিরিবিলি দিকটায় চলল। একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল।

যা আশা করেছিল তাই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিতলি এসে হাজির। দু'গজের মধ্যে দাঁড়ালো, দু'হাত কোমরে উঠল—এ পরদেশীবাবু, আমার ওই পাজি সহেলীরা যা-তা বলছে!

শাওন ফিরে দেখল। হাত ধরে টেনে পাশে বসাতে ইচ্ছে করল। কিন্তু ইচ্ছে ইচ্ছেতেই শেষ।—কি বলছে?

—বলছে, পরদেশীবাবু তোর খোঁজেই পুনপুতে এলো, কিন্তু আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে সরে গেল।

শাওন নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয়?

তিতলির চোখ পাকানোর ভাব।—আমার মনের কথা তোমাকে বলব কেন, ওরা যা বলেছে তাই বললাম।

—তাহলে ওদের গিয়ে বলে দাও, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ধুলোবালির মধ্যে কাটানোর পর একটু খোলা বাতাসে বসার বা বেড়ানোর মতো জায়গা পুনপু ছাড়া আর কোথাও নেই।

ভুরু কোঁচকালো।—তুমি এই পুনপুর দিকে ক'দিন বেড়াতে এসেছ?

—গুনে রাখিনি, ফাঁক পেলেই আসি। শাওন একেবারে ডাহা মিথ্যে বলেনি। গত এক সপ্তাহের মধ্যে দু'দিন ওকে সাইটে না দেখে আশা নিয়ে এখানে এসেছিল। কিন্তু সেই দু'দিন তিতলি এখানেও আসেনি।

—কই, আমি তো তোমাকে দেখিনি?

—তুমি রোজ আস যে দেখবে?...গত পরশুর আগের দিন এসেছিলে? তারও দু'দিন আগে এসেছিলে?

তিতলি ভাবল একটু। মাঝে দু'দিন আসেনি এটুকু অবশ্য মনে পড়ছে। তুমি প্রায়ই পুনপুর দিকে বেড়াতে আস বলতে চাও?

—প্রায় না হোক, মাঝে মধ্যে আসি। এবারে একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল। খানিক দূরে নদীটা যেখান থেকে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে, কিছু গাছপালার দরুন ওদিকের খানিকটা দেখা

যায় না। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শাওন বলল, ও দিকটায় যাই, বেড়াবার সময় বেশি লোকজন ভালো লাগে না।

কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যে তিতলি চোখ দিয়ে ওজন করছে। —কতজন থাকলে ভালো লাগে?

—বড় জোর একজন।

—মেয়ে না মরদ?

নদীর দিকে চেয়ে শাওন জবাব দিল, মেয়ে হলেই ভালো।

তিতলি হনহন করে সহেলীদের কাছে চলল। ঘাড় ফিরিয়ে শাওন চলার ঠমক দেখছে। একটু বাদেই সঙ্গিনীদের নিয়ে ফিরে এলো। গম্ভীর। সবকে লেআইলী কওন্ তোঁহার মন্-পসন্দ্ চুনা লো।

ওরা হাসিতে ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু হাসছে না। শাওন গম্ভীর মুখে সকলকে দেখল একবার তারপর বছর এগারো বারোর যে একটাই কালোকোলো মেয়ে ওদের মধ্যে তার দিকে হাত বাড়ালো।

মেয়েটা ছুটল। হাসিতে ভেঙে পড়ে অন্য মেয়েগুলোও ছুটল। তিতলি এখনো গম্ভীর থাকতেই চেষ্টা করছে। আফসোসকা বাত্ ও ছৌড়ী তোঁহারকে পসন্দ্ না করলী।

শাওন বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল। আমার এরকমই ভাগ্য।

তিতলি এবারে হাসছে। একবার সহেলীদের দিকে তাকাতে তারা ওকে হাত তুলে ডাকল। শাওনের দিকে ফিরে তিতলি বলল, এত বড় সাহেব হয়েও এরকম ভাগ্য নিয়ে বসে আছ কেন? উঠে পড়ো, আমরা এখন ঘরে যাব—

—যাবে তো যাও, আমি উঠব কেন?

—তুমি এখানে একলা বসে থাকবে?

শরীরটায় কিছু যেন হয়েছে, নদীর ঠাণ্ডা হাওয়াও ভালো লাগছে না। তবু ওঠার ইচ্ছে নেই। একলা বসে থাকলে কি হয়েছে, হাঙরে টেনে নিয়ে যাবে?

তিতলি আবার গম্ভীর হঠাৎ। একটু চেয়ে থেকে জবাব দিল, পুনপুতে হাঙর নেই, কিন্তু ডাঙায় অনেক আছে—ওঠো এখন!

শাওনের তক্ষুনি গোঁ চাপল।—তোমাকে কে ধরে রেখেছে, তুমি যাও না?

তিতলি রাগ করেই দুপ-দাপ পা ফেলে ফিরে চলল। মাঝামাঝি গিয়ে একবার ঘুরে তাকালো। তখনো বসেই আছে দেখে আবার ঘুরে সঙ্গিনীদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। তারপর তেমনি রাগ-রাগ ভাব দেখিয়ে ফিরে এসে ধুপ করে পাশে বসে পড়ল। ঝাঁঝালো মন্তব্য, তুম বহুত জিদ্দী আদমী!

শাওন চেষ্টা করে গম্ভীর। ফিরে এলে কেন?

জবাবে তিতলির খিলখিল হাসি। তারপরেই সুরেলা গলায় গুনগুন গান:

> 'জিয়রা কস্‌ক-মসক্ মোর রহে লাগল
> মনমেঁ আকে কেই-চোর রহে লাগল'।

অর্থাৎ আমার বুকের তলায় মোচড় পড়তে লাগল, মনের মধ্যে কোনো চোর এসে সিঁধ কাটল—না এসে করি কি?

শাওনের কান-মন জুড়িয়ে গেল। ভালো গান করে শুনেছিল, গুনগুন দু'লাইনের এই রসের গানও এত সুন্দর, এমন মন-ভরানো হতে পারে।

শাওন লোলুপ সুরে বলে উঠল, হয়ে গেল!...আর নেই!

হাসি উপচে উঠছে, কিন্তু চাউনি ধমকে ওঠার মতো। এর পরেও... আরো? আবার খিলখিল হাসি।

একটু পরে শাওন বলল, আজকাল তো সাইটে বেশি যাও না, এখানেই বেশি আস বুঝি?

—ফাঁক পেলেই আসি।...পুনপু হল আমার গঙ্গা মাই—আজ তিন বছর ধরে এই মা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে...

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, আন্ধেরি নামছে, এখন ওঠো তো...।

—আন্ধেরির এখনো দেরি আছে, তাছাড়া তোমার এত ভয়ের কি আছে?

মুখের দিকে থমকে চেয়ে রইলো একটু।—বাবুসাহেব, সত্যি তুমি সাঁনঝতক পুনপুর ওই নিরালা দিকে বসে থাকো?

বলে যখন ফেলেছে সেই ভাবটুকুই বজায় রাখতে হল। হাঁ-না জবাব না দিয়ে ফিরে জিগ্যেস করল, থাকলে কি হয়েছে?

—না. মাথা ঝাঁকালো. আমার কশম, একলা তুমি সাঁনঝতক কক্ষনো এখানে থাকবে না!

শাওনের কৌতূহল বাড়ছে. এ-ও স্পষ্ট, ভয় নিজের জন্য নয়, কেবল তারই জন্য। বলল, কার ভয়ে থাকব না?

—ওই ঠাকুর ব্রিজমোহন আর তার ভাতিজা বাবুয়াকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না, তুমি জানো না ব্রিজমোহনের এখন তোমার ওপর আগের থেকেও বেশি রাগ।

শাওন সাদা মনের মানুষ। কিন্তু বোকা নয়। খনির কাজ এখন যে হারে এগোচ্ছে, ব্রিজমোহন তার জমির আশা আর রাখে না।...তাহলে তিতলির সঙ্গে মেলামেশাই তার বেশি রাগের একমাত্র কারণ হতে পারে। কিন্তু তা ভাবতেও অবাক লাগছে। কি মনে পড়তে আগে একটু রসিকতার লোভ ছাড়তে পারল না। বলল. ব্রিজমোহনের ভাতিজা বাবুয়ার দেমাক তো তার ইয়ারবন্ধুদের সামনে ভেঙ্গে দেবার ব্যাপারটা তোতারামের মুখে শুনেছিলাম. সে আর তোমার জন্য আমার ওপর রাগ করতে যাবে কেন?

তিতলির সমস্ত মুখ এই পড়ন্ত আলোতেও মুহূর্তে সিঁদুর বর্ণ। ওড়নাটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল, যেন এটুকু শুনেই বে-আবরু লাগছে। বলে উঠল. ওই পাজি নচ্ছার তোতার মুখ একদিন আমি ভোঁতা করে দেব—এসব গল্পও সে তোমার কাছে করেছে!

শাওনের মাথাটা আরো ভার লাগছে, শীত-শীতও করছে, তবু আরো খানিক বসার লোভ। বলল, কাকার কাছে ওরকম বকুনি খেয়ে ঠিক হবার পরে সে আর আমার ক্ষতি করতে যাবে কেন, আর ব্রিজমোহনের তো তুমি মেয়ের বয়সী, তোমার খোঁজ-খবর রাখে, তোমাকে খুব পেয়ার করে শুনলাম...সে-ই বা আমার ক্ষতি করতে যাবে কেন?

এ-কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার নয়। মুখের দিকে চেয়ে আছে, দু'চোখ রাগে জ্বলছে। ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, সাঁপ মেডক্‌কে (ব্যাঙকে) কইস পেয়ার করে তুম না জানথ? বুঢ়ঢা সাপুরা কচি ভেক পেলে তাকে না গিলে ছেড়ে দেয়?

এরকম একটা সন্দেহ শাওনের মনের তলায় কখনো উঁকিঝুঁকি দেয়নি এমন নয়।...আজ পর্যন্ত এই মেয়ের পাঠানো কতজন মরদকে সে খনির কাজে লাগিয়েছে ব্রিজমোহন তার হিসেব রাখে, তার কথায় অছুত এলাকায় গভীর কুঁয়ো করে দিয়েছে বলে ওই লোক তার চরের মারফৎ প্রশংসার কথা শোনায়, তিতলি ধরে পড়েছিল বলেই সরকারি জিপে সে সকলের সঙ্গে লছমীকে পাটনার বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করিয়েছে, অছুত মেয়ে তিতলি রাতে কোথায় ছিল তা নিয়েও ঠাকুর সাহেবের দুশ্চিন্তা...নাঃ, নিজেকে শাওন একটা বোকা-হাবাই ভাবছে এখন, মনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিলেও ভালো দিকটাই ভাবতে ভালো লেগেছিল।

তিতলি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো।—এ বাবু, তুম্ উঠ্‌ব কি নহী?

ওর জন্য এই মেয়ের উদ্‌বেগটুকু ভারি ভালো লাগছে।—তুম যাও, আমি আর একটু বসি—

জবাবে ঝুঁকে ওর একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান, জল্‌দি ওঠো বলছি—

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর অনুভূতির তারে যেন গণ্ডগোলের মতো লাগল। দু'হাতে ধরা হাতের ওপর আর একটু চাপ পড়ল। মুখের ওপর চাউনি তীক্ষ্ণ একটু। চট করে একবার এদিক ওদিক দেখে নিয়েই দুই হাঁটুর ওপর তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। তারপরেই ওর একটা হাত শাওনের ঘাড়ের পিছনে, অন্য হাত কপালে।

আবার উঠে দাঁড়ালো। এ বাবু, তোমার গা যে খুব গরম, বোখার হয়েছে...তোমার কিছু মালুম হচ্ছে না?

শাওন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।—হ্যাঁ, বিকেল থেকে শরীরটা বেশ খারাপ লাগছিল...

—খারাপ লাগছিল আর তুমি এই ঢাই মাইল পথ হেঁটে নদীর দিকে বেড়াতে এলে! এখন যাবে কি করে, এদিকে তো একটা বয়েল গাড়িও পাওয়া যাবে না—

—ঠিক চলে যাব, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

বলল বটে, কিন্তু এত পথ হেঁটে ক্যাম্পে ফিরতে হবে ভেবে আরো অবসন্ন লাগছে। শরীরের দিকে খেয়াল না করা পর্যন্ত এতটা খারাপ লাগেনি। আধ মাইলটাক এগনোর পরেই তিতলি বুঝতে পারছে লোকটার কষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে এদিকটা নির্জন এখন। শাওনের পরনে ট্রাউজারস, গায়ে হাফ-হাতা বুশ শার্ট। শীতে সমস্ত শরীরে এক-একবার কাঁপুনি উঠছে। অথচ গরমিকাল এসেই গেছে বলা যায়। তিতলি মাঝে মাঝে তার হাত ধরছে, সেই হাত থেকে থেকে কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত উঠছে—জ্বর বাড়ছে কিনা বোঝার চেষ্টা।

আরো খানিক হাঁটার পর তিতলি বলল, এ বাবু, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, এখন এদিকে লোকজন নেই, আঁধেরিতে কেউ খেয়াল করবে না—তুমি যতটা পারো আমার কাঁধে ভর করে এসো—

আবছা অন্ধকারে এখন মমতাময়ী মূর্তি দেখছে এই মেয়ের। শাওন একটু হেসে বলল, এই লোভেই কষ্ট বেশি হচ্ছে...

হাত ছেড়ে দিয়ে তিতলি এক হাত তফাতে সরে গেল।—তুমি খুব নচ্ছার আদমী আছ—

একটু বাদেই আবার পাশে এসে হাত ধরল। বুঝতে পারছে খুব কষ্ট হচ্ছে। আরো খানিকটা আসার পর লোকালয়। তিতলি হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু পাশ ঘেঁষেই চলল। অনেকেই ওদের চোখে তাকিয়ে দেখছে। শাওনের মনে হচ্ছে এই পা দুটো তাকে বুঝি আর ক্যাম্প পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

...শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলো।

দুটো পাকা ঘর আর টালির ছাদের স্থায়ী ক্যাম্প এখন। অনেকটা জায়গা ছেড়ে এক সারিতে ভদ্র কর্মচারী আর টেকনিশিয়ানদের জন্য পর পর এক ঘরের আরো ছ'টা ওইরকম পাকা ক্যাম্প। শাওনের বাইরের আঙিনায় একটা আর শোবার ঘরের সামনে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। বাইরের ঘরে তিতলি আরো এসেছে, শোবার ঘরে এই প্রথম। টলতে টলতে ঘরে ঢুকে শাওন প্যান্ট জামা জুতো সুদ্ধু শুয়ে পড়ল। এত জ্বর সত্ত্বেও ঘামছে।

রতন তার সাহেবের অবস্থা দেখে হাঁ।

তিতলি চটপট তার জুতো মোজা খুলে নিল, শাওন খেয়ালও করল না। একটু বাদে চোখ টান করে দেখল, তিতলি দু'হাত কোমরে তুলে তার দিকেই অপলক চেয়ে আছে। এগিয়ে এসে ঘামসুদ্ধু কপালে হাত রাখল। রতনকে বলল, এক বালতি জল আর একটা গামছা নিয়ে আসতে। রতন জল আর তোয়ালে নিয়ে এলো। তিতলি প্রথমে তোয়ালে ভিঝিয়ে মাথায় চাপড়ে চাপড়ে দিল। তারপর বেশ করে মাথাটা মুছে দিয়ে আবার তোয়ালে ভিজিয়ে জল নিঙড়ে সেটা মুখে কপালে বার কয়েক চেপে চেপে ধরল। তারপর তোয়ালে তুলতেই দু'চোখ বিস্ফারিত। কিছু চোখে পড়েছে। রতনকে হ্যাজাকটা ভিতরে নিয়ে আসতে বলল। হ্যাজাক আসতে ঘর দিনের মতো আলো। বিছানায় ঝুঁকে তিতলি শাওনের কপাল দেখল, গলা দেখল, নিজের হাতে দুই কান উল্টে দেখল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, হায় রাম!

মাথা আর কপাল মুখ জল দিয়ে মুছে নিতে একটু আরাম লাগছিল, তিতলির মুখ দেখেই শাওন বুঝে নিয়েছে কি হয়েছে বা হতে পারে। রতনকে বলল আরশিটা নিয়ে আসতে। তারপর নিজেই ভালো করে মুখ গলা কান দেখল। জলভরা আট দশটা গুটি চোখে পড়ল।

আরশিটা রতনকে ফেরত দিয়ে আঙুল তুলে তিতলিকে দরজা দেখিয়ে দিল। ছোঁয়াচে রোগ, এখানে আর এক মিনিটও নয়, বাড়ি চলে যাও।

তিতলি শান্ত মুখেই চলে গেল। চারদিকে এখন বসন্ত হচ্ছে ও জানে। পরদেশীবাবুরও হল। দেখার কেউ নেই, সেবা যত্ন করারও কেউ নেই। এ রোগ হলে ভয়ে কেউ কাছে আসতে চায় না। ভাবতে ভাবতে তিতলি ঘরের দিকে দ্রুত পা চালিয়েছে।

শাওনের জ্বর যন্ত্রণাও তেমনি। রাত কত খেয়াল নেই। রতনের ডাকে ঘোর কাটল। সে বড়সড় একটা বাটি আর জলের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে।

—কি?

—দুধ-সাবু...তিতলিয়া দিদি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

খিদে না হোক, তেষ্টা খুব। শাওন এক চুমুকে সবটাই খেয়ে নিল।

পরদিনের মধ্যে সমস্ত শরীর গুটিতে ছেয়ে গেছে। তেমনি জ্বর। সকাল দশটা নাগাদ একজন অচেনা লোক ঘরে ঢুকল। হাতে ব্যাগ।—গুড মর্নিং, আমি ডক্টর শ্রীবাস্তব...। আপনার পক্স হয়েছে আর খুব হাই টেম্পারেচার শুনলাম, ওই মেয়েটা বার বার আপনাকে একবার দেখে যাবার কথা বলল, তাই—

ওই মেয়েটা বলতে কে, শাওন আর জিগ্যেস করল না। জামা তুলিয়ে ডাক্তার একবার গা দেখল। থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর দেখল। রতনকে দিয়ে জল আনিয়ে নিজেই তাতে পটাশ পারমাংগানেটের গুঁড়ো ফেলে থার্মোমিটার তার মধ্যে ডুবিয়ে রেখে বাইরে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুলো। তারপর থার্মোমিটারটা মুছতে মুছতে বলল, জ্বর এখন একশ তিন, আরো বেরুবে মনে হয়, কিছুদিন ভুগতে হবে, জ্বর আর যন্ত্রণা কমিয়ে রাখার ওষুধ রেখে যাচ্ছি—

যাবার আগে শাওন জিগ্যেস করল, আপনার ফি কত?

—ফী যাই হোক, আপনি গাঁয়ের লোকের এত উপকার করছেন, আপনার কাছ থেকে ফী নেব না।

যন্ত্রণা সত্ত্বেও একজনের অদৃশ্য উদ্‌বেগ আর যত্ন অনুভব করে শাওনের ভালো লাগছে। বলল, আপনি পুরো ফী আর ওষুধের দাম নেবেন, কারণ চিকিৎসার টাকা আমি অফিস থেকে পাব।...অন্য কোনো কমপ্লিকেশন না হয় এ জন্যে আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।

—নিশ্চয়, তাহলে ফী-এর বিলও পরে একসঙ্গেই হবে।

দুপুরের খাবার দেখেও শাওন অবাক। সরু চালের গরম ভাত, নিম ঝোল, লাউ শুক্তো, কাঁচা মুগের ডাল আর চমৎকার ভয়সা ঘি। জিগ্যেস করতে হল না, রতন নিজেই জানান দিল, সীতিয়া দিদি এসব রেখে গেছে আর বলে গেছে এরকম ঠাণ্ডা জিনিসই এখন খেতে হবে—সকালের খাবারটা সে রোজ নিয়ে আসবে।

শাওন বিব্রত বোধ করল। এরাও তার কাছে কৃতজ্ঞ বটে, কিন্তু জনার্দন পূজারীর বাড়ি থেকে খাবার আসবে এটা চায় না।

বিকেলে দরজার কাছেই তিতলিকে দাঁড় করিয়ে দিল শাওন। ভিতরে নয়, ওইখান থেকেই দেখো আর শোনো।...ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার পাঠিয়েছ ঠিক আছে, কিন্তু জনার্দন পূজারীর বাড়ি থেকে খাবার আনার ব্যবস্থা করতে গেলে কেন? যা করার রতন করবে, তুমি ওদের অবশ্য বারণ করে দিও, কাল যেন কক্ষনো না আনে।

ঠাণ্ডা মুখে তিতলি বলল, রতন সীতিয়া বহ্নীর মতো পারবে না।

শাওন বিরক্ত।—যা পারে তাইতেই আমার হবে, ওখান থেকে আমার খাবারটা আসুক আমি চাই না।

মুখরার মতো তিতলি বলল, সীতিয়া দিদি শুধু রান্নাই করে দিচ্ছে, ভালো ঘিউ চাল ডাল

সব তো আমিই ওখানে দিয়ে এসেছি—জনার্দন পূজারীর তুমি কিছু খাচ্ছ না, আর সীতিয়া বহ্‌নী আর লছমী খুব ভালো মেয়ে।

শুনে শাওন হতভম্ব খানিক, তারপর বলল, তাহলে এত ধকল না পুইয়ে তুমি রান্না করে পাঠালেই তো পারো?

তিতলির দু'চোখ বড় বড় । খুশিও। আমার রান্না ভাত পর্যন্ত তুমি খেতে পারো?

—পারি কিনা করে দেখো।

তিতলি অপলক চেয়ে আছে। তারপর হঠাৎই বিরক্তির সুরে বলে উঠল, তুমি বড় নটখট আদমী, ছুপার হাজার চোখ আমার চলা-ফেরার দিকে নজর রাখে জানো না? আর আমার ঘরে একজন ফুফু আছে তাও জানো না? কেন তুমি আমাকে এরকম মুশকিলে ফেলো? ও আমার দ্বারা হবে না—সীতিয়াই দিয়ে যাবে।...তোমার মুখের দিকে তো আর তাকানো যায় না দেখি, খুব কষ্ট হচ্ছে?

ওর দিকে চেয়ে কষ্ট হচ্ছে বলতেও খারাপ লাগছে শাওনের। হাসতে গেলেও যন্ত্রণা। বলল, আর কখনো এ-সব হয়নি তো, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে—

পরের তিন চার দিনে যে গুটিগুলোতে পাক ধরেছে তার অসহ্য যন্ত্রণা। শরীরের কোথাও আর জায়গা নেই। গলার চোখের আর কানের ভিতরেও হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই জ্বরে আর যন্ত্রণায় শাওন বেহুঁশ।

এক সময় মনে হল পাক-ধরা গুটিগুলোর ওপর কেউ খুব নরম কিছু দিয়ে যেন কি বোলাচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা আর আরাম লাগছে। চোখ খুলে তাকালো। ঝাপসা দেখছে। তারপর স্পষ্ট হল। শয্যায় বসে ঝুঁকে পড়ে গুটিগুলোর ওপর তুলোয় করে কিছু একটা তেল-তেলে জিনিস লাগিয়ে দিচ্ছে তিতলি—তার পিছনে কুচ্ছিত দেখতে এক বয়স্কা রমণী দাঁড়িয়ে।

শাওন যতটা পারে চেঁচিয়েই উঠল, বিছানায় বসে ও কি করছ তুমি?

ঠাণ্ডা মুখে তিতলি জবাব দিল, ওষুধ লাগাচ্ছি। দাঁড়ানো রমণীকে দেখিয়ে বলল, ওই ভিখুয়াকা মা এ-সবের খুব ভালো দাওয়াই জানে—একটু পরেই তোমার জ্বালা-যন্ত্রণা অনেক কমে যাবে দেখো—

ঘুরে তাকালো।—ভিখুয়াকা মা, ঠিক লাগানো হচ্ছে তো?

সে মাথা নাড়লো। ঠিক হচ্ছে।

—তাহলে তুমি ঘরে চলে যাও, আর বড় এক শিশি তেল তৈরি করে রেখো, এ তো ফুরলো বলে। শাওনের দিকে ফিরল, আরাম হচ্ছে না?

আরাম যে হচ্ছে শাওন স্বীকার করে কি করে। কিন্তু তিতলি এই বিছানায় বসে এ-সব করছে বলে আরামের থেকে রাগ চারগুণ । ভিখুয়ার মা চলে যেতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, কেন তুমি এ বিছানায় এসে বসেছ? যাও শিগগীর, চান-টান করে জামা-কাপড় সব ধোয়ার জন্য পাঠিয়ে দাও!

তিতলি ঝুঁকে তেমনি মন দিয়ে প্রত্যেক গুটির ওপর আরকের তুলি বোলাতে বোলাতে বলল, বেশি চেঁচামেচি করলে রাতেও এখানেই শুয়ে থাকব—

হেসে উঠল। দাঁতের সারি ঝিকমিক করে উঠল। এই মেয়েকে বলবে কি, তার ওপর রাগই বা করবে কি। তিতলি জিগ্যেস করল, তোমার একটু আরাম হচ্ছে কিনা বলো?

শাওন হাসতে চেষ্টা করল, হচ্ছে, কিন্তু সেটা তোমার হাতের গুণে কি ওষুধের কে জানে—

তিতলি বলে উঠল, থাক, আর মস্করা করতে হবে না—খানিক আগে এসে দেখলাম বেহুঁশ হয়েও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছ, তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ভিখুয়ার মা-কে ধরে নিয়ে এলাম।

চোখের মধ্যেও উঠেছে বলে শাওনের তাকাতে কষ্ট হচ্ছে, তবু চেয়ে আছে। এ যদি অছুত হয় তো দুনিয়ায় ছুত্ কে, জানে না।

সকালে দুপুরে বিকেলে ক্যাম্পের অন্য কর্মচারীরা কেউ না কেউ দেখতে আসে। শাওনের নিষেধ শুনে তাদের সকলেরই স্বস্তি, কেউ ভিতরে ঢোকে না, সকলেই দরজার কাছ থেকে দেখে যায়, দু'চারটে কথা বলে যায়। তোতারামকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ঠাকুর ব্রিজমোহনও দরজার কছে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে, কিছু সহানুভূতির কথা বলেছে। আর যাবার আগে ভিখুয়া-কা-মায়ের দাওয়াই ঠিকমতো লাগানো হচ্ছে কিনা সে খোঁজও নিয়েছে। মন্তব্য করেছে, এ-রোগে ভিখুয়া-কা-মায়ের দাওয়াইয়ের খুব নাম আছে, জ্বালা-যন্ত্রণা কমে।

শাওন সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় থাকে। গুটিগুলোতে টান-ধরার পর ব্যথা বেদনা কিছু কমেছে। জ্বরও। তিতলিকে বলেছিল, তুমি আসবেই যখন সন্ধ্যায় এসো, অবশ্য যদি অসুবিধে না হয়, ওই সময়টা খুব বিচ্ছিরি লাগে আর একলা লাগে।

তিতলি মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসেছিল। কিছু বলতে গিয়েও বলেনি। মাথা নেড়েছে।—আচ্ছা সাঁনঝেই আসতে চেষ্টা করব।

তাই আসছে। ওর কথা আর গল্প শুনতে শুনতে রোগ-যন্ত্রণা ভুলে যায়। আবার ওর জন্য দুশ্চিন্তাও। বলে, এত ছোঁয়াছুঁয়িতে তোমারও এই রোগ হল বলে, দেখো।

তিতলি সেদিন নিরীহ মুখে বলে বসল, তোমার সঙ্গে বেশি ছোঁয়াছুঁয়ি আবার কখন হল? তারপরেই হাসি, তোমার হল কেন, তুমি কার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি করতে গেছলে? হবার হলে এমনিই হয়—

সেই সন্ধ্যায় তিতলি আসতে শাওন জানালো, ঠাকুর ব্রিজমোহন দেখতে এসেছিল, ভিখুয়ার মায়ের ওষুধ লাগানো হচ্ছে এ-খবরও রাখে দেখলাম—

চোখ বড় করে তিতলি বলে উঠল, কেবল দাওয়াই কা খবর? আমি কবে কখন ক'বার এখানে আসি, কতক্ষণ থাকি সব ওই শেরমোহনের হিসেবের খাতায় লেখা আছে—বুঝলে?

—শের-মোহন কে?

—যাঃ, তোতাচাচা ব্রিজমোহনকে শের-মোহন 'টাইটল' দিয়েছে জানো না বুঝি, তাঁমালচা (বন্দুক) নিয়ে কি ভীষণ শের শিকারে নেমেছিল ঠাকুর সব তা-ও জানো না?

মজার গন্ধ পেয়ে শাওন উৎসুক, কি-রকম ভীষণ সের শিকারে নেমেছিল?

তিতলি তার বিছানতেই জোড়াসনে গ্যাঁট হয়েবসল।—তোতাচাচা যে-রকম করেবলেছিল সেই রকম করে বলব?

শাওন মাথা নেড়ে সায় দিল।

—তব্ শুনত্ রহ।...একদ্দিন রাতমে ঝাঁকিসে (ছোট জানলা) খইলনমে (ঢেঁকিশালে) দেখলী, এক শের বৈঠলবা, এত্না বড়া শের জিন্দেগীমে না দেখলী—উকরা পুছুয়া (লেজ) এত্না লম্বাই যে দেহড়ী পর্ আ-গইল।...ঠাকুর সাহাব শোচতে রহল কা করি। তুহার (তোতারামের) ভোজীসে পুছ্ল, আরে রামুকা মাতারি, খইলনমে এক শের বৈঠলবা—কা করি? ও নিদ্মে কহ্লী, তাঁমালচাসে উড়া দিহ।...তব্ হম তাঁমালচা আন্ল, টোঁটা ভর্ল, নিশানা ঠিক কর্ল, লেকিন মুশকিলমে পড়্ল—হাম ছেত্তি (ছত্রী) ঠেরে, বিনা দোষমে কইসন টোঁটা ছোড়ি? হম্ আওয়াজ দিওনস্, হটিযা! নঁহি তো সিনা ভোঁক দি! আরে শ্বশুরা কা দেখ্ল? শের আপন পুছোয়া টানত্-টানত্ হামারা সামনে খাড়া কর্ল! হমার অপমান হইল, আঁখো বন্ধ করকে চাবি ঠেল্ল—আরে শ্বশুরা কা দেখি! ও শের টোঁটা মুমে লেইকে হমার সামনে চল্ আইল! আরে তোতা, এ গুজব নঁহি ঠেরে—ও টোঁটা হমারা নানাকা নানার রহল—তব্ হম্ ফির টোঁটা ভরলী, নিশানা ঠিক করলী, লেকিন চাবি না ঠেললী—ক্যায়সে ঠেলি, শের হমার পাঁয়ে পড় করকে গিড়-গিড়ায়ে লাগ্ল—ব্যস, হম ওহকে মাফি করলী...ওক্রা বাদ গাঁওমে হমারা ইজ্জত বাড়্ল বটে লেকিন মনোয়াঁমে এক গম্ভীর দুখ্ রহলন্।... কা দুখ্ সমঝল? ...আরে ও শ্বশুরা শের নোটঙ্গী দলোঁকা এক ভাংগ্লা (অনাথ) বহুরূপী ঠেরে।

যে-ভাবে গম্ভীর মুখে হাত মুখ নেড়ে তিতলি ঠাকুর সাহেবের শেরমোহন 'টাইটল' পাওয়ার গল্পটা বলল, ওটুকু সময়ের জন্য শাওন ভুলেই গেল সে অসুস্থ।

ক্রমে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। খোসা সব পড়ে যাওয়ার পর স্নানও করেছে। কিন্তু শরীর খুবই দুর্বল। তার ওপর মেজাজও ভালো না। তিতলি আসা কমিয়েছে। সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে, তারপর হাল ছেড়ে ধরে নেয় সেদিন আর এলো না।

শেষের বারে পর পর চার দিন তার দেখা নেই। রাগ করে শাওন ভাবছে কালই সে কাজে জয়েন করবে। ডাঃ শ্রীবাস্তব বলে গেছে আরো কম করে সাত দিন রোদ মাথায় করে কাজে বেরুনোর কোনো কথাই ওঠে না।

সেই সন্ধ্যার পর তিতলি এলো। শাওন শুয়েই ছিল। ওকে দেখে একখানা বাহু কপালের ওপর উঠে এলো। তাতে কপাল মুখ আর দু'চোখের অনেকটাই ঢাকা পড়ল। তিতলি শয্যার কাছে এসে দাঁড়ালো। দিন-সাতেক হল সে-ই নিম সেদ্ধ জলের চানের আগে লোক ডেকে যতটা সম্ভব ঘরটাকে ঝাড়মোছ করিয়েছে, ডাক্তার শ্রীবাস্তবের কথামত ওষুধ এনে সমস্ত ঘরে আর বিছানায় ছড়িয়েছে, শয্যায় ব্যবহারের সব জিনিসই রজকের বাড়ি কাচতে পাঠিয়ে নতুন একপ্রস্থ করে পেতে দিয়ে গেছে। তারপর দু'দিন বাদ দিয়ে একদিন এসেছিল, এবারে চার দিন পরে এলো। কোমরে দু'হাত তুলে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো। রাগ হয়েছে বুঝতে পারছে।

—কেমন আছ?

মুখ থেকে হাত না সরিয়ে শাওন জবাব দিল, খুব ভালো।

নিরীহ গলায় তিতলি বলল, এ-রকম মুখ ঢেকে শুয়ে আছ কেন—এই সাঁনঝ্ রাতে ঘুম পাচ্ছে নাকি? তাহলে আমি যাই—

মুখ থেকে হাত সরালো।—আমার ঘুম পাওয়া না-পাওয়ার কি আছে, তোমার যাবার ইচ্ছে হলে যাও।আমি ভালোই আছি, কাল থেকে দু'বেলাই সাইটের কাজে বেরুবো, তোমারও দায় ফুরোবে—

তিতলি তেমনি দু'হাত কোমরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে। ঠোঁটে হাসি ভাঙতে দিচ্ছে না।—এই দুব্‌লা শরীর নিয়ে ডাগ্‌দার তোমাকে ধূপ আর গরম্মির মধ্যে কাজে যেতে বলেছে?

—তোমার সে-খোঁজে দরকার কি?

এবারে তিতলি হেসে ফেলল। —বেমারিতে পড়ে তুমি একেবারে বাচ্চা ছেলে বনে গেলে যে! আমার আসা কি সহজ, ওই সেয়ানা ফুফু রোজ বিকেলে কোনো না কোনো মেহ্‌মানকে এনে রাত পর্যন্ত ধরে রেখে আমাকে আটকায়—

বাজে কথা বোলো না, তিন সপ্তাহ ধরে আটকাতে পারল না, এখন আটকাচ্ছে? আসলে যেই একটু সেরে উঠেছি অমনি সরে যাচ্ছ—আছি কি নেই চার দিনের মধ্যে একটা খবর নেবারও দরকার মনে করোনি!

রাগ দেখে তিতলি মজাই পাচ্ছে। বলল, আসি না আসি তোমার সব খবর, প্রত্যেক দিনের খবর রাখি।

—বাজে কথা, পালিয়ে বেড়াচ্ছ—খবর রাখছ কি করে?

তিতলি চেয়ে আছে। লালচে ঠোঁটে হাসি টসটস করছে। হঠাৎ ঘুরে এগিয়ে গিয়ে দরজা দুটো চার আঙুল ফাঁক রেখে ভেজিয়ে দিল, তারপর পর্দাটা বেশ করে টেনে দিয়ে ফিরে এসে গদী-আঁটা মোড়াটা টেনে তার সামনে মুখোমুখি বসল।—একটা গান শুনবে?

এই অসুখটার মধ্যে এসে এসে তিতলি গুটির ওপর আরকের তুলি বোলাতে বোলাতে যন্ত্রণা ভোলানোর জন্য বা অন্যমনস্ক করার জন্য কত রকমের গল্প করেছে। কত হাসির কথা বলেছে। একটু সুস্থ হবার পর শাওন নিজেই দুই-একদিন ওর গান শোনার আব্দার ধরেছিল। তিতলি তক্ষুনি তা নাকচ করেছে। বলেছে, হ্যাঁ, এখানে গানের আসর বসাই আর গাঁও ভর ট্যাঁড়া পড়ে যাক্! আজ সেই মেয়ে নিজে থেকেই গানের কথা বলছে! লালায়িত খুশি মুখে শাওন তার দিক পাশ ফিরল।

তিতলি আগে ওকটু ভণিতা করল, তুমি বললে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, খবর রাখি কি করে— তাই তো গানটা মনে পড়ল।

প্রথমে একটু গুনগুন করে তারপর সহজ সুরেই গানটা ধরল :

'সূরয ছুঁপে আদরি-বাদরি
চন্দ্রমা ছুঁপে দিন মাবস আয়ে
আর পানিকি বুন্দ্ পতংগ ছুঁপে...
আর মীন ছুঁপে গহেরা পায়'

ফিক করে হেসে উঠল, তারপর শেষের লাইনটা বদলে নিয়ে আবার গাইলো :

'আর শাওন আয়ে তো তিতলি ছুঁপে
আর ভোর ভয়ে পর চৌর ছুঁপে
মৌর ছুঁপে যব ফাঁগন আয়ে...'

আবার ফিক করে একটু হাসি, গায়ের পাতলা ওড়না মাথায় ঘোমটার মত করে টেনে দিয়ে শাওনের দু'কান আর দু'চোখ ভরে দেবার মতোই গানের শেষের দুই পঙ্‌ক্তি ঃ

'ঘুংঘট নয়না ওঠ্ করে
চনচল্ নয়না ছুঁপে নৈহি ছুঁপায়ে।'

মেঘ বাদলে সূর্য গা-ঢাকা দেয়, অমাবস্যা এলে চাঁদ পালায়, আর তিতলি (প্রজাপতি) পালায় শাওন এলে, মাছ পালায় জল গভীর হলে, ভোরের ভয়ে চোর পালায় আর ময়ূর পালায় ফাগুন এলে—কিন্তু ঘোমটা টেনেও (মেয়েদের) চঞ্চল চোখ ওঠে-নামে, আড়াল নিয়েও যেটুকু দেখার ঠিক দেখে নেয়।

মাথার ওড়না টেনে নামিয়ে তিতলি খুব হাসতে লাগল। বলল, তাহলে আসি বা না আসি, তেমার খবর রাখি কি রাখি না—বুঝলে?

৬

এটা কার্তিকের শুরু। আর দিন কয়েকের মধ্যে দেয়ালি। এখানকার সব থেকে বড় উৎসব। অনেক আগে থেকেই নাচ গান যাত্রা পালা শুরু হয়ে যায়। দেয়ালির পরেও দিন কতক ধরে এই উৎসব চলে। এই সময় মেয়ে বউরা পর্যন্ত সাঁন্‌ঝের পরে কমই ঘরে থাকে। দল বেঁধে সব যাত্রা বা রামলীলার আসরে গিয়ে বসে।

শাওন ভার্মার মন মেজাজ কিছুদিন ধরে বেশ বিক্ষিপ্ত। তিতলির ইদানীং দেখাই নাই। সে-ও যদি আর দশজনের মতো এ-সময় আনন্দ ফুর্তিতে মেতে থাকত, শাওনের তাহলে অভিমান হতে পারত, কিন্তু ভাবনা হত না। ওর জন্য মনে একটা শংকার ছায়া পড়ছে। অনেক দিন হয়ে গেল সকালে বা বিকেলে সাইটে তো আসেই না। বিকেলে রোজই প্রায় পুনপুর ধারে গিয়েও দেখে সহেলীরা আছে কিন্তু তিতলি নেই। তাকে দেখেও সহেলীদের চোখে মুখে হাসি-মসকরার ভাব উপচে ওঠে না। শাওন খোঁজ নিয়েছে, তিতলি কোথায়? তারা বলেছে, তিতলি আজকাল ঘর থেকে বেরোয় না। খুব সম্ভব তার সাদী হবে।

—খুব সম্ভব কেন, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় না—তোমরা খোঁজ রাখো না?

ওদের জবাব, কুঠিয়াতে গেলেও তিতলি ঘর ছেড়ে আসে না, আর ফুফুও চায় না কেউ ওকে বিরক্ত করে—তাই তাদের সঙ্গে দেখাও হয় না, খোঁজও রাখতে পারে না।

শাওনের অবাক লাগেছ।...বিয়ে হতে পারে কিন্তু আগে থাকতে এ-রকম-বন্দী হয়ে থাকার কারণ কি?...ওই মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনার কথা শুনেও বুকের ভিতরটা হঠাৎ এত ফাঁকা-ফাঁকা লেগেছে যে অস্বস্তি। নিঃশ্বাস নিতে-ফেলতে কি-রকম কষ্ট হয়েছে। শাওনের মা মারা যাবার পর যে-রকম কষ্ট হত অনেকটা সেই রকম।

...তিতলির বিয়ে একদিন না একদিন হবে জানা কথাই। এমন রূপ যৌবন আর গুণের মেয়ের এতদিনে বিয়ে হয়ে যায়নি এটাই আশ্চর্য। ওর সেই গানের কয়েকটা কলি এখনো কানে লেগে আছে।...সূরয ছুঁপে আদরি-বাদরি, চন্দ্রমা ছুঁপে দিন মাবস আয়ে, আর শাওন আয়ে তো তিতলি ছুঁপে...। তারপর ওই গানের শেষটুকুর মতোই তিতলি আড়াল নিয়েছে, প্রায় এক মাস হয়ে গেল ওর দেখা নেই—কিন্তু এই আড়ালে বসেও সে কি তার খবর রাখছে—ঘোমটা টেনেও চঞ্চল মেয়ের চোখ যেমন ওঠে-নামে, যেটুকু দেখার ঠিক দেখে নেয়—তিতলি কি এই অদেখার আড়াল থেকে এখনো ওর দিকে সে-ভাবে চোখ রেখেছে?

সে-রকম দেখা আর সম্ভব নয়। বাইরে থেকে শাওন ভার্মাকে দেখার কিছু নেই। সে এখন বেশ সুস্থ। কিন্তু পক্সের থেকেও ঢের বেশি একটা চাপা যন্ত্রণা নিয়ে যে-মানুষ উঠছে বসছে, দু'বেলা সাইটের কাজ করে যাচ্ছে, তাকে তিতলি দেখবে কি করে? শাওনের মনে আছে শেষ যেদিন দেখা, সেদিন দারুণ হাসিখুশি মনে হয়েছিল ওকে। হালকা চঞ্চল প্রজাপতির মেজাজেই যেন ছিল সেদিন।...তিনটেয় ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে সাইটের তদারক সেরে পুনপুর দিকে পা চালিয়েছিল শাওন। খানিক যেতে না যেতে খুশি মুখ, উল্টো দিক থেকে তিতলি আসছে। কাছে এসে হেসে টিপ্পনীর সুরে ও বলেছিল, ঠিক জানি কাজে ফাঁকি দিয়ে এখন তুমি পুনপুর দিকে ছুটবে।

শাওনও হাসিমুখেই বলেছিল, তোমার জন্য আমি কাজে ফাঁকি দিতে পারি ভাবো নাকি?

অমনি সুচারু ভ্রূকুটি।—আমার জন্য এটুকু পারো না! কি পারো তাহলে?

শাওন দার্শনিকের মতো জবাব দিয়েছিল, তোমার জন্য আমি সমস্ত ফাঁকির ওপরে উঠে যেতে পারি।

বুঝতে সময় লেগেছিল একটু। তারপর খুব খুশি। ওকে নিয়ে তিতলি সেদিন জঙ্গলের দিকে বেড়াতে গেছল। ওর বাপু যে-দিকে থাকে সেদিকে নয়, অন্য দিকে। অনর্গল কথা বলছিল, কারণে অকারণে হাসছিল, খুশিতে উপচে উঠছিল। শাওন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, দেখছিল। জিগ্যেস করেছিল, আজ এত খুশি যে, কি ব্যাপার?

তিতলি জবাব দিল, দেয়ালি এসে গেল, খুশি হব না? তারপরেই প্রশ্ন, আচ্ছা বাবুজী, দেয়ালিতে বংগালে তুমি অনেক বকরা বলি দেখেছ, তাই না?

—বলি হয়, তবে আমার ও-সব দেখতে ভালো লাগে না—কেন?

তিতলি আবার হাসছিল। বলেছিল, এবার এখানে দেয়ালি উৎসবে একটা মেয়ে বলি হবে শুনছি, দশখানা গাঁওয়ের বড় বড় আদমীরা সব আসবে—তাই ভেবে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

শাওন হাঁ করে চেয়েছিল খানিক। কিন্তু জিগ্যেস করার আগেই তিতলির ফেরার তাড়া। বলেছিল, তুমি আস্তে আস্তে এসো, আমাকে এক্ষুনি ঘরে ছুটতে হবে, খুব দরকার আছে—

বলেই প্রায় ছোটার মতো করে হাঁটা শুরু করেছিল। শাওন পিছু ধাওয়া করে তার সঙ্গ নিয়েছে। তার মনে হয়েছে, দেয়ালির রাতেই কি ওর বিয়ে নাকি? এমন কথা বলল কেন? কোন অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে কি বিয়ে হতে যাচ্ছে তার? পাশে এসে হাত ধরে ওর চলার গতি মন্থর করতে চেষ্টা করল, তারপরেই উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন, দেয়ালির দিনে তোমার কিছু ব্যাপার আছে

নাকি—ও-রকম করে বললে কেন?

হাসি মুখেই ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল, হাতটাত ধোর না, কারো চোখে পড়ে গেলে খুব মুশকিল—

—দেয়ালির দিনে তোমার বিয়ে?

হাসছে।—বিয়ে আর বলি এক হল?...ওই উৎসবের রাতে ঠিক হবে বলি কে নেবে। এই যাঃ, তোমার যে মূর্ছা মুখ হয়ে গেল দেখছি! আবার একপ্রস্থ হাসল, মজা করতে গিয়ে তোমাকে ভয় পাইয়ে দিলাম—নিশ্চিন্ত থাকো, তিতলিকে বলি দিতে পারে এমন মানুষ পিরথিবীতে নেই। হল?

আবার দ্রুত পা চালালো। সঙ্গ নিয়ে শাওন জিগ্যেস করেছে, কাল কখন দেখা হচ্ছে?

—কাল দেখা হচ্ছে না।

—পরশু?

—পরশুর কথা আজ কি করে বলব?

শাওনের দু'চোখ ওর মুখের ওপর থমকালো।—তোমার মতলবখানা কি? কি ব্যাপার আমাকে বলছ না কেন?

...তিতলি দাঁড়িয়ে গেছল। ঠোঁটে হাসি, চোখে চোখ। গুনগুন করে গেয়ে উঠল, 'শাওন আয়ে তো তিতলি ছুঁপে...'।

বলে আর হাঁটা নয়, হাসতে হাসতে একেবারে ছুট।

তারপর চৌদ্দ পনেরো দিন কেটেছে, তিতলির দেখা নেই। সাইটে না, পুনপুর দিকে না, জঙ্গলের দিকেও না। মনে হয় বিয়েই ঠিক হয়েছে, কিন্তু ওর মেয়ে-বলির উপমাটা শাওন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার চোখের সামনে একটা অজানা আশংকার ছায়া দুলছে।

দেয়ালির আগের দিন বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে শাওন জনার্দন পূজারীর ডেরার দিকে চলল। ওই লোকটাকে একটুও পছন্দ করে না, তবু মন উতলা বলেই চলল। সীতা আর লছমীর সঙ্গে তিতলির খুব ভাব, ওর খবর তাদের জানা থাকাই সম্ভব।

দাওয়া থেকে সীতা আর লছমী তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। শাওনের মনে হল দু'জনেরই মুখ বিষণ্ণ। তাকে ভিতরে আসতে বলল।

—তোমাদের বাবা বাড়ি নেই?

লছমী জানালো বাবা এ-সময় বাড়ি থাকে না।

শাওন তবু ভিতরে গিয়ে বসল না। বলল, তিতলির সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না, তাই খবর নিতে এসেছিলাম সে কেমন আছে.. তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় তো?

দু'জনেই মাথা নাড়ল, দেখা হয় না। তারপর গলা খাটো করে সীতা বলল, তিতলি দশদিন আগে এসেছিল, তারপর আর আসেনি। এরপর যা বলল, শুনে শাওনের চক্ষু স্থির।

—বাবুজী, তিতলির জন্য আমাদের খুব চিন্তা হচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা আমাদের মনে হয়েছিল কিন্তু সাহস হয়নি। ...দশ দিন আগে এসে তিতলি খুব হেসেই বাতাবাতি করছিল, কিন্তু যাবার আগে হঠাৎ বলল, আর বোধহয় কারো সঙ্গে

শিগ্‌গীর দেখা হচ্ছে না। কেন জিগ্যেস করতে চোখ পাকিয়ে বলল, অনেক তো দেখা হয়েছে আর কত দেখবে—তিতলির (প্রজাপতির) পরমায়ু জানো না? হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল।

—তারপর?

তার পরেরটুকু শুনে শাওনও উতলা। দশদিনের মধ্যে তার দেখা নেই। আজ সকালে তোতারামের সঙ্গে দেখা হতে সে বলল, তিতলির জীবনে মরদ মানুষ আসছে, দেখা হবে কি করে? কবে সাদী জিগ্যেস করতে তোতারাম রাগ দেখিয়ে বলল, তার আমি কি জানি, তিতলির সঙ্গে তোদের এত পেয়ার—তোরা খবর নিতে পারিস না? ওই শুনে আজই সকাল দশটার পর সীতা আর লছমী বাপুকে লুকিয়ে তিতলির ফুফু হীরা মল্লার বাড়ি গিয়েছিল।...হীরা মল্লা ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। বলেছে, তিতলিকে আজই ভোরে ভিন গাঁওয়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠানো হয়েছে, এখানে অনেক লোক মেয়েটাকে খুব জ্বালাতন করে, ওখানেই তার বিয়ে হবে আর বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। কবে বিয়ে, কোথায় বিয়ে আর তিতলি কোন গায়ে গেছে জিগ্যেস করতে হীরা মল্লা রেগে গিয়ে বলেছে, সে-সব তাদের জানার দরকার নেই। একটু চুপ করে থেকে সীতা বলল, তিতলির ফুপু হীরা মল্লা ভালো আওরত না বাবুজী, আমাদের গণ্ডগোল লাগছে...তাছাড়া মেয়েটা প্রায়ই বলত, তিতলির পরমায়ু বেশি না, শেষ দিনও ওই কথাই বলে গেল!

না, শাওনও ভেবে পাচ্ছে না কি ব্যাপার। ফিরে আসতে আসতে ভাবছিল, তিতলির আয়ু বেশি না এ-কথা একদিন ওকেও বলেছিল। আর শেষের দিন, দেয়ালির রাতে মেয়ে-বলির কথা বলেছিল।...অবশ্য তারপর ওকে আশ্বাস দিয়েছিল, তিতলিকে বলি দিতে পারে এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই।

ক্যাম্পে ফিরে দেখে জল না চাইতে মেঘ। বসার ঘরে তোতারাম খোশমেজাজে বসে চা-বিস্কুট খাচ্ছে। ওকে দেখেই হেসে বলল, তোমার এখানে এলেই চা-বিস্কুটের লালচ ছাড়তে পারি না দোস্ত—

—বেশ, আরো চা-বিস্কুট দিতে বলব?

—না না, তোতারামের ব্যস্ত মুখ, আমি ঠাকুর সাহেবের জরুরী আরজি নিয়ে এসেছি, এক্ষুনি ফিরতে হবে।...কাল দেয়ালির রাতে দশখানা গাঁওয়ের রইস আদমীদের নিয়ে একটা উৎসব হবে, যাদের নেওতা (নেমন্তন্ন) পাঠানো হবে কেবল সেই ক'জন ছাড়া এই উৎসবের খবর আর কেউ জানবেও না—ঠাকুর সাহেবের তুমি খুব মন-পসন্দ মানুষ, তাই দোস্ত হিসেবে তিনি তোমাকেও সঙ্গে নিতে চান, তিনি সাঁনঝে এসে তোমাকে তাঁর বগ্‌গি গাড়িতে তুলে নেবেন—

শাওন ভিতরে ভিতরে তিতলির খবর শোনার জন্য উৎসুক। তবু ব্রিজমোহনের এত আগ্রহের কথা শুনে অবাক একটু। ভদ্রতার খাতিরে জিগ্যেস করল, কোথায় উৎসব?

—আমার নেওতা আছে কিনা এখনো জানি না, নেওতা না থাকলে কোথায় উৎসব জানার

উপায় নেই—তবে তার জন্য ভাবনা কি, ঠাকুর সাহেব তো তোমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবেন।

শাওন সবিনয়ে বলল, ঠাকুর সাহেবকে বোলো আমি হাত-জোড় করে তাঁর কাছে মাফ চেয়েছি, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, পরে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেব...কিন্তু তোতাজী, তোমার সঙ্গে আমার একটু অন্য কথা ছিল—

ঢুলুঢুলু চোখ যতটা সম্ভব টান করে তাকালো তোতারাম। হাসছেও অল্প-অল্প। —তুমি তিতলির খবর জিগ্যেস করবে তো? ...কিন্তু তার আগে দোস্ত, এই নেওতার ব্যাপারটাই ফয়েসলা হয়ে যাক, এই উৎসবে রইস লোকদের নেওতা দিচ্ছে হীরা মল্লা—তুমি ঠাকুর সাহেবের দোস্ত হিসেবে গেলে তোমারও তাঁর নেওতাই নেওয়া হবে...তুমি যেতে আপত্তি কোরো না—কিন্তু হনুমানজীর কসম, এই যা শুনলে তা ভাঙখোর তোতারা মগজের বুলি—কেউ জানলে আমার জান চলে যাবে। আমার আর সময় নেই, কাল সাঁঝএ রেডি থেকো—

চেয়ার ঠেলে উঠে তাড়াতাড়ি চলে গেল। ইলেকট্রিক শক্-খাওয়া স্থাণুর মতো বসে রইলো শাওন।...হীরা মল্লার নেওতা...তার উৎসব! ...তিতলি কি বলেছিল, কি বলেছিল তিতলি? জোরে জোরে নিজের মাথার চুল টেনে প্রতিটি কথা হুবহু মনে করতে চেষ্টা করল। মনে পড়ল...তিতলি বলেছিল, দেয়ালির উৎসবে একটা মেয়ে বলি হবে, দশখানা গাঁওয়ের বড় বড় আদমীরা আসবে।...আর বলেছিল ওই উৎসবের রাতে ঠিক হবে বলি কে নেবে।

কিন্তু শাওনের শেষ পর্যন্ত কিছুই বোধগম্য হল না, কি হতে পারে। দশ গাঁয়ের বড় বড় রইস লোকদের ডেকে তিতলির ফুফু হীরা মল্লা কি আগের কালের মতো স্বয়ম্বর সবার আয়োজন করেছে? সব থেকে পয়সাঅলা লোকের গলায় মালা দেবে তিতলি? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? নেওতা পেয়ে ওই উৎসবে যারা যাচ্ছে তারা বেশির ভাগই জাতের মানুষ, গাঁয়ের ছোট বড় ভূস্বামী—অছুত্ মেয়ের তাদের কারো গলায় মালা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে ওটা কি বিয়ে পাকা হওয়ার মতো উৎসব কিছু —যেখানে পাঁচ-সাতখানা গ্রামের মান্যজনেরা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবে? শাওনের মনে হল খুব সম্ভব সে-রকম কিছুই হবে।...কিন্তু তাহলে সেখানে ঠাকুর ব্রিজমোহনের শাওনকে নিয়ে যাবার এত আগ্রহ কেন? মন বলছে, সে ওকে কিছু দেখাতে চায়, দেখিয়ে আক্কেল দিতে চায়, এই জন্যেই তার এত আগ্রহ।

সেই রাত আর পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি-ভাবে কাটল শাওনই জানে।

৭

সন্ধ্যার একটু পরেই পাকা ক্যাম্প ঘরের সামনে ব্রিজমোহনের বগ্‌গি গাড়ি এসে দাঁড়ালো। শাওন প্রস্তুতই ছিল, বেরিয়ে এলো। তোতারাম নেমে এসে হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঠাকুর সাহেবের মুখোমুখি আসনে বসালো, তারপর নিজেও শাওনের পাশেই উঠে বসল। ঢ্যাঙা তোতারামের পর্যন্ত আজ বাহারী সাজ। আর ঠাকুর ব্রিজমোহনের তো কথাই নেই। সামনে বসতেই ভুর-ভুর করে আতরের গন্ধ নাকে এলো শাওনের। তার পরনে মিহি ধুতি, গায়ে মুগার

জামার ওপর কলিদার কুর্তা, মাথায় শাফা (পাগড়ী), কুর্তার উপরেও আবার খুব পাতলা রেশমী চাদর, পায়ে শৌখিন নাগরা। খুশবু পানে দুই ঠোঁট টসটস করছে, চোখে যত্ন করে সুরমা টেনেছে।

বগ্‌গি গাড়ি ছুটেছে। ব্রিজমোহন অমায়িক হেসে মুখ খুলতেই বোঝা গেল সে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। আধো-আধো টানা সুরে বলল, হমারা খাতির মেহফিলমে আরহল্‌ মিস্টার ভার্মা— হম্‌ বহুত-বহুত খুশ হইলী।

শুধু ব্রিজমোহন নয়, ভালোমতো নেশা তোতারামও করেছে। বগ্‌গি গাড়ি চলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সে দুলছে, আর থেকে থেকে শাওনের গায়ের সঙ্গে তার গা ঠেকছে। শাওন ধার ঘেঁষে বসার পর তার দুলুনি আরো বাড়ল। ঠাকুর সাহেবের খোশবাত শুনে সে-ও মুখ খুলল, তার কথা এমনিতেই টানা-টানা।—ভারমা সা-হা-ব স-অবকো পেয়ার আদমী, আপকে নেওতাকা খাতির আইলন।

শাওন বেশ অস্বস্তি বোধ করছে কেন জানে না। গাড়িটা হীরা মল্লা অর্থাৎ অচ্ছুত পাড়ার দিকে যাচ্ছে না।...সীতা বলেছিল, তিতলিকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিজমোহনের দিকে চেয়ে সবিনয়েই বলল, আপনার নেওতা পেয়ে আমি তো খুশি হয়েই এলাম ঠাকুর সাহেব, কিন্তু উৎসব কিসের এখন পর্যন্ত তো তাই জানি না—

এধার থেকে ফস করে তোতারামের মুখ দিয়ে বেরিয়ে ওলো, নথ ভাঙানিয়াকা—

সঙ্গে সঙ্গে শাওনকে চমকে দিয়ে ব্রিজমোহনের গর্জন।—খামোশ উল্লুকা পাঠঠে, ফি্‌র আগে বাড়ত্‌ বাত করব তো ঘেঁড়ি পাকড়কে উতর্‌ দি!

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করে তার দিকে চেয়ে দু'হাত জোড় করে করুণ সুরে তোতারাম বলল, মাফি দে রহুয়া, মাফি দিহ, মহারাজ কি এত্‌না মিঠ্‌ঠি নশামে মুমে বাত্‌ আগইল, হামারা কা কসুর...।

মহারাজ এটুকুতেই পরিতুষ্ট। শাওনের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসল একটু। বলল, জরা সবুর, এইসন মজাদার পার্টি তুম কভু না দেখত্‌।

ব্রিজমোহন হাসছে, দুলছে, মাঝে মাঝে দু'চোখ বুঁজে আয়েস করে পিছনে ঠেস দিয়ে যেন মজার খোয়াব দেখছে কিছু। ও-দিকে ধমক খেয়ে মুখ বন্ধ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সিটের ওপাশে হেলান দিয়ে তোতারাম ঘুমিয়েই পড়ল, একটু একটু নাক-ডাকার শব্দও কানে আসছে।

দুই মাতালের সঙ্গে শাওন কোথায় চলেছে বুঝতে পারছে না। নথ্‌ ভাঙানির উৎসব আবার কি? নথ বলতে তো কেবল মেয়েদের নাকের নথ জানে! সরকারী পদস্থ কর্মচারী হিসেবে তার ও-সব নেমন্তন্নে আসা ঠিক হল কি না তাও মনে আসছে। কিন্তু আনন্দ করতে নয়, সে এসেছে অন্য দায়ে, আর একজনের কথা ভেবে।

চারদিকে বাজী আর আলোর রোশনাই ছাড়িয়ে বগ্‌গি গাড়ি এক নিরিবিলি এলাকা দিয়ে জোর ছুটেছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে গাড়িটা একটা একতলা দালানের সামনে দাঁড়ালো। অর্থাৎ কম করে পাঁচ মাইল রাস্তা পার হয়েছে তারা। ওই দালানের আশপাশে আর কোনো বাড়ি চোখে পড়ল না। গেটের সামনে আরো ছ'সাতটা বগ্‌গি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

নেমে গেট দিয়ে ঢোকার সময় দরোয়ানগোছের দু'জন লোক ঠাকুর ব্রিজমোহনের উদ্দেশে ঘটা করে সেলাম জানালো। ব্রিজমোহন তাদের দিকে চেয়েও দেখল না।

বাড়িটাকে নিরিবিলি একটা বাগানবাড়ির মত মনে হচ্ছিল শাওনের। গেটের পরেই বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত ছোট রাস্তা। দু'পাশে ফুলের বাগানে নানারকম ফুল ফুটে আছে। আলোর রোশনিতে দালানের ভিতর-বার আর চারদিক দিনের মতো। ব্যস্ত এবং হাসি মুখে যে রমণীটি দাওয়ায় এসে ব্রিজমোহনকে অভ্যর্থনা জানালো, শাওনের কেন যেন মনে হল সেই হীরা মল্লা হবে। বয়েস বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ মনে হয়। এখনো সুশ্রী, দেহের কাঠামোয় যৌবনশ্রী অনুপস্থিত বলা যাবে না। একটু ঝুঁকে দু'হাত জোড় করে ব্রিজমোহনের উদ্দেশে সামান্য আনত হল, মিষ্টি অভ্যর্থনা জানালো, আহ ঠাকুর সাহাব আ-হ, সব-কোই রহয়াকা প্রতীখ্সাকা খাতির বৈঠল রহল।

হাসি মুখে ব্রিজমোহন দাওয়ায় উঠল। দেরিতে আসার জন্য কোনরকম কৈফিয়ত দাখিল করল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিল, এ হমারা দোস্ত শাওন ভার্মা, হম্ তোঁহারা তরফসে নেওতা ভেজি—রহয়া কিরপা করকে আগইল...আর এ তিতলিকি ফুফু হীরা মল্লা।

শাওনের মনে হল হীরা মল্লার কটাক্ষে বিদ্যুৎ খেলে গেল একপ্রস্থ। তারপর আরো আনত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো, এ বহুৎ সৌভাগ্ হামারি, পরদেশী বাবুকা দিলো কা খবর কওন্ ন জানথ—আইয়ে আইয়ে—

সামনের বড় একটা ঘরে আলোর ফোয়ারা। চমৎকার গালচে পাতা সেখানে, আট ন'জন ভদ্রলোক ছড়িয়ে বসে। দেখলেই বোঝা যায় এরা পয়সা-অলা মানুষ। এর মধ্যে তিনজন শাওনের পরিচিত। তারা পঞ্চের কর্তাব্যক্তি মহাদেও প্রসাদ, জগদেও মিশির। ব্রিজমোহন ভিতরে ঢুকতে ঘরের সকলেই একটু বিশেষ সম্মানদেখিয়ে হাঁটুর ওপর বসে দু'হাত জুড়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো, তারপর সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি শাওন ভার্মার দিকে।

আবার তারা গালচের ওপর বসল। একটি অল্পবয়সী মোটামুটি সুশ্রী মেয়ে গান গাইছিল। তার অদূরে একজন তবলা বাজাচ্ছিল। আরো কেউ কেউ অন্য বাজনা বাজাচ্ছিল। কিন্তু তার গানের দিকে কারো মন আছে মনে হয় না। অতিথিদের সামনে সারি-সারি ট্রে, তাতে মদের গেলাস আর পানের রেকাবি। নবাগত তিনজন বসতেও তাদের সামনে ট্রেতে করে দু'জন লোক পান আর মদের গেলাস রেখে গেল। তোতারাম সঙ্গে সঙ্গে গেলাস তুলে এক লম্বা চুমুক। আয়েসী মেজাজে ব্রিজমোহনও তার গেলাস তুলে নিল। শাওনের এ-সব চলে না। তোতারাম তার পাশেই বসে, সে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, ও যেমন আছে থাক, সময় বুঝে আমি সাবড়ে দেব।

কেন যেন এখন তাকে একটুও বে-সামাল মনে হল না শাওনের। সে আবার ঝুঁকে বলল,তোমার চেনা মুখ ছাড়া আর যাদের এখানে দেখছ, তারা সকলেই নানা গাঁওয়ের ছোট-বড় ভূ-স্বামী।

বেচারী মেয়েটা গেয়েই চলেছে। তার গানের দিকে কারো মন নেই।

হীরা মল্লা এসে ব্রিজমোহনের কানে কানে কি বলতে সে মাথা নেড়ে সায় দিল। হীরা

দ্রুত ভিতরের দিকে যেতে যেতে, গান করছে যে মেয়েটি তাকে কি ইশারা করে ভিতরে চলে গেল। তবলা আর বাজনা থেমে গেল, কারণ গান থামিয়ে ওই মেয়েটিও উঠে ভিতরে চলেগেল।

একটু বাদে এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরে যাকে নিয়ে ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকল, সে কে আঁচ করে শাওন স্থান-কাল ভুলে হতবাক। ঘরের অন্য সকলেও নির্বাক।

তিতলি।

মাথায় খুব লাল রেশমের ওড়নার ঘোমটা। কিন্তু এত আলোয় ঘোমটা সত্ত্বেও কে বোঝা যাচ্ছে, মুখ দেখা যাচ্ছে। কারণ গায়ে মাথায় ওই রেশমের চাদর যেমন পাতলা তেমন স্বচ্ছ। পরনে জরির কাজ করা আকাশী রঙের বেনারসী। শাড়ি আর রেশমের চাদরের ভিতর দিয়েও অন্তর্বাসের আভাস চোখে পড়ে। আলতা-পরা পায়ে লাল ভেলভেটের চটি, আঙুলে রূপোর অঙ্গুঠা, দুই গোড়ালি ঘিরে রূপোর বিছুয়া, কোমরে কোমর-ধ্বনি, হাতে বাহুতে সোনার ঠেলা অনন্ত বিছা বাজু, দশ আঙুলে ছ'টা অঙ্গুঠা। গলায় হার কণ্ঠা হাঁসুলি, কানে বড় ঝুমকা, মাথায় কানো-লাগানে মনটিকা, নাকের গোল বড় নথনির মূর্গা লাগানো চেন কানের সঙ্গে জড়ানো, মুখে হালকা অভ্রের প্রলেপ, চোখে কাজল, কপালে লাল সিঁদুরটিপ, দুই ঠোঁট হালকা লাল রঙে রাঙানো, হাতের তালুতে মেহেন্দির ফুলের ছাপ, নখে নখর-নজনি।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখার পরেও শাওন হাঁ করে চেয়ে আছে। ... দু'হাত জোড় করে কারো দিকে না চেয়েই তিতলি সকলের উদ্দেশে অভিনন্দন জানালো। জানু মুড়ে পিছনে দু'পা রেখে আস্তে আস্তে বসল। এবারে অভ্যাগতদের দিকে চোখ। তারপরেই রেশমী-চাদরের আড়ালে তার দুই চোখ স্তব্ধ, বিস্ময়াহত। বিহুল বিভ্রান্ত চাউনি শাওনের মুখের ওপর। ব্রিজমোহন বা অন্যদেরও লক্ষ্য না করার কথা নয়। সকলের অলক্ষ্যে তোতারাম শাওনের হাঁটুতে চাপ দিল। শাওন অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

এরপর হীরা মল্লা একটু ঝুঁকে অভ্যাগতদের উদ্দেশে অভিবাদন জানিয়ে খুব মিষ্টি করে তার বক্তব্য পেশ করল।...নানা গাঁও থেকে নেওতা পেয়ে এতসব মানীজনেরা এসে এই আসর রোশন করেছেন বলে সে ধন্য। শুধু মানুষ কেন, স্বর্গের দেওতারাও এ-রকম আনন্দের আসরের শরিক। তাঁদের চিত্তবিনোদনের জন্যেই সর্ব-কলায় বিদুষী উর্বশী-মেনকা-রম্ভার সৃষ্টি। দেবতাদের মতো মানুষও এই আনন্দের অধিকারী। সেদিকে চোখ রেখেই হীরাবাঁদী মর্ত্যের দেবতুল্য মানুষদের মনোরঞ্জন আর চিত্তবিনোদনের জন্য ওই অপ্সরাদের মতোই একটি কলাবতী রূপসী মেয়েকে এই আসরে উপস্থিত করেছে। এই আদরের মেয়েকে রাজরানীর মতো রাখার শর্তে রহয়া মহারাজদের মধ্যে কে একে গ্রহণ করবেন সেটা তাঁরাই বিচার করুন।

আবার অভিবাদন জানিয়ে হীরা মল্লা তিতলির পাশ ঘেঁষে বসে তার রেশমী ওড়নার ঘোমটা মাথার ওপর তুলে দিল।

সকলের জোড়া-জোড়া লুব্ধ চোখ ওই মুখের ওপর অনড়। তিতলির আয়ত দু চোখ শাওনের দিকে নির্বাক ভর্ৎসনায় স্থির কয়েক পলক। বলতে চায়, এই নেকড়ের দলের আসরে সে কেন?

কে জানে কেন, শাওনের দু'চোখ এবার ঠাকুর ব্রিজমোহনের দিকে ঘুরল। তার চাউনি থেকে নেশা ছুটে গেছে, লোভের নীলচে আগুন ঠিকরোচ্ছে। সে-ও শাওনের দিকে ফিরল। হাসছে অল্প-অল্প। এমন মজা যেন আর জীবনে পায়নি।

হীরা মল্লা তিতলির কানে কি বলতে সে দু'হাত জোড় করে অভ্যাগতদের উদ্দেশে ঈষৎ মাথা নোয়ালো, তারপর হাত-দুটি জোড় করে রেখেই গান শুরু করল। তবলচি ঠেকা দিতে লাগল, অন্য বাজনাতেও সুরের ছোঁয়া লাগল।

'পাঁইয়া পড়ু ও গঙ্গা মাইয়া
নিলামওয়া হোত্ হ্যায় বিটিয়া তুঁহার
মিলা দে সাজন মেরা,
পাঁইয়া পড়ু বার বার ও মাইয়া'

গানের সুললিত সুরে এতবড় ঘরে একটা কান্না যেন গুমরে গুমরে উঠছে। সকলে নির্বাক। রাগে হীরা মল্লার মুখ লাল।

'দিল্‌বা কো খরিদার না মিলল হমার
পায়েলকা ছনছন, তবলাকা ঠুন-ঠুন
সীতারৌকে ঝুনঝুনৌয়া, ও মাইয়া
শুনে না শুনে হমার এ সাজনৌয়া,
আঁখোকা লালচ শিঙ্গারোকা খুশবু
সিক্কাকা (টাকার) ঠন্‌ঠনৌ
শুনে না বুঝে হমার এ সাজনোয়া,
তোহি হমার লাজ রাখিও
বার বার পড়ু তেরি পাঁইয়া, ও মাইয়া।'

শাওনের বুকের ভিতরটা কাটছে, কিন্তু অনুভূতিশূন্য মূর্তির মতো বসে আছে। অভ্যাগতরা তখনো নির্বাক। এই আসরে এ-রকম গান শোনার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। তিতলির দিকে একটা রুক্ষ দৃষ্টি হেনে হীরা মল্লা ঈষৎ ঝুঁকে সুন্দর করে আবার অভ্যাগতদের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে কৈফিয়ত দাখিল করতে গেল, তোমাদের মধ্যে যে রুহুয়ার সেবা করার জন্য আমার এই মেয়ে প্রস্তুত, ভিতরে সে কত ধরমশীলা তা মনে রাখার জন্যেই—

মুখের কথা থেমে গেল। হীরা মল্লার বিস্ফারিত দু'চোখ এত বড় ঘরের দরজার বাইরের দিকে। ঘরে আলোর ফোয়ারা তাই প্রথমে চোখ পড়েনি। দরজার বাইরে একটি লোক দাঁড়িয়ে, রোগা পাকানো লম্বা দেহ, রুক্ষ ফর্সা মুখ, অভ্যাগতদের মতোই সাজ-পোশাক। তার পিছনে দু'জন বন্দুক-ধারী লোক। হীরা মল্লার অমন বিহুল বিভ্রান্ত দৃষ্টি অনুসরণ করে সকলেরই জোড়া-জোড়া চোখ এবার বাইরের দিকে। পরমুহূর্তে তারাও যেন মোহাবিষ্ট। দেখেও কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না এই মানুষ এখানে। সকলের থেকে হতবাক বোধহয় ঠাকুর ব্রিজমোহন।

তোতারামের আঙুলের খোঁচা খেয়ে শাওনের চমক ভাঙল। কানের কাছে মুখ এনে সে ফিসফিস করে জানান দিল, লোহার গাঁওর ঠাকুর কুন্দন সিং।

এই প্রবল শক্তিমান ভূস্বামীটির কথা শাওন অনেক শুনেছে বটে।

আত্মস্থ হয়ে হীরা মল্লা দরজার দিকে ছুটল। তারপর রাজা বাদশাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার মতো করে ঘরে নিয়ে এলো। বিড়বিড় করে হয়তো নিজের সৌভাগ্যের কথাই বলছে। কুন্দন সিং ঘরে এসে দাঁড়াতে সচকিত হয়ে সকলে অভিনন্দন জানালো তাকে। ব্রিজমোহনও। তার মুখে আর হাসি নেই এখন। বিবর্ণ।

কুন্দন সিং আসরে ব্রিজমোহনের পাশে বসল। ম্যাড়মেড়ে দু'চোখ তিতলির মুখের ওপর অপলক। নিষ্প্রাণ মুখে তিতলিও চেয়ে তাকেই দেখছে।

কুন্দন সিং-এর দৃষ্টি এবারে অন্য সকলের দিকে ঘুরল। কারা এসেছে দেখে নিচ্ছে। শাওন ভার্মাকে দেখে চাউনি থমকালো একটু। মাথা নিচু করে ব্রিজমোহনকে জিগ্যেস করল, এ কওন?

ব্রিজমোহন শুকনো চাপা গলায় জানান দিল, খঁনিয়াকা এনজিনিয়ার শাওন ভার্মা...ক্যাম্প-ইন-চার্জ।

কুন্দন সিং ঘাড় ফিরিয়ে তাকে আর এক দফা দেখে নিল।

হীরা মল্লা নিজের হাতে কুন্দন সিংয়ের জন্য পানপাত্র নিয়ে এলো। তার চোখে মুখে একটু ভয়ের ছায়া, আবার লোভের জেল্লাও। হাতের ইশারায় কুন্দন সিং পানপাত্র নিয়ে যেতে বলল, এ-সবের দরকার নেই—

হীরা মল্লা প্রস্তাব করল, রহুয়াকা খাতির আওর এক গীত ফরমাই?

কুন্দন সিং-এর ঠাণ্ডা জবাব, বাহারোঁসে গীত শুনল, বহুত দর্দ্‌ভরি আওয়াজ।

তার দৃষ্টি আবার তিতলির মুখের ওপর। শাওনের মনে হল লোকটার অভিব্যক্তিশূন্য চাউনি নিস্পৃহ হতে পারে আবার ভয়ংকর নিষ্ঠুরও হতে পারে।

সকলের উদ্দেশে হাত জোড় করে হীরা মল্লা বলল, তব রহুয়া লোগনকা হুকুমসে আসর চালু হৈ...।

আসরের সবাই নড়েচড়ে বসল। আবার শাওনের দিকে ঘাড় ফেরাতে গিয়ে কুন্দন সিং এই প্রথম যেন তোতারামকে দেখল। গম্ভীর কিন্তু গলার স্বরে সামান্য বিস্ময়ের আভাস। বলল, আরে তোতা, তু-হি হিয়াঁ! তো পহলে তু মুখোল্।

আদেশ পেয়ে তোতারাম টান হয়ে বসল। জিভে করে একবার ঠোঁট ঘষে নিয়ে ঘোষণা করল, পান্‌শ' রূপয়া—!

হীরা মল্লার চোখে আর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। মন্তব্য করল, বহুত সুন্দর মিটিয়াকা পুরুয়া মিলব—

ব্রিজমোহন আর কুন্দন সিং ছাড়া আর সকলের মুখে চাপা হাসি। ও-দিক থেকে আর একজন দর হাঁকল, হাজার রূপয়া—

—দো হাজার...

—দো হাজার পাঁন শ'!

দর হাঁকা কর্তব্য বোধেই একে একে এরা মুখ খুলছে। কেবল ব্রিজমোহন আর কুন্দন সিং ছাড়া। শাওন ভার্মা রক্তশূন্য মুখে স্থাণুর মতো বসে আছে। এখন গোটা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে।

—তিন হাজার।

—তিন হাজার পাঁনশ।

—চার হাজার।

—পাঁচ হাজার।

—ছে হাজার।

শেষের এই দরটা দিল ব্রিজমোহনের অনুগত মহাদেও প্রসাদ। এরা সকলেই জানত তিতলি শেষ পর্যন্ত কার দখলে যাবে। কিন্তু কুন্দন সিং এই আসরে এসে উপস্থিত হতে সবই কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তিতলিকে দেখে পাওয়ার লোভ সকলেরই, কিন্তু পাবে না এ-ও জানে বলেই ছ'হাজার পর্যন্ত দর তুলে চুপ সকলে।

...ব্রিজমোহন হীরা মল্লাকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছিল, নথ ভাঙানির আসরে যে দামই উঠুক—সে তাকে দশ হাজার টাকা গুণে দেবে, আর তিতলিকে রানীর হালেই রাখবে। কিন্তু সব অনিশ্চিত হয়ে গেল এই একটা লোক আসাতে।...হার্টের রোগ, ষাটের দিকে বয়েস গড়াচ্ছে—তার এমন লোভ হতে পারে কেউ কল্পনাও করেনি। গোঁ-ভরে ব্রিজমোহন প্রতিশ্রুতির ঢের বেশি দর হেঁকে বসল।—পন্‌র হাজার।

দর দিয়েই ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত একটু। এই লোকটা ধূর্ত অতি, পনেরো হাজার টাকা দর তুলে সকলের সামনে তাকে বোকা বানিয়ে হয়তো চলে যাবে।

ঠাণ্ডা গলায় কুন্দন সিং বলল, তিশ হাজার।

ব্যাস, এই এক দরেই নিলাম শেষ, নথ-ভাঙানির আসর শেষ। কুন্দন সিংকে সকলে এক কথার মানুষ বলে জানে। এর ওপর দর চড়ানোর মুরোদ কারো নেই। তিরিশ হাজারই কল্পনার বাইরে। কিন্তু ব্রিজমোহনের মনের যে অবস্থা, এত দিনের বাসনার যে ব্যর্থ দংশন—তার ইচ্ছে করছিল তিরিশের ওপরে পঞ্চাশ হাজার হেঁকে বসতে। কিন্তু কুন্দন সিং তিরিশের উপর আর এক টাকাও হয়তো বাড়বে না। এরপর ব্রিজমোহনকে কেবল এক নম্বরের শত্রু বলে চিহ্নিত করে রাখবে। সেটাই আসল ভয় নয়। রীতি অনুযায়ী যে-দর উঠল তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ সকলের সামনে এই আসরে আগাম দিয়ে যেতে হবে, পঞ্চাশ হাজার দর হাঁকলে এক্ষুনি দশ হাজার টাকা ব্রিজমোহনের সঙ্গে ‹াই। থাকলেও তিতলিকে গ্রহণের দিনে বাকি চল্লিশ হাজার টাকা সত্যি দেওয়া হল কিনা বা কোনরকম কারচুপি করা হল কিনা সেটা যে-ভাবে হোক কুন্দন সিং যাচাই করে নেবেই। আসল কথা যত আ' নই মাথায় জ্বলুক, পঞ্চাশ হাজার ছেড়ে তিরিশ হাজারই তার স্বপ্নের বাইরে।

হার মানা বা হাল ছাড়ার রীতি হল দু'হাত জোড় করে প্রতিপক্ষকে নমস্কার জানানো।

মাথা নেড়ে নমস্কার গ্রহণ করে কুন্দন সিং পকেট থেকে একতাড়া নোটের বটুয়া বার করে হীরার সামনে গালচের ওপর ছুঁড়ে দিল।—ছে হাজার, গিন্ লে...

তার যেন জানাই ছিল তিরিশ হাজারে এই কেনা-বেচার ফয়েসলা হবে, তাই তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছ' হাজার পকেটে মজুত।

টাকার থলেটা তুলে নিয়ে হীরা মল্লা আ-ভূমি নত হয়ে তাকে কুর্নিশ জানালো।

ব্রিজমোহনের মুখের দিকে তাকাতে তার অস্বস্তি, কিন্তু দশ হাজারের জায়গায় তিরিশ হাজার টাকা পাওয়ার আনন্দই বা সে গোপন করে কি করে?

নথ-ভাঙানির আসল উৎসবের দিন এরপর কুন্দন সিংই ঠিক করবে। সেই উৎসব তার কোন কুঠিতে হবে। সেই দিন বাকি লেন-দেন শেষ হলে তিতলিকে তার এই মালিকের হেপাজতে চলে যেতে হবে।

কুন্দন সিং উঠে দাঁড়ালো। তার সম্মানে হোক বা আসর শেষ বলেই হোক অন্য সব অভ্যাগতরাও কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছে। কুন্দন সিং-এর দু'চোখ আবার তিতলির মুখের ওপর। অন্য সকলেরও, একমাত্র শাওন ভার্মার বাদে। তার রক্তে আগুন জ্বলছে, এমন এক জঘন্য বাসনার বেসাতি তাকে চোখের সামনে বসে দেখতে হল. এখন সেই রাগ। তিতলির দিকে না চেয়ে তার নতুন মালিক কুন্দন সিংকেই দেখছে। যৌবনের আগুনে বার্ধক্যের লোভকে ধ্বংস করার শক্তি কারো কি আছে? শাওন ভার্মার নেই।

...আবার এ-ও দেখছে, এই বেসাতির আসরে অনায়াসে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও কেবল ওই লোকটারই দু'চোখের দৃষ্টি এখনো ভাবলেশসূন্য। উঠে দাঁড়ানোর পরেও অন্যদের জোড়া-জোড়া চোখ অপরের পণ্য লেহন করছে। কুন্দন সিং-এর যেন ওই জীবন্ত পণ্যের মালিক হবার পর এটুকুও বরদাস্ত করার ইচ্ছে নেই। রোগা লোকটার গলার স্বর শুধু ভারী নয়, রাশভারী। হীরা মল্লার দিকে চেয়ে হুকুম করল, ছৌড়ীকে অন্দরমে লে যা!

হীরা মল্লা শশব্যস্তে বাহু ধরতেই তিতলি উঠে দাঁড়ালো। আর কারো দিকে নয়, যাবার আগে একবার শুধু শাওনের দিকে তাকালো। শাওন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

কুন্দন সিং কি এটুকুও লক্ষ্য করেছে? শাওন ঘাড় ফেরাতেই তার চোখে চোখ।

সবার আগে ধীর পায়ে কুন্দন সিংই ঘর ছেড়ে বেরুলো। অন্য সকলে তার পিছনে পিছনে চলল। ঘরে কেবল শাওন, তোতারাম আর একটু দূরে ব্রিজমোহন দাঁড়িয়ে। তার ফর্সা মুখে আগুন লেগে আছে। নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শাওন দেখল, কুন্দন সিং তেমনি ধীর পায়ে গেটের দিকে চলেছে। তার পিছনে দুই সশস্ত্র বরকন্দাজ, তাদের পিছনে অন্য অভ্যাগতরা। গেটের সামনে একটাই সেকেলে মোটার গাড়ি। মালিককে দেখে একজন শশব্যস্তে দরজা খুলে দিল। মালিক উঠে মাঝে বসল। তার দু'দিক থেকে দুই সহচর উঠে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। আওয়াজ তুলে গাড়ি চোখের আড়ালে।

...গাড়িটা যখন এসে এই গেটের সামনে থেমেছিল তখনো নিশ্চয় শব্দ হয়েছিল। এখানে এই ঘরের সকলে তখন ওই রূপের জীবন্ত বেসাতিকে নিয়ে তন্ময়।...আর শাওন ভার্মা তখনো স্পষ্ট করে না বোঝায় বিস্ময়ে তলিয়ে যাচ্ছিল, তিতলির ওই গানের করুণ আর্তিতে বুকের তলায় মোচড় পড়ছিল। তাই ওই মোটর গাড়ি এসে থামার শব্দ তার বা কারো কানে আসেনি।

অন্যেরা যে-যার বগ্‌গি গাড়িতে উঠে রওনা দিল।

তোতারাম ফ্যাল ফ্যাল করে যে-দিকে চেয়ে আছে, ঘুরে দাঁড়াতে শাওনেরও সেই দিকেই চোখ গেল। মস্ত ঘরের একেবারে উল্টো দিকের দেয়ালের কাছে দু'হাত জোড় করে হীরা মল্লা

ঘন ঘন মাথা নাড়ছে আর অস্ফুট স্বরে বলছে কিছু।...ঠাকুর ব্রিজমোহন অপলক কঠিন চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

ওই লোকের গাড়িতেই আবার এতটা পথ ফিরতে হবে ভেবেও শাওনের ভিতরটা বিদ্রোহ করছে। পায়ে পায়ে তোতারামের পাশে দাঁড়ালো। তোতারামের নিষ্প্রাণ দু'চোখ হীরা মল্লার দিকে। মনিব না নড়লে সে নড়ে কি করে। কিন্তু পাশে এসে কে দাঁড়ালো খেয়াল করেছে। প্রায় ফিস ফিস করে টানা গলায় মন্তব্য করল, এই কুঠিয়া আর কুঠিয়ার দুই পাহারাদার ওই ঠাকুর সাহেবের...শেরের ঘরে এসে আর এক শের তার মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেল...আওরত সেয়ানী কত দেখো দোস্ত, ভয়ে সিঁটকে গেছে ভাব দেখাচ্ছে, কিন্তু খুব ভালো করেই জানে লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং এখন তার পিছনে—দুনিয়া ফুঁঃ!

পাথর-মূর্তি ব্রিজমোহন ঘুরে দাঁড়াতে সে ব্যস্ত মুখে দরজার দিকে চলল।

তিনজনে আবার সেই বগ্‌গি বাড়িতে। শাওন আর তোতারাম একদিকে, উল্টো দিকে ব্রিজমোহন। ফাঁকা রাস্তায় বগ্‌গি গাড়ি জোরে ছুটেছে। শাওন ঘড়ি দেখল। রাত ন'টাও নয় এখন।...গাড়ির ঝাঁকুনিতে ব্রিজমোহনের পাথরের মূর্তির মতো দেহটা উঠছে, নামছে।

নেশা উবে গেছে। খানিক বাদে বরফ-কাটা ছুরির মতো তার গলা শোনা গেল।—কুন্দন সিংকে নেওতা কওন্ দিহল?

তোতারাম নড়েচড়ে সোজা হল। ফিরে বোকা-বোকা গলায় প্রশ্ন করল,...হীরা নহী!

ব্রিজমোহন মাথা নাড়ল। অর্থাৎ না।—হীরা শিউজীকা কসম খা-কে কহলী ও নহী। তু পতা লে কওন...।

—জি সরকার...।

আবছা অন্ধকারে শাওনের দু'চোখ দিয়ে ব্রিজমোহনের মুখের ওপর ঘৃণা ঠিকরে বেরুচ্ছে।...ব্রিজমোহন প্রৌঢ়। সে তুলনায় প্রায় বৃদ্ধ একজন তার মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। তবু এ-লোকটার দিকে চেয়ে আর তার ক্ষোভ দেখে উৎকট রকমের আনন্দ হচ্ছে শাওনের।

তিতলিও এই লোকটাকে ঘৃণা করত। নিজের অদৃষ্ট সে জানত। সেই অদৃষ্ট হঠাৎ অন্যের হাতে চলে গেল বলে তারও কি আনন্দ হচ্ছে? থাক, তিতলির কথা শাওন আর ভাববে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে এবারে তোতারাম নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, মালিক, হামারা মনোয়ামে এক গম্ভীর চিন্তা আওত্ রহল...।

ব্রিজমোহন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে সে উঠে গিয়ে তার পাশে বসল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে দু'চারটে কথা মাত্র বলল।

শাওনের মনে হল তার উপস্থিতির কারণেই গম্ভীর আলোচনাটা আপাতত স্থগিত থাকল। গাড়ির ভিতরের আবছা আলোয় ব্রিজমোহনের বেড়ালের মতো দু'চোখ তার মুখের ওপর স্থির একটু। কেন এমন সমাদরে ওই আসরে তাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটা আর শাওনের কাছে একটুও অস্পষ্ট নয়।...যে মেয়ের সঙ্গে এক বছর ধরে এত ভাব-সাব, সেই মেয়ে শেষ পর্যন্ত

কার ভোগে যায় সেটা দেখাবার লোভ ওই বীর পুরুষের হতেই পারে। এমন বে-ইজ্জত হবার ফলে শাওনও এখন তার দু'চোখের বিষ বইকি।

রাত্রি।

...তিতলির কথা শাওন আর ভাববে না, চিন্তা করবে না। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই মেয়েই বার বার চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। নেই নেই, তিতলি নেই, তিতলি নামে একটা মেয়ে তার জীবনে মৃত। সম্পূর্ণ মৃত।

তবু সেই মৃত মেয়ে জীবন্ত হয়ে বার বার তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

শাওনের চোখে ঘুম নেই। বাইরে আজ সে-রকম খোলাখুলি বাতাসও নেই। বাতাস না থাকলে মশার উপদ্রব। পা থেকে নাকের নিচ পর্যন্ত একটা পাতলা চাদর টেনে আর একটা রুমাল কপাল থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে! ঘুম আসছে না, ঘুমনোর চেষ্টাও নেই। সভ্য দেশে এমন এক ইতর প্রবৃত্তির উৎসব কল্পনা করতে পারে না। ভিতরটা সব থেকে বেশি বিষিয়ে ছিল তিতলির ওপর। সে তার এই ভাগ্য জানত, জেনেও বিদ্রোহ করেনি। কেবল মুখে বলেছে তিতলি বেশিদিন বাঁচে না, প্রজাপতির পরমায়ু কম। সে এই মৃত্যুর কথা বলেছিল, দেয়ালির রাতে এই মেয়ে বলির কথা বলেছিল।...কিন্তু একই সঙ্গে কিছু একটা আশংকার ছায়াও শাওনের মনের ওপর দুলছে। সেটা বুদ্ধির গোচরে আনতে না পারায় অস্বস্তি। নিবিষ্ট মনে ভাবতে চেষ্টা করল, অস্বস্তিটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনতে চেষ্টা করল।...তিতলি দেয়ালির রাতে মেয়ে বলির কথা বলেছিল, আবার শাওনকে ঘাবড়ে যেতে দেখে সেই মুখেই আবার জোর দিয়ে বলেছিল, নিশ্চিন্ত থাকো, তিতলিকে বলি দিতে পারে এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই—হল?

...বলি তো এক-রকম হয়েই গেল, তাহলে এ-কথার অর্থ কি?

আবার কি মনে পড়তে সচকিত।...নদীর ধারে বসে তিতলি একদিন বলেছিল, পুনপু হল আমার গঙ্গা-মাই—আজ তিন বছর ধরে এই মা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আবার আজও নথ-ভঙানির আসরে এই গঙ্গা-মাইয়ের কাছেই তার করুণ সমর্পণ, তোহি হমার লাজ রাখিও, বার বার পডু তেরি পাইয়া, ও মাইয়া। মনের ওপর অজানা আশংকার ছায়াটা আরো ঘন কালো হয়ে উঠছে। নিশ্চল শুয়ে আছে, কিন্তু একটা অস্থিরতা তাকে ছেঁকে ধরছে।

৮

বাইরের দেয়াল-ঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হল। অর্থাৎ রাত এখন একটা।

শাওনের দু'কান উৎকর্ণ। বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ির শব্দ কানে এলো মনে হল। শোনার ভুল...এত রাতে এখানে আবার গাড়ি কোথা থেকে আসবে। ততক্ষণে শাওনের একটু তন্দ্রার মতো এসেছে। চোখ ভারি। একবার তাকিয়ে আবার চোখ বুজল। বাইরে দরজার আড়ালে একটা লণ্ঠন ডিম-করা, ঘর প্রায় অন্ধকার।

মেয়ে-গলার আচমকা আর্তনাদে মধ্যরাতের নীরবতা খান-খান। কিছু বোঝার আগে পরের মুহূর্তে কেউ তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল।—এ তু কা করলী পরদেশীবাবু—কা করলী। উঠ্ বাবু উঠ্, হম তোঁহার জহর পি লিব—তোকে বিছড় যা নেহী দিব!

বলতে বলতে প্রায় অন্ধকারে দুই বাহুতে তাকে আঁকড়ে ধরে নিজের অধরের জোরে শাওনের ঠোঁট-দাঁত ফাঁক করে যেন জিভ থেকে গলা থেকে পেট থেকে কিছু বার করে নেওয়ার চেষ্টায় মরীয়া হয়ে উঠল কোনো উন্মাদিনী।

শাওন দু'হাতে তাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেও পারছে না, সে প্রাণপণে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে, ঠোঁট দিয়ে মুখ দিয়ে জিভ দিয়ে দেহের অভ্যন্তর থেকে বিষ টেনে বার করে নিতে চেষ্টা করছে।

আলো বাড়িয়ে লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকল তোতারাম।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তিতলি আর্তনাদের সুরে বলে উঠল, তু উঠ্ যা পরদেশীবাবু—উঠ্! কসম খাকে কহতি তোঁহার তিত্লিকা ইজ্জতমে কভু না দাগ লাগব—কভু না—কভু না!

তারপরেই দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। লণ্ঠনের আলোয় ওই লোকের হতবাক মূর্তি। তিতলিকে বুকের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল। ঠিক দেখছে কিনা তিতলির এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। ঝুঁকে নাকটা প্রায় শাওনের মুখে ঠেকিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে শুঁকল। তার গালে চোখে দু'হাত বুলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, একটা সুস্থ মানুষকেই দেখছে কিনা।

শাওনও স্থান-কাল ভুলে চেয়ে আছে। তিতলির পরনে এখনো নথ-ভাঙানির উৎসবের পোশাক। একটু এলোমেলো হয়েছে কেবল। ভেবে পাচ্ছে না যা দেখছে ঠিক কি না। বিমূঢ়ের মতো জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার এত রাতে তোমরা এখানে?

তিতলি সরে বসতেও ভুলেছে। তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

—তুমি জহর খাওনি?

শাওনের স্নায়ুতে এখনো কিছু ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসছে না।

—জ-হ-র...বিষ...আমি বিষ খেয়েছি!

লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে খুব গম্ভীর টানা সুরে এবারে তোতারাম জানান দিল, নথ-ভাঙানির আসর থেকে ফেরার সময় তোমার মুখ দেখে মনে হল তুমি নিশ্চয় জহর খাবে, তোমাকে ক্যাম্পে ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর ব্রিজমোহনকে এ-কথা বলতে রইঁয়া গম্ভীর চিন্তিত মে কহলী, তোতা, তু তুরন্ত যাইকে তিতলিকে লে আয়ে, দেখ্, পোয়ারকা এইসন পরিণাম না দেখল্—হায় রাম, হায় রাম! মালিকের কথা শুনে তার বগ্গি গাড়ি নিয়ে আমি ছুটে চলে গেলাম। তুমি জহর খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছ শুনে তিতলি পাগলের মতো ছুটে চলে এলো, আসার সময় আমাকে বার বার বলল, ডাগদার শ্রীবাস্তবকে তার কুঁঠিয়া থেকে তুলে নিতে, আমি বললাম পরদেশীবাবু এতক্ষণে মূর্দা হয়ে গেছে কিনা গিয়ে দেখি, তাবপর যা-হয় করব। ঢুলু-ঢুলু দু'চোখ টান করে তোতারাম বড় নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু তাজ্জব কা বাত্, এসে দেখছি এখন পর্যন্ত তুমি জহর খাওনি...।

রাত একটার সময় এমন নাটকের জন্য কে প্রস্তুত থাকতে পারে? শাওন হাঁ করে তোতারামের দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু পরের মুহূর্তের নাটক আরো ভয়াবহ। তিতলি শয্যা থেকে আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে দাঁড়িয়েছে। তোতারামের দিকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। রক্তবর্ণ মুখ, হিংস্র চাউনি। পরক্ষণে বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল।—শয়তান—বদমাস! তোঁহার জিহ্বা হম্ টানত করকে ছিঁড় দেইবু, কট্‌রাসে তোঁহার আঁখ নিকাল লে আইবু!

তোতারাম ওকে এগিয়ে আসতে দেখেই সাবধান হয়েছে। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রাণের দায়ে বাধা দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পেরে উঠছে না, মুখে কয়েকটা আঁচড় চাপড় পড়েইছে, কিন্তু তিতলি সত্যিই দু'হাতের দশ আঙুল দিয়ে ওর চোখের নাগাল পেতে চেষ্টা করছে। তোতারাম বাধা দিচ্ছে আর চিৎকার করছে, এ বাবুজী, বচাও—বচাও!

পিছন থেকে শাওন তিতলিকে এক-রকম জাপটে ধরেই টেনে নিয়ে এলো। তা-ও কি সহজে পারে, হাত ছাড়িয়ে আবার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আক্রোশ। জোর করে ওকে খাটে বসিয়ে দিয়ে চাপা ধমকের সুরে বলল, আঃ, বোসো চুপ করে! রতন জেগে উঠলে বা শোরগোল শুনে ও-দিকের ক্যাম্প থেকে লোকজন ছুটে এলে ভালো হবে?

তিতলির তেমনি রক্তবর্ণ মুখ, হিসহিস করে বলে উঠল, বাবুসাহেব, আমার জন্য আমি ভাবি না, কিন্তু ওই শয়তান ব্রিজমোহনের সঙ্গে ষড় করে তোমার কি সর্বনাশ করেছে তুমি জানো না!

ছাড়া পেয়ে তোতারাম মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে হাঁপাচ্ছে। টানা করুণ সুরে বলল, দোস্ত্, তুমি সব শুনে বিচার করো—আমি দোষ করেছি মনে হলে সামনের সাইটে অনেক গাড্ডা আছে, আমাকে একেবারে জিন্দা পুঁতে রেখে এসো। ব্রিজমোহন আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে বটে, কিন্তু আমি যে বিপদের ভয়ে তিতলিকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছি, ব্রিজমোহন তার কিছুই জানে না—

খানিকটা ফারাকে শাওনও শয্যায় বসল। উত্তেজনায় সে-ও শ্রান্ত। ভ্রূকুটি করে বলল, কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো!

তোতারামের আবার ঢুলু ঢুলু চোখ, টানা-টানা কথা।—হীরার ওখান থেকে ফিন্ আমরা যখন বগ্‌গি গাড়িতে উঠি, তুমি হাত-ঘড়ি দেখেছিলে দোস্ত...তখন রাত ন'টাও নয়—ঠিক?

প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝেও শাওন মাথা নেড়ে সায় দিল।

—ফিন যখন বগ্‌গি গাড়ি নিয়ে ওই আমি কুঁঠিয়ামে গেছি তখন রাত আন্দাজ সাড়ে বারো। আর এখনো দেখো, তিতলি সেই নথ-ভাঙানির সাজ পরে বসে আছে—ও ছৌড়ীকে পুঁছো কাঁহে?

তিতলি ঝলসে উঠল, হমারি খুশি!

—আচ্ছা দোস্ত, ধীরসে শুনো। তেতারামের কথাগুলো আরো মোলায়েম, আরো টানা-টানা।—ওতনা রাঁতোমে আমি ফিন্ গিয়ে দেখলাম, কুঠিয়াকা দো পাহারাদার নশাকা নিঁদমে বেহুঁশ, অন্দরে গিয়ে দেখলাম, শরাব খেয়ে হীরা মল্লা ওই আসরের ঘরেই মেঝেতে পড়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে, আর ও কবুতরীকে পুঁছো—নথ-ভাঙানির খুঁশিয়া রাতে সে-ই তার

ফুফুকে পিয়ার করে শরাব খাইয়েছিল কিনা, আর পাহারাওলা দুটোকেও তার ভাগ দিয়েছিল কিনা—আওর ভি পুঁছো বাবু, ভিখুয়া-কা মায়ের থেকে নিদ্‌কা দাওয়াই এনে শরাবের সঙ্গে মিশিয়ে তাই ফুফুকে আর সিপাই দুটোকে খাইয়েছিল কিনা?

তিতলি ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো।—হম্ চল্‌লী।

তোতারাম হাসল।—শোচ্ বাবু, অব ও ছৌড়ী চার মিল রাস্তা পার হোনেকে লিয়ে খাড়া হইল।

হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে শাওন বলল, পাগলামো কোরো না! তোতারামের দিকে ফিরল, কি ব্যাপার, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!

—কুছ্ না বুঝল? আচ্ছা আগে হমার বাত্ শুনো।...হীরা মল্লা বেহুঁশ, দুই পাহারাদারভি বেহুঁশ, কিন্তু তিতলি তখন কুঠিয়ার কোত্থাও নেই। তিন মিনিট বগ্‌গি গাড়ি ছোটাইকে ওকে রাস্তায় ধরলাম। পুনপুর রাস্তায়...। ওকে বললাম, পরদেশীবাবু ঘরে ফিরেই জহর খেয়েছে—এতক্ষণে বোধহয় অন্তিম দশা হইলী—আব্ ছৌড়ীকো পুঁছো দোস্ত, তিনজনকে শরাব খাইয়ে বেহুঁশ করে এত রাতে পুনপুর দিকে ও কেন যাচ্ছিল...

শাওন বিভ্রান্তের মতো তাকেই জিগ্যেস করল, কেন যাচ্ছিলে?

—গঙ্গা মাঁইয়াকি আঁচরোঁয়ামে (আঁচলে) শুতল খাতিরা। অনেক দিন ওর মুখে শুনেছি, তিতলির পরমায়ু বেশি না, অনেকদিন শুনেছি ওই পুনপু ওর মা, আজ আসরের গানেও পুনপু মা-কে বলছিল, তোহি হমার লাজ রাখিও।...কহ দোস্ত, তোমার আত্মহত্যার কথা বলে তিতলিকে খুদখুশি থেকে বাঁচিয়ে আমি কি খুব বুরা কাম করেছি?

দু'চোখ টান করে শাওন তিতলির দিকে তাকালো।...ওরা আসার আগের মুহূর্তের সেই আশংকার কালো ছায়াটা আর দুর্বোধ্য নয়, একটুও অস্পষ্ট নয়। তার আতঙ্কগ্রস্ত দুই চোখ যেন কিছু একটু দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল। উঠে তাড়াতাড়ি তিতলির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, তিতলি—তিতলি—এ তুমি কি করতে যাচ্ছিলে—কেন কেন তুমি আমাকে কিছু বলোনি—আমি ভাবতাম—আমি যা-হোক কিছু ব্যবস্থা করতাম—

তোতারামের এখনকার মুখ দেখলে মনে হবে, সন্ধ্যার নেশার পরে আবার সে ভাং চড়িয়ে এসেছে। ঝিমুনো গলায় বলল, এক্ষুনি ভাবো, এক্ষুনি ব্যবস্থা করো—সকালের কউয়া ডাকার পরে তোমার আর কিছু করার থাকবে না—

শাওনের হাত ছাড়িয়ে তিতলি উঠে দাঁড়ালো, তোতারামের মুখের ওপর এক-ঝলক আগুন ছিটিয়ে বলে উঠল, গঙ্গা-মাইকা কসম বাবুজী, তুমি এর মধ্যে থেকো না, কুন্দন সিং কি ভীষণ লোক তুমি জানো না, আমাকে এখন যেতে দাও—

শাওন বলল, কালকের মধ্যে আমি ভেবেচিন্তে যা হয় করব, দরকার হলে আমি ছ'হাজার টাকা নিয়ে কুন্দন সিং-এর সঙ্গেই দেখা করব, তুমি আর দেরি না করে তোমার ফুফুর কাছেই ফিরে যাও—

তোতারাম টেনে টেনে হেসে উঠল। হাসিটা কুৎসিত মনে হল শাওনের। কিন্তু পরের কথাগুলো কানের পর্দা ছিঁড়ে মগজে ঘা পড়ার মতো।—নথ-ভাঙানির আসরে কুন্দন সিংয়ের

কেনা ছৌড়ী নিঝুম রাতে তোমার এখানে আসার পর তার ফেরার মতো সিরিফ তিন জায়গা আছে দোস্ত—এক, গিধরকা হাবেলী, কোটেকো নিশানা (ব্রিজমোহনের ঘর বা বেশ্যাবাড়ির পথে)—নাইতো পুনপুকি আঁচরোঁয়া—তিতলি কোন্ দিকে যাবে জিগ্যেস করো—

তিতলির আবারো ওই তোতারামের ওপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে। শাওন শক্ত করে তার হাত ধরে ফেলেছে। তোতারামের কথা কেন যেন আর অবিশ্বাস হচ্ছে না। জিগ্যেস করল, তিতলি যদি এই রাতের মতো তার ফুপুর কাছে ফিরে যায়, কুন্দন সিং জানছে কি করে?

তোতারামের নির্লিপ্ত জবাব, শিকার ছুটে গেল বলে ঠাকুর ব্রিজমোহন রাগে আর অপমানে তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—লেকিন ও তোহার দোস্ত না আছে—আওর হামভি ও-মালিককা চেলা ঠেরে—

অর্থাৎ তিতলি এই রাতে আবার তার ফুফুর কাছে ফিরে গেলে তোতারাম আর ব্রিজমোহনের কাছ থেকেই কুন্দন সিং সব জানতে পারবে।

আবার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে তিতলি হিসহিস করে বলে উঠল, বাবুজী, আমাকে ছেড়ে দাও—আমি ওকে খুন করে গঙ্গা-মাইয়ার আঁচরোঁয়ামে শুতল যাই—

দুহাতে ওর দু'হাত ধরে রেখে শাওন বেশ জোরেই একটা ঝাঁকুনি দিল।—তিতলি, এই তোমার হাত ধরে আমি কসম খেয়ে বলছি, তুমি আত্মহত্যা করলে পরদিনই তোমার আত্মা দেখবে আমিও আত্মহত্যা করেছি—আমার কথার নড়চড় হবে না, বুঝতে পারছ?

আরক্ত ক্রুদ্ধ মুখে মুহূর্তে ত্রাসের ছায়া নেমে এলো।—না, বাবুজী, না না— ।

—সাবাস! মোড়ার ওপরে বসা তোতারাম দুলে দুলে তারিফ করল। ঝিমুনি চোখ শাওনের মুখের ওপর টান করে বলল, এখন এই ইজ্জতের সওয়াল করার মতো হিম্মত থাকে তো ঠাণ্ডা হয়ে বসে তোতাবুলি শোনো—আপাতত কাউকেই তোমাদের খুদখুশি করতে হবে না—সব ব্যবস্থা পাক্কি করে তিতলিকে এখানে তোমার আত্মহত্যার নাম করে ধরে আনতে আমার চার ঘণ্টি সময় লেগেছে—

ওর মুখে এই কথা শুনে শাওন শুধু নয়, তিতলি পর্যন্ত থমকে তাকিয়েছে।

ঢিমে-তালে তার মতলবের সার কথা, পেয়ারের ইজ্জত রাখতে এই রাতের মধ্যে ওদের বিয়ে করতে হবে। বিয়ে দেবে টিকাটি পণ্ডিত—সেই ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। তার বাড়িতেই কিষণজীর মন্দিরে বিয়ে হবে। কিষণজী ছুত অছুত মানে না, তাই সেও মানে না। অছুত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে একমাত্র টিকাটি পণ্ডিত ছাড়া গাঁয়ে আর কে দেবে। দশ ছেলেমেয়ের বাপ ভোজনলোভী টিকাটি পণ্ডিত অছুতদের কাজ করে তাদের ছোঁয়া খায় বলে এখানকার উঁচু সমাজে সে-ও অছুত। কিন্তু খবরদার, সে যেন জানতে না পারে কুন্দন সিংয়ের কেনা মেয়ের সঙ্গে এই বিয়ে হচ্ছে। সে কেবল জেনেছে, ঠাকুর ব্রিজমোহনের ইচ্ছেয় এই বিয়ে, তাই খুশি হয়ে রাজি হয়েছে। বিয়ে যে হয়েছে তার সাক্ষীও দরকার, দেয়ালির রাতে সে-রকম সাক্ষীও সহজে জুটেছে।...বিয়ের পরেই তিতলিকে নিয়ে শাওন যে কুঠিয়াতে চলে যাবে সেটা মাসাউরি গাঁও, এখান থেকে ছ'সাত মাইল দূরে। তাই বগ্গি গাড়িতে হবে না, দোস্তকে চুপচাপ তার জিপ

গাড়ি বার করতে হবে, তাহলে বিয়ের পরে তিতলিকে মাসাউরির কুঠিয়াতে রেখে দোস্ত সকাল হবার আগেই ক্যাম্পে ফির আসতে পারবে, তারপর দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে সে মাসাউরিতে গিয়ে গা-ঢাকা দেবে। সেখানেই ওদের সোহাগ-রাত হবে—।

তিতলি বলে উঠল, না না, ওর কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না বাবুজী, মাসাউরি কুন্দন সিংয়ের লোহার গাঁও থেকে মাত্র পাঁচ-ছ'মাইল দূরে, কুন্দন সিং ওই গাঁয়েরও মাতব্বর—ওরা সক্কলে মিলে তোমাকে ভীষণ বিপদে ফেলবে!

—বুদ্ধিসে চিন্তা করত তিতলি।...লোহার গাঁওয়ে কুঠিয়া মিললে আরো ভালো হত, কুন্দন সিং ভাবতেও পারবে না তুই মাসাউরিতে আছিস—এ-সব বাতাবাতিতে আর দেরি করলে সব...

—বাবুজী, তোমার পায়ে পড়ি আমার জন্য তুমি এ ঝুঁকি নিও না, আমি ওদের কাউকে বিশ্বাস করি না।

মোড়া থেকে তোতারাম শিথিল দেহটা টেনে তুলল, তব্ হম্ চলথ—

—দাঁড়াও! শাওনের মাথায় একটাই সংকল্প এঁটে বসেছে। তিতলিকে বলল, শোনো, আব তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না, মরতে হলে দু'জনে একসঙ্গে মরব। তোতারামের দিকে ফিরল, তিতলিকে মাসাউরিতে রেখে ফিরে এলে তখন কোনরকম গণ্ডগোল হবে না তার বিশ্বাস কি?

—তোমরা সেখানকার কুঠিয়াতে গেলেই দেখবে দু'জন পাহারাদার বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে—তাছাড়া তুমি কয়েক ঘণ্টার জন্যে চলে এলে বিয়ের সাক্ষীদের একজন তিতলির সঙ্গে থাকবে—তার জান থাকতে তিতলির কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

শিকার হাত-ছাড়া হবার ফলে রাগ আর গোঁ-এর বশে ব্রিজমোহন পাহারাদারের ব্যবস্থা করতেও পারে—কিন্তু শাওনের অনুপস্থিতিতে তিতলিকে এমন কে আগলাবে যে জানের পরোয়া করে না! শাওন জিগ্যেস করল, সেই সাক্ষী কে...কোনো আওরত?

তোতারাম খুব বিরক্ত।—না তো কি, কোনো মরদকে আমি ওকে আগলাবার জন্য রেখে যাব! শোনো তাহলে, সেই সাক্ষী চুনীলাল মাস্টারজীকা লেড়কি দুলারী—সাদীর সময় তোমরা ওকে না দেখতে পেলে আমার মুখে জুত্তি মেরে চলে এসো।

শাওন যত না, তার চার গুণ ভ ব তিতলি। দুলারী বহ্ন ওকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু তা বলে সে এতটা ঝুঁকি নেবে! কোথা থেকে একটু ক্ষীণ আশাও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিল।...শুনেছিল, নিষ্ঠুর কুন্দন সিংয়ের মতো লে কও দুলারীকে স্নেহ করে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল—যদিও সবাই বলে চুনীলাল মাস্টারের ওপর রাগ করেই এক পাগল ছেলের সঙ্গে বিয়েটা দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু দুলারী বহন নিজেই তা স্বীকার করে না—বলে, তার ভাগ্যেই পাগল স্বামী জুটেছে—আর সেই স্বামী না থাকলেও মাঝে মাঝে সে তার ভিটে আর ক্ষেতি দেখাশুনা করতে যায়।

না, এখন পর্যন্ত তোতারাম মিথ্যে বলেনি।...তি তলিকে নিয়ে বেরিয়ে এসে বগ্‌গি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে তোতারাম দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। একটু বাদে শাওন নিজেই ড্রাইভ করে

এসে তাদের জিপে তুলে নিল। তার পাশে তোতারাম, তিতলি পিছনে। সাত আট মিনিটের মধ্যে তোতারামের নির্দেশে জিপ যেখানে দাঁড়ালো সেটাই চুনীলাল মাস্টারের বাড়ি। হর্ন বাজাতে হল না, জীপ থামার আওয়াজ পেয়েই একটা টিনের বাক্স হাতে দুলারী বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগালো, তারপর তোতারামের ইশারায় সে জিপের পিছনে উঠে বসল। এবারে কোন পথে যেতে হবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তোতারাম জানালো, তোমার নসিব ভালো, দেয়ালির ছুটিতে দুলারীর বাপ পাটনায় গেছে, সে ফিরে এসে জানবে খামখেয়ালী মেয়ে লোহার গাঁওয়ে তার মরদের বাড়ি গেছে—দুলারী ওই রকমই চিঠি লিখে রেখে এসেছে।

আবছা অন্ধকারে শাওন খুব ভালো করে ঠাওর করতে পারেনি। তার মনে হয়েছে একটু খাটোর উপর মোটাসোটা মিষ্টি চেহারার একটি রমণী। এর আর তোতারামের বিয়ে নাকচের গল্প শাওন তিতলির মুখে শুনেছিল।...শুনেছিল, তোতারাম এখনো ওই মহিলাকে তার পেয়ারের আওরত ভাবে, আর দুলারী রেগে গেলে তাকে দুর-দুর করে তাড়ায় আবার দরকার পড়লে ডেকে নোকরের মতো খাটায়। শাওন মুখ বুঁজে জিপ চালাচ্ছে, আর মনে মনে অবাক হচ্ছে, এই লোকের অনুরোধে ওই রমণী এ-ভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে!

আরো মিনিট পাঁচ-সাত বাদে তোতারামের কথায় জিপ থামিয়ে শাওন অবাক। গজ পনেরো দূরে সীতা-লছমী, অর্থাৎ জনার্দন পূজারীর ডেরা! কিছু জিগ্যেস করার ফুরসত না দিয়ে তোতারাম নেমে সেই দিকে চলল। তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। মিনিট তিন-চারের মধ্যে আবার বেরিয়ে এলো। তার হাতে মস্ত বড় একটা ঝুড়ির মতো কি। আর পিছনে আসছে দুটি মেয়ে—একজন সীতা, অন্যজন লছমী। পিছনে ঝুড়ি রেখে আর ওই দু'জনকে তুলে দিয়ে তোতারাম জিপে উঠে আবার পাশে বসল।—এবার এই রাস্তায় চলো...টিকাটি পণ্ডিতের বাড়ি। তোমার বিয়ের তিন সাক্ষী রেডি, বিয়ের পরে পুরী জিলাবী লাড্ডু রেডি—কিন্তু টিকাটি পণ্ডিত শুধু ওতে খুশি হবে না—তোমার পকেটে টাকা আছে তো?

নগদ হাজার দেড়েক টাকা ঘরে ছিল, শাওন সবই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। মাথা নাড়ল, আছে। তারপর জিগ্যেস করল, এদের নিয়ে এলে, জনার্দন পূজারী বাড়ি নেই?

—দেয়ালির রাতে ভাঙ চড়িয়ে নিদ্‌-এর বিরিজ দিয়ে সে এখন বেহস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তুমি সীতা আর লছমীর সঙ্গে কথা বলে আগেই সব ঠিক করে গেছলে? তোমার কথা শুনে ওরাও এই বিয়েতে সাক্ষী থাকতে রাজি হল?

—জরুর! তোতার সব কাজ পাক্কি কাজ...। তার পরেই আফসোসের সুরে বলল, কেবল নিজের বেয়ার আগে একটা কাচ্চি কাজ করে ফেলে ও শ্বশুরাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে সব বরবাদ করে দিয়েছিলাম। নসিব খারাপ হলে যা হয় আর কি!

হাসির কথা। কিন্তু জিপ চালাতে চালাতে শাওন অন্য কিছু ভাবছে। ...সীতা আর লছমী তিতলিকে খুব ভালবাসে। তার বিপদের কথা শুনলে সীতার মতো সাহসী মেয়ে এই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেও পারে। তাছাড়া শাওনের প্রতিও ওদের দু'বোনের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এক বাপ ছাড়া ওদের সকলেরই ধারণা, পাটনার বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে লছমীকে সময়ে অপারেশন করিয়ে শাওনই তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। কিন্তু শাওনের দুর্বোধ্য লাগছে এই একটা

লোককে। তোতারামকে।... জানে, এই লোকটা ব্রিজমোহনের চেলা, মোসায়েব, তার নেক-নজরের ওপর তার জীবিকা আর জীবন নির্ভর, আজও যা করছে, ওই মালিকের মর্জি বুঝেই করছে। তবু বার বার মনে হচ্ছে, এই একটা লোককে তার এখনো ঠিক-ঠিক চেনা বা বোঝা হয়নি।

টিকিধারী টিকাটি পণ্ডিতের চেহারাখানা দর্শনীয় বটে। বেঁটে, পেল্লায় মোটা, মিশকালো গায়ের রং। রাত তখন আড়াইটে। তার আড়াই গণ্ডা ছেলে মেয়ে ঘুমোচ্ছে। কেবল গৃহিণী জেগে। ব্যবস্থা সব রেডিই ছিল। তার সেই ব্যবস্থা দেখে বোঝা যায়, দায়-ঠেকা বিয়ে দিয়ে সে বেশ অভ্যস্ত। ছেলের পরার পট্টবস্ত্র পর্যন্ত তার হেপাজতে থাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বর-কনেকে বিয়ের আসনে বসিয়ে দিল। বিয়ে শুরু হবার একটু বাদেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সকলেই চমকে উঠল। দুলারীর হাতে কাঠের টুকরোয় বাঁধা একটা ম্যাগনেশিয়াম তার জ্বলে উঠল। তারপর বিয়ের আসর দিনের মতো সাদা। সেই আলোয় তোতা একটা বক্স ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। বর কনের উদ্দেশে বলল, ইস্‌মাইল পিলিজ।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ফোটো তোলা শেষ।—থ্যাংকু।

টিকাটি পণ্ডিতের ফরমূলা অনুযায়ী এক ঘণ্টার মধ্যে বিয়েশেষ। কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানও বাদ গেল না। তাকে খুশি করে সকলকে তাড়াহুড়োর মধ্যে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে তোতারাম সকলকে নিয়ে আবার জিপে উঠল। তিতলিকে এবারে সামনে শাওনের পাশে বসানো হল। শাওনের পরনে আবার প্যান্ট শার্ট, কিন্তু দু'জনের কোমরেই লাল রেশমী চাদরের গাঁটছড়া বাঁধা। রাত সাড়ে তিনটের সময় কে আর দেখছে। তাছাড়া তিতলির মুখ ঘোমটায় ঢাকা। মাঝের ক্যাম্বিসের পর্দাটা এখন তোলা। নিশুতি রাতে জিপ মাসাউরির পথে ছুটেছে। একটা বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু এমন বিয়ে যে উত্তেজনায় কারো মুখে কথা নেই।

মিনিট দশেক বাদে পিছনে হঠাৎ একটু হাসিব শব্দ শুনে শাওন একবার ঘুরে তাকালো। লছমী বলল, তোতাচাচা ঘুমিয়ে পড়েছিল, দুলারী বহিনী বলল, তাকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যেতে—

শাওন আবার সামনের দিকে মুখ ফেবালেও তোতারামের ঘুম-জড়ানো টানা-টানা জবাব কানে এলো।—বেয়ার আগেই আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে—আর কতবার ধাক্কা মারবে।

সকলের সঙ্গে তিতলিও হেসে উঠলে শাওন খুশি হত। কিন্তু ও কাঠ হয়ে বসে আছে। আসলে সকলেরই টান-ধরা স্নায়ু শিথিল করাব চেষ্টা।

আধ-ঘণ্টার আগেই পৌঁছে গেল। রাত তখন চারটে। ফটকের ও-ধারে সত্যি দু'জন পারাহাদার মাচিয়ায় বসেই ঘুমোচ্ছে। জিপের হর্ন কানে যেতে তারা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। একজন ফটক খুলে দিল। তারপর তারা হ্যাজাক দুটো জ্বেলে দিতে দেখা গেল, বাংলোর মতো সুন্দর পাকা দালান। এক-তলা। বড় বড় তিনটে ঘব। চারদিকে জমি, বাগান, গাছ-গাছড়া। একবার দেখে নিয়ে শাওন ভাবল, ব্রিজমোহন তার মিত্র আদৌ নয়, কিন্তু প্রতিশোধের আগুন মাথায় জ্বলছে বলেই আজ সে ওর আর তিতলির জন্য এ-রকম ব্যবস্থা করেছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ফেরার তাড়া। দুলারী থাকবে। বাকী সকলকে নিয়ে ভোরের আগেই শাওনকে ছুপায় ফিরতে হবে। সীতা আর লছমীকে সকলের অগোচরে তাদের ঘরে ছেড়ে দিয়ে তারপর নিজের ভাবনা।...দিন কতকের ছুটি নিতেই হবে। এটুকু সময়ের মধ্যে ছুপা থেকে পাটনায় গিয়ে মুরুব্বি প্রকাশ দীক্ষিতকে সব বলে আসা সম্ভব নয়। আপাতত যত নিরাপদই মনে হোক, তিতলির জন্য মনে দুশ্চিন্তা আছেই।... একটা চিঠি লিখে কাউকে পাটনায় প্রকাশ দীক্ষিতের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে ছুটির দরখাস্তও। বেলা দশটা এগারোটার মধ্যেই আবার এখানে ফিরে আসতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু তিতলির জন্যেই আরো পনেরো মিনিটের মতো দেরি হয়ে গেল। সীতা বলল, পরদেশীবাবু, তিতলি তোমাকে কিছুতে যেতে দেবে না বলছে, তার ভয় ব্রিজমোহন সকালের মধ্যেই ঠাকুর কুন্দন সিংয়ের কাছে খবর পৌঁছে দেবে, হয়তো এই রাতেই সে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে...তা যদি হয়, তাহলে পরদেশীবাবুর বিপদ কেউ রুখতে পারবে না...তাকে সে এখন কিছুতে যেতে দেবে না।

তোতারাম কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাধা দিল দুলারী। এই মেয়ে-লোকটির কলজের জোর আর বিবেচনা দেখল শাওন ভার্মা। দেশোয়ালি ভাষায় ধমকের সুরে সে বলে উঠল, আমাদের ওপর তোর ভরসা নেই—শিউজীর ওপর তোর বিশ্বাস নেই? ঠাকুর কুন্দন সিং বুদ্ধু, না ব্রিজমোহনের মতো চুহা? দিন কয়েকের মধ্যে সবাই সব কিছু জানবে। আমরা এতজন তোর বেয়ার সাক্ষী—তোর মরদের কিছু ক্ষতি হয়ে গেলে আমরা চুপ করে বসে থাকব কিনা সেটা সে জানে না? ঠাকুর কুন্দন সিং-এর হিংসা পশুরাজ সিংহের হিংসার মতো—ব্রিজমোহনর মতো গিধরের (শেয়ালের) হিংসা নয়—বুঝলি? ঠাকুর কুন্দন সিং-কে আমি অনেকদিন ধরে জানি। সে বোকার মতো এক্ষুনি কিছু করবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। সীতার দিকে তাকালো, পথে যেতে যেতে তুই বরং ওই বকরীকে (তোতারামকে দেখিয়ে) সাবধান করে দিস, সে যেন ব্রিজমোহনের মেজাজের খবর রাখে।

এরপর আর কোনো কথা উঠল না। দুলারী আর তিতলিকে রেখে সকলকে নিয়ে শাওন চলে গেল। এরই মধ্যে তিতলিকে আড়ালে ডেকে বলে গেল, আমরা দু'জনে তো একসঙ্গে মরতে প্রস্তুত, তুমি মনে কোনো ভয় রেখো না।

তিতলি বেপরোয়া মেয়ে। তার চোখে শাওন কখনো জল দেখেনি। এখনো জল না দেখুক দু'চোখ ছল ছল, আর বাধা দিল না, বলল, শিউজীর কিরপা থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে—তুমি যাও, যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো।

ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় বারোটা। ওপরঅলাকে চিঠি লেখা আর সহকারীকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার ফাঁকে বেলা গড়িয়ে গেছে। একলা ফেরেনি, তোতারামও সঙ্গে এসেছে। ঘরে পা দিয়েই সে তিতলিকে একটা খোশখবর শোনালো। গত রাতে নথ-ভাঙানির আসরের পরে লোহার গাঁওয়ে ফেরার পথেই ঠাকুর কুন্দন সিংয়ের তবিয়ত খারাপ হয়েছে। সেই হার্টের বেমারি। বেশি নয় অবশ্য, তবু লোহার গাঁওয়ের ডাগদার রহুয়াকে বিস্তারায় শুইয়ে দিয়েছে, আর বড় ডাগদারের খোঁজে পাটনায়ও লোক গেছে। এখানে আসার খানিক আগে লোহার

গাঁওয়ের দু'জন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হতে তারা এই খবর দিয়েছে।

তিতলির পরনে এখন আটপৌরে বেশবাস। বাড়তি কিছু শাড়ি জামা হয়তো টিনের তোরঙ্গে দুলারীই নিয়ে এসেছিল। এই বেশেও ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। ছোট ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তিতলি লক্ষ্য করল শাওনেরও একটু নিশ্চিন্ত মুখ। কিন্তু সকলেই সচকিত দুলারীর ধমকের গলা শুনে। তোতারামকে বলে উঠল, এ বিছুয়া (বিচ্ছু), এ বাত্ তু ঠিক কহল না ধাঁকা দিহল?

তোতারামের একটু ঘাবড়ে যাওয়া মুখ।—বাত্ তো ঠিক, লেকিন রহয়া লোগঁনকা বেমারি প্রচারোঁমে কভু কমতি না রহে—সচমুচ হালত হম্ কা জানে,...

দুলারী আবার একটু তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থেকে গম্ভীর মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেল। হালছাড়া মুখে তোতারামও সে-দিকে চলল। একটানে ঘোমটা খসিয়ে তিতলি জিগ্যেস করল, ও সত্যি কথা বলছে?

শাওন জবাব দিল, মনে তো হয় সত্যি, মিথ্যে বলে ওর কি লাভ। তিতলিকে দেখছে। কাল নথ-ভাঙানির আসরের শুরু থেকে ওর ওপর দিয়ে ধকল যাচ্ছে। তার ঢের আগে থেকে মানসিক ধকল তো ছিলই। গত রাতেও যে মেয়ে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত, নিঃশব্দে তার স্নায়ুর ওপর দিয়ে কি ঝড় গেছে শাওন আঁচ করতে পারে। শুকনো মুখখানা শ্রান্ত করুণ অথচ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। হেসে হাল্কা সুরে বলল, তোমাকে কালকের আসরে কিনে ফেলার পর বুড়োর দিল্‌এ বোধহয় একটু বেশি রসের দোলা লেগেছিল, সেটা আর সামলে উঠতে পারেনি...তুমি আমাকে পাষণ্ড ভাবতে পারো, কিন্তু আমাদের বরাত ভালো হলে এমন লোভের পাপে ব্যাটা এবার শ্মশানযাত্রাও করতে পারে।

তিতলি তার দিকেই চেয়ে আছে। একটু বিমনা। মাথা নাড়ল।—কিষণজী কাকে রাখবে কাকে নেবে সেটা তার বিচার...কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা হলেও ওই ব্রিজমোহন তোমার এক নম্বর দুশমন হয়ে উঠবে—ওই কুন্দন সিংয়ের ভয়ে তার অত্যাচার কিছু বন্ধ হয়েছিল...এরপর সকলের সে হাতে মাথা কাটবে।

ওর ভয় কাটাবার জন্যেই শাওন গোঁ-ভরে জোর দিয়ে বলল, তোমার কিষণজী চাইলে ওই বড় কাঁটা যদি সরে তো তার দয়ায় ছোট কাঁটাও সরবে। আমরা দু'জনেই মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত যখন, তুমি মনে আর কোন রকম ভয় রেখো না—তোমার কিষণজী কি করে দেখই না—

আয়ত দু'চোখ তার মুখের ওপর অপলক খানিক।—আমি নিজের জন্য কখনো ভয় করিনি...এখন আমার ভয় কেবল তোমার জন্য...।

শাওন চুপচাপ চেয়ে রইলো একটু। তারপরেই কিছু মনে হতে নিশ্চিন্ত মুখ।—দাঁড়াও, আমার কথা যদি শোনো তাহলে আমার জ্যন্যও তোমার মনে আর কোনো ভয় থাকবে না—

তিতলি উৎসুক।—কি?

—রোসো বলছি, কেউ যেন না জানতে পারে—। ব্যস্ত মুখে এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা ভালো করে টেনে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে পালঙ্কে ওর পাশ ঘেঁষে বসল।—চলো, এই চিন্তা ভাবনা ছেড়ে এক্ষুনি আমরা পালাই—

তিতলি আরো অবাক।—কোথায়...কি করে?

—এখানেই আর এই করে।

পলকের অবকাশ না দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের ওপর টেনে নিল। চুমুতে চুমুতে আদরে সোহাগে একেবারে অস্থির করে তুলল। তিতলির হাঁসফাঁস দশা, ছাড়াতে চেষ্টা করতে গিয়ে বুকের ওপর মানুষটার আরো বাড়তি ভারে শুয়ে পড়তে হল। ফলে হামলার সুবিধে আরো বাড়ল। তারপরেই মুখ তুলে শাওন গম্ভীর ধমকের সুরে বলল, তাহলে হবে না, তোমার কিষণজী হঠাৎ মনের ভিতরে বলল, আমার থেকেও অনেক বেশি জোরে তুমি যদি আমাকে তোমার বুকে আঁকড়ে ধরে থাকো—তাহলে কেউ আর আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

কথাগুলোতে এমন জাদু আছে শাওনও কি ভাবতে পেরেছে। তার দখলের ওই মেয়ের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল একবার অনুভব করেছে। তারপর দুই বাহুতে প্রাণপণে তাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে।

খানিক বাদে হেসে তাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করে বলল, তুমি খুব দুষ্টু, দেওতার নাম করে কক্ষনো ও-রকম বলবে না—হট যাও—তোতাচাচাকে বিশ্বাস আছে? দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তে পারে।

শাওন হাসতে হাসতে উঠে সরে বসল। বলল, বন্ধ দরজা ঠেলে ঢুকলে তোমার তোতাচাচাও আমার হাতে খুন হয়ে যাবে।

দু'জনেই লক্ষ্য করছে সেই থেকেই দুলারী বেশ গম্ভীর। বিকেলের দিকে তোতারাম বলল, চলি দোস্ত, আবার কবে দেখা হবে জানি না—

তিতলির থেকেও শাওন বেশি অবাক।—সে কি, তুমি তো দিনকতক এখন আমাদের সঙ্গে থাকবে বলে এলে?

তোতারাম তার স্বভাবসুলভ টানা গলায় বলল, সেইরকমই তো ইচ্ছে ছিল দোস্ত...কিন্তু কি করব, আমি হুকুমের গোলাম, হুকুম হল আজই যেতে হবে—যাচ্ছি।

এরই মধ্যে কার হুকুম হল না বুঝে শাওন আর তিতলি দু'জনেই দুলারীর দিকে তাকালো। নির্লিপ্ত মুখে দুলারী বলল, ওর যাওয়া দরকার—

ছোট-খাটো দেখতে এই মিষ্টি চেহারার মেয়ের এক ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে, যার কথার ওপর আর জোর চলে না। যাবার আগে নিস্পৃহ গলায় তোতারাম বলে গেল, কিছুদিন তোমরা এখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, মনে ডর-ভয় না রেখে আনন্দ করতে পারো।

...এই লোকও মিত্র নয়। কুন্দন সিংয়ের মতো না হোক, আর একজন প্রবল শত্রুরই কেনা মানুষ। হুকুম হলে চরম ক্ষতি এর হাত দিয়েও হতে পারে। তবু লোকটা চলে যেতে শাওনের মনে হল সে যেন একটু কমজোরি হয়ে গেল।

...রাতের স্বর্গ-রচনা দু'জনেই নিবিড় নিশ্ছিদ্র করে তুলতে চায়। কোনো ফাঁক দিয়ে কোন-রকম ভাবনা চিন্তার কালো ছায়া ঢুকতে দিতে চায় না। তিতলি জোর দিয়ে বলে, কিষণজী কক্ষনো দু'জনের এই আনন্দ বরবাদ করে দেবে না, তাদের দুঃখের আগুনে ফেলে পুড়িয়ে

মারবে না—কক্ষনো—না। শাওন সঙ্গে সঙ্গে ওর কথায় সায় দেয়, ডবল সাহস দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই স্বর্গসুখের মধ্যেও অদৃশ্য একটা খড়গ ঝুলছেই, এ-চিন্তা থেকে নিজেদের তারা মুক্ত করবে কি করে? তিতলি ভাবে কখন না ওই খড়গ শাওনের ওপর নেমে আসে, আর শাওন ভাবে কখন না ওটা নেমে এসে তিতলিকে রক্তাক্ত করে দেয়।

কি মনে হতে হালকা সুরে শাওন জিগ্যেস করল, তিতলির পরমায়ু কম এ আর তোমার মনে হয় না তো?

ঠোঁট উল্টে তিতলি জবাব দিল, মনে না হওয়ার কি আছে, তিতলির পরমায়ু আর বেশি কবে হয়...।

বিষণ্ণ মুখ করে শাওন বলল, তা বটে, শাওনের পরমায়ুই বা আর কতটুকু, মাত্র দু'মাস...

তিতলি থমকে তাকালো. কিন্তু সে জব্দ হবার মেয়ে নয়। হেসে বলল, দু'মাস হলেও সে ঘুরে ফিরে প্রত্যেক বছরেই আবার আসে।

—এক তিতলি গেলে আবার অন্য তিতলিও তো আসে।

খিলখিল হাসি। —তুমি অন্য তিতলি ধোরো একটা।

—আমি কি করে ধরব। এই শাওন গেলে সে তো আর আসে না, অন্য শাওন আসে।

সঙ্গে সঙ্গে বিষম রাগ, দেখো বাবুজী, ভালো হবে না বলছি!

এবারে শাওনের মুখে হা-হা হাসি।—তুমি কি এখনো আমাকে বাবুজীই বলবে নাকি?

এ-রকম ভুল তিতলি আগেও বার কয়েক করেছে। করে হেসেছে। কিন্তু এখনো রেগেই আছে।—তাহলে কি বলব?

—কেন, শাওন বলবে।

রাগ গিয়ে আবার হাসি। গুনগুন করে গেয়ে উঠল, 'যব্ শাওন্ আয়ে তো তিত্‌লি ছুঁপে...'।

হেসে উঠে শাওন ওকে দুই বাহুতে বেঁধে জবাব দিল, এই শাওন এলে তিতলি ধরা দেয় দেখতেই তো পাচ্ছ।

এমন আনন্দের মধ্যেও অদৃশ্য ওই খড়গ মাথার ওপর ঝুলছেই—এ দু'জনের কেউ ভুলতে পারে না।

চার পাঁচ দিন হয়ে গেল দুলারীর মুখে হাসি নেই। চুপচাপ, বিষণ্ণ। অথচ বড় বোনের মতোই ওদের দেখাশুনা করছে, নিজের হাতে রেঁধেবেড়ে খাওয়াচ্ছে। তিতলি বার কয়েক তাকে জিগ্যেস করেছে, বহিনী, তোমার কি হয়েছে আমাকে বলছ না কেন?

দুলারী মাথা নাড়ে। ছোট্ট জবাব, কিছু না—এখন আর আমার দিকে তাকাতে হবে না, নিজের মরদকে দ্যাখ।

কিন্তু তারপরের এক বিকেল থেকে তাকে বেশ খুশি মেজাজে দেখা গেল। তিতলির সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করল। শাওনের জন্য কি মিঠাই বানাবে বলে তাকে ডাকতে তিতলি অবাক হয়ে বলল, আমি তোমাদের রসুইঘরে যাব কি। তাই শুনে দুলারী মারমুখী, এখন তুই ব্রাভন হয়ে গেছিস, আর কেউ তোকে অছুত বললে আমি তাকে লকড়ি নিয়ে মারতে যাব—

তার কথা শুনে শাওনও হাসছিল। তিতলিও হাসি মুখেই বলল, দুলারী বহিনী, চার দিন বাদ তোমার খুশি মুখ দেখলাম আর মিঠা বাত শুনলাম, মনে হচ্ছে যেন কোনো ভালো খবর পেয়েছ—

হালকা ঠেসের সুরে দুলারী বলল, পেলেও তোরা জানবি কি করে, বিকেল পর্যন্ত তো দরজা বন্ধ করে ঘুমোলি।

দুলারী তিতলির থেকে বয়সে কম করে দশ এগারো বছরের বড়, শ্রদ্ধার পাত্রী। কিন্তু মুখ খুললে এমনি মুখরা। তিতলিও সমান তালে জবাব দিল, তেমন ভালো খবর থাকলে দরজা নিশ্চয় বন্ধ থাকত না, তোমার ভালো খবর বলতে আমি কেবল তোমার মরদের ঘরে ফেরা বুঝি।

এবারে নির্লিপ্ত মুখে দুলারী জবাব দিল, সে-ই এসেছিল, মোটামুটি ভালো খবর দিয়ে ছুপায় চলে গেল।

শাওন অবাক, আর তিতলি হাঁ খানিক।—তুমি কার কথা বলছ বহিনী—আমি তো তোমার আপনা আদমীর ফেরার কথা বললাম।

দুলারীর চোখে মুখে পলকা রাগ।—তোর সাহস তো কম নয় ছৌঁড়ী, আপনা আদমী না তো কি আমি পরের আদমীকে নিজের মরদ বলব!

তিতলির বুদ্ধির ধার কম নয়, কিন্তু ও-কথার পরেও সে হতভম্বের মতো চেয়ে রইলো। শাওন চুপ করে থাকতে পারল না। দুলারী তার থেকেও বছর দুই আড়াই বড় হবে। বলল, দিদি, এতকাল বাদে ওই মানুষ ফিরে এলো আর তুমি তাকে যেতে দিলে, আমাদের একবার ডাকলেও না!

দুলারীর হাসি-চাপা বিরক্ত মুখ।—তোমাদের সবে বিয়ে হয়েছে ভাই-সাব, তাই চার-পাঁচ দিনকেও এতকাল ভাবছ। তিতলির দিকে ফিরল, তেমনি ধমকের সুরেই বলে উঠল, হাঁ করে চেয়ে আছিস কি, পুনপুর জলে ডুবে মরতে গেছলি, সেখান থেকে তোকে ভাঁওতা দিয়ে ভাই সাহেবের কাছে নিয়ে এলো, তারপর আমাকে আর সীতা-লছমীকে তুলে এনে টিকোটি পণ্ডিতের বাড়িতে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোদের বিয়ে দিল—সেই লোক আমার আপনার আদমী না হলে রাত দুপুরে তার কথায় ঘর ছড়ে বেরিয়ে এখানে এসে পাঁচদিন ধরে তোদের পাহারা দিচ্ছি? আর এত সবের পরেও আমার আপনার আদমী কে তোদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?

হাসি চাপা অসম্ভব হয়ে উঠতে সে দ্রুত রসুইঘরের দিকে চলে গেল। শাওন আর তিতলি দু'জনে দু'জনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। তারপরেই তিতলি রসুইঘরের দিকে ছুটল।

মিনিট পনেরো বিশ পরে খুব হাসতে হাসতে ফিরে এলো। জানালো, ছুপার তোতারামই লোহার গাঁওয়ের রামভরোসা—দুলারী বহিনীর দিওয়ানা ঘর-ছাড়া মরদ তোতাচাচা। চুনীলাল মাস্টার বিয়ে বন্ধ করে দিতে দুলারী বহিনী লোহার গাঁয়ে পালিয়ে যায়, পরে তোতাচাচা যেতে কুন্দন সিং দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ে দেয়। তারপর মরদের নামে এ-রকম না রটিয়ে উপায়

কি? চুনীলাল মাস্টার ব্যোমভোলানাথ আদমী না হলে এতদিনে সব ফাঁস হয়ে যেত, বাপেরই যখন সন্দেহ হয়নি তখন এমন সন্দেহ আর কে করবে? মাঝখান থেকে গাঁয়ের লোক এখন শুধু ভাবছে তোতাচাচার সঙ্গে দুলারীবহিনীর তলায় তলায় বেশ রসের কারবার চলছে।...তোতাচাচাকে লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিংয়ের কাছে পাঠিয়েছিল দুলারী বহিনী, এবারে আবার বুকের বেমারি হতে সে নাকি বলেছে, এ-সব আর গোপন রাখার দরকার নেই, চুনীলাল মাস্টারকে সে ডেকে পাঠিয়েছে—নিজেই সব বলে দেবে।

যেমন আশ্চর্যের কথা তেমনি আনন্দের কথাই বটে। কিন্তু লোহারগাঁওয়ের প্রবলপ্রতাপ কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে ওদের এই যোগাযোগটাই কেবল তিতলির বা শাওনের ভালো লাগেনি। ষাটের দিকে বয়েস গড়াতে চলেছে, তবু এমন চরিত্র যে মেয়ের থেকেও ছোট এক অদ্ভুত মেয়ের লোভে সে ছুপার সেই জঘন্য নথ-ভাঙানির আসরে গিয়ে তিরিশ হাজার টাকার কড়ারে তাকে কিনে ছ'হাজার টাকা বায়না ফেলে এসেছে। দু'জনেই মনে মনে ভাবে, এর মধ্যেও ওপরঅলার মঙ্গলের ইচ্ছে কিছু আছে কিনা কে জানে। দু'জনের মধ্যে ব্রিজমোহন এই মেয়েকে কিনলে ষড়যন্ত্র করে রাত একটায় তোতারাম তিতলিকে আনতে যেত না, আর তিতলিও পুনপুর জলে ডুবে মরতই। অন্য দিকে এমনি খেলা যে ওই মেয়েকে কিনল যে, ফেরার পথেই তার ছোট-খাট হার্ট অ্যাটাক হয়ে বসল। সে ভালো হয়ে উঠলে ভবিতব্য কি, আর না হলে ব্রিজমোহন কোন মূর্তি ধরবে—দু'জনের কেউ জানে না।

শাওন জিগ্যেস করল, তোতারাম ভালো খবর কি দিয়ে গেল...কুন্দন সিং-এর কেনা মেয়ে হাত-ছাড়া হয়ে গেছে সে জানে?

তিতলি জবাব দিল, হয়তো জানে না, কারণ এ সম্বন্ধে তোতাচাচার সঙ্গে নাকি কোনো কথাই হয়নি। আর তোতাচাচাও তো নিজের কীর্তি তাকে সেধে জানাতে যাবে না, তাহলে সবার আগে তো তারই গর্দান যাবে। দুলারীবহিনীকে সে কেবল বলে গেছে, কুন্দন সিংয়ের বেশি বেমারি কিছু হয়নি, তবু পাটনার বড় ডাগদার তাকে বিস্তারা থেকে নামতে বারণ করে দিয়ে গেছে, আর কোনরকম উত্তেজনায় মাথা দিতে নিষেধ করেছে—তাই দোস্ত আর তিতলি যেন আপাতত নিশ্চিন্ত থাকে আর ফুর্তিতে থাকে—কিষেণজীর সামনে বিয়ে হয়েছে যখন, দেওতার যা ইচ্ছে তা-ই হবে।

দশ দিনের ছুটি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু এমন অনিশ্চিত মানসিক অবস্থা নিয়ে শাওন কাজে যোগ দেয় কি করে। বাড়িতে দু'দুটো পাহারাদার আছে বটে, কিন্তু ব্রিজমোহনের পাহারাদার তাদের নিরাপত্তা দেখছে না নজরবন্দী করে রেখেছে? কাজে জয়েন না করে শাওন খুব ভোরে উঠে পাটনা চলে গেল। গিয়ে হতাশ। তার ওপরঅলা প্রকাশ দীক্ষিত আগের দিন কলকাতা চলে গেছে। পনের বিশ দিনের আগে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা নেই।

তাঁর নিচে যে ভদ্রলোক সে অন্য মেজাজের মানুষ। না বলে কয়ে হঠাৎ দশদিনের ছুটি নেওয়ার জন্যেই সে অসন্তুষ্ট। আবার তিন সপ্তাহের ছুটির নামেই তিরিক্ষি হয়ে উঠল। শাওন ভার্মা তাকে ঠাণ্ডা মুখে জানালো পারিবারিক কারণে তার এখন জয়েন করা সম্ভব নয়। তার আপত্তি সত্ত্বেও ছুটির মেয়াদ আরো তিন সপ্তাহ বাড়ানোর দরখাস্ত দিয়ে চলে এল। এই মুরুব্বিটি

আরো চটে গেল, কারণ ছুটি কেন চাই-ই, শাওন ভার্মা সে রকম সন্তোষজনক কোনো কারণ দেখাতে বা বলতে পারেনি।

শাওনও তিক্ত মন নিয়েই মাসাউরি ফিরেছে। কিন্তু তিতলিকে দেখামাত্র এই মনের ওপর ঠাণ্ডা প্রলেপ। ও জানলায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখেই ছুটে এসে দরজা খুলেছে। এক মুখ হাসি। তারপরেই চোখে শংকার ছায়া। জিগ্যেস করেছে, পাটনার খবর ভালো না বুঝি?

—ভালো না তোমাকে কে বলল?

—তোমার মুখ শুকনো।

শাওনের মনে হল তিতলির ভিতর থেকে সমস্ত ভয়ের ছায়া সরিয়ে দিতে পারলে তার এই পৃথিবীতে আসা সার্থক হয়। হেসে বলল, সকাল থেকে এই প্রায় বিকেল পর্যন্ত তোমাকে দেখিনি, মুখ শুকনো ছাড়া সরস দেখবে কি করে?

এটুকুতেই খুশি।

গত পাঁচ ছ'দিন ধরে শাওন তোতারামের অপেক্ষায় আছে। ছুপার আর লোহার গাঁওয়ের খবর একমাত্র সেই দিতে পারে। পাটনার ব্যাঙ্ক থেকে নগদ আট হাজার টাকা তুলে এনেছে। এর থেকে ছ'হাজার টাকা নিয়ে তোতারামের সঙ্গে গিয়ে কুদন সিং-এর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে। আজ হোক, দু'দশ দিন পরে হোক, ফয়সালা একটা করতেই হবে। ভালো হোক বা মন্দ হোক—এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আর কত দিন থাকা চলে। কিন্তু লোহার গাঁওয়ে গিয়ে কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করার সংকল্প তিতলিকে বলেনি। তার কাছে যেতে দেওয়া আর বাঘের মুখে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে তিতলি তফাৎ দেখে না।

তোতারাম এলো আরো দিন পাঁচেক বাদে। অর্থাৎ বিয়ের পনেরো ষোল দিনের মাথায়। অনেক খবরই নিয়ে এসেছে। প্রথম খবরটা তার নিজের। শ্বশুর চুনীলাল মাস্টার কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেছে, আর খুশি হয়েই দামাদকে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। কিন্তু খবর শুনে তোতারামকে একটু বিপাকে ফেলেছে ছুপার দোস্তরা। আড়চোখে একবার দুলারীকে দেখে নিয়ে মুশকিলের কথাটা বলেছে। দোস্তদের বায়না, ছুপায় একটা সোহাগরাতের উৎসব করতে হবে, তাহলেই তারা তোতারাম আর দুলারীর বিয়ে মেনে নেবে।

শাওম আর তিতলি অন্য খবর শোনার জন্য উতলা কিন্তু তোতারামের এ-কথা শুনে দুলারী নিঃশব্দে এমন একট মুখঝামটা দিয়ে উঠেছে যে এরা দুজন হেসেই ফেলেছে।

এর পরের খবরেও তেমন উতলা হবার মতো নয়। তিতলির ফুফু হীরা মল্লা কাঁপতে কাঁপতে লোহার গাঁওয়ে এসে ঠাকুর কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেছে। তার সামনে আগাম পাওয়া সেই ছ'হাজার টাকার পুঁটিলি রেখে হাত জোড় করে নিবেদন করেছে, নথ-ভাঙানির রাতেই তার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে—ডাকাতরা তিতলিকে তুলে নিয়ে গেছে, আজও তার সন্ধান মেলেনি।

লোহার মতো মুখ করে কুন্দন বলেছে, টাকা ফেরত পাবার জন্যে সে টাকা দিয়ে আসেনি, তার কাছে খবর আছে, আরো বেশি টাকার দাদন পেয়ে হীরা তিতলিকে সরিয়েছে—পনেরো দিনের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনার খবর না পেলে হীরা মল্লা যেন নিজের প্রাণ আর ইজ্জতের

কথা ভাবে। এ-কথা বলে টাকার বটুয়াটা তার মুখে ছুঁড়ে মেরে সাগরেদ ছাবুয়া আহিরকে হুকুম করেছে, আওরতকা নিকালনেকা দেউড়ি দেখা দিহ!

এর অর্থই অপমান করে বার করে দেওয়া। ছাবুয়া আহির তাকে নাকি বাইরে এনে তার গা থকে চাদরটা টেনে নিয়ে সেটা মেয়েদের মতো গায়ে মাথায় জড়িয়ে হাত ধরে তাকে বেরুবার রাস্তা দেখিয়েছে। আর নিজের হাতে চাদরটা আবার ওকে পরিয়ে দেবার সময় অসভ্যতা করেছে, আর হেসে হেসে বলেছে, রহুয়াকা চিড়িয়া ঘরে ফিরল কিনা শিগগীরই খবর নেবার জন্য তার ঘরে যাবে। অপমানে, তার থেকেও বেশি ভয়ে কাঁটা হয়ে হীরা মল্লা ঘরে ফিরেছে। তারপর ঘর পাহারা দেবার জন্য ভীম হাবালদারকে খবর দেবে কিনা ভেবেছে। খবর দিলেই সন্ধ্যে থেকে পাহারা দেবার নামে সে আসবে। কিন্তু লোকটা ঘন ঘন তামাক খায়। কলকের টিকে-তামাক সাজিয়ে আগ্ লাগিয়ে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে দিতে হীরাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই তার আবার কলজেতে আগ্ লাগে। সেই আগ্ ঠাণ্ডা করার জন্য সমস্ত রাত হীরার ঘরেই থেকে যাওয়ার বায়না ধরে, পীড়াপীড়ি করে—

—কাহে ঝুট বাত্ কহতানি? দুলারী বেশ জোরেই ধমকে উঠল। —রহুয়াকা কুঁঠিয়ামে হীরা এইসন বেইজ্জত কভু না হো সক্‌তি!

গোবেচারা মুখ করে তোতারাম শাওনের দিকে তাকালো।—দুঃখ করে হীরা মল্লা নিজের মুখে আমাকে যা বলেছে আমি কেবল তাই বলছি!

তিতলি আর শাওন দু'জনেই চুপ। এই বয়সেও মেয়ে কেনার জন্য যে লোক লোহার গাঁও থেকে ছুপায় ছোটে তার সম্পর্কে দুলারীর এই শ্রদ্ধার উক্তি ওদের ভালো লাগার কারণ নেই। এর পরের খবর শুনে দু'জনেই উৎকর্ণ।...তোতারামকে সঙ্গে নিয়ে মালিক ব্রিজমোহন ঠাকুর কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তবিয়ত্ বেশি খারাপ শুনলে আসা কর্তব্য। আগের বারের হার্ট অ্যাটাকের সময়ও এসেছিল, দু'দিন থেকে তাকে সুস্থ দেখে তবে গাঁয়ে ফিরেছে—

দুলারী ধমকে উঠল, ফিন্ ঝুট? লোহার গাঁওমে ব্রিজমোহন কাহে গইল হম্ না জানে? ওক্‌রা মনোয়ামে আশা লেইকে গইল যে রহুয়া কুন্দন সিংকা অন্তিম দশা ভৈলি—লেকিন সুস্থ দেইখে দুখ্ লেকর আপন ঘর ওয়াপস আইল।

শাওন আর তিতলির দিকে চেয়ে বেজার গলায় তোতারাম মন্তব্য করল, দুলারী আমার মালিক ব্রিজমোহনের সবই খারাপ দেখে।

শাওন ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু একটু।—তারপর কি হল?

—তারপর কুন্দন সিং মালিককে বলল এবারে বেমারি বেশি কিছু না, আর দশ পনেরো দিনের মধ্যেই বেরুতে পারবে।

পরের সমাচারটুকুই খবর। এরপর তিতলি আর শাওন ভার্মার সম্পর্কে কথা হয়েছে। তিতলির ফুফুর ঘর থেকে পালানো শুধু নয়, শাওন ভার্মার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে তা-ও কুন্দন সিং আগেই জেনেছে। ব্রিজমোহন তাকে বলেছে, তারা এখন ছুপায় নেই, কাছাকাছির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে, এখন রহুয়ার মনের ইচ্ছে জানলে সেই অনুযায়ী সে তাঁকে সাহায্য করতে পারে।

...এই শুনে কুন্দন সিং-এর সমস্ত মুখ ভীষণ কঠিন হয়ে উঠেছিল। বলেছে, ওদের দু'জনের সমস্ত খবরই সে রাখে, কারো কাছ থেকে তার কোনরকম সাহায্যের দরকার নেই। ওরা দু'জন তার কবুতর কবুতরী। ফয়েসলা যা করার সেরে উঠে ধীরে সুস্থে সেই করবে, এমন কিছুই করার ইচ্ছে তার যা এ-দিকের দশ-বিশখানা গাঁওয়ের কেউ কোনদিন ভুলবে না—কিন্তু তার জন্য কিছু সময় লাগবে। ব্রিজমোহনকে সে এক রকম সাবধানই করে দিয়েছে, তার হয়ে কেউ যেন ফয়েসলা করতে না যায়, শাওন ভার্মা বা তিতলির গায়ে যেন এতটুকু আঁচড় না পরে। ওদের দু'জনকে খুব নিশ্চিন্ত থাকতে দিলেই তাকে সাহায্য করা হবে।

একটু চুপ করে থেকে আর ইতস্তত করে তোতারাম টেনে-টেনে বলল, দেখো, ব্রিজমোহনের আমি হুকুমের নোকর হলেও তোমরা আমার আপনার জনের মতো হয়ে গেছ...আর দুলারীর তো আমার থেকেও তোমরা বেশি পেয়ারের। তাই মালিকের সঙ্গে ঠাকুর কুন্দন সিং-এর আর যা কথা হয়েছে তা-ও বলে দিই।...কুন্দন সিং-এর বেশি সময় নিয়ে ফয়েসলার প্রস্তাব মালিক ব্রিজমোহনের খুব পছন্দ হয়নি। কুন্দন সিংকে সে বলেছে, ক্যাম্প-ইন-চার্জ শাওন ভার্মার সঙ্গে তার নিজের কিছু পুরনো হিসেব বাকি আছে, ওই লোকের অনেক খারাপ কাজের প্রমাণ তার হাতে আছে, গায়ে হাত না দিয়েও সে ওকে নানাভাবে নাজেহাল করার ব্যবস্থা করেই ফেলেছে—তাতে রহুয়া কুন্দন সিং-এর ফয়সলার জমিন আরো ভালোভাবে তৈরি হবে। জবাবে কুন্দন সিং বলেছে, নিজের ফয়সালার জমি তৈরি করতে সে নিজেই জানে, কিন্তু কারো পুরনো হিসেব যদি বাকি থাকে তাতে আর সে বাধা দিতে যাবে কেন। তবে সরকারি অফসারের সঙ্গে লাগতে গেলে সে যেন একটু হুঁশিয়ার হয়ে লাগে।

...আজও তিতলির নিজের জন্য ভয়-ডর নেই। তার সব ভয় আর দুশ্চিন্তা শাওনকে নিয়ে। তিতলি তাকে বুকে আগলে এমন কোথাও পালাতে চায় যেখানে কোনো দুশমন তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু শাওন পালাতে চায় না। গোঁ-ভরে বলে, কি অন্যায় করেছি যে লোক হাসিয়ে এখান থেকে চোরের মতো পালাবো? সে ঠিক করেছে, এবার ছুটি ফুরোলেই কাজে জয়েন করবে। আর সতর্কতার জন্য ওপরঅলা প্রকাশ দীক্ষিতকে সব জানিয়ে রাখবে। শাওনের বিশ্বাস, সব জানলে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তিনিই নেবেন। আর সে-রকম বিপদ মনে হলে আগাম ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

শাওন বুঝতে পারে তিতলি তবু তার জন্য সন্ত্রস্ত ভয়ার্ত। তাকে তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়তে হয়।—আমরা দু'জনে তো একসঙ্গে মরতে প্রস্তুত, তাহলে তোমার অত ভয় কেন? এমন কথা বলে শাওন নিজেই অবাক হয়ে যায়। নিজেকে সে বরাবর ভীতু মানুষ জানত। কিন্তু সত্যি মনে এত জোর তার এলো কোত্থেকে!

এত কথার পরেও তিতলির মনের ভাব বুঝে সে রাগ দেখায়। তিতলি নিজে মরতে প্রস্তুত, কিন্তু ওকে মরতে দিতে রাজি নয়। শাওন বলে, তুমি এত স্বার্থপর—তুমি চলে গেলেও আমি পড়ে থাকব, এই চাও?

জবাব না দিতে পেরে তিতলি তাকে দুই বাহুতে আঁকড়ে ধরে থাকে।

না, ব্রিজমোহনের হুমকির কথা শুনে তিতলি তেমন বিচলিত নয়। তার পুরনো হিসেবটা কি জানা আছে। জমি খালাস পাবার ষড়যন্ত্রে শাওন রাজি হয়নি। তার থেকেও বড় হিসেব তিতলি নিজে, যা ব্রিজমোহন কখনো প্রকাশ্যে বলবে না। ওদের দু'জনের প্রেম ভালবাসা দেখে দেখে এক-দেড় বছর ধরে তার দিল জ্বলেছে। শেষে কুন্দন সিংকে জব্দ করতে গিয়ে তোতাচাচার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই লোকের হাতে তিতলিকে সে নিজেই তুলে দিয়েছে। কিন্তু গায়ের জ্বালা যাবে কোথায়?

শাওন তাকে বলেছে, ব্রিজমোহন তার নামে নালিশ করে ওপরওয়ালার কাছে বড় জোর দুই একটা উড়ো চিঠি ছাড়তে পারে। কিন্তু ওপরওয়ালা প্রকাশ দীক্ষিতের হাতে সে চিঠি পড়লে তিনি তা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। কুন্দন সিং-এর হুমকির ভয়ে পিছন থেকে শাওনের ওপর ছুরি চালাবার জন্য লোক লাগাবে না যখন, ওই লোককে নিয়ে তিতলির অত দুশ্চিন্তা নেই।

তার আসল ভয় লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষ কুন্দন সিংকে। এই লোকের কি মতলব কিছুই হদিস পাচ্ছে না।

৯

কালবোশেখীর ঝড় বন্যা নামায় না, কিন্তু ক্ষণিকের তাণ্ডবে অতর্কিতে মানুষকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। জীবনের নৌকো নোঙর-ছাড়া করে ওলট-পালট করে দিতে পারে।

অফিসে জয়েন করার আগেই শাওন ভার্মার কর্মজীবনে সেই রকমই এক ঝড়। এতটার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

যেটা এলো দুই প্রধান সাগরেদসহ ঠাকুর ব্রিজমোহনের দিক থেকে। মহাদেও প্রসাদ আর জগদেও মিশিরকে সঙ্গে করে এক মস্ত অভিযোগের খতিয়ান নিয়ে সে পাটনায় শাওন ভার্মার অফিসে এসেছে। লিখিত অভিযোগ পত্রে গ্রামের মান্যগণ্য জনেরাই শুধু স্বাক্ষর দেয়নি, শ-দেড়েক শ্রমিক কর্মচারী এবং শান্তিপ্রিয় নিরীহ গরিব আর অছুত মেয়ে-পুরুষের টিপ-ছাপও আছে। ছুপা গাঁওরের মানুষেরা বিচারপ্রার্থী।

পাটনার অফিসে তখন প্রকাশ দীক্ষিত নেই। তাঁর জায়গায় যে দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে সেই ভদ্রলোক ছুটি-ছাটার ব্যাপার নিয়ে শাওন ভার্মার ওপর আদৌ খুশি ছিল না। এখন তার বিরুদ্ধে আপাত প্রমাণ সহ অভিযোগের ফিরিস্তি দেখে তার চক্ষুস্থির। দ্বিতীয় দফায় ওই লোক কেন আবার তিন সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত করেছিল তা বুঝে নিতে সময় লাগল না। বিপক্ষ দল আটঘাট বেধেই নেমেছে। লম্বা সই, টিপসই, আর ফোটোসহ অভিযোগপত্রের এক কপি পাটনা অফিসে এবং দ্বিতীয় কপি কলকাতার হেড অফিসে পাঠানোর জন্য আনা হয়েছে। টাইপ-করা কাগজে অনেক দফা অভিযোগ।

প্রথমেই অচ্ছুত এলাকার দরিদ্র নিরীহ পরিবারবর্গের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটানোর নালিশ। যে গ্রামে এতদিন পর্যন্ত ছুত-অচ্ছুত পরস্পরকে বিশ্বাস করে পরম শান্তিতে বাস করে এসেছে, একজনের ব্যভিচারী আচরণে সেই বিশ্বাস আর শান্তিতে ভাঙন ধরেছে। বলা বাহুল্য এর সবটাই

মেয়েঘটিত কারণে। অচ্ছুত এলাকার দরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্যবতী বা রূপসী মেয়েদের শাওন ভার্মা নির্লজ্জ ভোগদখলে টেনে এনেছে। সেই এলাকার মানুষদের বিশ্বাস উদ্রেকের জন্য শাওন ভার্মা সরকারের টাকায় সরকারের মজদুরদের বিনা পয়সায় খাটিয়ে এত তারিখ থেকে এত তারিখের মধ্যে পাকা গভীর কুঁয়ো করে দিয়েছে। (সেই কুঁয়োর ছবি অভিযোগ পত্রের সঙ্গে যুক্ত) ভোগের মেয়েদের বশে আনার জন্য ওমুক-তমুক তারিখে সর্বসাকুল্যে তাদের এতজন আত্মীয় পরিজনকে খনির কাজে লাগিয়েছে (তাদের নাম-ধাম অভিযোগ-পত্রে সংশ্লিষ্ট)। এইভাবে বশীভূত করে শাওন ভার্মা অছুত মেয়েদের দিনে দুপুরে তার অফিস-ক্যাম্পে পর্যন্ত টেনে এনেছে—তার চাক্ষুষ সাক্ষী সরকারী ডাক-পিওন চলতরাম।

...এরপর একটিই অছুত মেয়ে ক্যাম্প-ইনচার্জ শাওন ভার্মার ভোগের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। মেয়েটি যথার্থ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, ছুত-অছুত সকল গ্রামবাসীরই স্নেহের পাত্রী। শিশু অবস্থায় মা-মরা মেয়ে, বাপ পাগল, কন্যার স্নেহে আদরে লালিত এক পিসির কাছে। নিঃসন্তান পিসি হীরা মল্লার চোখের মণি সেই মেয়ে। এক বছরের চেষ্টায় নানা প্রলোভন দেখিয়ে শাওন ভার্মা সেই মেয়েকে বশ করেছে। মেয়েটির নাম তিতলি। ওই মেয়ের অনুরোধে পঞ্চ-এর মুরুব্বি এবং মহাবীরজিউর প্রধান সেবায়েত জনার্দন পূজারীর এক অসুস্থ মেয়েকে ওমুক তারিখে পাটনায় নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে জরুরী অপারেশনের অছিলায় শাওন ভার্মা বাপের আপত্তি সত্ত্বেও ওই অসুস্থ মেয়ের সঙ্গে স্ত্রীসহ তার জ্যেষ্ঠ মেয়েকে আর তিতলিকে সরকারের জিপে তুলে সরকারের তেল পুড়িয়ে পাটনায় নিয়ে গেছে। পঞ্চের মুরুব্বি জনার্দন পুজারী অনায়াসে পঞ্চের অন্যান্য সতীর্থদের সাহায্যে অসুস্থ মেয়েকে পাটনার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারতেন। শাওন ভার্মা জনার্দন পুজারীর স্ত্রী ও বড় মেয়েকে রোগিনীর সমূহ বিপদের কথায় ভুলিয়ে আর ব্রাহ্মণ পূজারীকে কোর্টে টেনে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে তাদের নিয়ে সরকারের জিপে পারোপকার করতে বেরিয়েছে। অসুস্থ মেয়েকে পাটানার হাসপাতালে আর স্ত্রী ও বড় মেয়েকে তাদের আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে শাওন ভার্মা পরদিন অর্থাৎ ওমুক তারিখে রাত্রিতে একা তিতলিকে নিয়ে ছুপায় ফিরেছে। শেষে দিনের পর দিন ওই সরল মেয়েটাকে ভালবাসার অভিনয় করে এক গভীর রাত্রিতে তার অসহায় পিসির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। (অভিযোগের এই পর্বে সেই অসহায় পিসি হীরা মল্লা আর তিতলির ফোটো পাশাপাশি পেশ করা হয়েছে। ফোটোর হীরা মল্লা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছে।) শাওন ভার্মা পিসির কাছ থেকে তিতলিকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই রাতেই (তারিখ) এক পতিত ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে একটা লোক-দেখানো বিয়ের অনুষ্ঠান করে তাকে নিয়ে মাসাউরি গাঁয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। সরল মেয়েটার এই সর্বনাশের ফলে গাঁয়ের সমস্ত অছুতরা এমন ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ যে শাওন ভার্মা আজও সাহস করে খনির কাজে ফিরে আসতে পারেনি। গাঁয়ের ছুত অছুত সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষই শাওন ভার্মার এই নির্দয় দুষ্কর্মের বিচারপ্রার্থী।

এছাড়াও গাঁয়ের অভিযোগকারীদের আবেদন, খনির কাজে বেশি লোকের হাজিরা দেখিয়ে টাকা চুরি হচ্ছে কিনা, এবং মজদুরদের চুক্তিমতো টাকা দেওয়া হয় কিনা—পঞ্চের নিঃস্বার্থ কল্যাণময়ী সভ্যদের দিয়ে যেন যাচাই করে নেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, এর

ফলে ক্যাম্প ইন চার্জ শাওন ভার্মার আরো অনেক দুষ্কর্ম প্রকাশের আলোয় আসবে।

প্রকাশ দীক্ষিতের জয়গায় সাময়িকভাবে যে মানুষটি এখন কর্তাব্যক্তি, সেই ভদ্রলোক রুক্ষ প্রকৃতির শুধু নয়, ভীতুও। অভিযোগের আদ্যোপান্ত পড়ে তার চক্ষুস্থির। অবিশ্বাস করার কিছু নেই, ফোটোগুলো আর শাওন ভার্মার ছুটি নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকাটাই তার বিবেচনায় অকাট্য প্রমাণ। তার আরো দুশ্চিন্তা, জাত-পাত আর অছুত গরিবদের ওপর অত্যচার নিয়ে দিল্লীও এখন দস্তুরমতো মাথা ঘামাচ্ছে। এই সময় এ-খবর তাদের কানে গেলে শোরগোল উঠবেই। ফলে নিজেদের নির্বিঘ্ন থাকাটাই জরুরী প্রয়োজন এখন।

ভদ্রলোক তড়িঘড়ি ফোটো সমেত অভিযোগের প্রতিলিপি কলকাতায় পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে কড়া নোট, পত্রপাঠ ক্যাম্প ইন চার্জ শাওন ভার্মাকে সাসপেণ্ড করে তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের বিশেষভাবে তদন্ত হোক। অভিযোগের গুরুত্ব অপরিসীম এবং তা ভিত্তিহীন নয়, শাওন ভার্মার সাম্প্রতিক আচরণে এ-রকম বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কলকাতার হেড অফিসের প্রধান কর্তা ব্যক্তিরও এই দারুণ অভিযোগ আর পাটনার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নোট হাল্কা করে দেখার কোনো কারণ নেই। তদন্তসাপেক্ষে শাওন ভার্মার সাময়িক বরখাস্তের হুকুম আসতে সময় লাগল না।

শাওনের দ্বিতীয় দফা ছুটি ফুরোতে তখনো আট ন'দিন বাকি। ছুপা থেকে এসে তোতারাম তাকে আড়ালে ডেকে জানালো শাওন যাকে সাইটের ভার দিয়ে ছুটিতে আছে, সেই লোক খোঁজখবর করে তার কাছে এসে ক্যাম্প ইন চার্জ কোথায় আছে হদিস পেতে চেষ্টা করেছিল। জানিয়েছে অফিসের ব্যাপারে বড় রকমের কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, তাকে পাটনায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল, সেখান থেকে তার মারফৎ কলকাতা হেড অফিসের একটা খুব জরুরি চিঠি ক্যাম্প ইন চার্জকে দেবার হুকুম হয়েছে।

কি হতে পারে ভেবে না পেয়ে তোতারামকে সঙ্গে নিয়ে শাওন তক্ষুনি ছুপায় রওনা হল। তিতলিকে বলে গেল, একটু দরকারে বেরুচ্ছে, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ফিরে আসছে। তোতারামই দুটো সাইকেল যোগাড় করল।

সহকারী বিমর্ষ মুখে তার হাতে কলকাতার হেড অফিসের জরুরী মোটা খামটা দিয়ে সই করিয়ে নিল। শাওন ভার্মা ক্যাম্পের অফিস ঘরে বসে সেই খাম খুলল। সামনে তোতারাম বসে।

সাময়িক বরখাস্তের সঙ্গে গ্রামবাসীদের অভিযোগ এবং বিচারের দাবির চিঠি। সব পড়ার পর তার পাথর-মূর্তি দেখেও তোতারাম হালকা সুরে জিগ্যেস করল, হালত আচ্ছা না হই?

শাওন ঠাণ্ডা গলায় ফিরে জিগ্যেস কবল, তুমি ইংরেজি পড়তে পারো?

—থোড়া থোড়া। তবে কষ্ট করে পড়ার দরকার নেই।...পঞ্চ আর গাঁওয়ের মানুষদের কি নালিশ আমি জানি, তাছাড়া মালিক বলছিল তোমাকে সাসপেণ্ড করা হবে, তোমার বিচার হবে...সেই চিঠ্‌টি তো?

শাওন ভার্মা কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক।—সব জেনেও আমাকে কিছু বলনি...মালিকের লোক বলে চুপ করে ছিলে?

একটা আঙুল কপালে ঠেকিয়ে নিস্পৃহ গলায় তোতারাম জবাব দিল, নোকরের নসিব এই রকমই।

আধঘণ্টার মধ্যেই শাওন ফিরল। প্রাণপণে সাইকেল চালিয়েও তোতারাম তার সঙ্গ ধরতে পারল না।

...তিতলি শুনল কি হয়েছে। দুলারী শুনল। তোতারাম বোকা মুখ করে বসে।

রাগে দুঃখে তিতলি প্রথমে শাওনের ওপরেই ঝলসে উঠল।—আমার মতো খারাপ নসিবের মেয়ের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে কেন তোমার এই সর্বনাশ করলে—এর থেকে পুনপুর আঁচরোয়া আমার অনেক ভালো ছিল—অনেক ভালো ছিল!

তার আগুন-পানা মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে শাওন বলল, তিতলি, এরা যা করছে তার জন্য আমারও কম রাগ হচ্ছে না, কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে আমি দুঃখ পাচ্ছি...এ চাকরির আমি পরোয়া করি না, যে-কোনো মুহূর্তে ছেড়ে দেব—কিন্তু তুমি কি আমার ছেড়ে দেবার জিনিস?

থমথমে মুখে তোতারামের দিকে ফিরল, যার লোকই হও, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ...দিন-কতকের জন্য আর একটু উপকার করতে পারো? তোমার মালিকের এই আরামের বাড়িতে আমি তিতলিকে নিয়ে আর একদিনও থাকতে চাই না, তুমি এখানে বা যেখানে হোক আজকের মধ্যে দুখানা ঘর যোগাড় করতে পারো? ভাড়া বেশি হলেও আপত্তি নেই।

তোতারাম ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে রইলো, তারপর ফিরে বলল, এ কুঠি আমার মালিক ব্রিজমোহনের তোমাকে কে বলল?

শাওনের গলার স্বর নীরস।—এটা ঠাট্টার সময় নয় তোতাজী!

তোতারামের পালিশ করা মুখ।—হায় রাম, সক্কলের বুরা বাত শোনাই আমার বরাত দেখছি। সাচ বাত্ শোনো দোস্ত, ঠাকুর ব্রিজমোহন শুধু জানে তোমাদের আমি মাসাউরির কোনো কুঠিতে এনে তুলেছি, কোন্ কুঠি সে জানেও না—এইসব আরামের কুঠিয়াঁতে তোমরা আছ জানলে মালিক আমার ওপরেও গোঁসা হবে—তুমি তোমার কোনো চেনা লোকের কুঠিতেই আছ, কিন্তু কার কুঠি জিগ্যেস করে আমাকে মুশকিলে ফেলো না—ব্রিজমোহন জানতে পারলে যার কুঠি তারও অসুবিধে হবে।

শুনে তিতলিও আকুল, আর শাওন বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তোতারামের দিকে চেয়ে আছে। চাকরিতে এমন একটা হীন চক্রান্তের গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে শুনে দুলারীরও দুঃখ হয়েছে। এবারে সে কোমল গলায় বলল, ভাইসাব, ব্রিজমোহনের ওই চামচা আমাকে অন্তত তার কুঠিয়াঁতে এনে রাখতে সাহস করবে না—এটা ব্রিজমোহনের কুঠি নয় তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

শাওন প্রথমে ভেবে পেল না তাব আর কোন্ চেনা লোকের বাড়ি হতে পাবে এটা, যেখানে দুজন সশস্ত্র পাহারাদার মজুত। ভাবতে গিয়ে ইঁট-সিমেন্ট-বালি লোহা-লক্কড়ের কারবারের মালিক গণপত লালার কথা মনে পড়ল। ছুপা ছাড়াও অন্যত্র তার গোটা দুই বাগানবাড়ি আছে শুনেছিল।...ওই লোক নিজের স্বার্থেই এতদিন তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করেছে, কথা-বার্তায় বিনীত, ভদ্র। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ অভিযোগ পত্রে সরকারের টাকার ইঁট বালি

সিমেন্ট দিয়ে অচ্ছুত পাড়ায় কুঁয়ো করে দেবার নালিশ আছে বটে, কিন্তু শাওনের মনে পড়ল পঞ্চের মাতব্বরদের মধ্যে অভিযোগ পত্রে কেবল ওই একজনেরই স্বাক্ষর নেই। আগেও সেটা লক্ষ্য করেছিল, আর ভেবেছিল, ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের নাম জড়াতে চায়নি বলেই তার স্বাক্ষর নেই—নইলে সে তাদের দলেরই একজন হবে। এখন বুঝল, তোতারাম যে-ভাবেই হোক তাকে বুঝিয়ে ওদের এই বাড়িতে এনে তুলেছে, আর এটা জানাজানি হয়ে গেলে পঞ্চএর মুরুব্বিদের কাছে তার একটু বেকায়দায় পড়ারই কথা।

শাওন ভিতবে ভিতরে একটু নিশ্চিন্ত। গণপত লালাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে যতদিন এখানে থাকবে তার ভাড়া জোর করেই তাকে গছিয়ে দিতে পারবে।

...তদন্তের ফল কি হবে শাওন জানে না। যাই হোক, এরপর এ চাকরি সে আর করবে না। তার একটাই আক্রোশ এখন, ব্রিজমোহন আর তার সাগরেদদের আর লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং-এর মুখোশ সে কি করে খুলে দিতে পারে। তিতলিও যেচে বলেছে, তার অফিসের বড় সাহেবদের কাছে সে-ও যাবে, এখানকার সক্কলের বজ্জাতি আর দুশমনির কথা সে জোর গলায় বলে আসবে।

দু'দিন ঘরে বসে শাওন তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের জবাব সাজালো।...মেঘ না চাইতে জলের দেখাও কোনো কোনো সময় মেলে বোধ হয়।

ঘরে বসে শাওন সামনের গেটের দিকে চেয়েছিল, বিমনার মতো অনেক কিছুই ভাবছিল। তাদের সাইটের জিপটা এসে ফটকের সামনে দাঁড়ালো। প্রথমে নামলেন তার প্রধান মুরুব্বি প্রকাশ দীক্ষিত। পিছন থেকে নামলো তোতারাম।

শাওন তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। দু'দিন ধরে কেবল এই একজনের কথা বার বার মনে পড়ছিল। প্রথম দফায় তাঁর কাছে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে চিঠিতে লিখেছিল, সামনাসামনি তার অনেক কথা বলার আছে, যত শিগগির হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলবে। দ্বিতীয় দফায় ছুটি নেবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলার জন্য পাটনায় গিয়ে দেখে তিনি নেই, বেশ কিছুদিনের জন্য কলকাতায় গেছেন।

...কিন্তু তিনি কাছে আসতে শাওনের মুখে খুশির হাসি মিলিয়ে গেল। প্রকাশ দীক্ষিতের থমথমে গম্ভীর মুখ। শাওন হাত জোড় করে নমস্কার করতেও মাথা পর্যন্ত নাড়লেন না, রুষ্ট চাউনি।

ঘরে এনে বসাতে প্রথমেই তোতারামকে বললেন, তুমি বাইরে অপেক্ষা করো, আমার এর সঙ্গে কথা আছে।

তোতারাম সরে গেল। শাওন কর্তব্য করার সুরে বলল, আগে একটু চা দিতে বলি স্যার?

প্রকাশ দীক্ষিত মাথা নাড়লেন। বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে তদন্তের ভার নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছি, চায়ের দরকার নেই। বোসো—

অপমানে শাওনের মুখ লাল। চুপচাপ বসল।

—তুমি এখানে আসার সময়েই সাবধান করেছিলাম, এখানকার জাত-পাতের ব্যাপারে

অনেক গণ্ডগোল, তুমি তাতে কান দেওয়ার দরকার মনে করোনি? একটা ছোট জাতের মেয়ের সঙ্গে নিজেকে এ-ভাবে জড়িয়েছ?

শাওন ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, আমি জড়াইনি, আমি তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছি। আমি আশা করব আপনি তার সম্পর্কে একটুও অসম্মান করে কথা বলবেন না।

প্রকাশ দীক্ষিত থমকালেন একটু। কিন্তু তাদের জাতের লোকেরাই তোমার সম্পর্কে এ-সব কি লিখছে?

—তাদের এলাকার একজনেরও কোনো অভিযাগ আছে কিনা আপনি তদন্ত করুন।

প্রকাশ দীক্ষিত চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে আছেন। একটু বাদে বললেন, শোনো, আমি কাল থেকেই ছুপায় এসে তোমার ক্যাম্পে আছি। প্রথমেই ব্রিজমোহনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তার বক্তব্য শোনার পর অন্য সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে সব জানার জন্য সে ওই তোতারাম না কে, সঙ্গে দিয়েছে। আমি অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি, তারা তারই শেখানো পড়ানো লোক এটা বোঝা গেছে। জনার্দন পূজারীর সঙ্গে আর আলাদা করে তার দুই মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেছি।...সীরিয়াস অপারেশনের জন্য পরের দিন না গিয়ে ওদের নিয়ে আগের দিন তুমি পাটনায় গেছলে, এ-কথা সেখানে গিয়ে তুমিই আমাকে বলেছিল। এর মধ্যে ভাঁওতার ব্যাপার কোনগুলো তা মোটামুটি আঁচ করতে পারছি।...ইঁট সিমেন্টের কারবারী গণপত লালার সঙ্গে দেখা হয়নি, ইচ্ছে করেই সরে আছে কিনা জানি না—সরকারি টাকায় জিনিস কিনে খনির মজুর খাটিয়ে কুয়ো করে দেবার ব্যাপারটা কি?

সকলের থেকে আপনার জন যাকে ভাবত, তাঁর ওপরেই শাওনের এখন সব থেকে বেশি অভিমান। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, কুঁয়োর জন্য মাল-মশলার সব টাকা আমি নিজে দিয়েছি, সে-সব রিসিট আমার কাছে আছে—সাইটের কাজের জন্য যেমন পাই তেমনি ডিসকাউন্টে পেয়েছি শুধু।...আর সেই এলাকায় অছুতদের মধ্যে দিনে যারা খনির কাজ করে রাতের পর রাত জেগে তারাই কুঁয়োর কাজ করেছে—আর বিনা পয়সায় কাজ নিজেদেরই স্বার্থে বলে কত আনন্দ করে করেছে আপনি খোঁজ করুন।

—কিন্তু তুমি উদার হয়ে নিজের টাকায় ওদের জন্য কুঁয়ো করে দিতে গেলে কেন?

আত্মজনের ওপর অভিমানের পরিণাম ক্রোধ। তবু সংযত মুখেই শাওন জানালো কেন নিজের টাকায় কুঁয়ো করে দিয়েছে। ভালো জলের অভাবে ওই এলাকার কত লোক কলেরায় মারা যায়, আর সমাজের ভদ্র এলাকায় ওদের মেয়েরা কি-ভাবে বেইজ্জত হয় জানিয়ে বলল, আমি যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছি, তার অনুরোধে এই কুঁয়ো করে দিয়েছি এটা সত্যি কথা।

—কিন্তু যে-মেয়েকে তুমি বিয়ে করেছ তার পিসী হীরা মল্লার সঙ্গে দেখা করতে সে তো কান্নাকাটি করে বলল, তুমি তাকে ভুলিয়ে চুরি করে নিয়ে এসেছ?

শাওন থমকে চেয়ে রইলো একটু, তারপর ক্রুদ্ধ শ্লেষের সুরেই বলল, বাইশ বছরের মেয়েকে ইচ্ছে করলেও ভুলিয়ে চুরি করে আনা সহজ নয় সার। তারপরেই ভিতরের দরজার দিকে চেয়ে হাঁক দিল, তিতলি—!

তোতারামের মুখে খোদ বড় সাহেব তদন্তে এসেছেন শুনে তিতলি আর দুলারী

কাছাকাছিই ছিল। ঘরের কথা কিছু কিছু কানে এসেছে। ডাক শুনে তিতলি ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। মাথায় খাটো ঘোমটা, দু'হাত জোড় করে বড় সাহেবকে নমস্কার করল।

জবাবে প্রকাশ দীক্ষিত বিমূঢ় মুখে চেয়েই রইলেন। অভিযোগ পত্রের সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়া হীরা মল্লা আর তার সঙ্গে তিতলির ফোটো আছে। কিন্তু সেই ফোটো দেখে তিনি ধারণাও করতে পারেন নি মেয়েটা এত সুন্দর। তাছাড়া ওটা ছিল ঘাগরা-পরা এক উচ্ছল মেয়ের ফোটো। কিন্তু শাড়ি-পরা এই দিব্যাঙ্গনা যেন আর কেউ, আর একজন। দেখা-মাত্র ভেতরটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এমন এক মেয়ের জন্য যে-কোনো ছোকরার মুণ্ডু ঘুরতে পারে বটে। একটু ব্যস্ত হয়ে প্রকাশ দীক্ষিত বললেন, বয়েঠ্ যাও মায়ি, বয়েঠ্ যাও—

শাওন বলল, আপনি বাংলা বললে ও বুঝতে পারবে। তিতলির দিকে ফিরল, বোসো।...ইনি আমার বড় সাহেব শ্রীপ্রকাশ দীক্ষিত, আমার বিরুদ্ধে ছুপার মানুষদের নালিশের তদন্ত করতে এসেছেন, তোমার ফুফু হীরা মল্লা এঁর সামনে কান্নাকাটি করে বলেছেন, আমি তোমাকে ভুলিয়ে চুরি করে এনেছি। এর জবাব তুমি দেবে না আমি দেব?

তিতলির তপতপে মুখ। পতির অপমানে সতীর ক্রোধ দেখলেন প্রকাশ দীক্ষিত। তিতলি তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে বসল। মিষ্টি গলার দৃঢ় জবাব, আমি বলব...তুমি কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে গেলে ভালো হয়।

শাওন গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো।—তুমি কোনো রকম অনুরোধ করতে যাবে না, তোমার ব্যাপারে যা সত্যি আর কি ভাবে আমার কাছে এসেছ সেটুকুই শুধু বলবে। তারপর প্রকাশ দীক্ষিতের দিকে তাকালো, আমি আপনার কোনো অনুগ্রহের প্রত্যাশায় ওকে ডাকি নি সার, যা সত্যি সেটুকু কেবল জেনে নিন...আমি ওকে বলে রেখেছি আপনাদের তদন্তের ফল যা-ই হোক, আমি আর ও চাকরি করব না—

এবারে ধমকের সুরে প্রকাশ দীক্ষিত বলে উঠলেন, ডোন্ট বি অ্যান অ্যাস্—

এই ধমকে আগেকার সেই স্নেহের সুর বাজল মনে হতে অকটু থমকে দাঁড়িয়ে শাওন ঘর তকে বেরিয়ে এলো।

আধঘণ্টা বাদে তার ডাক পড়ল। তিতলির লালচে মুখ আরো গনগনে, কিন্তু কালো চোখে যেন আলো ঠিকরোচ্ছে। প্রকাশ দীক্ষিত যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। তেমনি গম্ভীর। বললেন, তোমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তার একটা লিখিত জবাব আমাকে দেবে—

শাওন ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা লম্বা খাম এনে তাঁর হাতে দিল।—অফিসে যাচ্ছি না, তাই টাইপ করার সুবিধে হয়নি।

সেটা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, গণপত লালার সেই সব রিসিট এতে আছে?

—ক্যাম্পে আছে।

—ওগুলোর দরকার হবে, লেবার রেজিস্টার চেক্ করার সময়ও তোমাকে দরকার হতে পারে, জিপ্ পাঠালেই চলে আসবে...এখন আমি লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি...সে-ই বোধহয় এখন তোমার সব থেকে বড় শত্রু?

—মনে হয়। শাওনের ঠাণ্ডা জবাব।

দরজা পর্যন্ত গিয়েও প্রকাশ দীক্ষিত ঘুরে দাঁড়ালেন। তিতলির দিকে চোখ পড়তে গম্ভীর মুখ কোমল একটু, কিছু যেন বলতে গিয়েও বললেন না। শাওনের দিকে ফিরলেন।—আমার জিপ না এলে দিনকতক এখন বাহাদুরি করে বাড়ি থেকে বেরিও-টেরিও না। সঙ্গে যে লোকটা এসেছিল তাকে ডেকে দাও—

দালান থেকে নেমে ফটকের বাইরে এসে জিপে উঠলেন। পিছনে তোতারাম।

জিপ চোখের আড়াল হতে শাওন জিগ্যেস করল, সব শুনেছেন?

সব—সব, মনোয়াঁমে যা ছিল সব কহলী—ফুফু ব্রিজমোহন আর কুন্দন সিং-এর মুখোশ খুলে দিয়েছি—তোঁহার বড়াসাব খুব মন দিয়ে সব শুন্‌ল, আর রাতে পুনপুর জলে ডুবে মরতে গেছলাম শুনে খুব বকল, বলল, ঘর ছেড়ে বোকার মতো ও-দিকে না গিয়ে সোজা তোমার কাছে চলে এলাম না কেন। তারপর ফিক করে হাসল একটু, আর যা বলল শুনলে তোমার দিমাগ হবে—বলব না।

শাওন কিছু জিগ্যেস না করে শ্রান্ত মুখে বারান্দার মাচিয়ায় বসল। এই লোক তাকে কত স্নেহ করেন রাগে আর ক্ষোভে তা-ও মনে ছিল না।

তিতলি এগিয়ে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।—না বললেও ভালো লাগছে না, বলেই ফেলি। সব শোনার পর বড়াসাব বলল, তোমাদের দিন খুব খারাপ যাচ্ছে এখন, তবু মনে রেখো যে আদমীকে পেয়েছ তুমি, দশ-বিশ হাজারোর মধ্যে এ-রকম একজন হয় না।

শাওন অখুশি নয়। একটু হেসেই মন্তব্য করল, তা তো হল, কিন্তু উনি এখন যাচ্ছেন কুন্দন সিং-এর কাছে—সে তাকে বলবে দশ-বিশ হাজারের মধ্যে এ-রকম একজন দুশমন হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে তিতলি ঝলসে উঠল, কিষণজীকা মরজি হো তো ওক্‌রা নতিব পরভি আগ্‌ লাগি।

বেলা বারোটার পরে তোতারাম একলা ফিরল। শুকনো মুখ, ক্ষুধার্ত। এসেই জানান দিল, রহুয়া কুন্দন সিং এখনো সে রকম সুস্থ নয়, তাই সেখানে তার খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে হল না। খবর তেমন বিশেষ বলতে পারল না, দীক্ষিত সাহেবের সঙ্গে কুন্দন সিং-এর যা কথাবার্তা হয়েছে, তোতারামকে ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে ভিতর থেকে দুই একবার ইঁট-সিমেন্টের কারবারী গণপত লালার নামটা তার কানে এসেছে। আর দীক্ষিত সাহেবকে বিদায় দেবার সময় বাইরে এসে রহুয়া কুন্দন সিং তাঁকে বলছিল, ওই ক্যাম্প-ইন-চার্জ শাওন ভার্মা আর তিতলির খবর দিল্লীতেও পৌঁছে গেছে।

এটুকু শুনেই শাওন গুম। এরা বেশ আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে।

পরের চার দিনের মধ্যে দু'দিন জিপ এসে শাওনকে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। সেখানে প্রকাশ দীক্ষিতের বিচারকের মুখ।

এর পরের দিনটা ছুপার এক স্মরণীয় দিন। মহাবীর জিউর আঙিনায় পঞ্চএর বড় বৈঠক বসেছে বিকেল চারটেয়। বিচার সভা নয় কিছু, অনেকটা সামাজিক বৈঠক গোছের সমাবেশ। সরকারের তরফের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নিতে এলে

পঞ্চের মুরুব্বিরা তাঁকে নেওতা দিয়ে থাকে। গ্রামের দরিদ্র শ্রমিক মজুরেরা আসে, অচ্ছুতরা আসে, তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলে। এই বৈঠকেরও বাইরের হাওয়া তেমনি। কিন্তু সকলেই জানে, খনিয়ার কাজে সব থেকে বড়া সাহেবের সম্মানে এই বৈঠক ডাকার বিশেষ একটা লক্ষ্য আছে।... প্রকাশ দীক্ষিত এসেছেন এবং সমাদরে আসন গ্রহণ করেছেন। পঞ্চের মুরুব্বিদের মধ্যে একমাত্র ইঁট-সিমেন্টের কারবারী গণপত লালা ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত। অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও ঠাকুর ব্রিজমোহনের বিশেষ অনুরোধে লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিংও এসেছে। তার দুই সহচর লছমন আহির আর ছাবুয়া আহির মালিককে দু'দিক থেকে ধরে এনে বসিয়েছে। সে আসাতে ব্রিজমোহন আর তার সতীর্থরা খুব খুশি। তার ভূমি-সেনারাও দল বেঁধে এসেছে। কিন্তু ব্রিজমোহন একটু খুঁত-খুঁত করছে অন্য কারণে। দরিদ্র শ্রমিক মজুর আর অছুতরা যে-ভাবে দল বেঁধে আসবে ভেবেছিল, তেমন আসেনি। এর চারগুণ লোক হবার কথা। আর এমন দিনে অনুপস্থিত ইঁট-সিমেন্টের কারবারী গণপত লালাও। এ-সব কারণেই ব্রিজমোহন অসহিষ্ণু চোখে ভাইপো বাবুয়ার দিকে এক-একবার তাকাচ্ছে। চাচার ক্ষোভের কারণ বুঝে বাবুয়াও এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। নিজের দলের লোকের সঙ্গে কথা বলছে।

জনসাধারণের তরফ থেকে দু'জন আর পঞ্চের তরফ থেকে মহাদেও প্রসাদ, জগদেও মিশির প্রকাশ দীক্ষিতকে স্বাগত জানালো। তারপর একে-একে তিন-চারজন অছুত আর দরিদ্র শ্রেণীর লোক এসে জানালো, পঞ্চের মুরুব্বিদের সহৃদয়তায় তারা কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে।...কিন্তু সরকারের খনিয়ার কাজে একজন বড় লোক তাদের মেয়েদের মান ইজ্জত নষ্ট করছে, তাদের জাত-পাতের সংস্কারে নানাভাবে আঘাত করছে।

তিন চারজনের মুখে এ-রকম শোনার পর প্রকাশ দীক্ষিত বললেন, খনির কাজের ওই লোকটি যে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়েছে বলে গ্রামের লোকের নালিশ—সেই অছুত এলাকার কারা এখানে উপস্থিত আছে—তাদের বক্তব্য কি?

সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজমোহনের ইশারায় বাবুয়া নতমুখী দুঃখে ম্লান হীরা মল্লাকে এগিয়ে নিয়ে এলো। প্রকাশ দীক্ষিত বললেন, আমি নিজে ওর ঘরে গিয়ে ওর সব কথা শুনেছি, ওই এলাকার আর যারা এখানে উপস্থিত আছে আমি তাদের এখানে ডাকছি—একে দরকার নেই।

সকলের উদগ্রীব প্রতীক্ষা, কিন্তু দেখা গেল কেউ এগিয়ে আসছে না। ব্রিজমোহনের ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টি আবার ভাতিজা বাবুয়ার দিকে। সে চিৎকার করে বার কয়েক ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও কেউ এগিয়ে এলো না।

তাদের বদলে যে কালো আর মোটামুটি সুশ্রী এক মেয়ে এগিয়ে এলো তার বয়েস কম করে তিরিশ। মাথায় রুক্ষ কেশ, উগ্র চাউনি, বেশ-বাসেও তেমন যত্ন নেই। যারা চেনে, ওকে মান্যগণ্যদের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বিষম অবাক। কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু অবাক ব্রিজমোহনও। তার নাম রামকেলী, কিন্তু পরিচিত গেঁয়ো লোকদের মুখে সে রামকোল। সদর্পে সত্যিই সে কাছে এগিয়ে আসছে দেখে মাতব্বর'দের দিক থেকে কে একজন বলে উঠল, চুড়েলকো (পেত্নী) হটা দো।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে মেয়েটাকে সটান এসে, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রিজমোহনের

দিকে তাকিয়েচেঁচিয়ে বলে উঠল, বোল বাবুয়াকে চাচা, এতো লোগঁন্‌কা বিচার কৈসন বা দিনমে হাম লোগঁনকে অছুত দেখাই দি, আজ এ ভরে পঞ্চমে চুড়েল কহল—লেকিন রাতমে শরীরকা কোণে কোণে ছুত্ দেতখাইকি কহল, ফুলছড়ি, দিল্‌কা রাণী, পেয়ারকা কবুতরী—ও রোজ তু হম্‌কে তোঁহার বাগান-কুঠিয়ামে লে আইলী, পরশু তোঁহার ভাতিজা বুবুয়া হমারী দরওয়াজা খিট্‌খিটাইল—বোল ঠাকুর বোল্, হম ক ভইলি—মা বহু না কসবী (বেশ্যা)?

সভা স্তব্ধ মূক বিমূঢ়।

এমন দুঃসাহসের প্রহসন এই গ্রামে জন্মে কেউ দেখেনি, কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ব্রিজমোহনের ফর্সা মুখ রক্তবর্ণ।

কেউ কিছু বলার আগেই অসুস্থ কুন্দন সিং-এর চাপা গর্জন শোনা গেল। দুই সহচর লছমন আর ছাবুয়া আহিরকে হুকুম করল, ওই নষ্ট ছৌড়ীকে পাকড়ে নিয়ে আমার ভূঁই-সেনাদের হাতে দিয়ে এসো!

আদেশ শুনে ক্রুদ্ধ ব্রিজমোহন আঙুলের ইশারায় বাবুয়াকে ডাকতে যেতেই কুন্দন সিং আবার বাধা দিল, তু শান্ত রহ, হম্ এ বৈঠককা সভাপতি, এ অপমানকা সওয়াল হামারা পর ছোড় দিহ।

ব্রিজমোহন চুপ, নির্বাক। মেয়ে লোকটাকে নিয়ে গিয়ে আদেশ পালন করে মিনিট তিনেকের মধ্যেই লছমন আর ছাবুয়া তাদের মালিকের পিছনে এসে দাঁড়ালো। ওই পতিতা মেয়েটার কথা শুনে প্রকাশ দীক্ষিতের দু'কান লাল হয়ে উঠেছিল। এখন ভেবাচেকা-খাওয়া ঘাবড়ে যাওয়া মুখ। এর পর নৃশংস কোনো রক্তারক্তি কাণ্ড হবে কিনা ভেবে পাচ্ছেন না। এই ভয়েই হয়তো বৈঠকের ভিড় হালকা হতে শুরু করেছে, গরিব আর অছুতরা অনেকে সরে পড়ছে!

প্রকাশ দীক্ষিতও এখন তাড়াতাড়ি সভা ছাড়তে পারলে বাঁচেন। কিন্তু তাঁর একটি বিশেষ প্রশ্ন এখনো বাকি। ব্রিজমোহনকে জিগ্যেস করলেন, ইঁট সিমেন্টের কারবারী গণপত লালা এখনো অনুপস্থিত কেন...বিশেষ করে তার ব্যাপারটাই আমার জানতে বাকি।

ব্রিজমোহন ধৈর্যহারা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। দু' চোখে নীল আগুন ঠিকরোচ্ছে। আবার বাবুয়ার খোঁজেই হয়তো এ-দিক ও-দিক তাকালো। কিন্তু কুন্দন সিংই তাকে টেনে বসিয়ে দিল। তার কানে কানে বলল কিছু। তারপর আমন্ত্রিত অতিথির দিকে ফিরল, মিস্টার দীক্ষিত, গণপত লালা ব্যবসায়ী মানুষ, হয়তো কোনো বিশেষ কাজে আটকে পড়েছে... কালকের মধ্যে যে-কোনো একসময় আমি তাকে আপনার ক্যাম্পে গিয়েদেখা করার ব্যবস্থা করব।

প্রকাশ দীক্ষিতের মুখভাবে স্পষ্ট যে এই দিনে গণপত লালার সভায় না আসাটা তাঁর মনঃপূত হল না। তিনি কুন্দন সিং-এর দিকেই ফিরলেন, এবার আপনার কি বলার আছে?

কুন্দন সিং দু'বার মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে বলল, আমার অন্য মামলা, আর তা ফয়েসলা করার হিম্মত আমি নিজেই রাখি—ব্রিজমোহন আমার ছোট ভাইয়ের মতো, তার অনুরোধে তার সম্মান রাখার জন্য অসুস্থ শরীর নিয়েও এখানে এসেছি...এখন আবার অসুস্থ লাগছে, আপনার হুকুম হলে আমি এক্ষুনি ফিরব—

পাংশু ব্যস্ত মুখে ব্রিজমোহন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো।—রহয়া, এ বাত তো সাহাবকো সমঝাই দিহ যে গাঁওকি ছৌড়ীলোগকো ও শালে শাওন ইজ্জত আবরুপর আঁখমিছলি করতারে—

উঠে দাঁড়িয়ে কুন্দন সিং তেমনি বিড় বিড় করে জবাব দিল, লোহার গাঁওমে যব তু সাহাবকো ভেজাথা ম্যাঁয় উনকো হামারা বাত কহি থি, আব হামারা হিসাব তু হমার পর ছোড় দিহ।

সভা শেষ। প্রকাশ দীক্ষিতকে ধন্যবাদ আর নমস্কার জানিয়ে দুই সহচরের কাঁধে ভর দিয়ে কুন্দন সিং ধীরে ধীরে তার গাড়ির দিকে চলল। ঘামছে। কিন্তু ব্রিজমোহন বা অন্য কেউ বুঝল না, লোকটা সত্যি অসুস্থ বোধ করছে।

সন্ধ্যা হয় হয়। সভা ভেঙেছে, কিন্তু মাতব্বরদের নিয়ে ব্রিজমোহন সেখানেই পরামর্শে বসেছে। তার সামনের আসনে জনার্দন পূজারী, মহাদেও প্রসাদ আর জগদেও মিশির। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে তোতারাম। আর হুকুমের অপেক্ষায় জনাকতক বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে অদূরে অপেক্ষা করছে বাবুয়া। তাদের ধমনীর রক্ত ফুটছে। এখন মুরুব্বিদের সংকেত পেলেই তারা যা করার করতে পারে।

মাতব্বরেরা এটুকু অন্তত বুঝেছে, তদন্তকারী অফিসারকে অভিভূত করার মতো পরিবেশ তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু তারা ভেবে পাচ্ছে না গণপত লালা কেন এলো না। কুন্দন সিং অবশ্য ব্রিজমোহনের কানে কানে বলেছে, সরকারের কাজ করে যে কারবারীরা মুনাফা লোটে, সরকারের ব্যাপারে তারা সামনাসামনি লড়াইয়ে আসতে চায় না, পরে ব্যবস্থা করা যাবে। মাতব্বররা আরো ভেবে পাচ্ছে না, হীরা মল্লার এলাকার আর কোনো অছুতের এখানে না আশার মতো সাহস হল কি করে! আর তাদের কাছে সবথেকে অবাক ব্যাপার, চুড়েল রামকেলি সভায় এসে মাতব্বরদের মুখে এ-ভাবে চুন-কালি দিয়ে গেল কোন্ সাহসে, কার প্ররোচনায়? ছুপা গাঁওয়ের এ কি দুর্দৈব আজ!...সভাপতি হিসেবে কুন্দন সিং এ অপমানের ব্যবস্থার ভার নিয়েছে। তার মতো রাশভারী প্রতিপত্তির মানুষের এমন অপমান বরদাস্ত না করারই কথা। কিন্তু এর দরকার কি ছিল। যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা তো ব্রিজমোহন এই রাতের মধ্যেই করতে পারত। জনা কুড়ি জোয়ান ভূমিসেনা তাকে রাতের অন্ধকারে পুনপুর ধারে ধরে নিয়ে পুরুষের অত্যাচার শুরু করলে দেহের খাঁচা থেকে তার প্রাণটুকু বার করে দিতে কতক্ষণ লাগত? কেউ জানতেও পারত না, পরদিনের মধ্যে তার মৃতদেহ পুনপুর স্রোতে কোথায় ভেসে যেত ঠিক নেই।

সকলকে সচকিত করে ভটভট আওয়াজ তুলে একটা মোটর সাইকেল আসছে। এ তল্লাটে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায় একমাত্র গণপত লালা। সে এতক্ষণে আসছে!

কিন্তু আবছা অন্ধকারে মোটর সাইকেলটা এসে দাঁড়াতে সকলেই হতভম্ব। মোটর বাইকের পিছন থেকে যে নামল তার অচেনা মুখ, পরনে পুলিশের পোশাক। আর সামনে থেকে নামল প্রধান থানাদার যোগীন্দর চৌবে। এই থানাদারটি চেনা এবং পেটোয়া লোক। সময়ে অসময়ে এক জনার্দন পূজারী ছাড়া অন্য মাতব্বরদের অনেক কাঁচা টাকাই তার পকেটে আসে। সকলের উদ্দেশে অভিবাদন জানিয়ে যোগীন্দর চৌবে যে খবর জানালো তা সচকিত হবার

মতোই। শহর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ফারমান এসেছে, ছুপা আর লোহার গাঁওয়ে গণ্ডগোল হতে পারে, কিছুদিনের জন্য ওই দুই গাঁয়ে যেন বেশি পাহারাদার রাখা হয়, আর দুই গাঁয়েরই মাতব্বরদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়, তারা যেন কোনরকম হামলার প্রশ্রয় না দেয়।

ব্রিজমোহন বিমূঢ়।—কেন, গণ্ডগোল হতে যাবে কেন?

—কা মালুম মালেক, এইসব হুকুম আগইল। আরো জানালো, লোহার গাঁওয়ের দায় তার নয়, হুকুম-মাফিক এই গাঁওয়ের হুজুরদের সে বলে গেল।

সবিনয়ে আর দুই একটা সাধারণ কথা বলে সঙ্গীকে নিয়ে আবার সে মোটর বাইকে চেপে প্রস্থান করল।

মাতব্বরদের কারো মুখে কথা নেই খানিকক্ষণ।...এই রাতেই ভূমিসেনা পাঠিয়ে হীরা মল্লার এলাকা সরগরম করে আসার প্ল্যান মাথায় ঘুরছিল তাদের। তার মধ্যে এ কি অবাক কাণ্ড!...আগে থেকে খবর পেলে এ-রকম হুঁশিয়ারি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে ব্রিজমোহনের এম এল এ ভাগ্নে পবনকুমার। হয়তো গাঁয়ের কারো যোগসাজশে কিছু খবর পেয়েছে।...কিন্তু ঠাকুর কুন্দন সিং তো তার মিত্র, তার গাঁওকেও এই সঙ্গে জুড়ল কেন! তারপর ভাবল, পোলিটিক্যাল আদমীরা এই রকমই, এই মুহূর্তে যে পরম মিত্র, পরের মুহূর্তে সেই পরম দুশমন।

যা-ই হোক, এই দিনটা খুব অনুকূল নয়, মাতব্বরেরা এটুকু বুঝেছে। ব্রিজমোহন বাবুয়াকে ডেকে তার অনুচদের নিয়ে চলে যেতে বলল। আপাতত তাদের কিছু করার নেই—কারো সঙ্গেই কোনরকম হামলা বা গণ্ডগোলের মধ্যে যাবার দরকার নেই।

রাত্রি।

তিতলি শাওন দুলারী তিনজনেই স্তব্ধ নির্বাক।

তোতারাম আজকের পঞ্চের বৈঠকের আদ্যোপান্ত বলেছে। একটু চুপ করে থেকে সে মন্তব্য করল, আজ মাতব্বরদের নসিব খারাপ বলতে হবে, কোনো কিছুই তাদের মনের মতো হয়নি। সেদিক থেকে ভাবলে দোস্তএর (শাওনের) নসিব হয়তো ভালো—

তিতলি আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল, কিন্তু ওই রামকেলির কি হবে, কুন্দন সিং-এর ভূমি-সেনার দল তাকে নিয়ে গিয়ে কি মেরে ফেলবে?

রামকেলিকে তিতলি চোখেও দেখেনি কখনো। কিন্তু তার জন্য বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। সাদা-মাটা গলায় তোতারাম বলল, মেরে না ফেলে তাকে স্বর্গসুখেও রাখা হতে পারে।

এক এক করে বারোটা দিন কাটল তারপর। প্রকাশ দীক্ষিত পঞ্চের সেই বৈঠকের পরদিনই পাটনা ফিরে গেছেন। তারপর থেকে আর কোনো খবর নেই। এই অনিশ্চিত ভাগ্যের মোহনায় বসে থাকতে থাকতে শাওনের ভিতরটা এক এক সময় বিদ্রোহ করে ওঠে। পাটনায় গিয়ে চাকরি রিজাইন করার জন্য প্রস্তুত হবে কিনা ভাবে। তিতলি তাকে আগলে রাখে। এই জীবনে সে-ই সম্বল, সান্ত্বনা। তার মনের অবস্থা দেখে দরজা বন্ধ করে নাচে, গান শোনায়, তার

বুকে নিজের চিবুক ঘষতে ঘষতে বলে, কিষণজীর কিরপায় সব ঠিক হয়ে যাবে—তুমি কিছু ভেব না—এখান থেকে চলে যদি যেতে হয় আমরা মাথা উঁচু করেই যাব।

শাওনের তখন মনে হয়, এই একটি মেয়ের জন্য জীবনের সব দুর্যোগ সহ্য করা যায়।

এই ক'দিন ধরে একটাই খবর মাসাউরিতেও ভেসে আসছে। লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং -এর বুকের ব্যামো এবারে ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে জ্ঞান থাকছে না। পাটনাতে তিন বড় ডাক্তারের কমিটি বসেছে লোহার গাঁওয়ে। অক্সিজেন চলছে। দিল্লিতে টেলিগ্রাম করে তার এম পি ভাইকে আনানো হয়েছে।

শাওন ভার্মার এটা কোনো নিদারুণ খবর ভাবার কারণ নেই। মুখে না বললেও তিতলি এর পিছনে কিষণজীর কিরপাই ভাববে না ব্রিজমোহনের আরো ভীষণ অত্যাচারের পূর্বাভাষ দেখবে জানে না। লোহার গাঁওয়ের ওই মানুষ ভয়-ডর জানে না। আর ছুপার এই মানুষ বিপাকে পড়লে ভীতত্রস্ত, এটুকুই যা ভরসার কথা।

দুদিন আগে খবর এলো কুন্দন সিং-এর অবস্থা আরো খারাপ। তোতারাম এসে বিষণ্ণ দুলারীকে লোহার গাঁওয়ে নিয়ে চলে গেল। ফলে শাওন আর তিতলি স্বস্তি বোধ করল একটু। কুন্দন সিং-এর অবস্থা খারাপ শোনার পর থেকেই দুলারীর উতলা মুখ, বেশি খারাপ শুনলে মুখে শোকের ছায়া। তার এই মনের সঙ্গে শাওন বা তিতলি মন মেলায় কি করে? আর মন-রাখা কপট উদ্‌বেগই বা প্রকাশ করে কি করে?

তেরো দিনের দিন ওদের দু'জনেরই জীবনে আবার যেন নতুন সূর্যোদয়। অভাবিত সূর্যোদয়।

সকাল আটটায় ফটকের সামনে সাইটের জিপটা এসে দাঁড়ালো। জিপ থেকে নামল শাওনের সাইটের সহকারী, যে এতদিন তার হয়ে কাজ চালাচ্ছিল। তার হাতে একটা বড় খাম, আর ক্যালেণ্ডারের মতো কাগজে মোড়ানো কি। এসে হাসি মুখে জানালো, খুব ভোরে পাটনা থেকে সে সোজা এখানে আসছে। প্রকাশ দীক্ষিত তাকে তাগিদ দিয়ে সক্কালেই চলে যেতে বলেছেন। খুব ভালো খবর আছে।

তাকে বসতে দিয়ে শাওনও বারান্দায় বসল। তার হাত থেকে বড় কামটা হাতে নিল। ভালো খবর শুনে তিতলিও পায়ে পায়ে না বেরিয়ে এসে পারল না।

—হ্যাঁ, ভালো খবরই বটে। তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার হেড অফিস তাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দিয়ে সসম্মানে আবার কর্ম-ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছে। গাঁয়ের যে মাতব্বরদের হীন চক্রান্তের ফলে মিথ্যা অভিযোগ এনে ভারত সরকারের একজন সৎ পদস্থ কর্মচারীকে অপদস্থ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার জন্য রাজ্য সরকারকে লেখা হবে, এই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এটুকু কোনো চমকের খবর নয়।

ক্যালেণ্ডারের মতো মোড়ানো কাগজ খুলে সহকারী এবারে যা শাওনের হাতে দিল, আসল চমক সেটাই।

একই তারিখের খবরের কাগজের দুটো কপি। আজকের নয় গতকালের কাগজ। নিচের

দিকে শাওন ভার্মা আর অছুত-কন্যা তিতলির বিয়ের ছবি। যে-ছবি বিয়ের রাতে "ইসমাইল প্লীজ" বলে তোতারাম তুলেছিল। কিন্তু খবরটা এখানকার নয়, দিল্লির। ওপরে হেডিং, জাত-পাতের সমাধির নজির। ছবির নিচের খবর, ভারত সরকারের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ব্রাহ্মণ সন্তান শাওন ভার্মা একটি অছুত কন্যাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে দীর্ঘ দিনের এক অন্ধ সংস্কারের মূলে আঘাত করেছেন। নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এর আগে আপদে বিপদে সামজের ওই অপাংক্তেয় অছুতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, নিজের টাকায় নিজের পরিশ্রমে গভীর কুঁয়ো খনন করে দিয়ে বিস্তৃত একটি অছুত এলাকার দীর্ঘকালের পরিশ্রুত জলের অভাব দূর করেছেন। জাত্যাভিমানের যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এতকাল ধরে ছুত আর অছুতদের মধ্যে হিংসার স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, আশা করা যায় এমন একটি উদার বিবাহের বীজের মধ্যে তার ধ্বংসের ঘোষণা শোনা যাবেই। পরের খবর, জাতের মানুষ মর্যাদা দিয়ে কোনো অছুতকে বিয়ে করলে ভারত সরকার যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী শ্রীশাওন ভার্মাকে শিগগীরই পুরস্কৃত করা হবে। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট ভূ-তত্ত্বের দপ্তরও এই উদার দায়িত্বশীল কর্মীটিকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করার কথা চিন্তা করছেন।

খবরের কাগজের এক কপি শাওন পড়ছিল, অন্য কপি তিতলি। পড়া শেষ হল। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকালো। দু'জনেরই চোখের কোণ শিরশির করছে। বিস্ময়ে অভিভূত। এ খবর দিল্লি পৌঁছুলো কি করে, এই বিয়ের ছবি কাগজের দপ্তরে গেল কি করে?

সহকারীটি হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। জানালো প্রকাশ দীক্ষিত নিজে পঞ্চাশ কপি কাগজ কিনে তার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। দু' কপি এখানে দিয়ে বাকিগুলো ছুপা আর লোহার গাঁওয়ে বিলোতে হবে। ছুপায় বিলি করা শুরু হয়েছে, আর বাকি কপি লোহার গাঁওয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

পরে হবে বলে জলযোগের অনুরোধ না রেখে সে চলে গেল।

শাওন আর তিতলি এমনি অভিভূত যে তারা হাসবে নাচবে না কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এই রকম একটা ব্যাপার কি করে ঘটতে পারে তাদের মাথায় আসছে না।

সকাল দশটা নাগাদ আর একটা গাড়ি ফটকের সামনে দাঁড়ালো। খুব পুরনো ধরনের ঝরঝরে অথচ নামকরা গাড়ি। গাড়ি থেকে যে নামল তাকে দেখে দু'জনে আরো অবাক। তোতারাম। এটা তাহলে লোহার গাঁওয়ের কুন্দন সিং-এর গাড়ি।

নেমেই তোতারাম ছুটতে ছুটতে চলে এলো। তারপরেই এরা দু'জন বিমূঢ় হতভম্ব। তোতারাম দাওয়ায় বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কান্না, সেই সঙ্গে আর্তনাদ।—তিতলি শাওন! হাম লোগোঁনকা দেওতা, লোহার গাঁওকি দেওতা, গরিব আওর অছুতকা দেওতা ঠাকুর কুন্দন সিং চল্ গইলঅ—ঠাকুর সাহাব গুজর গইল্অ, আর কভু না বাত করবু—তোতা-তোতা বোল্কে আর কভু হামে না বোলাইবু—শুন্ তিত্লি শুন্, রহুয়া মহা-নিদ্মে গইলী—তোঁহার পালন-পিতাকা ভোরো চার বাজে অন্তকাল হো গইলে!

তিতলি কলের পুতুলের মতো তার পাশে বসে পড়ল। সে কেবল বুঝতে পারছে কুন্দন সিং আর নেই—কিন্তু ব্রিজমোহনের চামচা তোতাচাচা এ-রকম কাঁদছে কেন। পাগলের মতো

সে এ-সব কি বলছে! তিতলি কিচ্ছু বুঝতে পারছে না কিন্তু কি এক অজানা আশংকায় বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছে।

শাওন নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

তোতারাম আবার আর্তনাদ করে উঠল, তিতলি, তু হমার মু পর্ কা দেখতানি? তোঁহার বাইশ বরষোয়াকা পালন্-পিতা ঠাকুর কুন্দন সিং গুজর গইল্ আর তু আভিতক পুকারকে না রোলি! আভিভি দৌড়কে উনহেকে পাস্ যানে না চাহিলি?

তিতলি বিমূঢ় বিভ্রান্ত। চিত্রার্পিতের মতো বসে। তোতাচাচা কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল!

এবার শাওনও মেঝেতে উবু হয়ে বসল। দু'হাতে তোতারামের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তোতাজী, তুমি এ-সব কি বলছ? তুমি তো ব্রিজমোহনের লোক, কুন্দন সিং তো তোমার শত্রু।

—ঝুট্ ঝুট্! ও ব্রিজমোহন চুহা ঠেরে, হম্ ঠাকুর কুন্দন সিংকা গোলাম, হমারী জিন্দেগী উন্হেকে চরণ পর—তু চল্ তিতলি—জল্দি চল্!

শাওন তাড়াতাড়ি উঠল। তোয়ালে কাঁধে এক মগ জল নিয়ে ফিরল। তোতারামের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখ চোখ মুছিয়ে দিয়ে তাকে ঘরে এনে বসালো।

—আমরা তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার খুব শোক হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি...কিন্তু কুন্দন কিংকে তুমি তিতলির পালক পিতা বলছ কেন?

ঘোলাটে শোকার্ত চোখে তার দিকে চেয়ে তোতারাম জবাব দিল, হাঁ, তিতলির দেড় বরষ বয়েস থেকে রহুয়া কুন্দন সিং তার পালক পিতা।

—কিন্তু নথ-ভাঙানির আসরে সে তো তাকে কিনতে এসেছিল, কিনেও ছিল...।

—হ্যাঁ, তিতলি বিটিয়াকে রক্ষা করার জন্য সে তাকে কিনতে এসেছিল, কিনেছিল।

উন্মুখ আগ্রহে তিতলি তার দিকে ঝুঁকল।—কে তাকে নেওতা দিয়েছিল, কে তাকে নথ-ভাঙানির আসরের খবর দিয়েছিল?

—হম্। আজ উনিশ বরষ যাবত তোহার সব খবর আমিই রহুয়াকে দিয়ে আসছি, আর কেবল এই জন্যেই লোহার গাঁও ছেড়ে ব্রিজমোহনের চামচা সেজে এখানে পড়ে আছি—কেবল তোঁহার খাতির।

এরা দু'জনেই স্তব্ধ খানিক। শাওন ভার্মার মনে পড়ল নথ-ভাঙানির আসরে কুন্দন সিং দু'তিনবার নিবিষ্ট চোখে ওকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। সাগ্রহে বলে উঠল, তোতাজী, আমরা এখনো যে কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি আরো একটু খুলে সব বলো আমাদের!

তোতারাম আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। আবার তার চোখে জল। বলল, হাঁ, এখন সব বলার সময় হয়েছে।

এরপর ক্লান্ত টানা গলায় তোতারাম ঘটনা পরম্পরায় যে চিত্রটি তাদের সামনে তুলে ধরল, শুনতে শুনতে শাওন আর তিতলি নির্বাক, নিস্পন্দ। তাদের স্নায়ুগুলো শুধু থেকে-থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

...এই যে কুঠিয়াতে এখন শাওন আর তিতলি বাস করছে, এটা রহুয়া কুন্দন সিং-এর। উইল করে এই কুঠি এখন সে তার মেয়ে-জামাই তিতলি আর শাওনকে দিয়ে গেছে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিতলির মা বসন্তীয়া কুন্দন সিং-এর আশ্রয়ে এসে তার এই কুঠিতেই ছিল। এখন যে ঘরে শাওন আর তিতলি থাকে বসন্তীয়া সেই ঘরেই থাকত। বলদেওর দোস্তদের মধ্যে বসন্তীয়ার গানের সব থেকে বড় ভক্ত ছিল কুন্দন সিং। বলদেও তা জানত। টাকার দরকার হলে, মদের দরকার হলে জোর করেই বসন্তীয়াকে তার কাছে ঠেলে পাঠাতো। তোতারাম নিজের চোখে বসন্তীয়াকে অনেক দেখেছে, তার স্নেহ পেয়েছে। বসন্তীয়ারও খুব গোঁ ছিল। টাকার জন্য বা মদের জন্য কুন্দন সিং-এর কাছে কিছুতে যেতে চাইত না। ফলে বেদম মার খেত। হঠাৎ-হঠাৎ এসে সেই মার তোতারাম স্বচক্ষে দেখেছে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে কুন্দন সিংকে খবর দিয়েছে। তক্ষুনি টাকা এসেছে, মদ এসেছে।

...হাঁ, কুন্দন সিং বসন্তীয়াকে ভালবাসত। এত ভালো পৃথিবীর কোনো মরদ কোনো আওরতকে বেসেছে কিনা তোতারাম জানে না। তার আশ্রয়ে এসে বসন্তীয়াও তাকে কম ভালোবাসেনি। কিন্তু তার ভালবাসার আর একটা দিক পড়ে আছে তার মেয়ের বাপ বলদেওর দিকে। এই ভালবাসাও কম কিছু নয়। মরদকে ছেড়ে তার আশ্রয়ে আসার পরেও কুন্দন সিং সেটা বুঝতে পারত।

...এই কুঠিতে লোহার মানুষ কুন্দন সিং-এর আনন্দের এক অদ্ভুত সুন্দর উৎস তিতলি। তার সঙ্গে খেলা করার সময় অমন জাঁদরেল পুরুষ একবারে বাচ্চা ছেলে হয়ে যেত। নিজে ঘোড়া হয়ে তিতলিকে পিঠে চড়িয়ে এই বাংলোর চার দিকে ঘুরে বেড়াতো। কুন্দন সিং-এর হাঁটু ছড়ে যেত, বসন্তীয়া রাগ করত, হাঁটুতে ওষুধ লাগিয়ে দিত। কিন্তু কুন্দন সিং-এর ঘোড়া হয়ে তিতলিকে পিঠে চাপিয়ে ওর খিলখিল হাসি না শুনলে মোটে ভালো লাগত না। মাকে লুকিয়েও মেয়েকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো।

তিতলির সাড়ে তিন বরষ বয়েস পর্যন্ত এইভাবেই কেটেছিল। বসন্তীয়ার মলিন মুখ দেখে কুন্দন সিং বুঝতে পারত তার মনটা এখনো ঘরের মরদের দিকে পড়ে আছে। তাদের দু'জনের ভালবাসার মধ্যেও সত্যিকারের ময়লা কিছু ছিল না এ কুন্দন সিং জানত। কিন্তু বসন্তীয়া আর তিতলিকে ছেড়ে সে থাকে কেমন করে? শেষে বসন্তীয়া একদিন মন স্থির করে ফেলল। সে মেয়ে নিয়ে তার মরদের কাছে ফিরে যাবে। বলদেও তখন ছুপায় থাকে। মেয়ের জন্য, মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই বসন্তীয়াকে যেতে হবে। মরদ যদি তাকে না নেয়, তাহলে তিতলিকে বাপের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে। কিন্তু তিতলির জীবন পরিচ্ছন্ন রাখতেই হবে।

কুন্দন সিং-এর বুক ভেঙে গেল। কিন্তু সে বাধা দিল না। তিতলি আর বন্তীয়াকে নিয়ে তোতারামই ছুপায় এলো। গ্রামে ঢুকেই বসন্তীয়া তোতারামকে বয়েল গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে সন্ধ্যের মুখে একলা মরদের ঘরে চলল।

...পরদিন। টেবিলের ড্রয়ারে কুন্দন সিং বসন্তীয়ার ছোট্ট একটা চিঠি পেল। কোন কারণে তার যদি কোনরকম অঘটন ঘটে, রহুয়া যেন তার মরদকে তিতলির বাপকে ক্ষমা করে, তার মাথায় যেন বদলার আগুন না জ্বলে।

চিরকুট পেয়ে কুন্দন সিং-এর মাথা খারাপ হবার দাখিল। ওটা যখন পেয়েছে তখন রাত। করার কি আছে। তার পরদিন সকালে তোতারামকে পাঠালো খবর নিতে। তোতারাম এসে দেখল বলদেওর ঘর তালাবন্ধ। সে বা বসন্তীয়ার কোনো পাত্তা নেই। তিতলির মৌসির হদিস পেয়ে সেখানে গিয়ে তিতলিকে পেল। শুনল, বসন্তীয়া এসে তিতলিকে বাপের কাছে রেখে সেই রাতেই ফিরে গেছে। আর তারপর থেকে বলদেও মল্লা নিজেও নিপাত্তা।

শোনামাত্র কুন্দন সিং বুঝেছে বড় রকমের অঘটন কিছু ঘটে গেছে। সে পাগলের মতো হয়ে উঠল। বলদেওর খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠালো। পুলিশকে খবর দেবে দেবে করেও দিল না। বসন্তীয়ার শেষ অনুরোধ মনে পড়েছে।

একদিন বলদেও নিজেই কুন্দন সিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালো। পাগলের মূর্তি, পাগলের চোখ। বলল, শুনলাম আমাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, আমিও ভাবলাম বোকার মতো পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ কি, তাতে আরো যন্ত্রণা। চলে এলাম।

পালা-গান লেখায় সিদ্ধহস্ত এই গুণী মানুষটাকে কুন্দন সিং এককালে ভালোবাসত। বসন্তীয়ার ওপর অত্যাচারের ফলে সেই ভালোবাসা ঘৃণায় এসে ঠেকেছিল। রুদ্ধশ্বাসে জিগ্যেস করল, বসন্তীয়া কোথায়?

—জঙ্গলে ঘুমোচ্ছে।

কুন্দন সিং আর্তনাদ করে উঠল, কোথাকার জঙ্গলে?

—ছুপার জঙ্গলে।

—তুমি তাকে খুন করেছ—বসন্তীয়াকে তুমি খুন করেছ?

—বসন্তীয়াই যে ভুল করল...আমি তার সঙ্গে একটাও কথা বলছিলাম না, গুম হয়ে বসেছিলাম। সে তিতলিকে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রেখে একটা শরাবের বোতল এনে আমার সামনে খুলে দিল। সেই বোতল শেষ হতে আমার মাথায় খুন চাপল।...আমি তাকে বেশি কষ্ট দিলাম না, এই দুই হাতে আর দশটা আঙুলের চাপে দুই এক মিনিটের মধ্যেই যা হবার হয়ে গেল। রাতের আন্ধেরিতে তাকে কাঁধে করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুঁতে রেখে এলাম।

এ-পর্যন্ত শুনে তিতলি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাতের মৃদু চাপে শাওন তাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করল। তোতারামকে জিগ্যেস করল, তারপর?

—কুন্দন সিং-এর মাথায় খুন চেপে গেল। মালিকের মন বুঝে ছাবুয়া আহির প্রস্তাব করল, একে এখন হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে চুনা কুটুরিতে ফেলে রাখা হোক, রাতের আন্ধেরিতে কোথাও গিয়ে কুঠার দিয়ে ওর হাত পা সব জিন্দা কেটে বস্তায় পুরে শেষে পুনপুর জলে ফেলে দিলেই হবে।

বলদেও আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। মিনতির সুরে কুন্দন সিংকে বলল, আমি তোমার হাতে মরার জন্য তৈরী হয়েই এসেছি—কিন্তু এত কষ্ট দিয়ে মেরো না, বসন্তীয়া এখনো আমাকে পেয়ার করে, তার আত্মা কষ্ট পাবে।

সঙ্গে সঙ্গে কুন্দন সিং ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল একটা। বসন্তীয়ার চিঠির সেই কথাগুলো যেন ফিসফিস করে কানে বাজছে।...রহুয়া যেন তার মরদকে—তিতলির বাপকে ক্ষমা করে, তার মাথায় যেন বদলার আগুন না জ্বলে।

কুন্দন সিং রাগে কাঁপছে আবার ঘেমেও উঠছে। আস্তে আস্তে তার গলা দিয়ে আগুনের ফুলকি ঝরল।—তোমাকে আমি এর থেকে ঢের বেশি কষ্ট দেব, তোমাকে আমি কিছুই করব না...তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাবে, তোমার ভিতরে যে আর্টিস্ট আছে সে তোমাকে কুরে কুরে খাবে, বিবেকের আগুনে সারে জিন্দ্‌গী তুমি জিন্দা জ্বলবে, তিলে তিলে মরবে—ছাবুয়া, নিকাল দে উসকো!

তোতারাম জানালো, পরে রহুয়া কুন্দন সিং তাদের বলেছে, বলদেওর কি দোষ, বসন্তীয়ার মতো বহু ঘর ছাড়লে যে কোনো মরদের মাথায় আগ জ্বলবে, তাকে গলা টিপে মারবে—কুন্দন সিং নিজে হলেও তাই করত।

...এর পরেই কুন্দন সিং তোতারামকে ছুপার গাঁওয়ে পাঠিয়েছে। তার পিয়ারের লোককে টেনে নিয়ে জব্দ করার জন্য ব্রিজমোহন তোতারামকে খুশি মনেই আশ্রয় দিয়েছে। কুন্দন সিং -এর হুকুমে ছুপায় তোতারামের আসল কাজ একটাই। তিতলির ওপর চোখ রাখা, কাউকে বুঝতে না দিয়ে তার দেখাশুনা করা, তার প্রত্যেক দিনের খবর রাখা। সে এ-যাবৎ তাই করে আসছে। কুন্দন সিং জানত বসন্তীয়ার এই রূপের মেয়ে বড় হলে অনেক গিধর আর হাঙরের তার দিকে চোখ যাবে। সেই বাচ্চা বয়েস থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত তিতলির সমস্ত খরচ ঠাকুর সাহেবই চালিয়ে আসছে। তিতলির তেরো চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত হীরা মল্লা ভাবত খরচ তিতলির বাপের কাছ থেকে আসছে। এক-কালে তো কম রোজগার করেনি, কাউকে জানতে দিতে চায় না বলেই তোতার হাত দিয়ে খরচ পাঠায়। কিন্তু তিতলির বয়েস চৌদ্দ পার হয়ে যেতে হীরা বুঝেছে বলদেওর সর্বস্বান্ত দশা, টাকার আর মদের জন্য সে-ই উল্টে তার ঘরে এসে ঝামেলা বাধায়। অথচ তখনো তিতলির খরচের বাবদই ফি মাসে আরো অনেক বেশি টাকা হাতে পাচ্ছে। ধূর্ত হীরা মল্লা তক্ষুনি ধরে নিয়েছে এখন এই টাকা আসছে ব্রিজমোহনের কাছ থেকে।...কারণ ততদিনে তার পেয়ারের ভাতিজা বাবুয়ার শ্যেনচক্ষু তিতলির দিকে পড়েছে। কিন্তু আরো দু'তিন বছর যেতে হীরা মল্লার সেই ধারণাও বদলেছে। সে বুঝেছে ব্রিজমোহন টাকা দিয়ে চলেছে নিজের লোভেই। এমন মেয়ে বয়েসকালে কি-রকমটি হবে সে-চোখ কি আর ঠাকুর ব্রিজমোহনের নেই! ফলে তিতলিকে নিয়ে হীরার লোভও দিনে দিনে বেড়েছে। ব্রিজমোহন তো আর কোনো শর্ত বা চুক্তি করে টাকা দিয়ে যাচ্ছে না—টাকা যে পাচ্ছে হীরা মল্লার তা স্বীকার করারই দরকার কি? পুরুষের মন তার খুব ভালো জানা আছে।

তিতলির বছর উনিশ বয়সের সময় তোতারামের মারফৎ হীরার কাছে ব্রিজমোহনের প্রস্তাব এসেছে। তিতলিকে সে রানীর হালে রাখবে, কত টাকা পেলে সে তিতলিকে ছেড়ে দেবে? হীরার মাথায় ততদিনে নথ-ভাঙানির আসর বসানোর প্ল্যান এসে গেছে। বাইশ বছর পর্যন্ত তিতলিকে ঘরে রাখার একটা অজুহাত দেখিয়ে সে জানিয়ে দিয়েছে, ওই বয়েসের পর নথ-ভাঙানির আসরে ঠিক হবে তিতলির মালিক কে হবে। হীরার আশা সেই আসরে রহুয়া ব্রিজমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সামর্থ্য কারো থাকবে না। ব্রিজমোহনও মোটামুটি নিশ্চিন্ত। এরপর তোতারামেরই মারফতে ব্রিজমোহনের বাগানবাড়িতে গোপনে হীরার সঙ্গে যোগাযোগ

আর কথা-বার্তা হয়েছে।

তিতলির খরচ শুধু নয়, তার বাপ বলদেওর খাওয়া-পরা মদের খরচ, বর্ষায় ঘর ছাওয়ার খরচও সব কুন্দন সিংই দিত। একমাত্র সে-ই জানত, পালক পিতার মতো তিতলির সমস্ত খরচ কে চালিয়ে আসছে। এই জন্যেই মেজাজ বিগড়লে বলদেও মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিত তার মেয়েকে সুখে রাখা হয়েছে কিনা—সন্দেহ হলে হীরার ওপর হম্বি-তম্বি করত। কিন্তু ভুল করেও কখনো কুন্দন সিং-এর নাম প্রকাশ করে নি। তোতারাম তাকে সমঝে দিয়েছিল, কুন্দন সিং-এর নাম একবার ফাঁস হয়ে গেলে রহুয়া টাকা দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দেবে।

...এ-দিকে হীরা মল্লার নথ-ভাঙানির আসর বসানোর প্ল্যান রেডি, তার ঢের আগেই তোতারাম আর কুন্দন সিংয়ের পাল্টা প্ল্যানও রেডি। কুন্দন সিং ততদিনে তোতারামের কাছ থেকে তিতলি আর ক্যাম্প ইন চার্জের সমস্ত খুঁটিনাটি শুনেছে। তোতারামের সজাগ দৃষ্টি তখন সর্বদাই শাওনের ওপর। ওদের দু'জনের পেয়ার খাঁটি কি মেকি সেটা বোঝার ওপরেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তিতলির কথায় সাইটের কাজে লোক নেওয়া, তিতলির অনুরোধে নিজের খরচে শাওনের অছুত এলাকায় পাকা গহেরা কুঁয়া করে দেওয়া, তিতলির কথাতেই জিপে করে লছমীকে পাটনায় নিয়ে গিয়ে সময়ে অপারেশন করিয়ে তাকে বাঁচানো, শাওনের গুটি-রোগের সময় তিতলির নিঃসংকোচ সেবা—এ-সব শুনে কুন্দন সিং-এরও বিশ্বাস হয়েছে, ওদের পেয়ার খাঁটি বটে। নথ -ভাঙানির আসর বসার দিন-কতক আগেই টিকাটি পণ্ডিতকে জানতে বুঝতে না দিয়ে দেয়ালির রাতে সেখানে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। এমন কি দু'দিন আগে টিকাটি পণ্ডিতের বাড়িতে ম্যাগনেসিয়াম তার আর কুন্দন সিং-এর বক্স ক্যামেরা পর্যন্ত মজুত। কুন্দন সিং-এর কতদূর পর্যন্ত মাথা যায় এই থেকেই বোঝা গেছে। ওকে হুকুম করেছিল, বিয়ের ফোটো তুলে নিবি, দরকার হবে...।

...তোতারামের বদ্ধ বিশ্বাস ছিল ব্রিজমোহন রাগে আর হিংসায় তার ফাঁদে পা দেবেই। দিয়েছে। আক্রোশ মাথায় চেপে বসতে প্রথমে কুন্দন সিংকে জব্দ করা, পরে শত্রুকে দিয়েই শত্রু শাওন ভার্মাকে ঘায়েল করার উৎসাহে আত্মহত্যার কথা বলে তিতলিকে তুলে আমার প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। তার আগে তোতারাম অবশ্যই পুরো একবোতল শরাব ব্রিজমোহনের পেটে চালান করেছিল।...আর তারপর তোতারাম যে প্রস্তাবই করেছে তাতেই ব্রিজমোহনের প্রচণ্ড উৎসাহ।

...ব্রিজমোহনকে কুন্দন সিং সাবধান করে দিযেছিল তার হয়ে কেউ যেন ফয়েসলা করতে না যায়, বলেছিল, অন্যের সাহায্যের দরকার নেই—ফয়েসলা যা করার সেরে উঠে ধীরে সুস্থে সে নিজে করবে—ততদিন পর্যন্ত শাওন ভার্মা বা তিতলির গায়ে যেন এতটুকু আঁচড় না পড়ে—ওদের দু'জনকে খুব নিশ্চিন্ত থাকতে দিলেই তাকে সাহায্য করা হবে। এরপর কেউ ওদের শারীরিক ক্ষতি করতে সাহস করবে না এ-বিশ্বাস কুন্দন সিং-এর ছিল। কারণ ব্রিজমোহনের দল ধরেই নিয়েছিল রহুয়া সময় বুঝে ভীষণ রকমের কিছু প্রতিশোধই নেবে। তারা কোন্ দিক থেকে শাওন ভার্মাকে ব্যতিব্যস্ত এবং অপদস্থ করার জন্য তৈরি হচ্ছে, তোতারামের মুখে এ-খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শুয়েই কুন্দন সিং দিল্লিতে তার এম পি ভাইয়ের কাছে লম্বা চিঠি

লিখে বিস্তারিত জানিয়েছে, সেই সঙ্গে শাওন ভার্মা আর তিতলির বিয়ের ফটো পাঠিয়েছে, আর সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাওন ভার্মাকে যাতে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হয় সেই চেষ্টা অবশ্যই করতে বলেছে। তারপর পাটনা থেকে ব্রিজমোহনের ভাগ্নে পবনকুমারকে ডেকে পাঠিয়ে তাকেও সব বলেছে, তার হাতেও শাওন আর তিতলির বিয়ের এক কপি ফোটো দিয়ে সময়ে ব্যবস্থা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে।

...প্রকাশ দীক্ষিত তদন্তে আসার পর কুন্দন সিং-এর পরামর্শমতো তোতারামই ব্রিজমোহনকে প্রস্তাব দিয়েছে, সাহেবকে লোহার গাঁওয়ের রহুয়ার কাছে নিয়ে যেতে। ব্রিজমোহন সানন্দে দীক্ষিত সাহেবকে সেই অনুরোধ তো করবেই। শাওন ভার্মা আর তিতলির সব থেকে জাঁদরেল শত্রু তো ঠাকুর সাহেবই...লোহার গাঁওয়ে কুন্দন সিং-এর কাছে আসার পরেই দীক্ষিত সাহেব যা বোঝার জলের মতো বুঝে গেছেন। তার সঙ্গে রহুয়ার এক ঘণ্টার ওপর পরামর্শ হয়েছে। তোতারাম সারাক্ষণই সামনে উপস্থিত ছিল। দিল্লির থেকে এই বিয়ের জন্য শাওন ভার্মাকে পুরস্কৃত করার চেষ্টা হচ্ছে দীক্ষিত সাহেবকে রহুয়া তা-ও জানিয়েছে। আর ইঁট সিমেন্টের কারবারী গণপত লালাকে সত্যি কথা কবুল করানোর ভারও সেই-ই নিয়েছে।

দীক্ষিত সাহেব এই লোকের সঙ্গে দেখা করেই সব থেকে খুশি। ফেরার সময় জিপে দু'তিন বার বলেছেন, একজন মানুষর মতো মানুষ বটে।

...এরপর গণপত লালাকে ডেকে পাঠিয়ে কুন্দন সিং কি বলেছেন তোতারাম জানে না। কেবল এটুকু জানে সেই রাতেই সে ক্যাম্পে প্রকাশ দীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করে সত্যি কথা কবুল করে গেছে।

পঞ্চ-এর বৈঠকের আগে প্রকাশ দীক্ষিত আরো একবার লোহার গাঁওয়ে এসে কুন্দন সিং -এর সঙ্গে পরামর্শ করে গেছেন। তখন অবশ্য তোতারাম ছিল না, কারণ সে তখন খুব সং গোপনে কুন্দন সিং-এর ভূমি-সেনাদের নিয়ে ছুপার মানুষদের তৈরি করতে ব্যস্ত। ঠিক হয়েছে, তিতলিদের অছুত এলাকার সকলে বৈঠকে আসার আর শাওন ভার্মার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার প্রতিশ্রুতি দেবে—কিন্তু একজনও আসবে না। এখন থেকে রহুয়া কুন্দন সিং আর তার সমস্ত ভূমি-সেনার শক্তি তাদের সহায়—ভয় পাবার কি আছে! আর দুঃসাহসের নজির দেখিয়েছে রামকেলি! মিথ্যে আদৌ বলেনি। এক সময় ব্রিজমোহন তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তার বাগানবাড়িতে ওকে একাধিকবার আনা হয়েছে। আর এখনো তার প্রতি আসক্ত ব্রিজমোহনের ভাতিজা বাবুয়া।

সভায় দাঁড়িয়ে অপমানের ওই চূড়ান্ত প্রহসন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ক্রুদ্ধ মুখে রহুয়া তার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে তাকে নিজের ভূমি-সেনাদের হাতে গছিয়েছে। তারা পূর্ব ব্যবস্থা মতো তাকে সোজা লোহার গাঁওয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছে। কুন্দন সিং-এর দয়ায় রামকেলিকে আর পতিতার জীবন যাপন করতে হবে না।

শেষে তোতারাম আবার ভেঙে পড়ে বলল, তিতলি, অসুস্থ শরীর নিয়ে ঠাকুর কুন্দন সিং সেদিন ছুপার ওই বৈঠকে না এলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যেত না। ডাগদার বারণ করেছিল, রহুয়া কান দিল না। কেবল বলত, হামারী তিতলি বিটিয়াকা জিন্দেগীসে কাঁটা

হটাইকে ফুঁলোসে ভর্ দেইকে যাইবু—স্বরগসে বসন্তীয়া দেখ্‌বু ওকরা বেটী খুশ রহে, আনন্দমে রহে। তিতলি, শেষের ক'দিন রহুয়া কেবল তোদের দু'জনের কথাই ভেবেছে, তোদের দু'জনের কথাই বলেছে—আমি তার গাড়ি নিয়েই তোদের নিতে এসেছি—সকলে অপেক্ষা করছে—আর দেরি করিস না, চল—যাবার আগে ছুপা থেকে তোর বাপকেও তুলে নিয়ে যেতে হবে—

তিতলির বুকের ভিতরটা কাঁপছে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে, দুই ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে...মাগো, সমস্ত পৃথিবীটাই এমন কাঁপছে কেন!

বুকের তলার কান্না বন্যার মতো চোখের পথে ধেয়ে আসছে, কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। তিতলি কাঁদতে পারছে না।

...একটু আগে আনন্দ করতে করতে হীরা মল্লা কুন্দন সিং-এর মৃত্যুর খবর দিতে এসেছিল। বলেছিল, লোহার গাঁওকা ঠাকুর কুন্দন সিংকা অন্তিম কাল ভইলা—খুশিসে হমারা অন্তরাত্মা এত্‌না খুশ হইলন যে তুহাকে কইসন বুঝাই—

বলদেও খানিক হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের কোণের দিকে গেছে—জঙ্গলে যাবার সময় যে ডাণ্ডাটা তার হাতে থাকে সেটা তুলে নিতেই হীরা মল্লা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে।

লাঠিটা ফেলে দিয়ে খানিক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলদেও জঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছে।

কুন্দন সিং-এর গাড়ি তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজা খোলা। ভিতরে কেউ নেই।

তোতারামের নীরব ইশারায় তিতলি আর শাওন তার পিছনে পিছনে জঙ্গলের দিকে চলল। তিতলির সমস্ত শরীর আবার শিরশির করে উঠল, কেঁপে কেঁপে উঠল। বাপু কেন এত জঙ্গলে যায়, কখনো সমস্ত রাত কাটিয়ে আসে, এ কৌতূহল অনেক দিনের। আজ আর কোনো কৌতূহল নেই, কিন্তু ভিতরটা এত উন্মুখ যে এত ধীরে নয়, ছুটে ভিতরে যেতে ইচ্ছে করছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেশ কষ্ট করে অনেকটা আসার পর সামনে একটা বড় ঝোপ। খুব সন্তর্পণে সেটা পেরিয়ে এসে তিনজনেই থমকে দাঁড়ালো। নির্বাক, নিস্পন্দ। সামনে একটা উঁচু ঢিপির মতো। পরিচ্ছন্ন। ঢিপির চারপাশও তকত ক। এই সকালেরই অনেক আধ-শুকনো ফুল চারপাশে ছড়ানো।

ঢিপির দিকে মুখ করে মাটির ওপর বসে আছে তিতলির বাপু বলদেও মল্লা। মনে হচ্ছে না এই নির্জনে সে একলা বসে আছে। বসে আর কোন একজনের সঙ্গে যেন কথা কইছে। এত তন্ময় যে পিছনে তিনজন দাঁড়িয়ে টেরও পায়নি।—এ বসন্তীয়া, তু ধরতি মাইয়াকা গোদ্‌মে শুত্ রহলী... শুনথই হীরা কা কহল? কুন্দন সিং বসে, তু শুনথই বসন্তীয়া? উকার সাথ হমার আখেরি খেল্‌না হইল, উ জিত্‌কে তেরা মেরা রাজা রহল—তোঁহার তিত্‌লিকা জিন্দেগী ও সোনাসে বনা দিহল আওর হমারকে আখেরিবার মুসকরাইকে চল্ গইল্অ—

অতবড় দেহের মাথাটা খানিক বুকের ওপর ঝুলে রইলো। ওই মাথা তুলে তারপর পিছনে ঘুরে তাকালো। দুই চোখ জবা ফুলের মতো লাল।

রাগ নয়, খুব ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, তোহলোগঁন হামে ঠাকুর সাহাবকা পাশ লেনে আইল?

তিতলির বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো চোখে জল আসছে না। টিপিটার দিকে চেয়ে আছে। ওখানে তার মা ঘুমোচ্ছে।

তোতারাম মাথা নাড়ল, এগিয়ে এসে বলদেওর একখানা হাত ধরল। —আওর দের না কর, ঠাকুর কুন্দন সিং তিতলি শাওন আর তোঁহার খাতির বহুত্ সময়সে শুত্ রহল্অ।

কোনরকম বাধা না দিয়ে বলদেও মল্লা উঠল। লাল আর ঘোলাটে অপলক চোখে শাওন ভার্মাকে খানিক দেখল।

দুপুর প্রায় তিনটে তখন। কুন্দন সিং-এর হাবেলীর সামনে বিশাল জনতা। আশ-পাশের সমস্ত গাঁয়ের মানুষ হাবেলীর সামনের এই বিশাল প্রান্তরে এসে মিশেছে। এদের বেশীরভাগই অতি সাধারণ মানুষ; গরিব মেহনতী মানুষ। এই জনতার ছুত-অছুত মিলে-মিশে একাকার। সব গাঁয়েরই গণ্যমান্য জনেরা এসেছে, ভূস্বামীরা এসেছে। তারা হাবেলীর ছাওয়ায় লোহার গাঁওয়ের লোহার মানুষকে শেষ বিদায় জানানোর অপেক্ষায় আছে।

হাবেলীর বাইরে সামনের দরজার সামনেই সাজানো চালিতে কুন্দন সিং-এর দেহ শয়ান। দর্শনার্থীদের সুবিধের জন্যে তাকে এখানে রাখা হয়েছে। এখানে ভিড় করতে দেওয়া হচ্ছে না, সার বেঁধে মেয়ে পুরুষেরা আসছে, দেখছে, শেষ প্রণতি জানিয়ে চলে যাচ্ছে।

খাটের হাত-কতক সামনে মাইক ফিট করা। বিশেষ কে এলো না এলো মাঝে মাঝে ঘোষণা করছে চুনীলাল মাস্টার। এ ছাড়া থেকে থেকে কেউ কেউ দু'চার মিনিটের জন্য মাইকে শোক-বার্তা জানাচ্ছে, কেউ বা একটু আধটু স্মৃতিচারণ করছে। এ-গাঁয়ের ভূমিসেনাদের অনেকেই মাইকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলছে।

হাবেলী ঘেঁষে ঠাকুর কুন্দন সি-এর অতিপরিচিত গাড়িটা আস্তে আস্তে আসতে দেখে সামনের বিশাল জনতা খানিকক্ষণের জন্য থমকে চেয়ে রইলো। ভূমিসেনাদের তরফ থেকে দু'তিনবার ঘোষণা করা হয়েছিল, ঠাকুর কুন্দন সিং-এর বিশেষ একজন আপনার জন আসছে, সকলে যেন শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে। এর মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয়তো আঁচ করতে পেরেছে কে আসছে। কানাঘুষায় শুনে থাকবে তোতারাম কোথায় কাকে আনতে গেছে। কিন্তু সামনের ওই বিষণ্ন জনতার কারোরই ধারণা নেই রহুয়া কুন্দন সিং-এর এমন কে আত্মজন আছে যার আসার খবর দু'তিনবার মাইকে ঘোষণা করা হল। রহুয়ার আত্মজন বলতে এম পি ভাই আর তার পরিবারবর্গ। তারা তো দু'দিন আগেই এসে গেছে। পাটনা থেকে এসেছে রহুয়ার স্নেহাস্পদ এম এল এ পবনকুমারও—সে-ও ঠাকুর সাহেবের সম্পর্কে কত দর্দ-ভরি কথা শুনিয়েছে সকলকে।

কিন্তু এখন ঠাকুর সাহেবের গাড়িতে কে এলো? কোথা থেকে এলো?

গাড়ি থেকে নামল তিতলি, বলদেও মল্লা, শাওন ভার্মা, তোতারাম।

জনতার মধ্যে বেশ কাছে যারা, তাদের চোখে দুটি মুখ কেমন চেনা চেনা লাগল। একটি মেয়ের মুখ আর একটি ছেলের মুখ কোথায় যেন দেখেছে। আজই যেন দেখেছে। হ্যাঁ, আজই সকালের কাগজে দেখেছে। ঠাকুর কুন্দন সিংয়ের ভূমি-সেনারা আজই কতগুলো খবরের কাগজ বিনে পয়সায় লিখি-পড়ি জানা লোককে বিলি করেছে। তাতে এক অছুত মেয়ের সঙ্গে এক ব্রাভণ বড় অফ্‌সর ছেলের বিয়ের ছবি ছিল। বিয়ের খবর ছিল। দিল্লির সমজদারির কথা ছিল। ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে অনেকটা সেইরকমই তো লাগছে!

...খাট ঘেঁষে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তিতলি দু'চোখ টান করে চিরঘুমে শয়ান ওই মানুষটাকে দেখছে। লম্বা পাতলা দেহ, ফর্সা মুখ, পাকানো গোঁপ, ঠোঁটের ফাঁকে একটু চাপা হাসির আভাস।...এ কি হল তিতলির! এ কবেকার দৃশ্য বিস্মৃতির অতল থেকে তার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠল?

...হ্যাঁ, মাসাউরির যে বাড়িটাতে তারা এখন বাস করছে, সেই বাড়ির সেই ঘর আর দাওয়াই তো বটে। একটা লোক, ঠিক এইরকম দেখতে—দুই হাঁটু আর দুই হাতে ভর দিয়ে মাটিতে ঘোড়া হয়েছে—তার পিঠে চেপে বসে আছে সাড়ে তিন বছরের এক মেয়ে, মুখে হ্যাট হ্যাট করছে, ছোট ছোট দু'পা দিয়ে তার পাঁজরে মারছে আর খিলখিল করে হাসছে। ওই মানুষ-ঘোড়া তাকে নিয়ে ঘরে আর বারান্দায় চক্কর দিচ্ছে।

—উতর যা বিটিয়া, হমার ঠেওনা (হাঁটু) ছিঁড় গইল।

কিন্তু সেই দুষ্টু মেয়ে নামতে রাজি নয়।

কোথা থেকে একজন ছুটে এলো, সেই একজনের মুখও চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল তিতলির—ওই ছোট্ট মেয়ের মা—রাগত মুখে একটানে তাকে লোকটার পিঠ থেকে ধুপ করে মাটিতে নামালো। ওইলোকের দুই হাঁটুর কাপড়ের ওপর রক্ত দেখে মেয়েটার মা আরো ক্রুদ্ধ।

...পরের দৃশ্য। ওই ঘোড়া-মানুষ বসে। তার ঠোঁটের ফাঁকে ঠিক এইরকম একটু হাসির রেখা।...মা তুলো দিয়ে তার দুই অনাবৃত রক্তাক্ত হাঁটুতে দাওয়াই লাগাচ্ছে—ওই লোক আর ছোট্ট মেয়েটার দু'জনেরই ওপর রাগে গজগজ করছে।

ধড়ফড় করে তিতলি যেন কোথা থেকে আবার এখানেই ফিরে এলো। আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে মাটিতে অন্তিম যাত্রীর পায়ের কাছে বসল। খুব সন্তর্পণে রাশীকৃত ফুলের স্তূপ সরিয়ে তার পা দু'খানা নিজের বুকের কাছে টেনে নিল। ওই পায়ের ওপর কপাল আর মাথা রাখল। অনড়, নিশ্চল, এতক্ষণের রুদ্ধ কান্না চোখের আগল ভেঙে মুক্তির পথ পেল। চোখের জলের ধারায় মৃতের দু'পা ভিজে যেতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পিঠে হাতের স্পর্শ পেয়ে তিতলি মুখ তুলল। দুলারী। হাত ধরে তাকে তুলল। ভূমিসেনারা দুলারী বহিনীকে বলছে কিছু। দুলারী তিতলিকে এনে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। শাওন ভার্মাকে ধরে আর একজন তার পাশে নিয়ে এলো।

দুলারী তিতলির কানে কানে বলল, সামনের এই হাজার হাজার লোকের বেশিরভাগই অছুত আর গরিব মানুষ। এদের তুই কিছু বল—

তিতলি সামনে তাকালো। চোখের জলে তখনো দু'গাল ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু অনন্য সুন্দর মুখখানা তপতপে লাল হয়ে উঠতে লাগল, জলে-ভরা দু'চোখ ঝকঝক করে উঠতে লাগল। মাইকে তার গলা মৃদু, তারপর ধীর নিটোল পরিপুষ্ট।

—কোই দেশপ্রেমিক কহা থা, দেশকা আত্মা গাঁওমে বাস করি। ও সাচ কহা থা। তো-লোগঁনকা মু পর ও আত্মাকা রূপ হম্ দেখতানি...

...হমারী অছুত আওর গরিব মা-বাপুলোগঁন, হমারী অছুত ভাই আওর বহিন,—ম্যাঁয় তিতলি হুঁ। ছুপা গাঁওকি এক অছুত লেড়কি তিতলি! কোই কভু না জানল দেড় সাল উমরোঁয়াসে কওন্ হামে লালন করল—কোই না জানল আজতক কওন হমার ইজ্জত আবরু রক্ষসা করল। ও হমারী পালন-পিতা লোহার গাঁওকি এ হি ঠাকুর কুন্দন সিং সাহাব! কোই না জানে সমাজকা গিধর আওর মগরকা (কুমারী) লোভী কালা হাতোঁসে রক্ষসা করকে মহাত্মা ঠাকুর সাহাব এ ব্রাভণ কুমার শাওন ভার্মাকা সাথ হমার সাদী দিহল, সাহারা দিহল, নয়ি জিন্দেগী বসাইলঅ—এক অছুত লেড়কিকা খাতির জাত-পাত ছোঁয়া-ছুঁতকা লড়াইমে সারে অছুত লোগঁনকে জিতাইকে নয়ি জিন্দেগীকা ডাগরোঁয়ামে (পথে) চড়াইল।

জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগল। তিতলি/শাওন! আজ আকবরমে তোঁহারা ফোটো দেখলী! খবর পড়লী! খবর শুনলী!

তিতলির কান্না-ভেজা মুখ আরো উদ্ভাসিত, আরো রক্তাভ। তার গলার আওয়াজ আরো হৃদয়স্পর্শী।—হাঁ মা-বাপুলোগঁন—হাঁ ভাই আর বহিন, হম্ ও অছুত কন্যা তিতলি আর এ ব্রাভণ কুমার শাওন। এ যুদ্ধ মে অছুত লোগঁনকা জয়কা লিয়ে ঠাকুর কুন্দন সিং আজ শহীদ দানবকুলোআমে প্রহ্লাদ বন গইলন। ইতিহাসোঁমে প্রহ্লাদ আওর হ্যায় কি নাহী—হম না জানথ, না জানিলা।...আজ ঠাকুর সাহাবকা দেহান্ত হইলন, লেকিন শহীদ কুন্দন অমর রহলন। হমার মা-বাপু-ভাই-বহিন, তো আপন জনমকা কসম খাইকে শপথ লিহ—অছুত লোগঁনকা গরিব লোগঁনকা এ বিজয়-ঝণ্ডা খাড়া রহে, উচা রহে—চাঁদ সূরযোয়াকা সাথী হইকে! উঁচা জাতকা গিধর আওর মগরোয়াকা ডরসে লালচোয়াসে এ ঝণ্ডা কভু না নিচে ঝুঁকে। তোঁহারা শপথ লিহ—ঠাকুর কুন্দন সিং হামলোগঁনকা আন্ধেরি জিন্দেগীমে যো নয়ি দিয়া জ্বলা দিহল্অ, উস রোশনী দিকে দিকে ছোটে। শপথ লিহ, এ রোশনী কভু না বুতে—কোই না বুতায়—কভু না, কভু না!

সভা স্তব্ধ। জনতা স্তব্ধ।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অশিক্ষিত উৎপীড়িত নির্যাতিত দরিদ্র আর নিচু জাতের মানুষদের বুকের তলায় হাজার বছরের অন্ধকার জীবনে এক বিচিত্র আলোকপাত হয়ে গেল বুঝি। মুখোশ-পরা অন্ধকারের হিংস্র শাবকরা সচকিত ভয়ার্ত। এই আলোর ঘায়ে তারা পালাবার পথ খুঁজছে।

তারা নিঃশব্দে পালাচ্ছে।

ব্রিজমোহনরা পালাচ্ছে। জনার্দন পূজারীরা পালাচ্ছে। মহাদেবও প্রসাদরা পালাচ্ছে। জগদেও মিশিররা পালাচ্ছে। বাবুয়ারা পালাচ্ছে।
